উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি

(বাংলা বিভাগ)

উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-পত্র

২০০৮

দেবেশ রায়ের তিস্তা কেন্দ্রিক উপন্যাস ঃ একটি সমীক্ষা

গবেষক

কেশব চন্দ্র দাস

সহ শিক্ষক, গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দির (উঃমাঃ), নদীয়া

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

STOCK TAKING - 2011

Th 80.4
[illegible]

223079

31 MAR 2010

Prof. Subodh Kumar Jash
DEPARTMENT OF BENGALI
NORTH BENGAL UNIVERSITY

Phone : (0353) 2699123
P.O. NORTH BENGAL UNIVERSITY
Raja Rammohunpur, Dist. Darjeeling
West Bengal, India, PIN-734013

Date : 15.09.2008

This is to certify that Sri Kesab Chandra Das has prepared his Ph.D. thesis entitled ***'Debesh Rayer Teesta Kendrik Upanyas : Ekti Samiksha'*** under my supervision for the award of Ph.D. Degree of the University of North Bengal. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulations in preparing the said thesis.

I further certify that this thesis has not been submitted in this form to any other University or Institution previously for Ph.D. Degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit, fit to be adjudicated for the award of Ph.D. Degree by the University of North Bengal.

Subodh Kumar Jash
15/9/08

(Prof. Subodh Kumar Jash)
Supervisor of Sri Kesab Chandra Das

Professor
Dept. of Bengali
N.B.U.

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা—	১ —৭
প্রথম অধ্যায় : দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, রচনা। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় ও তাঁর রচিত উপন্যাসের ধারায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'	৮ —৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' এর পর্ব-পরিচয়, কাহিনি-সংক্ষেপ। 'তিস্তাপুরাণ' এর পর্ব পরিচয়, কাহিনি-সংক্ষেপ।	৪৭—২৫৭
তৃতীয় অধ্যায় : তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার তিস্তাপুরাণ : রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার।	২৫৮—৩৪৬
চতুর্থ অধ্যায় : ভাষা : তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ-এর ভাষা, রাজবংশী ভাষা ব্যবহারে বিশেষত্ব।	৩৪৭—৩৯৮
পঞ্চম অধ্যায় : নদী তিস্তা : অন্যান্য বাংলা নদী-উপন্যাস : তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে নদী।	৩৯৯—৪৩৬
উপসংহার :	৪৩৭—৪৪৪
পরিশিষ্ট :	৪৪৫—৪৫৫

ভূমিকা

১৯৯১ সালে মে মাসের গরমের ছুটিতে কোন একদিন গয়েশপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে বই খুঁজতে খুঁজতে হাতে পেয়ে যাই দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' বইখানি। রিডিং রুমে বসেই 'হাটের পথে' ও ন্যাওড়া নদীর খেয়া' অধ্যায় দুটি পড়ে ফেললাম। পড়ে মনে হল এ এক নতুন ধরনের বই। বইখানি বাড়ি নিয়ে এলাম। যত পড়ি ততই আগ্রহ বেড়ে যেতে থাকে। আগ্রহের কারণ বইখানি উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষিতে লেখা, আমি নিজে উত্তরবঙ্গের মানুষ। বইখানির ভাষা বাংলা ও রাজবংশী। বইখানিতে মূলত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নানা সমস্যার কথা লিখিত। আমি নিজেও রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই বইখানি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতে লাগলাম। বইখানির নানা চরিত্র—বাঘারু, গয়ানাথ, আসিন্দির, মাদারি, মাদারির মা, রাধাবল্লভ, হৃষিকেশ তাদের কথা বার্তা চালচলন, হাবভাব আমার খুবই চেনা—একেবারে ছোট বেলা থেকে এদের যেন দেখে আসছি। বইখানিতে বিভিন্ন ঘটনা—যেমন জমি জরিপ, জরিপের কাজে নানা বাধা, তিস্তা ব্যারেজ নিয়ে বামফ্রন্ট-উত্তরখণ্ডের রাজনীতি, মিটিং-মিছিল, সম্মিলন, বন্যা এসব খুবই চেনা ও দেখা। এককথায় বইখানি একেবারে সমকালীন ইতিহাস। রাজবংশীদের নেতা পঞ্চানন মল্লিক ও সম্পৎ রায়কে তো সামনাসামনি দেখেছি। দেখা চরিত্র ও ঘটনা শিল্পরূপে পাঠ করার অনুভূতিই আলাদা।

তারপর সময় চলে গেছে তিস্তা প্রবাহের মতই। প্রায় বার বছর পর ২০০৩ সালে 'দে'জ পাবলিশিং'এর কলকাতাস্থ বইয়ের দোকানে বই কিনতে গিয়ে দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপুরাণ' বইখানি দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কিনেই ফেললাম। টানা তিন মাস ধরে বইখানি আদ্যন্ত পড়ে তিস্তাপারের বৃত্তান্তের সঙ্গে এর মিল কোথায় খুঁজতে শুরু করলাম। কিন্তু মিলের চেয়ে অমিলই চোখে পড়ল বেশি। 'তিস্তাপুরাণ'ও বাংলা ও রাজবংশী ভাষার মিশ্রণে লেখা। এখানেও রাজবংশী জীবন, এখানেও তিস্তা, বন্যা, এখানেও ছোটদাদা, বিসারু, বাঙ্কুরাম। তৎসত্ত্বেও এর আবেদন ভিন্ন। এ এক নতুন ধরনের পুরাণ।

মনে মনে ভাবলাম এই বই দুখানিকে নিয়ে তো গবেষণার কাজ করা যায়। আমার এই মনোভাব জানিয়ে ফোন করলাম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ প্রতীপ মজুমদারকে। তাঁকে এই বই দুইখানির বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলাম। তিনি আমাকে উৎসাহিত করলেন। তিনি নিজেও কোচবিহারের মানুষ। দেবেশ রায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে, তাঁর রচনা সম্পর্কেও ধারণা আছে। স্যারের উৎসাহ, আশীর্বাদ মনে করে গবেষণার ইচ্ছাটিকে সংকল্প হিসেবে গ্রহণ করলাম।

উত্তরবঙ্গ আমার জন্মভূমি। উত্তরবঙ্গের নদী, পাহাড়, জঙ্গল, মাটি ও মানুষের কাছে আমি চিরঋণী। ভাবলাম তাদের সম্পর্কে কিছু কথা বলে খানিকটা ঋণ স্বীকার করব। তাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে নাম নথিভুক্ত করে গবেষণার কাজে ব্রতী হলাম। আমার এই গবেষণা কাজে প্রথমেই স্মরণ করি নির্দেশক ডঃ সুবোধ কুমার যশের নাম। তাঁর সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধান আমার চিন্তাগুলিকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করতে সাহায্য করেছে। নিয়মিত যোগসূত্র রক্ষা করে তাঁরই নির্দেশ মত আমি আমার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছি।

আর যাদের কাছে আলোচনা শুনে, বই নিয়ে পড়ে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা সঞ্চয় করেছি তারা হলেন অধ্যাপক ডঃ রবিন পাল, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ মীর রেজাউল করিম। দেবেশ রায় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন ডঃ রণজিৎ মিত্র ও আবছার আহমেদ আর সর্বক্ষণ উৎসাহ দিয়ে প্রেরণা জুগিয়ে ও নিয়মিত আলোচনা করে যাঁরা কাজটি সম্পন্ন করতে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন আমার দুই বাল্য বন্ধু ডঃ সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস ও ডঃ সত্যেন্দ্র নাথ বর্মন।

আমার কর্মক্ষেত্র গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বসু ও সহ প্রধান শিক্ষক সুবীর মুখার্জী মহাশয় আমাকে কাজের সময় ও সুযোগ করে দিয়েছেন। সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার পত্নী অতসী দাস প্রুফ সংশোধন, গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করে দেওয়া নানা কাজে সহযোগিতা করায় আমি সহজে কাজটি করতে পেরেছি। যেসব গ্রন্থাগার থেকে বই, পত্রপত্রিকা ও নানা তথ্য পেয়ে গবেষণাকর্ম সমাধা করেছি, সেগুলি হল— গয়েশপুর পাবলিক লাইব্রেরী, গয়েশপুর নেতাজী বিদ্যামন্দির লাইব্রেরী, লিটল ম্যাগাজিন সেন্টার ও গবেষণা কেন্দ্র (কলকাতা), বাংলা একাদেমি লাইব্রেরী (কলকাতা), কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী (সেন্ট্রাল পার্ক), ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র টাউন লাইব্রেরী, বঙ্কিম ভবন, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া পৌর টাউন লাইব্রেরী, কাঁচরাপাড়া, স্টেট ইনস্টিটিউট অব পঞ্চায়েত এন্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট লাইব্রেরী কল্যাণী, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নজরুল ইসলাম সরণী কলকাতা ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

সর্বোপরি লিপিকর সুরজিৎ ঘোষ, তিনি কঠোরশ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে গবেষণা পত্রখানি মুদ্রিত করে দিয়েছেন। সে জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পঞ্চাশের দশক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের উত্তেজনা, নতুন মূল্যবোধ ইত্যাদি হল পঞ্চাশের দশকের পটভূমি। এই যুগ পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে যে ক'জন কথাসাহিত্যিক এই দশকে প্রাথমিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, পরবর্তী ষাট-সত্তর

দশকে, এমনকি এখনও অনেকে সার্থক ভাবে লিখে চলেছেন তাঁদের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবী, বরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মতি নন্দী, কবিতা সিংহ, আনন্দ বাগচি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ প্রতিনিধিস্থানীয়।

পঞ্চাশের দশকের এই প্রতিভাবান লেখকেরা তাঁদের নিজস্ব বিষয় ও শৈলীতে বাংলা কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে চলেছেন। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিজীবন ও রচনা সম্পর্কে গবেষণা খুবই কম হয়েছে। কাউকে কাউকে নিয়ে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পেলেও অনেকে তার বাইরে রয়েছেন। দেবেশ রায় তার মধ্যে একজন। অথচ পঞ্চাশের দশকের কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে দেবেশ রায় একটি স্বতন্ত্র ধারা। তিনি একাধারে গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, সম্পাদক, সাংবাদিক, উপন্যাসতাত্ত্বিক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্প উপন্যাস তাঁর কাহিনি বৃত্ত প্রধান না হয়ে হয়েছে মনন ঋদ্ধ। নির্মম জটিল বাস্তব অনুভবের গাঢ়তায় নির্মিত তাঁর কাহিনি, অ্যাখ্যান, বৃত্তান্ত। সময়ের পরিবর্তন মানুষকে নিয়ত বদলে দিচ্ছে, বিশ্বায়ন এসে ঢুকে পড়েছে মধ্যবিত্ত, গ্রাম্য জীবনের হেঁসেল ঘরে সেই বদলের চিত্র বর্ণিত হয়েছে তাঁর গল্প উপন্যাসের নতুন ফর্মে। তাঁর রচনার মূল বিষয় মানুষ, নাগরিক ও গ্রাম্য উভয় স্তরের মানুষ। এই মানুষের কথা তিনি যে ভাষায় লেখেন তারও একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের চেয়ে তিনি সর্বাধিক অনুপঙ্খ তথ্যসহ ঘটনা বা আখ্যানের বর্ণনা দিয়ে যান। সে জন্য তা হয়ে ওঠে চিত্রল ও সজীব।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষিতে রচনাগুলিতে রাজবংশী, মদেশিয়া, পূর্ববঙ্গীয় ভাটিয়া মানুষের ভাষা এসেছে বর্ণনায়, কথোপকথনে। সেজন্য তাঁর শিল্পবাচন হয়ে উঠেছে আরও বাস্তব ও সুস্পষ্ট। সেজন্য দেবেশ রায়কে নিয়ে গবেষণা করা একটি সাংস্কৃতিক দায় মনে করে আমি তাঁর সাহিত্য কর্মের বিশেষ একটি দিক তিস্তা কেন্দ্রিক উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'র ওপর একটি সমীক্ষার কাজে ব্রতী হয়েছি। বিষয়টিকে গবেষণাকর্মে আনার জন্য নিম্নরূপে অধ্যায় বিভাজন করেছি।

প্রথম অধ্যায় ঃ দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন, রচনা। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় ও তাঁর রচিত উপন্যাসের ধারায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'এর পর্ব-পরিচয়, কাহিনি-সংক্ষেপ। তিস্তাপুরাণ এর পর্ব-পরিচয়, কাহিনি-সংক্ষেপ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার

তিস্তাপুরাণ : রচনা রীতি ও স্বরূপ বিচার

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ভাষা : তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ-এর ভাষা, রাজবংশী ভাষা ব্যবহারে বিশেষত্ব।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ নদী তিস্তা : অন্যান্য বাংলা নদী-উপন্যাস : তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে নদী।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপসংহার : অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়সমূহের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে গবেষণা কর্মের সিদ্ধান্ত রচনা।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথমেই আছে দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন। তাতে তাঁর জন্ম, বাল্যকাল, শিক্ষা, রাজনৈতিক জীবন, সাংবাদিক জীবন, গল্পকার ও ঔপনাসিক দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এরপর সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ এর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত রচনার উদ্দেশ্য এবং প্রায় ২০ বছর পর ফের কেন তিস্তা-কেন্দ্রিক আরেকটি উপন্যাস 'তিস্তাপুরাণ' লিখলেন সে সম্পর্কে কিছু কথা।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি গ্রন্থপরিচিতি। যে দুটি গ্রন্থ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' গবেষণার মূল বিষয় সেই উপন্যাসদুটির কাহিনি সংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে মূল বইয়ের ক্রম অনুসরণ করে। বই দু'খানি পর্বভিত্তিক। তাই পর্বপরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রতিটি পর্ব এবং পর্বের অন্তর্গত অধ্যায়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এবং কোন্ পর্বে পৃষ্ঠাসংখ্যা কত তাও দেখানো হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আছে উপন্যাস দু'খানির রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার। উপন্যাসের বিষয়কে বলবার ধরনই হল রচনারীতি। প্রচলিত প্লট, কাহিনি, চরিত্র সৃষ্টির প্রাধান্য নয়। আদি, মধ্য অন্ত্য'র ধরন নয়। এপিসোডিক, কথান্তর, কথা বিস্তার, বৃত্তান্তর, অনুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশেষ ধরনের ভাষা প্রয়োগ, দেশীয় গল্প কথকতার ভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন রচনা রীতির আলোচনা করা হয়েছে উভয় উপন্যাসে।

স্বরূপ বিচারের ক্ষেত্রে উপন্যাস দু'খানি কোন্ গোত্র বা শ্রেণিভুক্ত তা আলোচিত হয়েছে । সে জন্য উপন্যাসের মূল বিষয় বলতে গিয়ে আরও নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যা মূল বিষয়েরই সহায়ক। বিভিন্ন গোত্রের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করে উপন্যাস দু'খানির নানা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন জাতি বা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তা বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ভাষা নিয়ে। দেবেশ রায়ের এই দুই উপন্যাসের ভাষার বিশেষত্বে বাংলা ও রাজবংশী ভাষায়

লিখিত উপন্যাস দু'খানিতে বর্ণনার ভাষা, চরিত্রের সংলাপ, স্বগতোক্তি ইত্যাদি কীভাবে একটি নতুন ভাষার ছাঁদ তৈরি করেছে তা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজবংশী ভাষাই বা কীভাবে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়ে কথায় নতুন নতুন অর্থের স্তর তৈরি করেছে, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বহুস্বর সৃষ্টিতে সংলাপের ভাষা কতখানি সার্থক হয়েছে তাও দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বাংলা কথা সাহিত্যের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'গঙ্গা' উপন্যাসের সঙ্গে দেবেশ রায়ের নদী কেন্দ্রিক উপন্যাস তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ-এর তুলনা মূলক আলোচনা। এছাড়া উত্তরবঙ্গের নদী, তিস্তা নদীর আলোচনা, সবশেষে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে তিস্তা নদীর ভূমিকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে অধ্যায়-ভিত্তিক বিষয় সমূহের পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা বিষয়ে সিদ্ধান্ত। অধ্যায়টি গবেষণা কর্মের উপসংহার।

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' বাংলা কথা সাহিত্যের ধারায় অনন্য। আমি দেখাতে চেয়েছি দেবেশ রায়ের নিজের উপন্যাস ধারাতেও এ উপন্যাস দুটির স্থান সম্পূর্ণ আলাদা। 'যযাতি' থেকে তার উপন্যাস লেখার যে ধারাটি তিনি প্রবর্তন করেছেন তাতে দেখা গেছে যতগুলি উপন্যাস তিনি লিখেছেন তার প্রত্যেকটির বিষয় যেমন আলাদা, বিষয় উপস্থাপনের ভাষাও তেমনই আলাদা। তবে লেখার রীতি অনেকটাই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। কিন্তু তিস্তাপারের বৃত্তান্তে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন এক সম্পূর্ন আলাদা রীতি। ছোট ছোট এপিসোড, যা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, এমনকি যেগুলির কিছু কিছু অন্যান্য পত্র পত্রিকাতেও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে সাজিয়ে, আভ্যন্তরীন সম্পর্কযুক্ত করে গড়ে তুললেন মহাকাব্যেপম উপন্যাস যা গড়নে নবীন। ইতিপূর্বে এ ধরনের উপন্যাস বাংলা কথা সাহিত্যে আর আসেনি, তার নিজস্ব রচনা ধারাতেও আসেনি। তিস্তাপারে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তক্ষেপে প্রাকৃতিক পরিবেশের বদল ঘটে যাওয়ায় তার প্রভাবে কীভাবে মানুষের প্রাকৃতিক জীবন বদলে যাচ্ছে সে কাহিনি বিবৃত হয়েছে। বন পাহাড় নদীর সাথে সহাবস্থানে প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির মতই যে রাজবংশী, মদেশীয়া, ভাটিয়া, প্রভৃতি মানুষ এতদিন তাদের জীবন জীবিকা, রীতি নীতি, উদ্‌যাপন করে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে তিস্তার ওপর ব্যারেজ তৈরিতে সেই প্রাকৃতিক তিস্তার মৃত্যু ঘটে যাবে। ইতিহাস ও ভূগোল দুইয়েরই বদল হয়ে যাবে। ব্যারেজ তৈরিতে বন কাটা পড়বে, নগর নির্মাণ হবে, বনের পশুরা নতুন বনে চলে যাবে। প্রাকৃতিক বনের বদলে মানুষের হাতে

তৈরি হবে তাদের প্রয়োজনের বন, যা থেকে কল কারখানার কাঠ পাওয়া যাবে। ব্যারেজের জলে জমি উর্বরা হবে, নতুন ধরনের চাষে রাসায়ণিক সারের ব্যবহার,-হাইইল্ড ধানের চাষ হবে।

ফলে বিঘা প্রতি ১৫/২০ মন ধান হবে, মানুষ কম জমিতেই বেশি ফলন পাবে। ফলে গয়ানাথের মত জোতদারদের বেশি জমি রাখারই প্রয়োজন হবে না। কৃষক সমিতির রাধাবল্লভ, হৃষিকেশদের সঙ্গে আর গয়ানাথের সংঘর্ষ হবে না জমি নিয়ে। বরং এরা ধানের বেশি দাম আদায়ের জন্য একত্রে রাস্তা রোকো আন্দোলনেও সামিল হতে পারে। কিন্তু বাঘারু, মাদারি, মাদারির মা যারা একেবারেই প্রাকৃতিক জীবন কাটিয়েছে। কোন অর্থনীতি যাদের কোন দিন স্পর্শ করেনি। দারিদ্র্য সীমার নিচের নিচে যাদের অবস্থান, এই উন্নয়ন বা পরিবর্তন তাদের কোন কাজে লাগবে? ভারতের ১০০ কোটির দেশের ৬-৭ কোটি যারা বাঘারু, মাদারি, মাদারির মা'র মত তারা বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি নীতি, শিল্প নীতি, কোন কিছুর সুফলই পাবে না। মাদারির মা তার ওই শ্যাওড়াঝোরায় পাতার ঘরে ধীরে ধীরে মরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তার সামনের রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যে ভারতবর্ষ যাতায়াত করে তারই সামনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর বাঘারু-মাদারিরা মানুষের তৈরি নদী ও বন ছেড়ে নতুন নদী বনের খোঁজে হাঁটতেই থাকবে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' লেখার পর তিনি আরও অনেক কিছু লিখেছেন কিন্তু সেগুলি এরকম ব্যাপক বিস্তৃত পটভূমি নিয়ে নয়। এমন মহাকাব্যিক বিস্তার সেগুলির মধ্যে নেই। প্রায় ২০ বছর পর তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মত আর একখানি মহাকাব্যিক উপন্যাস তার হাতে রচিত হল 'তিস্তাপুরাণ'। পুরাণে যেমন সৃষ্টি, প্রলয়ের পর নব সৃষ্টি, বংশ বর্ণন, মন্বন্তর, চৌদ্দ মনুর শাসন বিবরণ, পৌরাণিক রাজগণের আখ্যায়িকা — ঠিক তেমনি তিস্তাপারের তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের জন্ম-মৃত্যু-সংস্ক্রিয়া, বংশবর্ণন, দৈনন্দিন—আহার, শোওয়া-বসা, পার্বণ, রীতিনীতি, গান, ছড়া, ফাকালী, ছিলকা, প্রবাদ, রসরসিকতা, রাজনীতি, খরা-লেভি, জমি দখল, জমির পাট্টা ও বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

আলোচিত হয়েছে একই রীতিতে - এপিসোডিক, কথান্তর, বৃত্তান্তর, কথার বিস্তার, অনুপুঙ্খ বর্ণনা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ভাষার ছাদ তিস্তাপারের বৃত্তান্তের চেয়েও ভিন্ন প্রকৃতির। সহজ বাক্য কিন্তু ব্যঞ্জনায় জটিল। তিস্তাপুরাণের মূল প্রতিপাদ্য পুরাণের মত জীবনের নানা যুদ্ধ জয় পরাজয়, শেষে শান্তির খোঁজে যাত্রা। এখানে ছোট দাদা যাচ্ছে সেই শান্তির খোঁজে 'খিদার পাকে'। এখানে একটা গোতের ক্রম পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় নতুন রাস্তা, নতুন গাড়ি, যানবাহন, নতুন চাষ, বিঘায় ১৫ বা ২০ মন ধান,

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা, গ্রামে গ্রামে স্কুল, মেয়েদের পোশাক আশাকে পরিবর্তন, জীবনচর্চায় পরিবর্তন। কিন্তু তবু এ উন্নয়নে অর্থাগম হবে, দারিদ্র্য ঘুঁচবে না। প্রকৃত শান্তির জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে। হতে পারে সে অপেক্ষা কয়েক মানব জন্ম।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলার জন্য লেখককে এক বিশেষ ভাষারীতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। বাংলা ও রাজবংশী ভাষার যথোপযুক্ত ব্যবহারে উপন্যাসটির বিষয় সজীব ও গতিশীল হয়ে উঠেছে।

বর্ণনার ভাষা বাংলা। চলতে চলতে রাজবংশী বাচনের সহায়তায় এক নতুন রূপ ধারণ করেছে। কথোপথন বা সংলাপে রাজবংশী ভাষার ব্যবহার বক্তব্যকে বহুস্বরিক করেছে। অর্থকে দু'তিনটি স্তরে নিয়ে গেছে। রাজবংশী ভাষা ছাড়াও মদেশিয়া, ভাটিয়া, ভাষারীতি, সংলাপ, বক্তব্যকে অধিকতর বাস্তব করে তুলেছে।

তিস্তাপুরাণ-এর ভাষা আপাতসহজ হলেও ভাব অত্যন্ত জটিল। বিশেষ ভাবে পাহাড়ে বানা ঝুলে থাকা, জননী কাউঠানী প্রসঙ্গ, নদী খুঁজতে ঘাটোয়ালের গল্প, তিস্তার চরে হাতির ডুবে যাওয়া, বুড়িমার বিশাল গোত ইত্যাদি মিথযুক্ত কথা গুলি উপন্যাসখানিকে ভাবগত জটিলতার শীর্ষে নিয়ে গেছে। এই জটিলতার মধ্যেই ব্যক্ত হয়ে আছে রাজবংশী সমাজ। তাদের সহজ সরল জীবন পুরাণের মত জটিল ও পূর্বতন।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' দেবেশ রায়ের উপন্যাসের ধারায় দুটি ভিন্ন রীতির, ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাস। সেইসঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ধারায়, বিশেষত পঞ্চাশ দশকের কথা সাহিত্যের ধারায় দেবেশ রায় যে একটি স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা এবং এই উপন্যাস দু'খানি যে সেই স্বতন্ত্র ধারার নবতম ফসল, সে কথা গুলি সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে কেন্দ্রস্থ করার চেষ্টা করেছি।

ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ

দেবেশ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন, রচনা।
ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় ও তাঁর
রচিত উপন্যাসের ধারায়
'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ'

প্রথম অধ্যায়

দেবেশ রায় : শৈশব—কিছু স্মৃতি

দেবেশ রায়ের জন্ম ১৯৩৬, ১৭ই ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। পিতা, ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় (১৯০৫-১৯৬৬)। মাতা অপর্ণা (১৯১২-১৯৯৮)। পিতামহ-উমেশ চন্দ্র রায় (১৮৬৪-১৯৪৪)। ইনি ১৮৮৪ সালে বি.এ পাশ করে বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। ১৯১৮ সালে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

মাতামহ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মাতামহী সরলা সুন্দরী (?-১৯৩৯)। ইনি ১৮৯২ সালে প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে 'এনট্রান্স' পাশ করেন। বিয়ের আগে।

দেবেশ রায়ের স্ত্রী কাকলি রায়, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী। পুত্র দেবর্ষি রায়। ডাক নাম তিতির। 'দেবর্ষি' নামটি দিয়েছিলেন লেখক বন্ধু, বিশিষ্ট লেখক দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখকরা চার ভাই—দিনেশ চন্দ্র রায় (প্রয়াত) , দেবেশ রায়, সমরেশ রায় ও সিদ্ধার্থ রায় (অকাল মৃত্যু)। তিন বোন।

তাঁর শৈশব কেটেছে পাবনার ঐ বাগমারা গ্রামে। "দাদুর বোন রাঙাদিদিমার জমিদার বাড়ি, কারণ তার আগের যে বাড়ি, বাগমারার বাড়ি, সেখানেই আমার জন্ম, হয়ত অবশেষ কিছু মনে লেগে থেকে গেছে—বাড়ির, বাগমারার বাড়ির উত্তর দিকে একটা বেশ উঁচু ঘরের পেছনে খুব বড় বড় গাছে ঘেরা অন্ধকার জলের একটা গোপন পুকুর" ১

তাঁর স্মৃতি কথা মূলক প্রবন্ধ 'জলের মিনার জাগাও' এ তিনি লিখেছেন—"আমাদের গ্রাম ও বাড়ি ছিল যমুনা নদীর পারে। যমুনা ভাঙ্গনের নদী, প্রতি বছরই পার ভাঙত। যে পাড় ভাঙত তার গ্রামের পর গ্রাম যমুনায় চলে যেত, চাষ ক্ষেত থেকে পাকাবাড়ি। বর্ষার আগে বোঝা যেত না যমুনা এবার কোন পাড় ভাঙবে। ব্রহ্মপুত্রের একটা শাখা যমুনা, পাবনা জেলার দক্ষিণ পুবঘেষে পাবনা জিলারই দক্ষিণ পুব বিন্দুতে পদ্মায় পড়েছে। পদ্মা আবার পাবনা জিলার দক্ষিণ পশ্চিম দিয়ে যমুনার দিকে নেমেছে। আমাদের গ্রাম ছিল পাবনার সবচেয়ে পুবে আর পাবনার সবচেয়ে পশ্চিমে ছিল ঈশ্বরদি, সারা, পাকাশি।" ২

সাত বছর বয়সে দেবেশ রায় ওদেশ থেকে জলপাইগুড়িতে চলে আসেন। কাজেই বাংলাদেশ সম্পর্কে তেমন কোনো প্রখর স্মৃতি তাঁর নেই। থাকার কথাও নয়। তাছাড়া অহেতুক 'নষ্টালজিক' হওয়াও তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি লিখেছেন—"পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে আছেন, তাঁরা বাংলাদেশকে এক স্থায়ী

স্মৃতিদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত করে নিয়েছেন। আমি নিজেকে এই আবেগগড্ডল থেকে বাঁচাতে চাই।" ৩

সেজন্য বার দুয়েক বাংলাদেশে গিয়েও তিনি দেশে যান নি। তবে কিছু স্মৃতি প্রায় সত্তর বছর বয়সে এই প্রবন্ধ লিখবার সময় পর্যন্ত মনে পড়ে। 'বাগমারার বাড়ির কোনটা সম্মুখ, কোনটা পেছনে সে সব নিয়ে আমার মনে কোন ছবির টুকরোও নেই।' কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে গাছ-গাছালি ঘেরা একটা কাল দীঘি। সেই দীঘির জলে কেউ তাকে নিয়ে গিয়ে আঁজলায় জল তুলে তার চোখে মুখে সাপ্‌টে দিয়ে আঁচলে মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল। 'তার আঁচলে একটা গন্ধ ছিল—জলকাদা থেকে বহু ব্যবহৃত কাপড়ে লেগে যাওয়া পুরোনো গন্ধ।' সেই গন্ধও তাঁর স্মৃতিতে রয়েছে।

মনে আছে নদীতে বাড়ি ভেঙ্গে যেতে পারার উদ্বেগে ব্যস্ত দাদুকে, ব্যস্ত বাবাকে, বিপদের সময়ে ধৈর্যশীলা ছিপছিপে গড়ন ঠাকুমাকে, যার এই মহৎগুণ লেখকের মা'ও পেয়েছিলেন তার শাশুড়ির কাছ থেকে।

লেখকের মনে আছে লালচাঁদ দাদাকে, মুসলমান বাড়ির কর্তা স্থানীয় তার ছেলে রমজান যিনি জলপাইগুড়ির বাড়িতেও ছিলেন এবং ভাইদের দেখাশুনা করতেন।

দেবেশ রায়ের স্কুল জীবন ও কলেজ জীবন কাটে জলপাইগুড়িতেই। ১৯৪৩-এ তিনি সাত বছর বয়সে বাগমারার বাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসেন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে ১৯৫২ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করেন এবং আনন্দ চন্দ্র কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ১৯৫৬-তে বাংলায় অনার্সসহ বি.এ পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন এবং ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ পাশ করেন। এরপর আবার জলপাইগুড়িতে ফিরে যান এবং আনন্দ চন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৭৫ সাল, কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করেন। কলকাতায় এসে নতুন কর্মক্ষেত্র হিসেবে 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স'-এ যোগ দেন।

পুরস্কার : ১৯৮৯ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদ দ্বারা তিনি 'ভুয়ালকা' পুরস্কার পান। ১৯৯০ সালের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার জন্য পান 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কার।

অধ্যাপনা ছাড়া তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির প্রায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে সারা জলপাইগুড়ি জেলায় নেতৃত্ব দেন।

দেবেশ রায় : রাজনৈতিক জীবন

দাদা দিনেশ চন্দ্র রায়ের মাধ্যমে বাড়ির পরিবেশে রাজনীতির হাওয়া ঢুকেছিল লেখকের বাল্য বয়সে। সেই বাল্য বয়সেই তিনি কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কমিউনিস্ট আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর সম বয়সী বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক সময়েই তাকে সরে থাকতে হত। তিনি লিখেছেন—'ছোট জলপাইগুড়ি শহরে ঐ বয়সে কম্যুনিষ্ট খ্যাতি অর্জন গৌরবের ছিল না বরং সমবয়সীদের ঠাট্টা তামাশার লক্ষ্য হতে হত।' তবে সামাজিক সাংস্কৃতিক পারিবারিক কারণে বড়দের প্রশ্রয় ও প্রশংসা পেতেন।

কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তিনি এ্যারেস্ট হন। এবং জলপাইগুড়ির রাজনীতির অঙ্গনে ঐ বয়সেই একটা জায়গা করে নেন। ১৯৫০-এ জলপাইগুড়ি মাদ্রাসার মাঠে কমিউনিস্ট পার্টির একটি জনসভা হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে পার্টি আইনী হওয়ার পর জলপাইগুড়িতে এটাই প্রথম জনসভা। মাঠের মাঝখানে একটি লাল ঝান্ডাপোতা, একটু দূরে অনিল মুখার্জী বসে আছেন। লোকজন নেই। হয়ত সাহস করে কেউ এগিয়ে আসতেও চান না। লেখক ঐ কিশোর বয়সে একা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যান ঐ লালঝান্ডা কিংবা অনিল মুখার্জীর দিকে। এমনি ছিল তাঁর আদর্শের প্রতি আনুগত্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশ কংগ্রেসে স্তালিন উদঘাটন, ৪৭'এ দেশভাগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত সৈন্যের প্রবেশ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা কমিউনিস্ট পার্টিকে নানা প্রশ্নের সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু লেখকের উৎসাহ তাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। বরং আরও বেশি করে পার্টির কাজে মনযোগী হন।

'৬২ সালের অক্টোবরে চীন আসাম সীমান্তে এসে গেল। কমিউনিস্ট পার্টিকে অনেকটা বেকায়দায় ফেলল। "১৯৬২-র প্রথমে নির্বাচন, শেষে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ—রাজনীতি আমার ওপর সমুদ্রের ঢেউ এর মত শ্বাসরোধী ঝাঁপিয়ে পড়ল। অথচ তখন তো কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে দুর্বিপাকের কাল।" ৪

এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে গেল। সি পি আই ভেঙ্গে আর একটি পার্টির জন্ম হল সি পি আই (এম)। লেখক মূল পার্টি সিপিআই-তেই রয়ে গেলেন। এবং আরও বেশি করে পার্টিকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। পার্টির কাজে রাজবংশী জন সমাজে তিনি খুব বেশি করে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

"আমি খুব ছোটবেলা থেকে কমিউনিস্ট পার্টি করছি। কমিউনিস্টদের মধ্যেই বরাবর আছি, কখনো বাইরে থাকিনি। আমি প্রথম এ্যারেস্ট হয়েছিলাম ১৪ বছর বয়সে, ১৯৫০-এ, কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হলে।" ৫

"কিন্তু '৬২-র চীন ভারত সীমান্তের ঘটনার ফলে পার্টি যখন ভাঙছে তখন ঘটনা চক্রে জলপাইগুড়িতে আমি প্রায় একক এবং সম্পূর্ণ একা। বাকি যারা সিপিআই-তে এসেছিলেন তারা কিছু পরে এসেছিলেন। প্রায় বছর দুয়েক প্রবল রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক একটি লড়াই গেছে। এটা আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।"৬ এরপর তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৬৫'র দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধা কী জিনিস কত ভয়ঙ্কর তা সরাসরি উপলব্ধি করেছেন মানুষের মধ্যে কাজ করবার ফলে। কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার ঝগড়াঝাটি গোলমাল ও ক্ষুধা এই দুটো জিনিস সে সময় তার অভিজ্ঞতাকে নতুন রূপ দিয়েছিল।

৬৫-র দুর্ভিক্ষ কাটতে না কাটতেই ৬৭'র নির্বাচন এসে গেল। এই নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলো। কিন্তু এরকম একটা অবস্থার জন্য কমিউনিস্ট বা বামপন্থীরা প্রস্তুত ছিল না। খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই এই জয় লাভ। 'জনগণ' ও 'ইতিহাস' যেন কথা বলে উঠল।

"আমরা সত্যি নিজেদের এই আরম্ভক্ষণের কর্মী বলে আবিষ্কার করেছিলাম।" ৭

নির্বাচনের আগে ও পরে তিনি রাজবংশী সমাজের সঙ্গে বেশি করে সম্পর্কিত হতে থাকেন। পার্টির কাজে রাজবংশীদের বাড়ীতে যাওয়া, থাকা, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের অংশীদার হওয়া এক কথায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে থাকেন। তাতে রাজবংশী ভাষাটিও তাঁর আয়ত্বে চলে আসে।

"তখন আমি গ্রামে পড়ে থাকতাম এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে রাজবংশী ভাষা শিখে ফেললাম। ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করতে পারতাম।" ৮

১৯৬৭তেই প্রথম ভারতের অনেকগুলি রাজ্যে অনেকগুলি দলের সরকার ও কেন্দ্রে এক দলীয় সরকার দেখা গেল। '৬৭ থেকে '৭৭ এই পুরো দশকটাতেই এই অবস্থা চলতে থাকে। "আর '৬৭ থেকে '৭৭ কী এক আক্রমণের দশক, বামপন্থীদের আত্মহননের দশক, ভুল যুদ্ধে, ভুলপক্ষে আত্মবিসর্জনের দশক।" ৯

'৬৭-র সরকার কিছুদিনের মধ্যে ভেঙ্গে গেলে ১৯৬৯ এ প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে আবার যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। কিন্তু '৬৯-এর নির্বাচনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও তার সহযোগী শক্তিগুলি ক্লিন্ন আত্মকলহে মেতে উঠল।' নকশাল বাড়িতে সৃষ্ট নক্শাল আন্দোলন সমাধান করতে পারল না যুক্তফ্রন্ট সরকার। '৬৭ থেকে ৬৯-র প্রতিরোধ আন্দোলন পাল্টেআক্রমণের আন্দোলনে রূপ নিল। 'সিপিআই (এম) ও নক্শালরা সম্মুখ যুদ্ধে আটকা পড়ে গেলেন।' এর সুযোগ নিলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। "এক কলঙ্কজনক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করলেন কংগ্রেসের সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। তার সেই ক্ষমতা দখলে

সহযোগিতা করল সিপিআই।" ১০ বিরোধীপক্ষহীন বিধানসভায় তিনি পাঁচ বছর রাজত্ব করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তত্ত্বে কাউন্টার-ইনসারজেন্সির তত্ত্ব আমদানি করলেন। গণহত্যা-অভিযান প্রশাসনের স্বীকৃতি পেল। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে দেবেশ রায় বলেছেন—

"রাষ্ট্র তার সমস্ত শস্ত্র দিয়ে আমাদের গলা টিপে ধরেছিল, শ্বাস নেওয়ার মত ফাঁক ছিল না। সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কে এক অবিশ্বাস আমার একেবারে ভিতরে সেঁদিয়ে গেল। সে অবিশ্বাস বোধ হয় আর কখনোই কাটবার নয়।"১১ জলপাইগুড়িতে তিনি যতদিন ছিলেন সারাক্ষণ পার্টির কাজই করতেন।

"৬২ থেকে ৭২ পর্যন্ত আমি জলপাইগুড়িতে প্রায় সারা সময় কমিউনিষ্ট পার্টি করেছি।"১২

বাল্যকাল থেকে যে বিশ্বাস, আদর্শবোধ দেবেশ রায়ের চেতনাকে পুষ্ট করেছে, যে পুষ্ট চেতনায় তিনি তাঁর লেখার জগৎকে পুষ্ট করেছেন, পেয়েছেন লেখক হিসেবে, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে খ্যাতি এবং যে কমিউনিজমকে তিনি তাঁর নিজের ও সমাজের চালিকা শক্তি মনে করেন, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সেই কমিউনিজমের এক বিধ্বস্ত রূপ কমিউনিস্ট দেশ গুলিতেই দেখা দেয়। লেখকের বিশ্বাসেও নাড়া দেয় সেই ঘটনা।

''আশির দশক শেষ হতে না হতেই প্রায় আণবিক বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ডতায় অথচ প্রায় বিস্ময়কর নীরবতায় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক দ্রুত ধ্বংসের মধ্যে ঢুকে গেল। আর বছর তিনচারের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরিচয় মানচিত্র থেকে মুছে গেল। আমার চেতনার কোন অস্পষ্ট শুরু থেকে সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন এক রাজনৈতিক কল্পনা হয়ে উঠেছিল। সে কল্পনা প্রতিদিন পুষ্ট হয়েছে এই ভারতীয় বাস্তবতার দৈনন্দিনে। সমালোচনা ছিল, আপত্তি ছিল, সংশয় ছিল তবু এসব কিছুর ওপর ছিল এক ধ্রুব বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের আর কোনো মাটি রইল না, রইল না কোন বিকল্প কল্পনা রচনার উপাদান।"১৩

রাজনীতিক দেবেশ রায় ও লেখক দেবেশ রায় একই সঙ্গে প্রায় ৭৫ সাল পর্যন্ত চলেছিলেন। তারপর রাজনীতিক দেবেশ রায়ের চেয়ে লেখক দেবেশ রায় অনেক বেশি দৃশ্যমান হয়ে উঠলেন।

এবার তার নির্ভরতা 'মানুষের সমাবেশের ওপর, সমবেত বিদ্রোহের ওপর, চৈতন্যে'র উন্মেষের ওপর, মানব সত্তার জাগরণের ওপর' — এই তাঁর অবলম্বন। তাঁর কথায় —"সেই অবলম্বন টুকু নিয়েই লিখব, বাঁচব। এটাও কেবল আশাই, যে আশা ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না, যতটুকু জীবৎকালই অবশিষ্ট থাকুক

না কেন এই আশাটুকু ছাড়া সেটুকুও পাড়ি দেয়া যাবে না।"১৪

দেবেশ রায় ঃ সাংবাদিক জীবন

১৯৪২-৪৩ সাল থেকে দেবেশ রায়ের জলপাইগুড়িতে স্থায়ী ভাবে বসবাস। ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ এম. এ. পড়ার জন্য কিছু দিন কলকাতায় ছিলেন। ১৯৫৮ তে এম. এ. পরীক্ষার পর আবার জলপাইগুড়ি ফিরে যান। ১৯৭৫ সালে একেবারে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে আসেন চাকুরির সুবাদে। সেই থেকে অদ্যাবধি তিনি কলকাতাতেই আছেন।

কলকাতায় এসে যাঁর সাহাচর্য তিনি সবচেয়ে বেশি করে পেলেন তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে। এছাড়া 'কালান্তরে'র রবিবারের পাতা ও শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্ব তারই হাতে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশ রায়কে এই দুই কাজে জড়িয়ে ফেললেন। "আমি কলকাতায় আসার পর দীপেন আমাকে কোন প্রস্তুতির অবকাশও দেয়নি। তার কাজেকর্মে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে নিল।"১৫

দীপেন্দ্রনাথের ইচ্ছাতেই দেবেশ রায় 'প্রগতি লেখক সংঘে'র সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং পরে এর অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবি সমিতি' তৈরি হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা একটা বড় আশ্রয় পেয়েছিল। দেবেশ রায় সেই সময় কিছু দিনের জন্য কলকাতায় ছিলেন। এবং বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে।

'পরিচয়'কে কেন্দ্র করে যে সারস্বত মণ্ডল তৈরি হয়েছিল দেবেশ রায় তার মধ্যে একজন হয়ে উঠলেন। বাংলা সাহিত্যের একটি ধারা 'পরিচয়'কে কেন্দ্র করেই রক্ষিত হয়েছিল। "পরিচয় এরকম সচল থাকায় কলকাতায় আসার পর আমি জলের মাছ জলে ভিড়ে গেলাম। 'পরিচয়' এর সেই আড্ডা প্রতি সন্ধ্যাতেই বসত আর শেষ হত প্রায় মধ্যরাতে।"১৬

১৯৭৯-র ১৪ জানুয়ারি আকস্মিক ভাবে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু তাকে সম্পূর্ণ ভাবে একা করে ফেলল। দীপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর আগে দেবেশ রায় তাঁর দাদা দিনেশ চন্দ্র রায়কে হারিয়েছেন। লেখকের দুই বড় অবলম্বন এভাবে চলে যাওয়ায় তিনি প্রায় ভেঙে পড়লেন।

" পর পর দু'বছরে দাদা আর দীপেনের মৃত্যুতে আমার লেখালেখির কাজটা ফাঁকা আর অর্থহীন হয়ে গেল হঠাৎ কেমন বন্ধুশূণ্য ও সমর্থন শূণ্য হয়ে গেল। যেন আমার কারো কাছে কোন দায় রইল না। আমাকে নিয়েও কারো কোন দায় থাকল না। ১৯৭৯-র পর আমার লেখালেখি বন্ধও হয়ে যেতে পারত।"১৭

বন্ধ না হওয়ার অন্যতম কারণ 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়া। তরুণ লেখকদের নিয়ে নতুন করে লেখার জগতে প্রবেশ। এই সময়ে তাকে যিনি বেশি সহচার্য দিয়েছেন তিনি হলেন লেখক-সমালোচক অরুণ সেন। ১৯৮৩-তে 'প্রতিক্ষণ' নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়। পরে পত্রিকাটি মাসিক হয়। "প্রতিক্ষণে'র শুরু থেকেই দেবেশ রায় এর সঙ্গে যুক্ত হন। যদিও স্বপ্নাদেব-এর সম্পাদনা করতেন এবং প্রিয়ব্রতদেব ছিলেন প্রকাশনার দায়িত্বে। তবু যৌথ সম্পাদনার দায় ভার অনেক খানি বহন করতেন দেবেশ রায়। প্রথম দিকে এর সাংবাদিকতা সংক্রান্ত সব কাজ দেখাশুনা করতেন লেখক নিজে। প্রতিক্ষণ ছিল ' বাংলা ভাষায় সর্বভারতীয় পত্রিকা'। সেই সর্বভারতীয়তা রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য দেবেশ রায়কে যেতে হত।

১৯৮৪ সালে 'প্রতিক্ষণ' থেকে একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্র ' পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' প্রকাশিত হয়। এই কাগজটি সম্পাদনার দায়িত্ব পান দেবেশ রায়। এর কাজের ভার এতখানি যে তাঁকে দু'বছর তাঁর কর্মস্থল থেকে ছুটি নিতে হয়। 'প্রতিক্ষণ' এর সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজনে ও 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্টের' সংগঠন তৈরির দরকারে তাঁকে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ঘুড়ে বেড়াতে হয়। সেই সুবাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তব ছবি তিনি দেখেছেন এবং রাজনৈতিক নেতাদের ধরন ধারণ লক্ষ করেছেন— যা পরবর্তী কালে তার অনেক লেখাকে প্রভাবিত করেছে।

সাংবাদিকতার সঙ্গে দেবেশ রায়ের আবাল্য সম্পর্ক। ছোটবেলায় জলপাইগুড়ির স্থানীয় কাগজ 'জনমত', 'ত্রিস্রোতা'তে তিনি সাংবাদিক লেখাই লিখতেন। জলপাইগুড়িতে চাকরি করার সময় , কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সময়, পার্টির পত্রিকায় খবর সরবরাহের কাজে তিনি সাংবাদিকতাই করেছেন। কলকাতায় এসে 'কালান্তরে' সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর 'প্রতিক্ষণ'। 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' এবং আরও অনেক পরে দৈনিক 'আজকাল'এ তিনি নিয়মিত সাংবাদিক রচনা লিখে গেছেন এবং মাঝে মাঝে এখনও লিখছেন।

গল্প উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রেও সাংবাদিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন— " সাংবাদিকতার

কাজ তথ্য নিয়ে, গল্প উপন্যাসের কাজও তথ্য নিয়ে। সাংবাদিকতা তথ্যের সেই ভিত্তিটা তৈরী করে দিতে পারে, যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গল্প উপন্যাসে তথ্যের একটা মানব দলিল নির্মাণ করা যায়। .....সাংবাদিকতা ভাষাকে নষ্ট করে না, ভাষাকে পুষ্ট করে। তথ্যনির্ভরতায় আর তথ্য বর্ণনায় ব্যবহৃত হতে হতে ভাষার একটা শক্ত ভিত তৈরী হয়ে যায়। .....কিন্তু যে সাংবাদিকতা চলমান ইতিহাসের আধার, তার কাছ থেকে আখ্যান সাহিত্যের গ্রহন করার আছে অনেক। .....কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সাহিত্য আর সাংবাদিকতার মাঝখানের সীমারেখাটি অনেক সময়ই আমি অস্পষ্ট করে তুলি যাতে আমার আখ্যান সাংবাদিক হয়ে ওঠে, যাতে সেই আখ্যানের ভিতর সঞ্চারিত হয়ে যায় সাংবাদিকতার তৎপরতা, যাতে আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি এক একটা তথ্যে ভরাট হয়ে উঠতে পারে।"১৮

দেবেশ রায় : গল্পকার

'গল্পসমগ্র' ছাড়া দেবেশ রায়ের লেখা গল্প সংকলন চারটি 'দেবেশ রায়ের গল্প (১৯৬৯), 'দুইদশক' (১৯৮২) , 'দেবেশ রায়ের ছোট গল্প (১৯৮৮), স্মৃতিহীন বিস্মৃতি হীন (১৯৯১)। এই চারটি বইয়ের ২৪টি গল্পই মূলতঃ পাঠকের চোখের সামনে ছিল। এই চব্বিশটির বাইরে যে বিশাল গল্পের জগৎ অগোচরে ছিল — তা নিয়েই তৈরি হল 'দেবেশ রায়ের গল্প সমগ্র' ৬টি খণ্ড। প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত লেখা গল্প গুলি। এসম্পর্কে লেখক বলেছেন — "প্রথম খণ্ডে রাখতে চেয়েছি সেই সময়ের লেখা গুলো যখন গল্প ছাড়া অন্য কোন চেহারায় আমি লেখালেখির কথা ভাবতে পারতাম না।"১৯ এই সময়ের গল্প গুলিতে আছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বাংলাগল্পের নামকরণ, সংলাপ-এর বদলানো রূপ এই গল্প গুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আরও একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে এই গল্প গুলির বিষয় রাজনীতি নয়। আবাল্য রাজনীতির মধ্যে বেড়ে ওঠা লেখকের পক্ষে রাজনীতিমুক্ত গল্প রচনা বিস্ময়ের বৈকি।

১৯৬১-র পর থেকে দেবেশ রায় গল্প লেখার পাশাপাশি উপন্যাস রচনাও শুরু করেন।

'গল্প সমগ্র' প্রথম খণ্ডের গল্প গুলি হলো - হাড়কাটা, নাগিনীর উপমেয়, আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা, অপরাহ্নের কান্না, সাত হাটের হাটুরে, দুপুর, শামুক, বত্রিশ আঙ্গুলে, জলধর ব্যানার্জীর মৃত্যু, স্মৃতিজীবি, পা, কলকাতা ও গোপাল, কালরাতের বেলায়, অসুখ, পশ্চাতভূমি, বেড়ালটির জন্য প্রার্থনা, ইচ্ছামতী, পায়ে পায়ে, অপেক্ষায়, দুঃসাময়িক, দাহনবেলা।

১৯৬২ থেকে ৬৭-র মধ্যে লেখা গল্প গুলি নিয়ে রচিত হয়েছে 'গল্প সমগ্র'র দ্বিতীয় খণ্ড। এই সময় গল্পের

পাশাপাশি দেবেশ রায় উপন্যাস রচনাও শুরু করেদিয়েছেন। এ সময়ের গল্প গুলো সম্পর্কে লেখকের নিজের উক্তি —"আজ যখন এই ৬২ থেকে ৬৭ সালের ভিতর লেখা গল্প গুলি পড়ছি, এই বইয়ের জন্যে সেই গল্পগুলির প্রুফ বার বার পড়েছি, যেমন পরতে হত গল্প গুলি লেখার সময়, তখন নিজেরই চোখে পড়ে যায় — এই সময় দলীয় রাজনীতির বাধ্যতায়, সংসদীয় রাজনীতির নিয়মে সাংগঠনিক রাজনীতির অনিবার্যতায় যতই আমাকে দৈনন্দিন কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদে ঢুকতে হয়েছিল। আমার গল্প গুলোর বাক্য ততই হয়ে উঠতে চেয়েছিল জটিলতর, প্রত্যক্ষ ঘটনা ততই অন্বিত হয়ে যাচ্ছিল পরোক্ষের সঙ্গে।"২০

৬২-র চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ, এরপর কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙে যাওয়া, ঘনিষ্ট বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাঁচির মানসিক হাসপাতালে স্থানান্তর ইত্যাদি ঘটনা স্রোতের মধ্যেই তাঁর এই পর্বের গল্প গুলির সংরচনা। তবে তাঁর নিজের কথায় — "এই খণ্ডের কিছু গল্পে তার শুরু টুকু মাত্র দেখতে পাচ্ছি। এখন যখন এতটা সময়কে একসঙ্গে মাপা যাচ্ছে, তখন মনে হয় ৬২-র পর থেকে আমার গল্প আর বিশেষ ঘটনা থেকে রাজনৈতিক কল্পনার সর্বজনীনে সমাধান পাচ্ছিল না।"২১

'গল্প সমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ডের গল্প গুলি হল — ক্ষয় ও তার প্রতিকার, নিরস্ত্রীকরন কেন, উদ্বাস্তু, মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট, দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার, মর্তের পা, বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলকাতা, অমলেন্দুর, মালতীর ও আরো কয়েক প্রকারের ভালোবাসা, যুযুৎসু, দখল, সাধারণ চক্কোত্তির জীবন সূত্র, তিন পুরুষের উপ্যাখ্যান, অপভাবনা, রঞ্চুর রক্ত, ক্ষুধায় জন্মমৃত্যু, একটি দলিল চিত্র, সতীমিলিদের নিয়ে, জননী। জন্মভূমি!!, মিলন পিয়াসী, ধর্না, অনাসক্ত, বানা। কিন্তু এই সময়ের লিখিত একটি তালিকা দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টতে দেওয়া হয়েছে। তাতে গল্পের সংখ্যা ২৯টি। আর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ২৩টি। ৬টি গল্প দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পায়নি। সেই গল্প গুলি হল — বাজি, ক্রীতদাস, ইতিহাসের রবিবারের সকাল, রথের মেলায় নিরুদ্দেশ, সনাক্তকরণ ও মাগো বন্দেমাতরম বলে।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সালে লেখা গল্পগুলিকে নিয়ে দেবেশ রায়-এর গল্পসমগ্র'র তৃতীয় খণ্ড। এই সময়কালটা পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৬৭তে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট বা অ-কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় এলো। যেখানে বামপন্থীদের না ছিল কৃতিত্ব, না ছিল প্রত্যাশা। সে জন্য সরকার মজবুত হয়নি। অল্প সময়ে ভেঙে যায়। পুনরায় ১৯৬৯-এ ক্ষমতালাভ। কিন্তু এবারেও বামপন্থীদের ভিতর আত্মকলহ শুরু ৭৭ পর্যন্ত — নতুন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত। ৬৭ থেকে ৭৭ এই দশ বছর দেবেশ

রায়কে পেরুতে হয়েছে প্রচুর দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ব্যর্থতা ও সাফল্যের মধ্যে দিয়ে। সে জন্য এসময়ে রচিত গল্পের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। 'গল্প সমগ্র' তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন — " গল্প গুলো এই ধারাবাহিকতাতে লেখা হলেও, এখন দেখা যাবে মাঝে মধ্যে ফাঁক থেকে গেছে। যেন ৬৮ সালে আমি ঐ একটা মাত্রই গল্প লিখেছিলাম, বা ৬৯-৭০ সালে, ৭২ সালে বা ৭৫ সালে কিছুই লিখিনি।"২২

তাহলে এ সময়ে কী তিনি অন্য কিছুই লেখেননি? তাঁর নিজের উক্তি— "এই দশটা বছর কেটেছে আমার একটার পর একটা উপন্যাস লেখায়— 'মানুষ খুন করে কেন', 'যযাতি', 'বেঁচে বততে থাকা', 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে', ' মফঃস্বলি বৃত্তান্ত'"।২৩ " আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' ও 'মফঃস্বলি বৃত্তান্ত'র মাঝখানে লেখা হয়েছিল 'সাপের সঙ্গে সহবাস', কয়েদখানা', 'অনৈতিহাসিক' প্রভৃতি গল্প।"২৪

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত লেখা গল্পের তালিকা নিম্নরূপ— রাষ্ট্রপতি শাসনে, জয়যাত্রায় যাও হে, ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে, রাখি পূর্ণিমার রাত, মানুষরতন, সাপের সঙ্গে সহবাস, কয়েদখানা, অনৈতিহাসিক, আগডুম-বাগডুম-ঘোড়াডুম, জরিপ, রক্তের অসুখ, মূর্তির মানুষ। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ এই ৭/৮ বছরে তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা মাত্র ১০। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় আসার পর তিনি খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাংবাদিকতায়। লেখকবন্ধু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে তিনি যুক্ত হন 'পরিচয়' এর সঙ্গে। পরে সম্পাদকও হন। নিয়মিত 'কালান্তরে' লিখতে থাকেন। বারোমাস, প্রতিক্ষণ, পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট পত্র পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করেন, অন্য দিকে একটার পর একটা উপন্যাস লিখতে থাকেন। ফলে তাঁর ছোট গল্পের সংখ্যা কমে যায়। এই সময়ের লেখা ছোট গল্প গুলি হলো— উচ্ছেদের পর, জোতজমি, সাইক্লোনের চোখ, যৌবন বেলা, শরীরের রকম ফের, মানচিত্রের বাইরে, অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি, আইনানুগ ও প্রমোদকরহীন, মুখের সত্যমিথ্যা, জন্মপ্রজন্ম। এই গল্পগুলি নিয়ে রচিত হয়েছে 'দেবেশ রায় গল্প সমগ্র' চতুর্থ খন্ড।

'গল্পসমগ্র' পঞ্চমখণ্ডের ভূমিকায় দেবেশ রায় লিখেছেন —"১৯৮৭ থেকে ৯৪ সালের মধ্যে লেখা ষোলটি গল্প নিয়ে 'গল্প সমগ্র' এর এই পঞ্চম খণ্ডে আমার শেষতম গল্পটিও জায়গা পেয়ে গেল। আপাতত তাই এটাই 'গল্প সমগ্র' এর শেষ খণ্ড যতদিন না আর একটি খণ্ড হওয়ার মত গল্প জমে ওঠে। এই খণ্ডটি তৈরী করতেই করতেই গল্প লেখা করুণ ভাবে কমে আসছে। ৯০ সালে বা ৯১ সালে অনেক দিন পর চারটি বা তিনটি গল্প লিখে ফেলেছিলাম বটে কিন্তু ৯১ থেকে ৯৪ এ কোনো গল্পই লিখিনি। ৯৪-এও মাত্র একটি।"২৫

223079

31 MAR 2010

MBU. DARJEELING LIBRARY

এই গল্প কমে যাওয়ার নানা কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে লেখক কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন এভাবে — "যেমন আমার অভ্যাস, হয়তো কোন উপন্যাসের টুকরো , ছোট গল্প হিসাবে পেয়েছি, পরে সে লেখা উপন্যাসেই যথাস্থানে ফিরে গেছে।' .....দুই) ' নিজের কাছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ছোট গল্পের ভাবনা আর অমন চট করে মাথায় খেলে না, সে অনেকদিন হলো।' তিন) ' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির যেমন একটা অদল বদল ঘটে যায়, এ অনেকটা তেমনই। তবু এ হয়তো আমারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এমন উদাহরণও প্রচুর পাওয়া যাবে যাতে আমার এই অভিজ্ঞতার বিপরীতটাই প্রমাণিত হবে। সে প্রমাণ সত্ত্বেও তো একথা সত্য যে আমি আর বেশি ছোট আখ্যান লিখতে পারছি না, না লিখতে পেরেও আমার বছরের পর বছর কেটে যেতে পারে— তাতে হয়তো কখনও কখনও খারাপও লাগে। কিন্তু তার ফলে অবস্থা তো বদলায় না।"২৬

এই পঞ্চম খণ্ডে প্রাকাশিত গল্প গুলি হল — স্মৃতিহীন বিস্মৃতিহীন, স্বদেশ বিদেশ, মুখের দরদাম, বৃষ্টিবদল; স্বপ্নজাগরণের ব্রত, এই উপকথার দুই আরম্ভ, জীবনানন্দের মুখ, ছেলেরা করে খেলা, আমিষ নিরামিষ, আত্মসচেতনতার ফাঁক ফোঁকর, অসংরক্ষণ, ভয়, গীতাল যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ, নদীরাম জঙ্গলরাম, বৃষ্টি কলরোল, গ্লোবালাইজেশন।

—ঃ ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পের তালিকা ঃ—

১) বাণিজ্য যাত্রারই এক ধরন	বারোমাস শারদীয়-১৯৯৫
২) স্বর্ণ দুর্গার উপাখ্যান	কালান্তর শারদীয়- ১৯৯৫
৩) বাবা গীতালের শেষ যাত্রা	কালান্তর শারদীয়- ১৯৯৬
৪) গান্ধারীর চোখ	বারোমাস শারদীয়- ১৯৯৭
৫) তিস্তাপুরাণ	পরিচয় শারদীয়- ১৯৯৭
৬) শব্দ তত্ত্ব নিয়ে	কালান্তর শারদীয়- ১৯৯৭
৭) বাঁচা না বাঁচার নিশানা	দেশ শারদীয়- ১৯৯৭
৮) উড়িয়াল	প্রমা শারদীয়- ১৯৯৮
৯) খা	কালান্তর শারদীয়- ১৯৯৮

উপরোক্ত গল্প গুলি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'গল্প সমগ্র' ষষ্ঠ খণ্ড। 'গল্প সমগ্র' ৫ম খণ্ডের ভূমিকায় দেবেশ

রায় বলেছেন - ' এখন 'গল্প সমগ্র' এর এই আপাত শেষ খণ্ডের ভূমিকা লিখতে লিখতে শুধু আশা করতে পারি ভবিষ্যতে আরও একটি খণ্ড তৈরী করে তোলার মত গল্প ধীরে ধীরে জমে উঠবে।'

লেখকের সেই 'আশা' সেই ধীরে ধীরে জমে ওঠা গল্প গুলি নিয়েই ষষ্ঠ খণ্ড রচিত হয়েছে। লেখকের কাছে পাঠক আশা করে পরবর্তী আরও এক বা একাধিক 'গল্প সমগ্র' খন্ডের।

ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় ও তার রচিত উপন্যাসের ধারায় ' তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'

দেবেশ রায় গল্পকার, প্রবন্ধকার, সম্পাদক, সাংবাদিক , কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে তার পরিচয় অধিতর ব্যাপক। তার রচনা ধারায় ' তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' একটি বিস্ফোরণ। তিস্তা কেন্দ্রিক আর একটি বিস্ফোরণ হল ' তিস্তা পুরাণ'— বাংলা উপন্যাসের ধারায় যা অনন্য, অভিনব ও আধুনিকতম।

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে দেবেশ রায়ের আবির্ভাব গল্পকার হিসাবে। ১৯৫৫ সালে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র দেবেশ রায় 'দেশ' পত্রিকায় 'হাড়কাটা' নামে একটি গল্প লিখে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা করেন। তবে লেখালেখির কাজ তাঁর কিশোর বয়স থেকেই স্কুল, কলেজের পত্র-পত্রিকায়। তাঁর নিজের কথায় - ' কবে যে লিখিনি আর কবে যে সে লেখা কোন না কোন চেহারায় ছাপা হয়নি— তা, আর এখন মনেও পড়ে না।"২৭

১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত লেখা গল্পগুলি নিয়ে প্রকাশিত হল তাঁর গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ড। এই পাঁচ-ছ'বছর ধরে তিনি কেবল গল্পই লিখেছেন। অন্য কোন মাধ্যমে লেখার কথা ভাবেন-ই নি। উপন্যাস লেখার কথা তাঁর মনেও আসেনি। ' এই লেখাগুলি যখন লিখেছি তখন উপন্যাসের 'গল্পের ওপর এই বিকল্পহীন নির্ভরতার সময়ে বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতার একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 'দেবেশ রায়ের গল্প গুলিতেও সেই প্রবাহ এসে লাগে— গল্পের নামকরণে, সংলাপে, ডিটেললসের চর্চায় । তাঁর রচনাতেও দেখা যায় ' বানানের কত কৌশল, যতি চিহ্নের কত ব্যবহার, বাক্য গঠনে কত ভাঙ্গন।'

এতে অবশ্য তিনি ততটা খুশি হতে পারেননি — তাঁর মনে হয়েছে 'বাস্তব যে অভিজ্ঞতা বাস্তবকেই প্রধান করে তুলতে পারে তার অভাব' রয়েছে সেখানে। সুতরাং অনুসন্ধান চলতে থাকে অন্য কিছুর।

১৯৬১ -র পর তিনি শুধু গল্পই নয় উপন্যাস লেখাতেও হাত দেন। ১৯৬১ -র পর পরপর কিছু ঘটনা — তাঁর চিন্তার জগতে আলোড়ন আনে। ১৯৫৭-তে কেরলে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির সরকার গঠন, তাঁর ঘনিষ্ট

কমিউনিস্ট বন্ধু দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু।, ১৯৫৮-য় হাঙ্গেরিতে সেভিয়েত সৈন্যের প্রবেশ, স্তালিন উদঘাটন, ৬২-র অক্টোবরে চীন-ভারত যুদ্ধ, কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। নিজে একজন কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হওয়ায় এই ঘটনা গুলি তাকে বেশি করে স্পর্শ করেছে। এহেন সর্বনাশ তাঁর কর্ম ও চিন্তাকে, তাঁর লেখকসত্ত্বাকে ভিন্নরূপ দিয়েছে।

"কিন্তু এই সর্বনাশের মধ্যেই জলপাইগুড়ির গ্রাম, তার রাজবংশী মানুষজন, সেই মানুষজনে বিধৃত প্রকৃতি, রাজবংশী বাচন, তিস্তা নদী, চা বাগানের শ্রমিক, ডুয়ার্স, ফরেস্টের লোকজন, ফরেস্টের গাছপালা— জঙ্গল-পশু-পাখির এক ভুবনে আমার অধিকার কায়েম হতে শুরু করল, দিনের পর দিন ধরে, বছরের পর বছর ধরে।"২৮

এই অভিজ্ঞতা ও নব আধুনিকতার অন্বেষণ তাকে গল্পের জগৎ থেকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল উপন্যাসের জগতে। সেই সময় তাঁর আত্ম আবিষ্কার— 'গল্প লিখতে শুরু করে উপন্যাস হয়ে যায়', 'ছোট গল্পের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলি, 'লিখলেই বড় হতে চায়' ইত্যাদি। ফলে লেখা হতে থাকে একের পর উপন্যাস — 'যযাতি', 'মানুষ খুন করে কেন', 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' ইত্যাদি।

চরিত্রের ব্যাপকতার অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতার বড় পটকে ধরার লক্ষেই তাঁর গল্প থেকে উপন্যাসে আসা। লেখক জীবনের প্রথম প্রায় দশ বছর যিনি উপন্যাস লেখেনই-নি, যখন গল্প ছাড়া অন্য রকমের কথা ভাবতেই পারেননি, পরবর্তী সময়ে তাকেই বলতে শোনা যায় গল্প লেখায় তাঁর আর এখন মন নেই, কিংবা 'লিখতে বসে ছোট বা বড় এসব তাঁর কাছে জরুরী নয়।' এ ধরণের কথা তিনিই বলতে পারেন উপন্যাসের রক্তমাংস যার সর্বাঙ্গে।

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫-র ভেতর তিনি 'মানুষ খুন করে কেন' উপন্যাসটির প্রথম খসড়া প্রস্তুত করে উপন্যাস কাকে বলে তা বুঝতে চেয়েছিলেন। এই উপন্যাসটি লিখতে বসে সময় লেগেছিল মোট ১৩ বছর — ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৬। এরই মধ্যে 'যযাতি' লিখিত হয় ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে, বই রূপে প্রকাশ ১৯৭৩-এ। সেদিক থেকে 'যযাতি'ই দেবেশ রায়ের প্রথম উপন্যাস। ১৯৬৮ তে আর একটি উপন্যাস ' বেঁচে বততে থাকা' রচিত হয়- যা নিজের বেগেই উপন্যাস হয়ে উঠল।

'যযাতি'তে গিরিজামোহন -রেনু ও খোকার বিচ্ছিন্নতা সময়ের অন্যমাত্রা স্পর্শ করতে চায়। তাদের সম্পর্কে জটিলতা আসলে দেশ ও কালেরই জটিলতা। বাবা-মা ও ছেলের বিবরণের মধ্যে তাদের ব্যক্তিগতের মধ্যে

ছায়া ফেলে বাইরের ইতিহাস। গিরিজামোহনকে ও উত্তরাধীকারকে অস্বীকার করে খোকা নতুন করে জন্মাতে চায়—সে জন্য সব ত্যাগ করে চলে যায়। এখানে চরিত্রের নিজস্ব বিররণ এমন যুক্তিতে লেখা হয় যা বিবরণকে স্বাবলম্বন দিয়েছে। বিষয়ই কর্মকে নতুন আধুনিকতার আস্বাদ দিয়েছে।

'মানুষ খুন করে কেন' তে ক্ষেত্র আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। এই উপন্যাসের নায়ক আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির এক বিকার। কিন্তু এই নেতির বিপরীতে তার কর্মময়তা আভাসিত হয় কোনো এক সময়ে। এখানে লেখকের অভীপ্সা ও ক্ষমতা চিনে নিতে কারও কোনো অসুবিধা হয় না।

'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে'তে দেখা যায় চরিত্র ও পরিবেশকে ডিটেলসে বিস্তারিত হতে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহুস্তরে বিন্যস্ত বাকভঙ্গির জটিলতা। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' কে একটা 'ব্রেক'ও বলা যেতে পারে।

''ক্রমশ প্রতিবেদনে ও বৃত্তান্তে এই দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায়, গঠনে যে দেবেশ রায় ব্যক্তি ও ইতিহাসের মিথস্ক্রিয়াকে ধরেন, তাঁর সূত্রপাত এই উপন্যাসে। ' যযাতি', মানুষ খুন করে কেন'র পর্যায় শেষ হয়ে যায় এই উপন্যাসের বয়ানে, ডিসকোর্সে।''২৯

এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম ছকের বাইরে এলেন। ' আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে', লিখতে গিয়ে তিনি জানালেন যে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার আখ্যানকে কিভাবে বদলাতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে তিনি উত্তরবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করার সুবাদে রাজবংশী ভাষা সুচারু রূপে আয়ত্ব করেছেন। এই ভাষার সার্থক প্রয়োগ দেখা গেল পরবর্তী 'মফস্বলি' বৃত্তান্তে।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে তিনি লিখেছেন মাত্র কয়েকটি গল্প। কারণ তখন তাঁর লেখা যেন গল্পের আধারে আর আটছিল না। এই সময় প্রায় দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এসেছিল বহু পরিবর্তন। ১৯৬৭ ও ৬৯ এ দু'বার পশ্চিমবঙ্গে অ-কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসে— কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। সারা বাংলায় সে কি উন্মাদনা, সে কি জাগরণ। কিন্তু সে সময় বামপন্থী শিবিরে মতানৈক্য দেখা দেয় প্রচুর। সৃষ্টি হয় নকশাল আন্দোলন। ১৯৭২ সালে আবার ক্ষমতায় আসে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার। নকশাল আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন থেকে যুব আন্দোলনের রূপ নেয়। শুরু হয় নকশাল দমনের নামে গণহত্যার যুগ।

'৭৭ সালে, এত রক্তক্ষয় ও আত্মবিনাসের পর আবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হল যা

এই সন্দর্ভ লেখার কাল (২০০৮) পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার, উন্নয়ন, অপারেশনবর্গা ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহু নব নব দিকের উন্মোচন করে। দলীয় রাজনীতির অবক্ষয়, দলাদলি, সংকীর্ণতা ইত্যাদি উল্লেখ করার মতো। দেবেশ রায়ের লেখক সত্তায় ইতিবাচক, নেচিবাচক সবই ধরা পড়েছে। মফস্বলি বৃত্তান্ত লেখা হয় ১৯৭৪ সালের জুন মাসে। এই উপন্যাসখানি লেখা হয় একবারেই, কিন্তু পাঁচ-ছ'বছর ধরে এর বিভিন্ন অংশ পত্রপত্রিকায় বের হয় কখনো উপন্যাস হিসাবে, কখনও বড় বা ছোট গল্প হিসাবে। এতে তিনি উপন্যাসের সমগ্রতার একটা চেহারা দেখতে পান। তিনি অনুভব করেন " আখ্যানকে একটি ছোটগল্প বা একটি বড় উপন্যাসের ভিতর সম্পূর্ণ আটাতে গেলে আখ্যানের সর্বাতিশায়িত খর্ব হয়। আখ্যানকে যদি সেই নিগড় থেকে মুক্ত করে দেখা যায় তাহলে তা কখনো ছোটগল্পে, কখনো বিবরণে, কখনো উপন্যাসে, কখনো কাহিনিতে ছড়িয়ে যেতে পারে, আবার এই ছড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ভিতর যে ঐক্য থাকে সেটাই সেই আখ্যানের শিল্পগত ঐক্য।"৩০

এভাবে একটা গোটা লেখা লিখে তাকে টুকরো টুকরো করে কাগজে প্রকাশ করা, আবার তাকে একত্রে বই করে তোলার মধ্যে একটা ত্রিস্তর শিল্প পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়।

'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উত্তরবঙ্গের কৃষক জীবনের একটি নিখুঁত দলিল। উপন্যাসটির সাতটি অধ্যায় জুড়ে খেত খেতু তার ভাইপো চ্যারকেটু, তার বউ টুলটুলি- তাদের বাচ্চা-কাচ্চা, আট বছরের বৈশাখু, ছ বছরের বেঙ্গু, চার বছরের খেতেশ্বরীদের শুধু ক্ষুধা জর জর জীবন। চরিত্র গুলির শরীরের বর্ণনায়, বাচনে, চিন্তনে, স্বপ্ন দেখায়, শুধু ক্ষুধারই কথা। আর এই কথার মধ্যে — সমাজের অনুপুঙ্খ ছবি কখনো ধানক্ষেতের বর্ণনায়, কখনো পার্টির মিছিলে, আইন অমান্য আন্দোলনে ও নেতাদের রাজনৈতিক ভাষণে।

আশির দশক শেষ হতে না হতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশ গুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। লেখকের আবাল্য পুষ্ট সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন যা একটা রাজনৈতিক কল্পনা হয়ে উঠেছিল তা প্রবল বেগে ধাক্কা খায়।

"সে বিশ্বাসের আর কোন মাটি রইল না, রইল না কোনো বিকল্প কল্পনার রচনার উপাদান। .....ইতিহাসের এমন পশ্চাদ অপসারণ শতাব্দীতে ঘটে না, সহস্রাব্দেও ঘটে কী না সন্দেহ। আমরা সেই পশ্চাদ অপসারণের সঙ্গী হয়ে থাকলাম আর হলাম ভূমিকাহীন অংশীদার।"৩১

বিশ্বাস ও কল্পনা এভাবে ধসে যাওয়ায় লেখক লেখাকেই আঁকড়ে ধরলেন একমাত্র সঙ্গী হিসাবে। লেখা

হতে থাকল একটার পর একটা উপন্যাস — 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, (১৯৮০) জীবন রচিতে প্রবেশ (১৯৮৩), হনন আত্মহনন (১৯৮৪),সমুদ্রের লোকজন (১৯৮৬), আত্মীয় বৃত্তান্ত (১৯৮৮), সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (১৯৯৩) , খরার প্রতিবেদন, দাঙ্গার প্রতিবেদন, শিল্পায়নের প্রতিবেদন— ইত্যাদি প্রতিবেদন, তিস্তা পুরাণ (২০০০) ও আরও বহু উপন্যাস।

'মফস্বলি' বৃত্তান্ত লেখার পর — মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পারিক সম্পর্ক ও মিলেমিশে যাওয়ার কাহিনি, উত্তরবঙ্গের মাঠ, নদী,জল, বন, ও তার অবিচ্ছিন্ন অংশ রাজবংশী সমাজ, তাদের ক্ষুধা, উন্নয়ন, প্রত্যাখ্যানের জন্য মফস্বলি বৃত্তান্তের চেয়েও বড় আধার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এ সময় দেবেশ রায় ১৯৭৫-এ কলকাতায় চলে আসেন উপচে পড়া অভিজ্ঞতার থলি নিয়ে। কলকাতার নাগরিক পরিবেশে, জলপাইগুড়ি, তিস্তা, ফরেস্ট, রাজবংশী সমাজ, চা বাগান ও তার শ্রমিকরা যেন লেখকের মানস পটে আরও বেশি করে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। অভিজ্ঞতার এই প্রবল চাপেই তিনি লিখলেন ' তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'।

তিনি বুঝতে পারলেন, '"আমার ভিতরে একটা বিষয় যখন আধার খোঁজে তখন জলপাইগুড়ির মানুষজন ও প্রকৃতির মধ্যেই আমি সেটাকে সহজে খুঁজে পাই বা পেতে চাই।' 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র লেখাও শুরু হল সেই সহজ অধিকার বোধ থেকেই।"৩২

সময় অসময়ের বৃত্তান্ত ঃ

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' লিখতে লিখতেই আর একটি বৃত্তান্ত লেখা হতে থাকে ' সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'। প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখিত হতে থাকে একের পর এক কাহিনি। নানা অখ্যান কাহিনির মধ্যে রচিত হতে থাকে। কাহিনি ঘটে যাওয়ার পর আর একটি কাহিনি তাতে যুক্ত হয়ে যায়। আগের কাহিনি বদল হয়। প্রত্যক্ষ ঘটনা যা লিখিত নথিপত্রের অন্তর্ভূক্ত তার সঙ্গে উপন্যাসও তার স্বতন্ত্রতা নিয়ে হাজির হয়।

শুধু অভিজ্ঞতা নয়, তথ্য নির্ভরতার সঙ্গে যুক্তি এবং মানবমুক্তির সুতীব্র বাসনা এ উপন্যাসের বিন্যাস তৈরির সহায়িকা শক্তি। কতগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষত বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। যেমন বিশ্বনাথ নামে এক নকশাল কর্মীর ঘরছাড়া, পুলিশের হাতে ধরা পড়া, জেল ভেঙে পালানো, অজ্ঞাত বাস, আবার ধরা পড়া। পুনাসি বাঁধ নির্মাণ, নির্মাণের সময়ে পাড়াড়িয়া গ্রামে জসিডি থানার পুলিশের দ্বারা ২৫ জন নারীকে ধর্ষণ করা, এর প্রতিবাদে মিটিং, মিছিল, মামলা, মোকদ্দমা, বিচার, বিচারে পুলিশের বেকসুর খালাস, নারীদের উপর অপবাদ, কলকাতার বেহালায় বিষ তেল খেয়ে বহু মানুষের অসুস্থ হওয়া, এর প্রতিবাদে মিছিল, ষ্টোনম্যান, ধড়পাকড়

ইত্যাদি নানা ঘটনা সরকারের অফিসে নথিভুক্ত ঘটনা। এই ঘটনা গুলিকে এক লাইনও বিকৃত বা পরিবর্তিত না করে লেখক তার মধ্যে উপন্যাসের যুক্তি মননশীলতা আরোপ করে — উপন্যাসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই উপন্যাসে বা বৃত্তান্তে আটটি কাহিনি আটটি পর্বে বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত।

(১) কামাক্ষী, গোপা, মেয়ে-মিতু, ছেলে মিঠুর কাহিনি। এদের নতুন ফ্লাট বাড়িতে মধ্যবিত্ত জীবন। ফ্লাটের অদূরে বস্তি উৎখাত, অফিসে যেতে বাসের হাঙ্গামা, অফিস, কম্পিউটার, বাড়ি, টিভি, খেলা দেখা ইত্যাদি দৈনন্দিন। নিরাপদ জীবনে ভাই বিশ্বনাথের খোঁজে পুলিশের জেরা - নানা ছোট বড় ঘটনা নিয়ে প্রথম অধ্যায় ' ডেভেলপমেন্টের সময় এরকম ঘটে থাকে, আগের নাম ছিল ' দিন যাপনের কৃৎ কৌশল।' এটি লিখিত হয় ১৯৮৩ তে।

(২) ' কনষ্ট্রাকশনের সময় এরকম ঘটে থাকে' - অধ্যায়ে কনষ্ট্রাকশন বলতে বিশেষ ভাবে পুনাসিবাঁধ নির্মাণকেই বোঝানো হয়েছে। এখানে গাওনা না হওয়া মেয়ে আনোপিকে নিয়ে নানা ঘটনা, স্বামী কর্তৃক আনোপী অপহরণ, আনোপীর মার বিলাপ, একলাল চৌকিদারের হস্তক্ষেপ, পাড়াড়িয়া গ্রামে একলাল ও অন্য এক পুলিশ কর্মীকে গ্রামবাসীদের মারধোর, বদলা নিতে জসিডি থানার পুলিশ বাহিনী কর্তৃক ২৫ জন গ্রামের রমনীর ওপর সারারাত নিষ্ঠুর ধর্ষণ। ১৯৮৯-এর ১৯ এপ্রিল বিশ্বনাথের জেলে ফিরে আসার আগে ও পাড়াড়িয়া মামলার রায় বেরবার আগে পাড়াড়িয়া ধর্ষণ নিয়ে ১৯৮৮ তে এই আখ্যান লেখেন লেখক।

(৩) 'বিচারের সময় আদালতে এরকম ঘটে থাকে' লিখিত হয় ১৯৯০ এ। এতে লিখিত হয় পাড়াড়িয়া ধর্ষণের মামলার রায়। রায়ে বিচারক অভিযুক্ত পুলিশদের বেকসুর খালাস করে দেন। বরং ধর্ষিতা মহিলাদেরই অসংযত যৌনাচারের অভিযোগ আরোপ করা হয়। সাংবাদিক কনক - এই রায়ের কপি জোগাড় করেন — তাতে পুলিশ, আদালত, উকিল, সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, ধর্ষণ সম্পর্কে বিস্তৃত কথা লেখা আছে।

(৪) ' ধর্ষণের পরের সকালে এরকম ঘটে থাকে, অলৌকিক খণ্ড' লিখিত হয় ১৯৯০ এ। এই অংশে কেলু রাধিয়ার আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এক সংসার বিবাগী যুবক কেলুর সঙ্গে বাপ-মা মরা রাধিয়ার বিয়ে। বিয়ের পরই কেলুর গৃহত্যাগ। ফিরে আসে সেদিন যেদিন রাধিয়া পুলিশ বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা হয়। কেলু সেই নরক দর্শন করে।

(৫) ' ধর্ষণের পরের সকালে এরকম ঘটে থাকে, অলৌকিক খণ্ড' - লিখিত হয় ১৯৯১ এ। এতে ধর্ষণের পরের সকালে ধর্ষিতা নারীদের স্ব স্ব লজ্জা, যন্ত্রণা ও সামগ্রিক যন্ত্রণার কথা বর্ণিত হয়েছে। পাশোয়ান,

যোগীন্দরদের পরামর্শে এর প্রতিবাদ- অভিযান, নানা কর্মসূচি গ্রহণ, রাধিকার নেতৃত্বে দেওঘর যাত্রা।

(৬) ' স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের সময় এরকম ঘটে থাকে' নগরখণ্ড এ আছে কলকাতার সমকালীনতার ভয়াবহ দুঃখময় অভিজ্ঞতা গুলো। কেলুর হাসপাতালের অভিজ্ঞতা, ডাক্তারদের সঙ্গে কথাবার্তা, তেল কেসে রোগীদের সঙ্গে কেলুর মিথ্যারোগী সাজা, রোগীদের আন্দোলন, মন্ত্রীর ভূমিকা, সাংবাদিক সম্মেলন, আত্মহত্যার প্রস্তাব কেলুর সম্মতি, স্টোনম্যানের কাহিনি ইত্যাদি।

(৭) 'স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের সময় এরকম ঘটে থাকে' সাগর খণ্ড: এখানে আছে কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে কেলু এসে পড়ে গঙ্গার ধারে। সাগর যাত্রী সাধুদের দেখা হয়। একজন সাধুর চেলা বনে যায়। নাঙ্গা সাধু জামা কাপড় পরে—কলকাতা দর্শন করায়। পরে সাগরে চলে যায়। সাগরে পিণ্ডদান। আরও ভিতর সমুদ্রে গমন। ঢেউয়ে পা দিয়ে অবতার হয়ে যায়। এদিকে রাধিয়াও ধর্ষিতাদের নেতৃত্ব দিয়ে অবতার বনে যায়। কেলুর আখ্যান, রাধিয়ার আখ্যান, কলকাতার আখ্যান লেখক ৮৮ সাল থেকেই লিখে রাখছেন। "৮৮ তে লিখেছি, ৯০ এ লিখেছি, ৯১ এ লিখেছি। ৯২ এও লিখেছি।"৩৩

(৮) ' বিপ্লবের সময় এরকম ঘটে থাকে'। এখানে বিশ্বনাথের প্রত্যাবর্তনের কাহিনি আছে। অজ্ঞাত বাস সেরে কলকাতা ফেরা, মুক্তির আনন্দ, হাওড়ায় আবার ধরা পড়া। বিশ্বনাথকে নিয়ে বানানো গল্প। কানুর ধরা পড়া, পুলিশি অত্যাচার। ইত্যাদি।

এই বৃত্তান্ত'র 'গ্রন্থবন্ধন' অংশে ১. রচনার ইতিহাস ও কারণ ২. রচনার পদ্ধতি ৩. রচনা পাঠের সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থবন্ধনের সূত্র ধরে বলা যেতে পারে বৃত্তান্ত বর্ণিত কাহিনিগুলি কাগজে, আদালতে পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত। লেখকের নিজের কথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে " আমি শুধু পাঠককে জানিয়ে রাখতে চাই এই বৃত্তান্তের সব কাহিনি-ই এই বৃত্তান্ত লিখিত হওয়ার আগে নথিভুক্ত। এই বৃত্তান্ত না লেখা হলেও এই কাহিনিগুলি কাহিনি হিশেবে আছে। আমি শুধু নথির ভিতর উপন্যাসের সংক্রমণ ঘটিয়েছি।"৩৪

উপন্যাসের এই সংক্রমণ ঘটনানোয় যে উপন্যাস সত্য রচিত হয়েছে— তাতে সরকার, পুলিশ, আইন, আদালতের নথিভুক্ত সত্যের অন্তঃসার শূন্যতা উদঘাটিত হয়েছে। লেখক মনে করেছেন " তারাই এই নথিপত্রের একমাত্র সংরক্ষক আর তাদেরই সংরক্ষণেই নথিপত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য এই কল্পকথার বিপরীতে আমার উপন্যাসকে দাঁড় করাতে চেয়েছি। আমি পুলিশের সরকারের আদালতের নথির একটা অক্ষরও না বদলে তাদের নথির কাহিনীর অর্থের বিকল্পহীন নির্দিষ্টতার বিরুদ্ধে আমার কাহিনীর অনির্দিষ্টতাকে খাড়া

করেছি। .....আমি পুলিশের, সরকারের, আদালতের আইনী অর্থ সর্বস্ব শব্দের বিপরীতে উপন্যাসের কল্পনা সর্বস্ব শব্দকে স্থাপন করতে চাই।"৩৫

এভাবেই একই কাহিনি নথিভুক্ত হয়েছে, একই কাহিনি উপন্যাসে এসেছে। কেউ কারও সীমানা অতিক্রম করেনি। অতিক্রম না করে উপন্যাসের কাহিনি, নথির কাহিনি ভিতর অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছে।

"অন্তর্ঘাতই এই বৃত্তান্ত রচনার পদ্ধতি।"৩৬

ডেভেলাপমেন্ট, কনষ্ট্রাকশন আধুনিক সভ্যতার সোপান স্বরূপ। মানুষ এর ভিতর দিয়েই মুক্তি খোঁজে। কিন্তু দেখা গেল তথা কথিত ডেভেলাপমেন্ট ও কনষ্ট্রাকশন কী ভাবে মানুষকে মুক্তির পরিবর্তে মরণের পথে এগিয়ে দেয়। । পুনাসি বাঁধ বা কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে লেখক অগ্রসর হয়েছেন ইউরোপ, রাশিয়ার পথে। লেখক মনে করেছেন, 'ইউরোপের আলোকপর্ব মার্ক্সীয় পর্বে মিশে ভাবনার কর্মময় ভিত গড়ে তোলে। সম্ভবত, নির্ভুলতা সেখানেই আছে।"৩৭

সংশয় রয়েই যায়, তাই আবার বলেন "সে মুক্তিও তত মুক্তি নয়। আলোকপর্বের বিজ্ঞান যে ডেভলাপমেন্ট ও কনষ্ট্রাকশনে বিশ্বকে গেঁধে ছিল তারও ফলে জার্মানিতে নাৎসিতন্ত্র তৈরি হতে পারে। মার্কসবাদের বিজ্ঞান যে ডেভেলাপমেন্ট আর কনষ্ট্রাকশনে বিশ্বকে গড়ে ফেলেছিল তারও ফলে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এক নষ্টতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে। 'মানুষকে মানুষের মুক্তি খুঁজতে হবে।'"৩৮

এ বৃত্তান্তে সেই মানুষের মুক্তির খোঁজ , সে খোঁজই চলতে থাকবে বৃত্তান্তের পর বৃত্তান্তে— পরবর্তী রচনায়, তিস্তাপারের বৃত্তান্তে, তিস্তাপুরাণে।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত :

'তিস্তাপারে বৃত্তান্ত' তিস্তার দিগন্ত প্রসারিত জলরাশির মতই বিশাল বিস্তৃত পটভূমিতে রচিত এক মহাকাব্যোপম উপন্যাস। তিস্তা থেকে ডায়না, গাজোল ডোবা থেকে ফুলবাড়ি বিশাল ভূ-খণ্ডে, ধূর্ত জোতদার গয়ানাথ, নাউছার আলম, এককালের নকশালিয়া জরিপ-অফিসার সুহাস, তার সহযোগী প্রিয়নাথ, এম এল এ সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার, হাটের লোকজন, বিভিন্ন পেশার দোকানী, ক্রেতা, রাজবংশী, ভাটিয়া, মদেশিয়া, চা বাগানের শ্রমিক, বাবু, চরুয়া, কৃষক সমিতির সংগ্রামী লোকজন, সীমান্তের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, রাজবংশী নেতা পঞ্চানন মল্লিক, বীরেন বসুনিয়া, তিলক, সম্পৎ রায়, গয়ানাথের জোয়াই আসিন্দির, শ্রীদেবী ও শ্রীদেবীর ফাংশানের ব্যবস্থাপক, পুলিশ প্রশাসন, আসাম থেকে পুর্ণিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে আসা দর্শক, ব্যারেজের

উদ্বোধনের সময়ের মন্ত্রী, আমলা, লাখো জনতা এবং তিনটি বিশেষ চরিত্র—'গয়নাথের মানষি বাঘারু, মাদারি ও মাদারির মা যাদের দারিদ্র্য আমাদের প্রচলিত দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় মেলে না'।

এতো চরিত্র সমাবেশে ব্যাপক পটে — সম্পূর্ণ দেশীয় রীতিতে, ছোট ছোট এপিসোডে বিন্যস্ত ও অনুপুঙ্খ বর্ণনার প্রাচুর্য্য,—রাজবংশী কথোপকথনে বহুস্বরিক— এ উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের ধারায় অদ্বিতীয় ও অনুপম।

এতোদিনে দেবেশ রায় যেন তাঁর অভিপ্সিত ফরম খুঁজে পেয়েছেন। পরিশিষ্টের একটি অধ্যায় সহ সমগ্র উপন্যাসটির ছটি পর্বে দু'শ ঊনিশটি অধ্যায়। আদি পর্বে 'গয়ানাথের জোত জমি' অংশে ক্রান্তির হাটের জরিপ অফিসার সুহাস তার সহযোগী প্রিয়নাথদের নিয়ে হাল্কা ক্যাম্প বসায়। ৬৮'র বন্যার পর বিধ্বস্ত তিস্তাপারের জমি জরিপ করে — তিস্তা ব্যারেজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহন করা এর উদ্দেশ্যে। এই জরিপের কাজে এসে হাজির হয় ধুরন্ধর গয়ানাথ। তার সুচতুর বাক্য বিন্যাস ও জমি মাপার ছলাকলা সুহাস ধরে ফেলে। গয়ানাথের জমি জরিপের সূত্রেই আবির্ভাব ঘটে - বাঘারুর। সারা উপন্যাস জুড়ে — যার বিবরণ, যার দারিদ্র্য, অস্তিত্বহীনতা, সহস্র নেতি পাঠককে শুধু ভাবায় না, লেখকের উপন্যাস সৃষ্টির লক্ষে সেই হয় আসল শক্তি।

জরিপের সূত্র ধরেই আসে কৃষক সমিতির রাধাবল্লব, হৃষিকেশদের কথা। জরিপ সম্পর্কে তাদের অভিমত। চা বাগানের শ্রমিকরাও ঘটনাক্রমে এসে হাজির হয়। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে দখল নিয়ে কিঞ্চিৎ সংগ্রাম সংগঠিত হয়। অবশেষে স্থাপিত হয় ঐক্য। সেই সূত্রে এম এল এ-র উপস্থিতি — ঘটনাটিকে পুরোপুরি রাজনৈতিক করে তোলে। এম এল এ সাহেব আর একটি রাজনৈতিক কাজে ফুলবাড়ির দিকে চলে যান। তাঁকে পিঠে করে নদী পার করে দেয় 'গয়ানাথের মানষি' বাঘারু। পথে এম এল এ-কে বলে তার জন্মকথা, তার নামের কথা। একটা মানষির নাম চায় সে।

দ্বিতীয় পর্ব, বনপর্ব 'বাঘারুর নির্বাসন' অংশে এম এল এ ফুলবাড়ি থেকে ফিরে এসে নানা কথার মধ্যে গয়ানাথের সঙ্গে আলাপ চারিতায় বাঘারুর প্রসঙ্গ আনে। এম এল এ-ই গয়ানাথের কাছে বাঘারু যাতে আধিয়ারি স্বত্ব পায় তার কথা বলেন। কিন্তু গয়ানাথ বোঝে বাঘারু বোধহয় এম এল এ -কে এ ব্যাপারে বলেছিল। ভুল বুঝে গয়ানাথ বাঘারুকে ডায়নার চরে নির্বাসনে পাঠায়। পরদিন সূর্যাস্তের আগেই সে নির্বাসন ভূমির দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে সে মোষ গরুর বাথানের দায়িত্ব পায় এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা করতে থাকে। এই অংশে

বর্ণিত হয় ডুয়ার্সের বনান্তরালে বাথান ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থার ছবি। বাথানের প্রয়োজনীয়তা। মিলিটারি ক্যাম্পে দুধ সাপ্লাইয়ের নানা কথা।

তৃতীয় পর্ব 'চর পর্ব' —'নিতাইদের বাস্তু ত্যাগ ও সীমান্ত বাহিনীর সীমান্ত ত্যাগ' অংশে বর্ণিত আছে তিস্তার ভয়ঙ্কর বন্যার ছবি। কী করে তিস্তায় বন্যা এসে চর গুলিকে ডুবিয়ে দেয়। চরের মানুষ বাঁধে গিয়ে আশ্রয় নেয়-তার কাহিনি। তেমন একটি চর নিতাইদের চর। তাদের চর ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় রাত জাগা — চরের মানুষকে, গরুবাছুরকে পঞ্চায়েতের লোকজন মিলে বাঁধে তোলে। অবশেষে বন্যা এলে সরকারী ত্রাণের ব্যবস্থার কথা বর্নিত হয়েছে। এছাড়া এই বন্যা তো রংধামালী বা দোমোহিনীতেই থেমে থাকে না। চলে যায় বাংলাদেশ সীমান্তে। সেখানে ভারতের সীমান্ত চৌকি-জলে ডুবে গেলে তারা আশ্রয় নেয় বাংলাদেশের সীমান্ত চৌকিতে। অতিথি সমাদরে সেখানে তারা থাকে। বন্যা কী করে দু'দেশের মানুষকে এক করে দেয় তার কথা এ অংশে জানা যায়। আবার নিঃসঙ্গ গৃহহীন দেশহীন একটি মেয়ে ভেজা শরীরে কিভাবে ধর্ষিতা হয়-সে কথাও বর্ণিত হয়েছে এ অংশে।

চতুর্থ পর্ব 'বৃক্ষ পর্ব' বাঘারুর প্রত্যাবর্তন অংশেও বন্যারই ছবি। তবে এখানে বাঘারুর উপস্থিতি ' বৃক্ষ বাহন' বাঘারু একটি বড় বিষয়। আপল চাঁদ ফরেস্টের গাছপালা বন্যার জলে উপড়ে ফেলছে দেখে গয়ানাথ বাঘারুকে ডায়ানার চর থেকে নিয়ে আসে এবং চারটি গাছ এক সঙ্গে বেধে বাঘারুকে তাতে আরোহী করে গাছ রক্ষার জন্য বন্যার জলে ভাসিয়ে দেয়। প্রবল জলস্রোতে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে বাঘারুর গাছ এসে থামে নিতাইদের চরে ভাসমান এক টিনের ঘরের চালে। সেখান থেকে সরকারি তত্বাবধানে - কাদা খোয়ার সাহায্যে বাঘারুকেউদ্ধার করে বাঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে কাগজের লোক, রেডিও, টিভির লোকেরা - নেংটি পড়া বাঘারুর ছবি তুলতে থাকে।

পঞ্চম পর্ব 'মিছিল পর্ব' - 'উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যদাবি' অংশে রাজবংশীদের অতীত গৌরব বর্তমান বঞ্চনা ও স্বতন্ত্র কামতাপুর রাজ্য আদায়ের কথা উল্লেখ করে - বিস্তৃত আলোচনা। তাতে এসেছে উত্তরখণ্ড আন্দোলনের কর্মসূচি, সম্মিলন, তাতে বিভিন্ন নেতার বক্তৃতা, গৃহীত কর্মসূচি। এই অবকাশে শ্রীদেবীকে নিয়ে একটি বড়ফাংশনের বিস্তৃত বর্ণনা। ফাংশনকে সামনে রেখে উত্তরখণ্ড সম্মিলন বাতিল করার উদ্দেশ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক দল গুলির প্রচেষ্টা, সার্কিট হাউসের মিটিং। হাস্যকর জল্পেশ অভিযান। রাজবংশীদের নিয়ে উত্তরখণ্ডের তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন বাতিল করার উদ্দেশ্যে মিছিল। বামফ্রন্টের মিছিলের দ্বারা সে মিছিল

বিধ্বস্ত।

রাজবংশীদের কথা বলতে গিয়ে লেখক রাজবংশীদের জাতি উপজাতি পরিচয়ও দিয়েছেন।

ষষ্ঠপর্ব 'অন্ত্য পর্ব' ' মাদারি মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' অংশে মাদারি ও মাদারির মায়ের দুঃখ জর জর জীবন বৃত্তান্ত। যে জীবন দারিদ্র্য সীমার নিচে সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে না। বহু পুরুষের সহবাসে বহু সন্তান লাভ করেও কোন সন্তান তার কাছে থাকে না। শেষ সম্বল মাদারি। সেও হারিয়ে যায় তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভিড়ে।

সামনে নির্বাচন। তাই কাজ শেষ হতে না হতেই তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের আয়োজন। উত্তরখণ্ডের বিরোধীতার জবাব, উন্নয়নের প্রতীক এই তিস্তা ব্যারেজ। লক্ষ লোকের সমাবেশে মাদারির মা ও মাদারিও এখানে উপস্থিত হয়।

এখানেই হারিয়ে যাওয়া মাদারি ও ঝাণ্ডাহীন, দলহীন বাঘারুর সঙ্গে দেখা হয়। পুলিশ এ ব্যবস্থা করে। আর এখান থেকেই এই মানুষের তৈরি নদীকে, বনকে, উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে ওরা দু'জনে নতুন বন, নদীর সন্ধানে হাঁটতে থাকে।

পরিশেষের দু'শ ঊনিশ অধ্যায়ে আছে 'এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ।' নদী বদলাবে, বন বদলাবে, পরিবেশ বদলাবে কিন্তু প্রাকৃতিক অরণ্যের পশুপাখি, বাস্তুহারা হবে। ব্যারেজের জলে শুখা জমি সরস হবে। অধিক ফলন হবে। গয়ানাথ, হৃষিকেশদের দূরত্ব কমবে। এমনও হতে পারে ওরা ফসলের অধিক দাম পাওয়ার দাবিতে বা আরও নানা দাবিতে এক সাথে রাস্তা রোকো আন্দোলন করবে। কিন্তু বাঘারু মাদারিদের কি হবে?

লেখকের বিশ্বাস - মাদারির মা ঐ একা ঘরে থাকতে থাকতে একদিন ধুলোয় মিশে যাবে। আর মাদারি ও বাঘারু এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে হাঁটতে থাকবে- হাঁটতেই থাকবে। তাদের এই চলা চলতেই থাকবে আর এক বৃত্তান্ত শুরু না হওয়া পর্যন্ত।

মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, আত্মীয় বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, সময় অসময়ের বৃত্তান্ত লিখে বৃত্তান্ত পর্বের সমাপ্তি ঘটলেও দেবেশ রায়ের তিস্তা পারের মানুষের কথা বলা শেষ হয় না। তিস্তপারের বৃত্তান্ত বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে দেবেশ রায় বলেছেন — "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার পর আমার মনে হয়েছিল কতটা না লেখা থাকে। লেখাটা খানিকটা এগোনোর পর লেখাটাই অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে, আকার বাদে। তাতে আমার মনে হয়েছিল

যে অনেক কিছুই লেখা হল না। লেখা হলো না, কিন্তু তাতে গল্পের খানিকটা ধাঁচ থাকে, আকার থাকে। তাতে একটা সম্পূর্ণতার দিকে যেতেই হয়। আমি ইচ্ছে করলেই তো একটা লিখতে পারি না। ফলে প্রায় ২০ বছর পরে আমি বোধহয় ' তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র চেয়েও একটা বড় উপন্যাস লিখেছি, বেড়িয়েওছে 'তিস্তাপুরাণ'। কিন্তু মজা হচ্ছে এটা লেখার পরও মনে হচ্ছে যে তাও যেন কিছুই লেখা হলো না। আর লিখব কিনা জানি না, কিন্তু লেখার যা ইচ্ছে ছিল তার অনেকটাই বাকি আছে।''৩৯

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি তিস্তাপারের বৃত্তান্ত লেখার পরও তিস্তাপারের মানুষজন, প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা বাকি রয়ে গেছে। তাই বাকি অনেক কিছু নিয়েই রচিত হয়েছে 'তিস্তাপুরাণ'। তিস্তাপুরাণ পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র প্রায় ২০ বছর। কেন এতো সময় লাগল তার উত্তর তিনি দিয়েছেন এভাবে—''আমি ইচ্ছে করলেই তো আর একটা লিখতে পারি না।' এই সময় ক্ষেপণের আরও আরও কী কী কারণ সে সম্বন্ধে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি। প্রথমত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র চেয়েও আরও উন্নত কাঠামোর পরিকল্পনা। কারণ 'অনেক কিছু' লেখার জন্য যে আধার দরকার হয় তা তিস্তাপারের বৃত্তান্ততুল্য আধারে আটবে না। সেই আধারটি হলো 'পুরাণ'। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তিত রাজনীতি — যা তিনি তিস্তাপারের বৃত্তান্তের পরিশিষ্ট অংশে দেখিয়েছেন তার গতি প্রকৃতি অনুসন্ধান করা।

তিস্তাপুরাণঃ

এর পর্ব সংখ্যা সাত। সাতটি পর্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে করা হলো—

১) 'শেষ'— ধূপগুড়ি থেকে, গয়েরকাটা থেকে অদূরে বন-পাহাড়-দশ নদী-বিশ নদীর বুড়িমা জুবু থুবু কর্মহীনা। 'বুড়িমা যেন ঝিনঝা কাঠির ঠাকুর — তার চোখ-মুখ-কান সবই আছে, দেখে দেখে সব বুঝতে হয়। তার কোন আওয়াজ নেই, তার কোন চলন নেই।' তবুও তার উপস্থিতি সংসারে সাদরে স্বীকৃত। তার ঘর আছে। সব ঘরই তার ঘর। তার অস্তিত্ব মিশে আছে পাঁচ-ছ পুরুষের বিস্তৃত এই সংসারে। ছেলে, ছেলের বউ, তার ছেলে, নাতি, নাতির নাতি বা নাতনি এভাবেই তার গোতের বিস্তার। যখন যার ঘরের সামনে সন্ধ্যা হয় — তখনই সেই ঘরে সে ঢুকে পড়ে, রাত কাটায়। এভাবেই সে বেঁচে আছে পাহাড়ের মতো, নদীর মতো। অবশেষে সে সমুদ্র হয়ে গেছে। সেই জন্যই তার গোত বিস্তৃত ও বিশাল। এতবড় গোতের কর্মকাণ্ডও বিশাল। ছয় এগিনা যুক্ত বিশাল বাড়ি ঘর রাজবংশী আদলে তৈরি। চাষ আবাদের ব্যাপক আয়োজন। বিশেষত শ্রাবণ মাসের শেষ কুড়ি দিনের ব্যস্ততা — চাষী মাত্রেরই জানা। তারই মধ্যে একদিন মুখটাটু কানকাটুর বউ খেয়াল

করে বুড়িমা নেই। শুরু হয় খোঁজা। এগিনা, জঙ্গলবাড়ি, জোতবাড়ি সর্বত্র খোঁজা হয়। বাড়ির বউ ছেলে মেয়ে সবাই চারদিক খুঁজতে থাকে বুড়িমাকে। অবশেষে কত কল্পনা, কত আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে বুড়িমাকে পাওয়া যায় ' সানঝুর বড় ছেলের ঘরের ঝাপের আড়াল থেকে বের করে আনে কাল্টি।'

এই বুড়িমা একদিন এক ভাদ্রের দুপুরে দুখারুর পুত্রবধূ ঢলানীকে আঙুল তুলে ডেকে বলে ' পাহাড়ের ধসে বান আটকি আছে, পাহাড়ত, উচাঁপাহাড়ত, বড়বান, বড়বান—'। বুড়িমার দিব্য দৃষ্টিতে দেখা ঝুলে থাকা বড় বানা যে কোন মুহূর্তে পাহাড় থেকে নেমে এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিতে পারে। সেই আশঙ্কায় বুড়িমার গোতে একটা সাড়া পড়ে যায় গোলাঘর রক্ষার, পাটা ঘররক্ষার, গোয়ালিয়া ঘর রক্ষার, শোয়া ঘর রক্ষার।

এই ছোটাছুটির মধ্যে চলে আসে জননী কাউঠানি প্রসঙ্গ। এসে পরে তিস্তার পরিচয় — তিস্তাবুড়ি - শিবঠাকুর — মেচেনী আখ্যান। শুরু হয় নদী খোঁজার পালা। বুড়িমার গোতের খোঞ্জন, ফরিঙ্গারা ' ' নদীজানা মানষিক খুঁজিবার যাছি' বলে 'বনপথে নদীপথে' তিনজন তিন দিকে চলে যায়। এই বানা থেকে বুড়িমার গোতের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে তিন জোয়ান আর এক বেটিছোয়া গরুর পাল নিয়ে দেশান্তরে চলে যায়।

এতক্ষণ ঘর, গোলাঘর, পাটাঘর, শোয়ারঘর রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমাকেও উঁচু নিরাপদ স্থানে রাখার যে ব্যবস্থা ছিল তা চুকে বুকে গেছে। এবার কখন বানা আসবে তার প্রতীক্ষা। দিন জাগা, রাতজাগা। বিসারু ভাবে বানা এসে পাটবাড়িতে ঢুকে পড়েছে। ওরা চার পাঁচজন ধানক্ষেতে, পাট ক্ষেতে নামে, আল ধরে হাঁটে। ধান পাটক্ষেতে বন্যার পরিবর্তে বাতাস বয়ে যায়। ওরা পাকা ধান ক্ষেতের মধ্যে বসে যে হল রেখা এখনও মিশে যায়নি সেখান থেকে পুরাণকন্যা উঠে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করে।

২) 'আর এক শেষ' — প্রচলিত সময়ের হিসাবে বানা আসার কিংবা ভাসার হিসাব হয়না। বুড়িমা যখন পাহাড়ে বানা ঝুলে থাকা দেখেছে- তার মানেই হল বানা পাহাড় থেকে নেমেছে এবং সব ভাসিয়েও দিয়েছে। হয়তো এমন হতে পারে বানা সব নদীতে এসে মিশে গেছে। সময়ের দার্শনিক আলোচনা করতে করতে শুরু হয়ে যায় এক ঘাটোয়ালের সোলংগা দর্শনের গল্প।

ঘাটোয়ালের বাবা আর এক ঘাটোয়াল তার বাড়ির উঠোনে সাত কেলেনে পুরনো একটা বড় শিমুল গাছের ভেতর একটা সোলংগা দেখেছিল। শিমুলগাছটাকে কেটে সে একটা আস্ত সোলংগা বের করে। তারপর শোয়ার ঘরে রেখে দেয়। তার ছেলে ঘাটোয়াল একদিন দেখে সেই সোলংগা জলে ভাসছে। তখন সে সেই

সোলংগা ঘাড়ে নিয়ে বের হলো নদীর খোঁজে, জলের খোঁজে, সোলংগা ভাসানোর জন্য। কোন নদীতে সোলংগা ভাসাবে। দুদুয়া, জমজমা, রইপিয়া যে কোন নদীতে সে সোলংগা ভাসায়। সবাই জেনে যায় এক নাইয়া একদিকের সব নদীতেই সোলংগা ভাসিয়েছে। এটা অনিশ্চয়তা ভেবে — মেয়েরা গান গাইতে থাকে 'পরাণ সাধুরে.....' সোলংগা ও নাইয়ার গল্প নদী গুলির মিলনের গল্প। দশনদী বিশনদীর মিলেমিশে যেন একনদী হয়ে গেছে।

জয়বীর পাড়া চা বাগানের নিচে রেতি নদী দু'ভাগ হয়ে যেখানে দুদুয়ায় মিশেছে সেখানে এক আশ্বিনে সোলংগার আরোহী হয় মইনুদ্দিন পাইকার সে নৌকায় করে যাবে জলপাইগুড়ি সদরে মামলা লড়তে। যেতে যেতে নাইয়ার প্রশংসা করে। জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয়। কিন্তু নাইয়া তার মা বাবাকে কিছুই বলতে পারে না। তখন মইনুদ্দিনের সন্দেহ হয়, তাকে কী তাহলে ভুলা মাসানে ধরেছে। মইনুদ্দিন নিজে নিজে অনেক কথা ভাবতে থাকে। পাইকার নাইয়াকে জিজ্ঞাসা করে সে নদী হারিয়েছে কিনা। যেখানে যেতে চায় তার নাম জানে কিনা। নাইয়া উত্তর দেয়—দেখলে চিনতে পারবে। সে তিস্তায় যেতে চায়। ঘাটোয়াল পাইকারকে তিস্তায় যাওয়ার আহ্বান জানায়। নৌকা এসে ঠেকে এক চরে। পাইকার সেখানেই নেমে নদী তীরের এক জঙ্গলে ঢোকে। কিন্তু নাইয়াকে ত্যাগ করতে মন চায় না। সে আবার সোলংগায় ফিরে আসে। সিদ্ধান্ত নেয় এখান থেকে আরও ভাটিতে গিয়ে একখানা জঙ্গল পার হয়ে কালীগঞ্জ, জাজং পার হয়ে ময়নাগুড়ির পশ্চিমে তিস্তায় গিয়ে উঠবে। সেই মত ভাটিতে গিয়ে ফরেস্টে প্রবেশ করে। সোলংগা কাঁধে নিয়ে ফরেস্টের পথে যেতে থাকে। টাম গাছের ডাল দিয়ে বৈঠা বানায়। এরপর ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে আসে। এখন জলঢাকা পশ্চিমমাল নদী। জলঢাকায় সোলংগা ভাসিয়ে ওরা ময়নাগুড়ির দিকে ওঠে। তারপর পশ্চিমে হেঁটে তিস্তায় গিয়ে পড়ে।

ওরা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তিস্তা দেখছিল। কিন্তু জল কোথায়। সেই স্বল্প ডোবার মত জলে সোলংগা ভাসিয়ে ওরা এক সময় বিশাল তিস্তায় এসে পড়ে।

তিস্তার প্রখর স্রোতে বৈঠা হাতে ঘাটোয়াল সোলংগা বাইতে থাকে। জলের বেগ, নদীর গভীরতা সব মিলিয়ে সে 'বাপের বেটা' বটে। হঠাৎ বৈঠা ফেলে লগি ধরে। মাঝ নদীতে এলে পাইকারের মনে আবার ভয় জাগে— ভাবে তাকে মারার কৌশল করছে বুঝি। সোলংগা একটা কাশিয়ার চরে এসে থামে। এখানে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানায় পাইকার। পাইকার নেমে পড়ে চরে। ঘাটোয়াল পুরাণ পুরুষের মত নদী খোঁজার জন্য

তিস্তার জলে সোলংগা বাইতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে একদিন সোলংগা ফেঁসে জলে ডুবে যায়। ঘাটোয়াল সাঁতার কেটে পাড়ে ওঠে। তার একজন্ম শেষ হলো এভাবে। বনে সে পাতার স্তুপের মধ্যেই শুয়ে পড়ে। তারপর হাঁটতে থাকে। দেখে সামনে এক পাতার ঘর। সেখানে আছে দুই বুড়োবুড়ি। ওই ঘরে ঢুকে পাতার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এদিকে বুড়োবুড়ি ওক্সি পাতার স্তুপ সরিয়ে দুটো 'মাথোয়াল' বের করে। মাথায় দেয়। তারপর 'রাজোবাড়ি চলো' বলে চাল ফুড়ে উড়ে যায়। ঘাটোয়ালও জেগে উঠে ওরকম একটা মাথোয়াল পায়। সেও সেভাবে মাথায় দিয়ে 'রাজোবাড়ি চলো' বলতেই চাল ফুড়ে উড়ে গিয়ে রাজবাড়িতে এসে পড়ে। দেখে স্তরে স্তরে খাবার সাজানো। সে খাবার গুলি তছনছ করে। পানীয় পান করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। কিছু লোক ছুটে এসে তাকে নিয়ে গিয়ে একটা শিমুল গাছের সঙ্গে বেঁধে — আগুনে পুড়িয়ে মারতে চায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার অন্তিম ইচ্ছা কী? তখন সে মাথোয়ালটা মাথায় দিতে বলে। মাথোয়াল মাথায় দিতেই সে শিমুল গাছ সহ উড়ে গিয়ে তার নিজের বাড়িতে বৌয়ের সামনে গিয়ে নামে। বউ জিজ্ঞাসা করে কোথা থেকে সে এলো। সে উত্তর দেয় ' পর জন্ম থেকে'।

৩) আরম্ভ — বুড়িমার গোতের পরিচয় দিতে গিয়ে তার সন্তানাদির হিসেব আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কেউই বলতে পারে না তার সন্তান কতজন। সে সময়ের কোনো লোক নেই। এমনকি বুড়িমা নিজেও বলতে পারে না। বুড়িমার কত জন্ম বাঁচা চলছে সে হিসেবও কেউ রাখে না। বুড়িমার বাঁচাটা তো আসলে একটা গোটা ফরেস্টের মত বাঁচা। তার একার বাঁচার মধ্যে কত জন্ম মৃত্যু মিশে আছে। সন তারিখ হিসেব করলে বুড়িমার বয়স 'আশি' 'একশ'-র মধ্যে। তার শক্তি নিহিত আছে তার মাতৃত্বে। নারী তার মাতৃত্বের শক্তিতে গোত সৃষ্টি করে। যে একটা শরীরের ভিতর আর একটা শরীর ধারণ করতে পারে তার কাছে বানা ঝুলে থাকার কথা, হাতি ডুবে যাবার কথা আগাম বলতে পারা কী এতই কঠিন ব্যাপার।

একজন মায়ের কাছে আত্ম-পর বলে কিছু নেই। ' যাক কহিছেন পরের ব্যাটা/ উমরায় মোর জাতে খোটা।' এভাবেই গড়ে উঠেছে বুড়িমার গোত আপন পর সবাইকে নিয়ে।

'সবকিছুর পেছনে' অবস্থিত এই বুড়িমার গোতে ' খাশ জমির দখল নিয়ে' যে 'একটা আওয়াজ উঠেছিল' তা পৌঁছে যায়। পৌঁছে যায় এর ওর মুখে, স্বাভাবিক নিয়মে। এই গোত ১৯৬৪-৬৫ সালে খরার পাকে পড়ে। ফসল দারুণ ভাবে মার খায়। তবু তারা লেভির কথা শুনতে পায়। প্রয়োজন হয় খোঁজ খবরের। অগুন ময়নাতলীর হাটে যায় ছোটু মিঞার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে। আরও ভালো জানার জন্য ছোট দাদা ব্লক

অফিসে যায়। ব্লক অফিসে শহুরে একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। নানা কথাবার্তায় তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে। বাড়ি ফিরে এসে শুরু হয় 'শলা পরামর্শ'। বাঙ্কুরাম স্পষ্ট জানায়, এই লেভির মধ্যে 'পাট্টিপুট্টি'র কোন ব্যাপার আছে। এর মধ্যে এ ব্যাপারে ধূপগুড়ি হাটে মিটিংও আছে। সিদ্ধান্ত হয় মিটিংএ গিয়ে দশদিকের দশ জনের আলোচনা শোনা দরকার।

হাটে যাওয়ার একটা নেশা ধরে বুড়িমার গোতে। কারণ হাট ঘর থেকে এক মুক্তির জায়গা। বুড়িমার গোতের লোকজন ধূপগুড়ি হাটে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। 'গুহাপথ' দিয়ে বাঙ্কুরাম, ছোটদাদা, নদিনী, অগুন, শাদুরী, দোলন-রা হাটের পথে চলতে থাকে। পথে কুলজুয়ার জলে ভিজে, সাঁতার কেটে ওরা এক সময় হাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রথমে ওরা দেখতে পায় ডাঁই করা হাঁড়ি কলসীর দোকান। সেখানে চুকাই, ঢেক, ঘারা, পোইলা, ঢেকসা নানা রকমের হাঁড়ি-পাতিল দেখে। এরপর গদিয়ালবাবুর দোকানে বসে। লেভির প্রসঙ্গ আসে। বাজারে চালের জোগান অত্যন্ত কম। দরও ৩০০ টাকা কুইন্টাল।

চা- নিমকি খেয়ে ওরা উঠার উপক্রম করতে গেলে গদিয়াল মিটিং শুরু হবে বলে বসতে বলে। 'ক্ষেতোয়াল' কাছুয়া মহম্মদ, টাকু পাইকার, মোটা শিলা জোতদার, ছোটু মিঞা, শশঙ্গি জোতদাররা এসেছে মিটিং-এ যোগ দেওয়ার জন্য লেভির এজেন্ট গদিয়াল ভদ্রলোক কৌশল করে বিডিও সাহেবকে নিয়ে এসেছে। বিডিও সাহেব সাধ্যমত সবাইকে লেভি দিতে বলেন। এদিকে হাটের মধ্যে বাংলা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি লেভি না দেওয়ার জন্য মিটিং মিছিল করছে।

লেভি নিয়ে নিজেরা আলাপ আলোচনা করে বুড়িমার গোত দু'কুইন্টাল ধান দিতে চায়। কিন্তু গদিয়াল মালিক বলে এতে গোতের মান থাকে না। অবশেষে সতের কুইন্টাল করা হয়। সেও আবার গদিয়ালই দিয়ে দেয় — ওরা গদিয়ালকে টাকা দিয়ে দেয়। সুতরাং এই মিটিং লেভি ছাড়ের মিটিং নয় বরং লেভি দেওয়ার মিটিং। খরার পাকের মধ্যে পড়েও বুড়িমার গোতকে এত লেভি দিতে হল ফলে ওরা ঠিক করে —' ই সরকারক পাল্টিবার লাগে'। এবং যথারীতি পরের ভোটে সরকার পাল্টে যায়।

লেভির কাজকমর্ম্ম সেরে ওরা বাড়ি ফেরে। বাড়ির কাছাকাছি এসে জিজ্ঞাসা করে ' বুড়িমা কেনং আছে? উত্তর আসে ' আছে, আছে, আছে।'

৪) আরম্ভের পর — বুড়িমার বাড়ির লোকেরা সারা দিনে বহুবার বুড়িমার গায়ে হাত দিয়ে দেখে বুড়িমা বেঁচে আছে কিনা। বুড়িমা তো শকুনের ডিমের মত বা দুস্প্রাপ্য লতার মত দুলর্ভ নয়। সেই সবচেয়ে বেশি

সহজ প্রাপ্য। তাকে বাড়ির সর্বত্র পাওয়া যায়। এবাড়ির দৈনন্দিন জীবন, ঋতুভর জীবন এই সবের মধ্যে বুড়িমা জড়িয়ে আছে — তুলসী মঞ্চের পেছনে লতার মত।

'হাতের ছোঁয়াতেই যাকে মৃত বলে জানা যেতে পারে, সে বেঁচে আছে কিনা সেটা জানা হয়ে যাবার পর সে আরও বেশি বেঁচে যায় না?' বুড়িমার শরীরের বেঁচে থাকার জন্য যে তাপ দেয়, সে বুড়িমার শরীর থেকে তাপ নেয়ও।

বাড়ির কোন পুরনো বৌ, বড় কোন নাতনী বা কোনো পুতির বেটি ঘরে এগিনায় যাওয়া আসার সময় বুড়িমাকে একটু ছুঁইয়ে দিয়ে যায়। কোনো ঘরে বুড়িমা ঢুকে থাকলে পুরনো বৌ দু'হাতে তার গাল ধরে আদর করে। উত্তাপ দেয়, নেয়। নতুন বৌয়ের ঘরে ঢুকলে, কেউ বাইরে থেকে বলে দেয় 'থাকুক, থাকুক।' বুড়িমা তো এ গোতে বুড়িমা হয়েই আসেনি। এসেছে বৌ হয়ে। সেদিক থেকে সে তো অন্য সংসারের মানুষ। তাই ইচ্ছে করলে সেও চলে যেতে পারে। একটা অনিশ্চয়তা। বুড়িমা যেন সাইটোন দেবী। তাকে বাঁজার লজ্জা যাতে পেতে না হয়, বনবাসে যেতে না হয়, তাই তাকে ছোঁয়া, তাকে বাঁচিয়ে রাখা।

৫) আর এক আরম্ভ — সেবার বুড়িমার দশনদী বিশনদীর পৃথিবীতে মনে হয় এক নি-ছাড়নি বর্ষা শুরু হয়ে গেল যার ফলে ফলনের হিসেব সব গোলমাল হয়ে গেল। বর্ষার আগের ফলন, বর্ষার সময় ও পরের ফলন সব কখন কোনটা সব যেন গুলিয়ে গেল। বর্ষার সময় বৃষ্টি ছাড়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। একবার শীতও নাকি এরকমই দীর্ঘ ও তীব্রতর হয়েছিল। সেই জমি দখল টখলের সময় ওই বর্ষা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের যুদ্ধের পর যে ভাটিয়া ওদেশ থেকে এসে এখানে বসবাস শুরু করেছিল। তারা জলচাষ জানত। তারাই এখানে জলচাষের সূচনা করে। জলচাষ মানে যে চাষে প্রচুর জল দরকার হয়। জমিতে জল দিতে হয়। আবার বেরও করে দিতে হয়। এটা হাইইল্ড চাষ। বিঘায় ১৫-২০ মন ধান হয়। ব্লক অফিস থেকে বীজ ধান এনে বিছন করে ঘন ঘন করে লাইন করে চারা লাগাতে হয়। তিন মাসের মধ্যে ধান পেকে যায়। বৃষ্টির ফলে এই জলচাষ করার সুবিধাও হল। অবশ্য জলা জায়গার পাশেও এচাষ চলে।

ঋতু বিপর্যয়ের ফলে দেখা দিল ভূমি বিপর্যয়। মাসের পর মাস জলে ডুবে থাকা মাটির রং বদলে যায়, গন্ধ বদলে যায়। ছোট ছোট মাছে মাখামাখি মাটি কোন চাষের উপযোগী তা ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় বর্ষাও থেমে যায়।

তখনও বুঝে ওঠা যায় না এটা কোন মাস চলছে এমনকি কোন ঋতু। দেখা যায় নাম বিপর্যয়। মাসের নাম,

ঋতুর নাম সব গোলমাল পাকিয়ে যায়। সূর্য উঠলেও বোঝা মুশকিল এটা আশ্বিন মাস না ফাল্গুন মাস। বর্ষার পর ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। তা থেকে শীতও অনুমান করা যায়। বর্ষা শেষ হলে একটা জিনিস বেশ লক্ষ্মণীয় তা হল গর্ভধারণ। বর্ষাটা যেন গর্ভধারণেরই সময়। গর্ভধারণ মানে তো প্রসবও। আর তাদের ছেলেদের নামও হয় ঝরণ, ঢেপা, জংলু, সিমুলিয়া। ঝরণ বৃষ্টি অনুসারে। ঢেপা বৃষ্টির বিপরীতে। বাংলাদেশ থেকে আসা দুদুয়ার ভাটিয়ারা এরই মধ্যে নতুন চাষ শুরু করে। আধিয়ারি লিস্টে তাদের নামও ঢুকানো হয়।

দুদুয়ার ভাটিয়ারা তাদের চাষবাস হয়ে গেলে বেরিয়ে পড়ে। দেখা শুনাও হয় সবার সঙ্গে। এভাবে ওরা সবার চেনা হয়ে যায়। তারা সবাই ভাটিয়া চাষ দেখায়। এখানকার প্রচলিত চাষের বাইরে নতুন ফলনের — আলু, টমেটো, কুমড়ো ইত্যাদি চাষ। দশ-বারো বছর পর দশনদী বিশনদী অঞ্চলেও এই সব চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন বর্গাও শুরু হয়। বর্গা লিষ্ট তৈরি হয়। কিন্তু আধিয়াররা ভয় পায়, এতে কি সুবিধা তারা বুঝতে পারে না। শশঙ্গি জোতদার দেশি আধিয়ারের চেয়ে ভাটিয়া আধিয়ারকেই বেশি পছন্দ করে তাদের নাম লিষ্টে দিয়ে দেয়। তাতে দেশি আধিয়াররা ক্ষেপে ওঠে। পরে ভাটিয়া আধিয়াররা নিজেরাই তাদের নাম কাটিয়ে নেয়।

ভাটিয়ারদের দ্বারা নতুন চাষ শুরু হলে আরও নতুন নতুন চাষের খোঁজ চলে। বিডিও অফিসে পাওয়া যায় সেই খোঁজ। বর্ষা ও শীতের শেষে — ক্ষেতবাড়িকে নতুন চাষের উপযোগী করা একটা অভিযান।

শুরু হয়ে যায় উপদেষ্টা খোঁজা। ব্লক অফিস থেকে চেয়ে পাঠানো হয় একজন চাষ জানা উপদেষ্টাকে। দুদুয়ার চাষিদেরও বুড়িমার গাঁও- এ নেমন্তন্ন করে আনা হয়। দুদুয়ার ভাটিয়ারা এসে মাটি পরীক্ষা করে দেখে এ মাটিতে ধান চাষ হবে কিনা। ব্লক অফিসে হাইইল্ড ধান চাষের পরামর্শ পাওয়া যায় সে কথাও তারা জানায়।

এরপর একদিন ব্লক অফিসের বাবুরা এসে বুড়িমার গোতের লোকজনের সঙ্গে হাইইল্ড চাষ সম্পর্কে আলোচনা করে। চাষ বিশেষজ্ঞবাবু জমিতে কতদিন জল রাখতে হবে কত দিন শুকনো রাখতে হবে সে বিষয়ে জ্ঞান দান করেন।

নদীর পারের একটা জমিতে 'হাইলে'র চাষ শুরু হয়ে যায়। ওরা তাদের জানা সমস্ত বিদ্যা উজার করে চাষ শুরু করে। ধান গাছও জঙ্গলের মত হয়। কিন্তু তাতে শীষ বের হয় না। ওদের মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম। ওরা বিডিও অফিসে যোগাযোগ করে জানতে পারে জমিতে হয় সার বেশি দেওয়া হয়েছে নয় তো কম।

ধানজ্বর প্রতি বছরের মত এবছরেও এলো। রোয়াগাড়ার সময় এ জ্বর শুরু হয়, ধান কাটার সময় পর্যন্ত চলে। একে একে বাড়ির প্রায় সবাই এ জ্বরে আক্রান্ত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিমপাতার রস খেয়েই এ জ্বর সেরে যায়।

ধানজ্বরের মত এবার ম্যালেরিয়া এসে বসল। খেতুয়া, ছোটবাপা, সোমারীরা, ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ল। হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে খাওয়াতে লাগল বাড়ির লোকেরা। এব্যাপারেও ব্লক অফিসে স্প্রে করার ওষুধ পাওয়া যায়।

হাইইল্ডের পাশাপাশি তামাক চাষের মত একটা পুরোনো চাষ চালু আছে বুড়িমার গোতে। ঢেমনার ডাঙ্গির মাঠের এক অংশে তামাক চাষ শুরু করে। এই তামাক ক্ষেতে তামাক চাষ করতে করতে ঢেমনার জ্বর আসে। এবং তামাক ক্ষেতের পাশে এক পাটকাঠির পুঁজে মারা যায়। আকাশের শকুন ওড়া দেখে বাড়ির লোকেরা গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পায়। সেই ঢেমনার মুখাগ্নি করে বড়দাদা। ঢেমনা বুড়িমার গোতের কেউ না হয়েও গোতের একজনের মর্যাদা পায়। যেন পুরাণ পুরুষ।

৬) শেষান্তর— বুড়িমা গোত্রনারী। বুড়িমা থেকেই একটা গোত তৈরি হয়েছে। সাধারণতঃ গোত তৈরি হয় অনেক পরে। মানুষেরা তাদের নিজেদের পরিচয় দেবার জন্য নিশানা হিসাবে গোত তৈরি করে। কিন্তু এখানে বুড়িমার জীবদ্দশাতেই — গোত্র তৈরি হয়ে গেছে। বুড়িমা নিজে ভুলে গিয়ে তার ছেলেকেও ভুলিয়েছে। এই বিস্মরণ থেকেই তৈরি হয়েছে গোত।

সেই গোতে এসেছে পরিবর্তন। এসেছে নতুন চাষ। বদল হয়েছে হাওয়া। বনে, ক্ষেতে যে সব পাখি আসত তারা সময়, পথ বদল করেছে। 'আওয়াজ বদল' হয়েছে। হাইইল্ড ধানের জন্য পাম্পসেটের শব্দ। নতুন শব্দ। ইউরিয়া সারের গন্ধ — এখানে নতুন গন্ধের আমদানি। এছাড়া বুড়িমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা হওয়া। গাড়ি, ভ্যান আসা যাওয়া শুরু করেছে। তারই সূত্রে বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে। সেখানে দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের দেখা যাচ্ছে।

শাড়ি পড়া দিদিমণিকে দেখে গোতের মেয়েরাও শাড়ি পড়া শুরু করে। এরই মধ্যে বুড়িমা একদিন দুখারুর পুত বৌ ঢলানিকে ডেকে বলে ' তিস্তার পারে' হাতি ডুবে যাবার ধরিছে। সেবা দে সেবা দে।' বুড়িমা যখন বলেছে হাতি নিশ্চয় ডুবছে। তাই সেবা দেওয়ার জন্য বুড়িমার গোত সেবার সামগ্রী জোগাড় করতে থাকে। নতুন কুলো বানায়। নতুন কলা পাতা, কলাগাছ কেটে টুকরো করে। পরের দিন তারা যাত্রা করে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ময়নাতলি যাওয়ার বাসে ওঠে। বাসেই টিকিটোয়াল ছেলেটির মুখে হাতি ডোবার স্থানটির নাম জানতে পারে। পুরনো বার্নিশের কাছে চরে হাতি ডুবে যাচ্ছে।

ডুবন্ত হাতিটা একটা কানজি হাতি। হাতি ডোবার স্থানে পঞ্চায়েত থেকে একটা প্লাষ্টিকের চাদর টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দর্শকের এত ভিড় যেন মেলা বসেছে। আমলাতান্ত্রিক কিছু অসুবিধায় ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করা যায়নি। হস্তি বিদ্যার নানা দিক আলোচনা করে শেষে সিদ্ধান্ত করা হয় যে —কানাজি নিজেই পাতাল প্রবেশ করবে বলে নদী দেবতার কাছে এসেছে।

বুড়িমার গোত সেই যে ভাদ্রের গোড়াতে হাতি ডোবার স্থানে এসেছে সেই থেকে আছে। হাতিকে সেবা দিয়েছে। প্রতীক্ষা করছে কবে হাতিটি সম্পূর্ণ ডুবে যাবে। কানজির হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাওয়ার দিন জোরপাকড়ির কোটকা জটাইয়ের নাতির সঙ্গে বুড়িমার গোতের শনিয়ার বিয়ে হয়ে গেল।

এই হাতি ডোবার মেলাতেই একদিন বড়দাদা ছোটদাদাকে দেখতে পায়। তাকে পেয়ে বুড়িমার গোতের সে কি আনন্দ। আবার তাকে গোতে ফিরে যাবার কথা বলে সবাই। কিন্তু ছোটদাদা বলে, 'মোর জোতও নাই, গোতও নাই।'

চাঁদের দহন বাড়লে কানজি ডুবে যায়। তিস্তাপারের শক্ত মাটি থেকে হাতির গান ভেসে আসে — 'ও মোর দাঁতাল হাতির মাহুত রে।' হাতির রাজা কানজি ডুবে যাচ্ছে হস্তি কন্যা কিছু করতে পারছে না বলে আক্ষেপ করে গান গায়। ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদ উঠলে হস্তির সারা শরীরে মস্তির নেশা জেগে ওঠে। বিভিন্ন বয়সীরাও নেশাগ্রস্থ হয়ে ওঠে। অন্যান্য হস্তি-হস্তিনীও রমনে মেতে ওঠে। কানজি আপন মনে, আপন রভসে শেষ মস্তি করে নিজেই নিজের সঙ্গে— কারণ তার পাশে তো অন্য কোন শরীর নেই।

হঠাৎ রটে যায় হাতির পুরোটা ডুবতে দু'মাস সময় লাগবে। তাই সবাই বাড়ি ফেরার জন্য 'প্রস্তুতি নেয়। একসময় নজরে পড়ল কানজির পেছনের বাঁ দিকটা ডুবে যাচ্ছে। কানজির মাথা সোজা হয়ে গেল। তারপর একেবারে ডুবে গেল।

এবার সবার মত বুড়িমার গোতও গাঁয়ে ফেরার জন্য তৈরি হতে লাগল। এমন সময় ভ্যানে করে শাড়ি পড়ে শনিয়া ও তার ফুল প্যান্ট পরা বর — এদের খোঁজে আসে। বুড়িমার গোতের লোকেরা ছোটদাদাকে সঙ্গে করে গাঁয়ে নিয়ে যেতে চায়। ছোটদাদা পরে যাবে বলে বাস থেকে নেমে যায়। নেমে শনিয়াকে দেখে। বুড়িমার গোতের মেয়ে তবু চিনতে পারে না। শনিয়াও পারে না। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থেকে

দু'দিকে চলে যায়।

৭) কথান্তর —ছোটদাদা পাঁচ সাত দিনের মধ্যে নতুন পথে গোতে ফেরে। একজীবনের অর্ধেকটা তো তার কেটেছে গোতের বাইরে নির্বাসনে। ফিরতি পথে সে পথের দু'ধারে পরিবর্তন দেখতে পায়। গোতে ফেরা মাত্র গোতের লোকেরা তাকে ঘিরে ধরে। শুনতে চায় তার বাইরের দেশের গল্প। সে গল্প করে, জানায় সব খানেই সে বুড়িমার গাঁওয়ের পরিবেশ দেখতে পেয়েছে। বড়দাদা, বাঙ্কুরাম, বনুয়া, কলিন, অগুনরা তাকে বুড়িমার পরিবর্তন হওয়া ক্ষেত দেখায়। ছোটদাদার মনে পড়ে গরুচুমানি, কার্তিক সংক্রান্তির স্মৃতি।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ছিলিম খেতে খেতে সবাই মিলে নানা রকম রসিকতা করে। এরই মধ্যে উঠে আসে ডাঙ্গির মাঠের প্রসঙ্গ। যে ডাঙ্গির মাঠ দখল নিতে গিয়ে একদিন ছোটদাদাকে নির্বাসনে যেতে হয়েছে— সেই ডাঙ্গির মাঠ এখন ছোটদাদাকে লিখে দিতে চায় গোতের কর্তারা। কিন্তু ছোটদাদা তা স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করে।

নইদারিঘরে একদিন দিনের বেলায় বড়দাদার পাশে শুয়ে সে ডাক শুনতে পায়, গোত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ডাক। এখন গোতের জমিতে এক মনের জায়গায় বিশমন ধান ফলে। কিন্তু 'এতখান ফসল মানষির ক্ষিধার তানে না। টাকার তানে।' তাই সে সেদিন ফিরবে যেদিন ' মানষির হাতের ফসল মানষির পেটের ক্ষিধার মুখত নিগিবার' দরকার হবে। এতে কয়েক জন্ম অপেক্ষাও করতে হতে পারে।

পাছত এগিনায় ঢোকার বাঁকে বুড়িমা আঙুল তুলে ছোটদাদাকে ডাকে তার পিঠে বেধে তাকে তিস্তায় বিসর্জন দিতে। ছোটদাদা বুড়িমার আদেশ মত পিঠে বেঁধে বড় বাঁক, আংরাভাসা নদী হয়ে তিস্তায় বিসর্জন দিতে নিয়ে যায়। বিসর্জনের পর আবার সে সেই পথেই ফিরে আসবে। দু'চার মানব জন্ম পর। এভাবেই পুরাণ শেষ হয়।

তিস্তাপুরাণের বিষয় মূলত রাজবংশী মানুষের জীবনকথা। গোত্রনারী বুড়িমাকে কেন্দ্র করে দশনদী-বিশনদীর দেশে বুড়িমার গোত। সেই গোত অন্তর্গত মানুষদের দৈনন্দিন —জন্ম-মৃত্যু, বেঁচে থাকা, তাদের রীতি নীতি পূজাপরব, বিশ্বাস। নদীকে চেনা— নদী মানষি। এই জীবনচর্চ্চার নিরিখে রাজনীতি। একটা জন গোষ্ঠীর ধীরে ধীরে পরিবর্তন — আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এখানেও উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে ছোটদাদার বুড়িমাকে তিস্তায় বিসর্জন দিতে চলে গেছে নদী ধরে ধরে। আবার আসবে মানুষের পেটের ক্ষিধে যখন ডাকবে। বিঘেয় ১০-১৫ মন ধানে পেটের ক্ষিধে মিটলেও অর্থের নেশা মেটে না। এ উন্নয়ন ধনতন্ত্রের। মানুষ

-এর সুফল পায় না। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বাঘারু,মাদারিরা যে উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন ফরেস্ট নতুন নদীর খোঁজে হাঁটা শুরু করেছে, কতদিন হাঁটবে কে জানে। অন্ততঃ গত ২০ বছরের বামফ্রন্ট শাসনেও লেখক তার হদিশ খুঁজে পাননি। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণের মধ্যবর্তী ২০ বছর কমিউনিস্ট প্রভাবিত বামফ্রন্টের শাসন কাল। কিন্তু লেখকের কমিউনিস্ট বিশ্বাসে মানব মুক্তির সম্ভাবনা আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে। তাই বৃত্তান্তের নায়করা পুরাণে এসে অন্য নামে হাজির হয়েছে। লেখকের আশা ছোটদাদা ফিরবে কয়েক জন্ম বাদে। চির আশাবাদী দেবেশ রায়ের এই বিশ্বাস। এই আশা থেকেই 'তিস্তাপুরাণ' পরিকল্পনা ও সমাপ্তি।

।। দেবেশ রায়ের রচনা সম্ভার ।।

দেবেশ রায়ের গল্প সমগ্র ৬ খণ্ডঃ—

দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ১-	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৯৯, এপ্রিল ১৯৯২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ২-	দেবেশ রায়, রাখি পূর্ণিমা, শ্রাবণ ১৩৯৯, আগষ্ট ১৯৯২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৩ -	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৪ -	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৫ -	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৬ -	দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০৭, এপ্রিল ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
দেবেশ রায়ের গল্প	প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ১৯৮৮, শাশ্বত লাইব্রেরি, কলকাতা।
দেবেশ রায়ের ছোটগল্প	প্রতিক্ষণ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, কলকাতা।
দুই দশক	অন্বেষা, ১৯৮২, কলকাতা।

স্মৃতিহীন বিস্মৃতিহীন	এ, মুখার্জী, কলকাতা।
রক্তমণির হারে (সম্পাদনা)	সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লী ১৯৯৯।
প্রবন্ধ	
আঠারো শতকের বাংলা গদ্য ঃ চিঠিপত্রে কিছু নতুন প্রমাণ	প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৮৭।
ঔপনিবেশের সমাজ ও সাংবাদিক গদ্য,	
উনিশ শতকের প্রথমার্ধ নিয়ে কিছু অনুমান	প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯০।
উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজ	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪।
উপন্যাস নিয়ে	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১।
তারাশঙ্কর নিরন্তর দেশ	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৩।
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য	কে.পি.বাগচি, কলকাতা, ১৯৭৮।
সময় ও সমকাল	রক্তকরবী, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪।
বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও আধুনিকতা	
শিল্পের প্রত্যহে	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯২।
অপর ভাষা	অক্ষর পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪।
উপন্যাস ঃ গ্রন্থাকারে অসংকলিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত	
শতরূপা	(প্রথম উপন্যাস, অপ্রকাশিত - ১৯৫৭)
প্রেতাচ্ছায়ে ঘেরাফেরা	(শতরূপাতে লেখা - ১৯৫৬-৫৭)
কালীয় দমন	(সপ্তর্ষিতে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস - ১৯৬১)
অস্তিত্বের গণিত	(৫০০ পৃষ্ঠা মিত্রালয়ে প্রকাশের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু হারিয়ে গেছে, খসড়ার সামান্য অংশ আছে - ১৯৬১)
উপন্যাস ঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত	

মানুষ খুন করে কেন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৭৬।
যযাতি	দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯১।
আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে	বিশ্ববাণী, কলকাতা ১৯৭৩।
বেঁচে বতর্তে থাকা	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮৪।
মফস্বলি বৃত্তান্ত	পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, নববর্ষ ১৩৯৬, এপ্রিল ১৯৮৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০।
স্বামী স্ত্রী	প্রতিভাস, কলিকাতা, ১৯৮৬।
সহমরণ	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৮৮।
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৮৮।
জীবন চরিতে প্রবেশ	অরুণা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০।
হনন, আত্মহনন	রক্তকরবী, কলকাতা, ১৯৯৩।
সমুদ্রের লোকজন	শারদীয়া বসুমতি, ১৯৮৫
আত্মীয় বৃত্তান্ত	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৯০।
সময় অসময়ের বৃত্তান্ত	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৯৯৬।
শিল্পায়নের প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬।
একটি ইচ্ছা মৃত্যুর প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৫।
দাঙ্গার প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৪।
খরার প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৩।
ইতিহাসের লোকজন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯২।
চেতাকে নিয়ে চীবর	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
জন্ম	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯৭।
লগন গান্ধার	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৪০১।
তিস্তাপুরাণ	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০০।

দুই দশক	অন্বেষা, কলিকাতা, ১৯৮২।
উচ্ছিন্ন উচ্চারণ	দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৮।
যুদ্ধের ভিতরে যুদ্ধ	দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯০।
আরেকটা কলকাতা	কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা ২০০০।
মারবেতালের পুরাণ	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪।
আঙিনা	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫।
ব্যক্তিগত ও গোপন ফ্যাসিবাদ নিয়ে একটি বই	
স্বদেশ বিদেশ	প্রতিক্ষণ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩।
নভেলজোড়	দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭।

সম্পাদনা ঃ

বিদ্যাসাগর : নির্বাচিত রচনা সমাজ ও সাহিত্য	
দেবেশ রায় ও অশ্রুকুমার শিকদার সম্পাদিত	রাজা রামমোহনপুর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১।
শত সানু দেশ	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।
ধানের গায়ে রক্তের দাগ	
দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ	পরিচয়, কলকাতা ১৯৮৩।
'রূপসী বাংলা' পাণ্ডুলিপি সংস্করণ	
জীবনানন্দ সমগ্র ১২ খণ্ড	
জীবনান্দ সমগ্র ১ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, ১৭ই জানুয়ারি ১৯৮৫
জীবনান্দ সমগ্র ২য় খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৯২, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২৫শে বৈশাখ ১৪০০।
জীবনান্দ সমগ্র ৩য় খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, ২৯শে

	জানুয়ারি ১৯৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৫।
জীবনান্দ সমগ্র ৪র্থ খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ৩১শে জানুয়ারি ১৯৮৭।
জীবনান্দ সমগ্র ৫ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ১৪ই মাঘ ১৩৯৫।
জীবনান্দ সমগ্র ৬ষ্ঠ খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ১৯৯০।
জীবনান্দ সমগ্র ৭ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ৩১শে জানুয়ারি ১৯৮২।
জীবনান্দ সমগ্র ৮ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ ৩১শে জানুয়ারি ১৯৯৩।
জীবনান্দ সমগ্র ৯ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ।
জীবনান্দ সমগ্র ১০ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৬।
জীবনান্দ সমগ্র ১১ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৭।
জীবনান্দ সমগ্র ১২ম খণ্ড	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃলিঃ।
অন্যান্য ঃ	
তৃপাকে এক তোড়া (আত্মজীবনীমূলক)	কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা ২০০০।
জলের মিনার জাগাও (আত্মজীবনীমূলক)	বারোমাস-এ ১খণ্ড ও আরম্ভ-এ ৩ খণ্ড প্রকাশিত।
প্রতিবেদন	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম সংস্করণ, ২০০৭।
মিতানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি	দোয়েল, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩
বোলে বোলে বোলেরে বোল বিহান	দোয়েল, কলকাতা ২০০৪
দলিত	সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১।

উল্লেখপঞ্জি

১। বারোমাস, ২৭ বছর, শারদ ২০০৫, জলের মিনার জাগাও পৃঃ ৩১৫।

২। তদেব পৃঃ ৩১৫

৩। তদেব পৃঃ ৩১৬

৪। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র প্রথম খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০, পৃষ্ঠা ১২।

৫। বিজ্ঞাপন পর্ব ১৯৮০, পৃঃ ৭৫

৬। তদেব পৃঃ ৭৫

৭। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র তৃতীয় খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০, পৃষ্ঠা ৯।

৮। বিজ্ঞাপন পর্ব ১৯৮০, পৃঃ ৭৬

৯। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র তৃতীয় খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০, পৃষ্ঠা ১০।

১০। তদেব পৃঃ ১১

১১। তদেব পৃঃ ১১

১২। বিজ্ঞাপন পর্ব ১৯৮০, পৃঃ ৭৬

১৩। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৫-৬

১৪। তদেব পৃঃ ৬

১৫। তদেব পৃঃ ১০

১৬। তদেব পৃঃ ১২

১৭। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০১, পৃঃ ১৩

১৮। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৫

১৯। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, প্রথম খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০, পৃঃ ১১

২০। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, ভূমিকা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৯৯, পৃঃ ৩

২১। তদেব পৃঃ ৭

২২। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, ভূমিকা, তৃতীয় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০০, পৃঃ ১২

২৩। তদেব পৃঃ ১২

২৪। তদেব পৃঃ ১৩

২৫। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ১

২৬। তদেব পৃঃ ১-২

২৭। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, প্রথম খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃঃ ১১

২৮। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা শ্রাবণ ১৩৯৯, পৃঃ ৭

২৯। পঞ্চাশের দশকের কথাকার, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, শঙ্খ পুস্তক প্রকাশন, কলকাতা ১৯৯৮, পৃঃ ২৩৭।

৩০। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র তৃতীয় খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা আষাঢ় ১৪০০, পৃঃ ১৩-১৪।

৩১। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র, পঞ্চম খন্ড, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃঃ ৬।

৩২। বাচন ও স্বনির্বাচন, অরুন সেন, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, কলকাতা ১৯৯৮, পৃঃ ১০১।

৩৩। সময় অসময়ের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃঃ ২২।

৩৪। তদেব পৃঃ ২৬

৩৫। তদেব পৃঃ ২৮

৩৬। তদেব পৃঃ ২৮

৩৭। তদেব পৃঃ ৩০

৩৮। তদেব পৃঃ ৩০

৩৯। মাধ্যম ও সংযোগ ঃ তৃতীয় বর্ষ ঃ বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' এর পর্ব-পরিচয়, কাহিনি-সংক্ষেপ 'তিস্তাপুরাণ' এর পর্বপরিচয়, কাহিনি-সংক্ষেপ

দ্বিতীয় অধ্যায়

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত

পর্ব-পরিচিতি

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৫০৪। মলাট ও অন্যান্য পরিচয় জ্ঞাপক পৃষ্ঠা, সূচিপত্র ও তিস্তাপারের ম্যাপ সহ ১২ পৃষ্ঠা। তাহলে গ্রন্থের মূলকাহিনি অংশ ৫০৪ থেকে ১২ পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে মোট ৪৯২ পৃষ্ঠার।

সমগ্র উপন্যাসখানি ৬টি পর্বে বিভক্ত। প্রতিটি পর্ব বিশেষ বিশেষ শিরোনামে চিহ্নিত। যেমন—

(১) আদিপর্ব - 'গয়ানাথের জোতজমি', (২) বনপর্ব— 'বাঘারুর নির্বাসন' (৩) চরপর্ব—'নিতাই দের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্ত বাহিনীর সীমান্ত ত্যাগ', (৪) বৃক্ষপর্ব—'বাঘারুর প্রত্যাবর্তন, (৫) মিছিল পর্ব—উত্তরখন্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দারি, (৬) অন্ত্যপর্ব—মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সবশেষে পরিশিষ্ট।

প্রতিটি পর্ব আবার কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলিরও প্রতিটি স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয়েছে। মোট অধ্যায় সংখ্যা ২১৯। কোন পর্বে কত অধ্যায় কত পৃষ্ঠা তা নিচে দেওয়া হলো—

পর্ব	শিরোনাম	অধ্যায় সংখ্যা	পৃষ্ঠা
▪ আদিপর্ব	গয়ানাথের জোতজমি	৪১	১৩—৯৯
▪ বনপর্ব	বাঘারুর নির্বাসন	৪৪	১০২—১৮৮
▪ চরপর্ব	নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্ত বাহিনির সীমান্ত ত্যাগ	৩৪	১৯৩—২৬৭
▪ বৃক্ষপর্ব	বাঘারুর প্রত্যাবর্তন	৩৩	২৭৩—৩৪৪
▪ মিছিল পর্ব	উত্তরখন্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি	৩৮	৩৫১—৪৩৩
▪ অন্ত্যপর্ব	মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র	২৮	৪৩৯—৪৮৯
▪ পরিশিষ্ট	এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ	১	৪৯৫—৫০৪

প্রকাশ কাল : ১৯৮৮ এর, জুলাই। এর আগে ১৯৮০ ও ৮১ শারদীয় 'বারোমাস' এ আদিপর্ব ও বনপর্ব,

৮৪ ও ৮৬'র শারদীয় কালান্তরে চরপর্বের অংশ ও ৮৭'র শারদীয় 'প্রতিক্ষণ'এ অন্ত্যপর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ১৯৯০ সালে অকাদেমি পুরস্কার পায়।

অধ্যায় পরিচিতি

সূচিপত্র

আদিপর্ব: গয়ানাথের জোতজমি

এক. হাটের পথে ১৩, দুই. ন্যাওড়া নদীর খেয়া ১৫, তিন. সত্যমের জয়তে ১৭, চার. ঢোলের বদলে মাইক ১৯, পাঁচ. প্রিয়নাথের সাহেব ও হাট কমিটি ২২, ছয়. প্রিয়নাথের সাহেব ও হাটের ২৪, সাত. প্রিয়নাথের সাহেব ও হাটের নাচ মাইক ২৫, আট. হাট কতরকমের ২৬, নয়. এই হাটটা কেমন ২৭, দশ. হাটের আড়ালে হাট ৩০, এগার. হাটের সামাজিকতা ৩৩, বার. শেষহাটি থেকে হাট শেষ ৩৪, তের. সাহেবের আত্মবিলাপ ৩৫, চোদ্দ. ফরেস্টার চন্দ্রের আত্ম ঘোষণা ৩৭ পনের. সার্ভে পার্টির যাত্রা ৪০ ষোল. গয়ানাথের হালুয়াগিরি প্রাক্‌টিস ৪২ সতের. হাল, বলদ ও মোটর সাইকেল ৪৪ আঠার. আসিন্দিরের হাল দেয়া ৪৬ উনিশ. বনপথে আকাশ বাতাস ৪৭ কুড়ি তিস্তার পাড়ে জমি জরিপের আয়োজন ৫০ একুশ. গাছের ডগায় মৌজা ম্যাপ ৫২ বাইশ. জঙ্গলের ভেতরে ৫২ তেইশ. নদীর ম্যাপ আঁকা ৫৫ চব্বিশ. নদী আছে কি নাই গয়ানাথী তর্ক ৫৭ পঁচিশ. দশবছর আগে পরে 'গয়ানাথের জোত' ৫৯ ছাব্বিশ. ভিড় ও গয়ানাথ ৬১ সাতাশ. জমি জরিপ : গয়ানাথী পদ্ধতি ৬৩ আঠাশ. গয়ানাথী প্রমাণ ৬৬ উনত্রিশ. জনসমাবেশ ৬৮ ত্রিশ. কৃষক সমিতির 'প্রোগ্রাম' ৬৯ একত্রিশ. রাধাবল্লভের বক্তৃতা ৭১ বত্রিশ. হৃষিকেশের গান ৭৩ তেত্রিশ. কৃষক মজুর ঃ আলোচনা ৭৫ চৌত্রিশ. কৃষক-মজুর : লেনদেন ৭৭ পঁয়ত্রিশ. কৃষক-মজুর : শ্রেণি সংগ্রাম ৭৯ ছত্রিশ. কৃষক-মজুর : ভাষণ সংগ্রাম ৮২ সাঁইত্রশ. কৃষক-মজুর সংগ্রাম ৮৫ আটত্রিশ. কৃষক-মজুর: ঐক্যের সংগ্রাম ৮৭ উনচল্লিশ. একি কৃষক না মজুর? ৮৯ চল্লিশ. বাঘারুর জিপারোহন ৯১ একচল্লিশ. মায়ের বাঘারু প্রসব , বাঘারুর ব্যাঘ্র নিধন ও এম, এল.এ তরণ এবং বাঘারুর প্রথম সংলাপ নিয়ে আদি পর্বের শেষ অধ্যায় ৯৪।

বনপর্ব : বাঘারুর নির্বাসন

বেয়াল্লিশ. এম.এল.এ ফিরে এল, ১০২; তেতাল্লিশ. জমির আল ও এসেম্বলির মাথা ধরা, ১০৩; চুয়াল্লিশ. এম, এল, এ,-র চা খাওয়া, ১০৬; পঁয়তাল্লিশ. এম, এল, এ ও গয়ানাথ, ১০৮; ছেচল্লিশ. এম, এল, এ -র লাথি, ১১০; সাতচল্লিশ. ভাষণ ও ভাবন, ১১২; আটচল্লিশ. এম, এল, এ ও অফিসার: সংলাপের আরেক

ধরণ, ১১৪; উনপঞ্চাশ. ঠিকাদার আর ইঞ্জিনিয়ার, ১১৭; পঞ্চাশ. এম, এল, এ-র রাগ ও মিটিংয়ের শেষ, ১১৯; একান্ন. এক মিটিংয়ে তিন ফল, ১২১; বাহান্ন. বাঘারু ও চাঁদ, ১২৩; তেপ্পান্ন. ভোরের আগে চা-বাগান, ১২৫; চুয়ান্ন. বাঘারু ও সূর্যোদয়, ১২৭; পঞ্চাশ. বাঘারুর সঙ্গীত লাভ, ১২৮; ছাপ্পান্ন. শ্রমিকদের দৈনিক উৎসব, ১৩০; সাতান্ন. বাঘারু ও শ্রমিক শ্রেণি, ১৩২; আটান্ন. বাঘারু ও বাবু, ১৩৫; উনষাট. মাথা ছাউনির পাতা, ১৩৭; ষাট. বাঘারুর পাথর খোঁজা, ১৩৯; একষট্টি. পাথর বা ধাতু বা..., ১৪১; বাষট্টি. বাঘারুর অস্ত্রলাভ, ১৪২; তেষট্টি. কুকুরের তাড়া, ১৪৪; চৌষট্টি. কুকুরের সাড়া, ১৪৬; পঁয়ষট্টি. বাঘারুর সঙ্গী লাভ, ১৪৮; ছেষট্টি. নির্বাসনের দিকে, ১৪৯; সাতষট্টি. অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত, ১৫১; আটষট্টি. কৃষি বিজ্ঞানের কিছু প্রক্ষিপ্ত, ১৫৩; উনসত্তর. রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত, ১৫৫; সত্তর. নির্বাসন ভূমি, ১৫৭; একাত্তর. পাখি জাগে বাঘারু জাগে, ১৫৯; বাহাত্তর. নদী জাগে, ১৬২; তিয়াত্তর. বাথান জাগে, ১৬৪; চুয়াত্তর. দুধের ট্রাকের অপেক্ষায় গান, ১৬৬; পঁচাত্তর. শহুরে কিছু প্রক্ষিপ্ত, ১৬৮; ছিয়াত্তর. দুধ দোয়ানো, ১৭০; সাতাত্তর. বাথান: কারো ও না, সগায় সগার, ১৭২; আটাত্তর. বাঘারু বাড়ি, ১৭৫; উনআশি. বাথানে গৃহযুদ্ধ, ১৭৬; আশি. বাথান দিয়ে সমাজ সেবা, ১৭৮; একাশি. বাথানের প্রত্যাবর্তন, ১৮১; বিরাশি. বাথানের জন্ম, ১৮৩; তিরাশি. বাথানে আরো একজন, ১৮৫; চুরাশি. পাখোয়াল পর্ব: আর এক বৃত্তান্তের শুরু, ১৮৭; পঁচাশি. বনপর্বের শেষ অধ্যায়, ১৮৮।

চরপর্ব : নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্ত বাহিনির সীমান্ত ত্যাগ

ছিয়াশি. ব্রিজে আলো কেন? ১৯৩ সাতাশি. জগদীশের রাগ ১৯৫ আটাশি. একটা নদীর ভেতর অনেক নদী ১৯৭ উননব্বই. ভূগোলের ভেতরে ইতিহাস ২০০ নব্বই. চরের ভেতর চরুয়া ২০২ একানব্বই. ফ্লাড আসবে কতক্ষণ চার ঘন্টা না ছ'ঘন্টা ২০৩ বিরানব্বই. আটষট্টির বন্যার স্মৃতি ২০৬ তিরানব্বই. হিন্দি সিনেমার জোকার ২০৮ চুরানব্বই. বালিয়ারির মাথায় কে? ২১০ পঁচানব্বই. বানা, জাগরণ ও ঘুম ২১৩ ছিয়ানব্বই. দক্ষিণে পশ্চিমে জাগো আইস ২১৫ সাতানব্বই. নদী এখনো পুরনো ২১৭ আটানব্বই. অকাল গোষ্ঠ ২২১ নিরানব্বই. গরুর পালের পাড়ে ও জলে নামা ২২৩ একশ. গরুর পালের পাড়ে ও বাঁধে ওঠা ২২৭ একশ এক. চর দুই নম্বর ২৩১ একশ দুই. বন্যার মুখে শয্যা ২৩৩ একশ তিন. বন্যার মুখে জিপগাড়ি ২৩৫ একশ চার. বন্যা ঘোষণা-হল কি হল না? ২৩৭ একশ পাঁচ. বন্যার মুখে পঞ্চায়েত ২৩৮ একশ ছয়. বন্যার কার্যকারণের সেই মুহূর্তটি ২৪০ একশ সাত জল গোধূলি ২৪৩ একশ আট. সীমান্ত বাহিনীর দুই অর্থ

২৪৫ একশ নয়. বাংলাদেশের দূত ইন্ডিয়ায় ২৪৭ একশ দশ. ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বার্তা বিনিময় ২৪৯ একশ এগারো. ইন্ডিয়ার গোপন আলোচনা ২৫১ একশবার. টু বাংলাদেশ উইথ আর্মস'; আয়োজন ২৫৩ একশ তের. বাংলাদেশ অভিমুখে কুচকাওয়াজ ২৫৫ একশ চোদ্দ. বন্যার বাতাসের মুখে দুটি পাঁঠা ২৫৭ একশ পনের. দেশের জন্য দুঃখ ২৫৯ একশ ষোল. বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ২৬১ একশ সতের. দুই সেনাপতির সংলাপ ২৬১ একশ আঠার. ঘোষের ইন্ডিয়ায় একবার প্রত্যাবর্তন ২৬৪ একশ উনিশ. বন্যার মুখে একটু ভেজা ধর্ষণ দিয়ে চরপর্বের শেষ অধ্যায় ২৬৭।

বৃক্ষপর্ব : বাঘারুর প্রত্যাবর্তন

একশ কুড়ি. আপলচাঁদ ফরেস্টে রাত তিনটে ২৭৩ একশ একুশ. বাঘারুর বৃক্ষ কর্তন ২৭৪ একশ বাইশ. গয়ানাথ মাটি গাছ জলের স্বরে কথা বলে ওঠে ২৭৬ একশ তেইশ. 'বাঘারুহে তুই ভাসি যা' ২৭৯ একশ চব্বিশ. অন্ধকার ও জলস্রোতের মাঝখানে ২৮১ একশ পঁচিশ. জলস্রোতে বৃক্ষবাহন ২৮৩ একশ' ছাব্বিশ. দুই আঘাতের মাঝখানে ২৮৪ একশ সাতাশ. জলস্রোতে নিদ্রাভঙ্গ ২৮৬ একশ আটাশ. বাঘারু ও পাখিদের জাগরণ ২৮৮ একশ উনত্রিশ. মাচান নির্মান ২৯১ একশ ত্রিশ. পাখিরা জলে ঝরে যায় ২৯৩ একশ একত্রিশ. বাঘারুর বিষাদ ২৯৫ একশ বত্রিশ. অস্থায়ী নোঙর ২৯৬ একশ তেত্রিশ. জলের দিগ্‌বিদিক ৩০০ একশ চৌত্রিশ. কমলেকামিনী দর্শন তুল্য চালে বাঘারু দর্শন ৩০১ একশ পঁয়ত্রিশ. বাঘারুর কমলে কামিনী তুল্য অন্তর্ধান ৩০৩ একশ ছত্রিশ. ফোনে বাঘারু উদ্ধারের আহ্বান ৩০৫ একশ সাইত্রিশ. বন্যার উপকথা ৩০৭ একশ আটত্রিশ. বাঘারু উদ্ধার সংক্রান্ত অনুসন্ধান ৩০৯ একশ উনচল্লিশ. বাঘারু উদ্ধার সংক্রান্ত বাজেট বিতর্ক ৩১৩ একশ চল্লিশ. বাঘারু উদ্ধার নিয়ে আলোচনা সভা ত্যাগ ও পরে মতৈক্য ৩১৭ একশ একচল্লিশ. কাদাখোয়ার নিদ্রাভঙ্গ ৩২০ একশ বেয়াল্লিশ. অপারেশন বাঘারু ৩২২ একশ তেতাল্লিশ. নৃত্যভাষায় সংলাপ ৩২৪ একশ চুয়াল্লিশ. বাঘারু ও উদ্ধারকারী দল ৩২৭ একশ পঁয়তাল্লিশ. বাঁধের ওপর তর্কবিতর্ক ৩২৯ একশ ছেচল্লিশ. শীর্ষ বৈঠক ৩৩১ একশ সাতচল্লিশ. কাদা খোয়ার নৌ চালনা ৩৩৩ একশ আটচল্লিশ. সন্দেহ ও সংশয় ৩৩৬ একশ উনপঞ্চাশ. বাঘারু ও কাদাখোয়ার সম্বর্ধনা ৩৩৮ একশ পঞ্চাশ. সংবর্ধনার পরে বাঘারু ও কাদাখোয়া ৩৪০ একশ একান্ন. বাঘারুর দ্বিতীয় সংলাপ ৩৪২ একশ বাহান্ন. দেড়হাতি তেনার বন্ধন, নাইলনের দড়ির বন্ধন ও টি.ভি, ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে বৃক্ষপর্বের শেষ অধ্যায় ৩৪৪।

মিছিল পর্ব : উত্তরখন্ডের স্বতন্ত্ররাজ্য দাবি

একশ তিপ্পান্ন. গয়ানাথের স্বগতচিন্তা ৩৫১ একশ চুয়ান্ন. উকিলবাবু বনাম উত্তর খন্ড ৩৫৩ একশ পঞ্চান্ন. গয়ানাথের পাব্লিক সন্ধান ৩৫৫ একশ ছাপ্পান্ন. গয়ানাথের উত্তর খন্ডের যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা ৩৫৭ একশ সাতান্ন. শব্দের অর্থ নিয়ে পঞ্চানন গয়ানাথের বিচার ও সিদ্ধান্ত ৩৫৯ একশ আটান্ন. উত্তরখন্ড সম্মিলন ও শ্রীদেবীর নাচ ৩৬২ একশ উনষাট. একটি প্রয়োজনীয় জীবনী সংক্ষেপে ৩৬৪ একশ ষাট. উত্তর খন্ডের ফাংশনের আলোচনা : এক ৩৬৮ একশ একষট্টি. উত্তরখন্ডের ফাংশনের আলোচনা: দুই ৩৭০ একশ বাষট্টি. জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসের স্থাপত্য ৩৭২। একশ তেষট্টি. সম্মিলন ও অনুষ্ঠান নিয়ে সরকারি আলোচনা ৩৭৪ একশ চৌষট্টি. শ্রীদেবীর নাচ ও জল্লেশ অভিযান নিয়ে আরগুমেন্ট ৩৭৬ একশ পঁয়ষট্টি. শ্রীদেবীর নাচ ও জল্লেশ অভিযান নিয়ে রাজনীতি ৩৭৯ একশ ছেষট্টি. উপেন্দ্রনাথ বর্মন ও উভয় পক্ষের ঐক্যমত্য ৩৮১ একশ সাতষট্টি. সম্মিলন ও অনুষ্ঠান প্রাঙ্গন ৩৮৪ একশ আটষট্টি. উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার ৩৮৬ একশ উনসত্তর. তিস্তা ব্যারেজ প্রসঙ্গে বক্তৃতা ৩৯০ একশ সত্তর. রাজবংশী সমাজের রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা ৩৯২ একশ একাত্তর. রাজবংশী সমাজের জাতি পরিচয় ও উপজাতি পরিচয় ৩৯৫ একশ বাহাত্তর. সাংস্কৃতিক ফাংশনের—বিবরণ যাত্রা ৩৯৭ একশ তিয়াত্তর. সাংস্কৃতিক ফাংশনের বিবরণ গান ৩৯৯ একশ চুয়াত্তর. সাংস্কৃতিক ফাংশনের—বিবরণ ভিডিও ৪০২ একশ পচাত্তর. শ্রীদেবীর নাচের জন্য ট্রাফিক কনট্রোল ৪০৪ একশ ছিয়াত্তর. শ্রীদেবীর নাচ প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা ৪০৬ একশ সাতাত্তর. শ্রীদেবীর আগমনের প্রতিক্রিয়া ৪০৭ একশ আটাত্তর. শ্রীদেবী চেনা ও অচেনা ৪১০ একশ উনআশি. শ্রীদেবী কতটা দেখান ৪১২ একশ আশি. সমবেত রমন নৃত্য ৪১৪ একশ একাশি. শ্রীদেবী ও বাঘারু ৪১৫ একশ বিরাশি. জল্লেশ অভিযানের কিছু অসুবিধে ৪১৭ একশ তিরাশি. বাঘারুর হাতে ঝান্ডা দিতে সুস্থিরের দ্বিধা ৪১৯ একশ চুরাশি. মিছিলের মাথায় বাঘারু ৪১২ একশ পঁচাশি. মিছিল হারা ঝান্ডা নিয়ে তিস্তাবুড়ির পূজা দেখতে দেখতে বিব্রত বাঘারু ৪২৪ একশ ছিয়াশি. উত্তরখন্ডের হাটমিছিল ৪২৬ একশ সাতাশি. বাঘারুর তৃতীয় সংলাপ ৪২৮ একশ আটাশি. আবার ক্রান্তিহাট; আবার গয়ানাথ ৪৩০ একশ উননব্বই. সেই ক্রান্তি হাট, সেই রাধাবল্লভ ৪৩১ একশ নব্বই. বাঘারুর মিছিল মুক্তি ও মিছিল পর্বের শেষ অধ্যায় ৪৩৩।

অন্ত্যপর্ব : মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র

একশ একানব্বই. মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র ৪৩৯ একশ বিরানব্বই. শ্যাওড়া ঝোরা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে

৪৪০ একশ তিরানব্বই. মাদারি হাটের জল্পেশের ঢোলাই ৪৪২ একশ চুরানব্বই. তিস্তা ব্যারেজ কী করে হল ৪৪৪ একশ পঁচানব্বই. শেষ না হতেই উদ্বোধন ৪৪৬ একশ ছিয়ানব্বই. ব্যারেজের আগেও ইতিহাস আছে ৪৪৭ একশ সাতানব্বই. পাহাড় থেকে সমতল ৪৪৯ একশ আটানব্বই. নির্বাচন ও উদ্বোধন ৪৫০ একশ নিরানব্বই. মাদারির মা জলুশে যায় কেন? ৪৫২ দুশ. মাদারি কী করে আগুন নিয়ে যায় ৪৫২ দুশ এক মাদারির মা কতবার মা ৪৫৬ দুশ দুই. মাদারির মা ও মাদারির ঘুম ভাঙে ৪৫৮ দুশ তিন. মাদারি প্রথম চা বানায় ৪৬০ দুশ চার. বাহাদুরের সাজ সজ্জা ও সমবেত চা পান ৪৬২ দুশ পাঁচ. হাট খোলায় নাচগান ৪৬৪ দুশ ছয়. বাসে ট্রাকে মিছিল ওঠে ৪৬৬ দুশ সাত. মাদারির মায়ের ট্রাকারোহন ৪৬৮ দুশ আট. ট্রাকে স্লোগান ও নির্জনতা ৪৭০ দুশ নয়. চা বাগান ঘিরে মিলিটারি ৪৭২ দুশ দশ. ট্রাকের ভেতরে নির্জনতার গান ৪৭৩ দুশ এগার. মাদারির মা মানুষের গন্ধশোঁকে আওয়াজ শোনে ৪৭৫ দুশবার. পাহাড়, খাদ, নদী, ব্রিজ ৪৭৭ দুশতের. শতাব্দী-শহস্রাব্দীর স্বাদ ৪৭৯ দুশচোদ্দ. নেতা আর মিছিল ৪৮১ দুশপনের. নদীর বুকের ওপর দিয়ে হাঁটা ৪৮৩ দুশ ষোল. অভিনয়ে স্লুইস গেট খোলা ৪৮৫ দুশসতের. মাদারির মায়ের সন্তান সন্ধান ৪৮৭ দুশ আঠার. মাদারির মায়ের স্বরাষ্ট্র প্রত্যাবর্তন—অন্ত্যপর্বের শেষ অধ্যায় ৪৮৯।

পরিশিষ্ট

দুশ উনিশ, এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ ৪৯৫

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ঃ কাহিনি

আদিপর্ব : গয়ানাথের জোতজমি

'একই হাটে এক সঙ্গে দুটো সাইনবোর্ড যাচ্ছে—এ বড় একটা দেখা যায় না।' ডুয়ার্সের এক নাম করা হাট 'ক্রান্তির হাট'। সেই হাটে দুটি লোক দুইটি সাইন বোর্ড নিয়ে যাচ্ছে। একটি সাইনবোর্ড হলুদের ওপর কাল রং দিয়ে লেখা—'কৃত্রিম গো প্রজনন কেন্দ্র', অন্যটি কালোর ওপর সাদা অক্ষরে লেখা 'হল্কা ক্যাম্প'। দুটিতেই সরকারী শিলমোহর আঁকা। সাইনবোর্ডওয়ালা লোক দুটি ছাড়া আরও অনেক হাটুরে মাথায়, বাঁকে নানা রকম মালপত্র বিক্রি করার জন্য চলেছে। ছোটখাট দোকানদার কেউ কাটা কাপড়, কেউ গেঞ্জি-লুঙ্গি, শার্ট প্যান্টের বোঝা সাইকেলে চাপিয়ে, রিক্সায় বা মাথায় করে হাটের পথে চলেছে। আসলে চলা দুই সাইন বোর্ড 'কৃত্রিম গো প্রজনন কেন্দ্র' ও 'হলকা ক্যাম্প' যেন পুরো লাইনটারই পরিচায়ক হয়ে উঠতে চায়।

হাটের পথে চলা এই সব মানুষ জন এসে পড়ে ন্যাওড়া নদীর খেয়া ঘাটে। লাইন ভেঙ্গে সবাই নৌকায়

চড়ে। সাইনবোর্ডওয়ালা লোক দুটিও নৌকায় ওঠে। নৌকায় দাঁড়ানো লোকজনের মধ্যে নাউছার আলমকেও দেখা যায়। নাউছার ওয়াকফএস্টেটের মালিক, 'হাজার হাজার বিঘার চুকানদার', ডুয়ার্সের প্রথম বন্দোবস্তের সময় সে এখানকার সব জমির মালিক ছিল। জমা জমির ব্যাপারে একজন দুর্দান্ত মামলাবাজ ব্যক্তি। এই নাউছারের পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রফুল্ল সেন যখন মাস তিনেকের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই মন্ত্রী সভার মন্ত্রী যোগানন্দ। নৌকা ঘাটে ভিড়লে যোগানন্দ নাউছারকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। নানা গাঁ-গঞ্জ থেকে হাটে আসা লোকজন হাটের দিকে ছোটে। সাইন বোর্ড দুটোও সেই ভিড়ে মিশে যায়।

পিঠে হল্কা ক্যাম্পের সাইন বোর্ড ঝোলানো সেটেলমেন্টের পিয়ন প্রিয়নাথ হাটে ঢুকে আগে চা নিমকি খায়। তারপর আগামীকাল এই হাটেই ক্যাম্প বসবে, জমাজমি সংক্রান্ত সমস্যার বোঝাপরা হবে সে বিষয়ে হাটে ঢোলাই দেওয়ার প্রস্তুতি নেয় যেদিকে সাইনবোর্ডে লেখা আছে সরকারী 'সত্যমের জয়তে' সেই দিকটা সবার দিকে তুলে ধরে। শুধু দু এক জায়গায় সাইনবোর্ড পিটিয়ে তো ঢোলাই হয় না-তাই প্রিয়নাথ কোথাও টিন পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে বের হয়। কারণ একাজে যে নতুন অফিসার এসেছেন তিনি নাকি বেশ কড়া লোক। এক সময়ের নকশাল। জোতদার দেখলেই ক্ষেপে যান। প্রিয়নাথ, টিন ওয়ালার দোকানে যায়, টিন পায় না। হাটে মদেশিয়া মেয়েদের 'ঢোল' পেতে চায়, তাও পায় না—অবশেষে এক লটারী বিক্রেতার মাইকে ওদের লটারীর টিকিটের প্রচারের সঙ্গে হল্কা ক্যাম্পের প্রচার সারে।

হাট কমিটির তিনটে ঘরে 'হলকা ক্যাম্প' এর অফিস। এরই মধ্যে অফিসার সুহাসবাবু, সঙ্গে জ্যোৎস্নাবাবু, বিনোদবাবু এসে হাজির হয়েছে। ঘর গোছগাছের সময় আর তিনজন স্থানীয় লোকছিল। তারা চাইছে আজ রাতে অফিসের লোকেরা, সুহাসবাবু সহ তাদের আতিথ্য গ্রহণ করুক। কিন্তু ওরা তা চায় না—কারণ তাতে একটা কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন এসে যায় ফলে কাজে বাধা হতে পারে। এরপর প্রিয়নাথকে নিয়ে হাট দেখতে বের হয়।

সুহাস হাট দেখে এর বিশালতা অনুমান করেন। শুকনো লংকার স্তুপ দেখে পাইকারী বিক্রির খোঁজখবর নেন। সামনে দেখতে পান কুপির আলোতে হাড়িয়া বিক্রি, মদেশিয়া মেয়েদের সম্মিলিত নাচ। এরপর তারা হাটের অন্য দিকে যায়।

প্রসঙ্গত আসে 'হাট কত রকমের'। কোন হাট সপ্তাহে একদিন বসে—যেমন চ্যাংমারির হাট, বড় দীঘির

হাট। এতে সংসারের কেনাবেচা হয়। এসব হাট বিকেলের দিকে বসে, সন্ধ্যার পর ভেঙ্গে যায়। আবার ওদলাবাড়ি-লাটাগুড়ির হাট বেশ বড়। ধূপগুড়ির হাটও বেশ বড় হাট। হাটের পাশ দিয়ে যাওয়া সদর রাস্তার দুদিকে সারি দেওয়া দোকান ঘর। সেই দোকানগুলোর পেছনে হাট। দুই দোকানের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে হাটে ঢুকতে হয়। হাটে নানারকম দোকান, মিষ্টির দোকান, কাপড় গামছার দোকান, সাইকেলের দোকান। নানা কণ্ঠের নানাস্বর—কোনো অর্থই বোধগম্য হয় না।

'ক্রান্তি' হাটে সুহাস, প্রিয়নাথরা যখন ঢুকেছে তখন হাটের পাইকারী বাজারের দিকটাখালি। গো-হাটার দিকটা প্রায় অন্ধকার। হাটের পশ্চিম সীমানা জুড়ে মাটির কলসীর দোকান। এখন শুনশান। তরকারী বাজারে ভিড় আছে। হাটের কোথাও কম আলো, কোথাও বেশি আলো। গো-হাটাকে ডাইনে রেখে বাঁয়ে বেঁকলে হাটের সব চেয়ে বড় বাজার, পাইকার হাটি। পাইকার হাটির পুব সীমানায় পাট হাটি। পাইকার হাটির মুখ করে বসা হাল হাটি। বনের বিনে পয়সার কাঠে তৈরি হাল। এরপর লোহার দোকান—দা, কুড়োল-হাতুরি। চা-বাগানের চোরাই কলমকাটা ছুরি, কোদালি, ফাড়ুয়া ইত্যাদি। তার পাশে চেয়ার, টেবিল, জাল দেওয়া ছোট আলমারি। এরপর অন্ধকার মাঠে এফ, সি, আই এর- ইউরিয়া আর মিশ্রসারের চোরাই বাজার। এছাড়া আছে বাঁশ হাটি-বাঁশ ফেলার শব্দ, কোথাও হুড়মুড় করে পাথর ফেলার শব্দ। তিস্তায় ভেসে আসা শাল সেগুন গাছ কুড়োলে কাটার শব্দ। এরকম নানা আওয়াজ। এসব কিছুর সঙ্গে মিশে থাকে রাজবংশী, মদেশিয়া ও অন্যান্য মানুষের মুখ।

'হাটের আড়ালে' আর একটি হাট বসেছে। যেখানে সাট্টা, জুয়া ডুগডুগি খেলা চলছে। সবাই মাথা নিচু করে ফিস ফিসিয়ে কথা বলছে। পাশে ডেকচিতে হাড়িয়া নিয়ে মদেশিয়া মেয়েরা। এসব মদ খেয়ে কেউ বেসামাল হয়ে আড়ষ্ট গলায় অসংলগ্ন কথা বলছে। এরই মধ্যে বিক্রি হচ্ছে জাপানি টেরিলিন, সিকোঘড়ি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুহাস হাটটা দেখে নেয়। পরে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। এমন সময় এক ছোটখাট লোক, নাউছার আলম এসে হাজির হয়। শোনা নাম সুহাসের। নামটা গেজিটিয়ারে উঠেছে। তার কাছে সরকার হেরেছে প্রায় সব মামলাতেই।

'হাটের শুরু হয় দূরের মানুষ নিয়ে। হাটের শেষও শুরু হয় দূরের মানুষ দিয়েই।' হাটের মানুষজন যেভাবে জিনিসপত্রের বোঝা, পশু, পাখি নিয়ে হাটে আসে, সেই ভাবেই বাড়ি ফেরে। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে

দু-চারজন মাতাল, সারা রাতের শিশিরে সজীব হয়ে আগামীকাল ঘরে ফিরবে।

শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পে রান্না করাই স্থির হল। সুহাসবাবুদের এই সিদ্ধান্ত কি তাহলে একটা 'নৈতিক কর্মসূচি' অ্যান্টিকরাপশন ড্রাইভ'? কিন্তু এ বিষয়ে সুহাসের মনে দ্বন্দ্বও দেখা দেয়। তার চেয়ে কম মাইনের অধঃস্তনরা যদি এখানকার মানুষের আতিথ্যগ্রহণ করে দু'পয়সা বাঁচাতে পারত তাতে কী খুব ক্ষতি হত। তার নিজের দম্ভ কি তা থেকে তাদের বঞ্চিত করল না? সুহাসের এরকম আত্মমর্যাদার জেদ কি আমলাতান্ত্রিকতার আর একটি লক্ষণ নয়?

ক্যাম্প শুরুর প্রথম দিনেই প্রায়ান্ধকার সকালে দেহ-মাথা ও পায়ের নানা ভঙ্গী করে চারিদিক আলোড়িত করে বাঘারুবর্মন তার আত্মঘোষণা করে বলে—'হুজুর', মুই আসি গেছু, মুই ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারুবর্মন। এর আগে অফিসারের উদ্দেশ্যে হু-জ-উ-র, 'হা-কি-ম' ও 'সা-হে-ব' তিনটি সম্বোধন সূচক পদ তিনবারে উচ্চারণ করে আত্মঘোষণার প্রস্তুতি নেয়। সে অফিসারকে হাতজোড় করে নমস্কার করতে চায়। কিন্তু এক হাত সামনে এলেও অন্য হাত আসে না। এভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাতদুটি বাগে আসে। এবার সে হাসে। জোড়া হাত মাথায় ঠুকে নমস্কার করার পর সে কথা শুরু করে। 'হু-জু-উ-র, মুই ফরেস্টার চন্দ্র আসি গেইছু'। সে হুজুরকে ভালো করে তাকে দেখে নিতে বলে, তার নামটা মনে রাখতে বলে; বাপের নামের কথা বলতে গিয়েও বলে না এবং নিজের কথা শোনাতে চায়। কথা তার 'দুইখান'। একখান কথা হলো—'ত মোর নাম খান তুমি কাটি দাও। মোর জমিঠে-মোর নাম খান তুমি কটি দাও।' আর দ্বিতীয় কথা হল 'আপালচাঁদের ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারুবর্মন উমরার দেউনিয়া-জোতদার-গয়ানাথ রায়বর্মনক উচ্ছেদ দিয়া দিল্।' হুজুরকে সে আরও জানায় যে এখানে আরও অনেক বর্মন আছে, অনেক ফরেস্টার আছে। কিন্তু ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারুবর্মন একটাই যার পেছনে ও পিঠে বাঘের থাবার দাগ আছে। এই বলে সে পেছনের কাপড় তুলে থাবার দাগ সবাইকে দেখায়। এরপর কানে গোজা সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তা ধরায়। সেই আগুনে তার মোঙ্গলীয় স্থাপত্যের মুখখানা দৃষ্টিগোচর হয়।

ক্যাম্পের ঘর থেকে দু-তিন মাইল দূরে আপলচাঁদের দক্ষিণ কিনারা দিয়ে উত্তর পূবে জরিপের কাজ শুরু হবে। তাই সকালে সুহাসের টিম তৈরি হয়ে যায়। ওরা কাজ শুরু করেছে - একেবারে তিস্তার পাড় থেকে ঠিক যেখানে আপলচাঁদ-ফরেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা, গাজোলডোবা, চা বাগান। পশ্চিমে তিস্তা। গাজোলডোবার

একটু দক্ষিণ থেকে একটা ছোট নদী, বেরিয়ে আরো দক্ষিণে গিয়ে তিস্তাতে মিশেছে।' এইপথ দিয়েই ১৯৬৮ সালের বড় বানা ঢুকেছিল। এখন দশপনের বছর পর-গাজোলডোবার কতটা নদীতে কতটা কায়েমে, আগের ম্যাপের অবস্থায় এসেছে কিনা সেটাই দেখার। ওদের লক্ষ উত্তর পশ্চিমে আনন্দপুর-চা-বাগানের জোতল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছানো, সুহাসবাবুর সঙ্গে প্রিয়নাথ, বিনোদবাবু, জ্যোৎস্নাবাবু লাল সালুতে মোড়া মৌজা, শিকলি, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, হাতে বোচকা নিয়ে পাকা রাস্তা থেকে মাঠে তারপর আল ধরে লাইন করে চলতে থাকে। নাকশালিয়া অফিসার সুহাসের ভয়ে গয়ানাথ হাল প্রাক্‌টিস করার জন্য বাঘারুর শরণাপন্ন হয়েছে। আপলচাঁদ ফরেস্টের পাশে তার জমি। সে জমিতে যদি গয়ানাথ চাষ করে না দেখাতে পারে তবে সুহাস সেই জমিটা তার নামের পরিবর্তে তার আধিয়ারের নামে রেকর্ড করতে পারে। তাই গয়ানাথ হালুয়াগিরি শিখছে।

আপলচাঁদ ফরেস্টের লাগোয়া জমিটা নিয়েই যত ঝামেলা। কারণ ফরেস্টের একটা অংশ তিন পুরুষ ধরে গয়ানাথদেরই আছে। আচমকা দেখলে এটা ফরেস্টের জমি বলে মনেও হতে পারে। আবার আরও কিছু জমি গায়নাথ নিজের জমি বলে চাষ করে আসছে। এখন এই সেটেলমেন্টের সময়—হালুয়া আধিয়াররা সবাই সচেতন হয়েছে। মাপামাপি হলে আসল তথ্য বেরিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া আনন্দপুরের ভেস্টজমিতে-কমুনিষ্ট পার্টির রাধাবল্লভরা জবর দখল নিয়েছে। ওরা হাজির থাকলে আরও বিপদ। অবস্থা সামাল দিতে গয়ানাথ নিজে হাল চালিয়ে দেখাবে যে এখন তারই দখলে।

বাঘারুর সহায়তায় সে হাল চালিয়ে যায়। দূরে কুয়াশার ভেতর চারপাঁচজন লোককে হেঁটে যেতে দেখে বাঘারু। আসিন্দিরকে জানায়। আসিন্দির ছুটে গিয়ে গয়ানাথকে বলে ' হে বাপা সার্ভে পার্টি যাছে হে সার্ভের জায়গাত'। বাঘারু হাল সামলায়। 'অ্যাঁ' বলে গয়ানাথ বাঘারুকে চেয়ার নিয়ে সার্ভের জায়গায় যেতে বলে। বাঘারু ছুটে গিয়ে সদর বাড়ি থেকে চেয়ার মাথায় করে ছুটতে থাকে পাছে সার্ভে অফিসারের পেছনে পড়ে যায় তাহলে অফিসার বসবে কোথায়? গয়ানাথ জামা কাপড় পড়ে জামাই আসিন্দিরকে মোটর সাইকেলখানা বের করতে বলে। নিজে মার্কিন কাপড়ে বাঁধা কাগজপত্র নিয়ে মোটর সাইকেলের পেছনে বসে বড় আল দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে যায়।

সুহাসবাবু, জ্যোৎস্নাবাবু ও বিনোদবাবুরা সদলবলে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে কাঁধে ভারি বোঝা নিয়ে প্রিয়নাথ ও অনাথ। সময়টা ভাদ্র মাসের শেষ। মেঘহীন বৃষ্টিহীন আকাশ। সামনে মালহাটি ফরেস্ট। ফরেস্টের মাথায় রোদ ঝলমল করছে। ওরা ফরেস্টাকে বাঁ হাতে রেখে ডাইনে বাঁকে। ডাইনে তাকালে সবুজ প্রান্তর। বাঁয়ে ঘন

জঙ্গল। ওরা এগোয়। সামনে দেখে তিস্তা। 'বাতাসে জলের গর্জন'। মনে হয় তিস্তা যেন ফরেস্টটাকে খাচ্ছে।

এই তিস্তা পারেই একটা শাল গাছের তলায় সার্ভে টেবিল পেতে সার্ভের কাজ শুরু হয়। দেখা যায় গাছতলায় একটা খালি চেয়ার পাতা—পাশে একটা চা-দোকান পলিথিনের সিট টানিয়ে। সুহাসবাবু ঐ খালি চেয়ারটাতে বসেন। লাল সালুর বস্তাখুলে মৌজা ম্যাপ বের করা হয়। খাতা আর কম্পাস হাতে বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে। গয়ানাথও এসে হাজির হয়। সুহাস চেয়ারে বসতে গেলে গয়ানাথ বাঘারুকে আদেশ করে চেয়ার মুছে দিতে। এতক্ষণে সুহাস বুঝতে পারে চেয়ারটা কে এনে রেখেছে। গয়ানাথ সুহাসকে প্রস্তাব দেয় সার্ভের জিনিসপত্র এখানেই ঠিক জায়গায় রাখতে, মিছিমিছি প্রতিদিন বয়ে না এনে। সুহাস পাত্তা দেয় না। নিজের কাজে মন দেয়। কিন্তু লোকটি নাছোরবান্দা আবার বলে- 'আপনার সুবিধার জন্য স্যার, এইটুকু সুযোগ আমাদের দিবা নাগিবেই।' এদিকে বিনোদবাবুরা মাপামাপি শুরু করে দিয়েছে।

'সুহাস তিস্তার পাড় ধরে সোজা উত্তরে তাকায়।' বোঝার চেষ্টা করে কোন কোন জায়গা কতটা তিস্তার ভেতরে চলে গেছে। ' মৌজা ম্যাপটা মাটির ওপরই মেলে ধরে তার ওপর উবু হয়ে বসে সুহাস বড় হাঁস খালির ২১ নম্বরে, ৮৫ নম্বরে, ৮৬ নম্বরে, ৮৭ ও ৮৮ নম্বরের পশ্চিম অংশে একটা করে ঢেরা মারে। ৮৭ ও ৮৮ নম্বরের পূবে একটা লম্বা দাগ দেয়।' এক একটা ঢেরায় এক একটা গ্রামের হিসেব চুকিয়ে দেয়। এমন সময় বাতাসে ম্যাপটা উড়ে যায়। প্রথমে মাটিতে পড়ে আবার উড়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে আটকে থাকে। গয়ানাথ বাঘারুকে ডাকে। বাঘারু তরতর করে গাছে উঠে ম্যাপটা ধরে ফেলে। তারপর দাঁতে কামড়ে ধরে গাছ থেকে নামে। গয়নাথের আগ বাড়িয়ে এতো করার উদ্দেশ্য কী তা সবার জানা হয়ে যায়।

ম্যাপটা হাতে নিয়ে সুহাস প্রিয়নাথের সঙ্গে শাল বনে ঢোকে। সঙ্গে গয়ানাথও। সুহাস গয়ানাথকে উদ্দেশ্য করে বলে তারা এখানকার প্রাচীন লোক কিনা; জানতে চায় তিস্তা বরাবরই-এতো কাছাকাছি ছিল কিনা। গয়নাথ সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে দার্শনিকতা করে। সুহাস বুঝে ফেলে গয়নাথের কাছে সুহাসের ম্যাপের সাক্ষ্যের সমর্থন পাবে না।

তিস্তার পারে দাঁড়িয়ে সুহাস ও প্রিয়নাথ শিকল ফেলে মাপজোখ শুরু করে। এখানে পাড়টা বেশ খাড়া। এমন সময় একটা খয়ের গাছ ডালপালা সমেত ভেঙ্গে পড়ে। তাতে বোঝা যায় তলার মাটি খেয়ে নিচ্ছে। সুতরাং আর একটু ছেড়ে শিকল ফেলার কথা ভাবা হচ্ছে। গয়নাথ এদের মাপা মাপিতে ভরসা পায় না। তার প্রশ্ন 'কিন্তু নদী আর বন, কতটা খাবে কতটা থাকিবে, তার হিসাব ম্যাপে করিবেন কেমনে? এরই ফাঁকে সুহাস

তিস্তার দিগন্ত জোড়া রূপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রিয়নাথ চেইন গুটিয়ে নিচ্ছে। এবার গয়ানাথ নানা প্রশ্নে সুহাসদের জমি মাপামাপি সম্পর্কে কথা তোলে। তাতে এখন যেখানে নদী সেটা নদীর সীমানা না ধরতে অনুরোধ করে। কারণ তাতে তার নদী খেয়ে যাওয়া জমি নদীর জমি বলে চিহ্নিত হবে। সে চায় নদীর ভেতরের জমিও তার জমি হিসেবেই থাকুক। গয়নাথ বলে 'মোর কথাটা সিধা স্যার, আপনারা যেইঠে নদী আঁকিলেন, ঐঠে নদী নাই, ঐঠা বর্ষার জল।' সুহাস নদীর দিকে ফের তাকায়, তারপর বলে 'না গয়ানাথবাবু, নদী এই পর্যন্তই এসেছে।' গয়নাথবাবুর আর্জি ভেবে দেখবার জন্য বিনোদবাবু সুহাসবাবুকে অনুরোধ জানালে সুহাস স্পষ্ট বলে দেয়—'এটা নদীরই আউটলাইন। স্পিল এরিয়া নয়।' 'গয়ানাথবাবুর যদি কোনো প্রমাণ দাখিলা থাকে তবে হাজির করুন।' গয়ানাথ একটু টাইম চেয়ে প্রমাণ হাজির করার জন্য বের হয়ে যায়।

'সুহাস গয়ানাথের প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে আছে।' আস্তে জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোক কে? জানা হয় এ গয়ানাথ জোতদার। এ মৌজার সবটাই ওর। আগে নিচের মৌজাতে ছিল। নামটা খুবই পরিচিত ঠেকে। বিনোদবাবু গয়নাথ সম্পর্কে এমন সবিস্তারে বলে যে এই জোতের নাম 'গয়ানাথের জোত', নামকরণও করা যেতে পারে। আরও জানায় যে গতবারের সেটেলমেন্টের পঁচিশ বছর পর এই সেটেলমেন্ট। মাঝে ৬৮'র বন্যা। সব তছনছ। এর মধ্যে তিস্তা ব্যারেজ। সুতরাং নতুন করে সার্ভের কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এই সার্ভেতে এই মৌজার ম্যাপ থেকে পুরোনো দাগ নম্বরগুলো বাদ দেওয়া হলো। নতুন করে নতুন দাগ নম্বর বসানো হবে। নদী যা খেয়েছে, তা নদীরই। এখন যদি দু-চার-দশ বছর পর চর জেগে ওঠে তাতে গয়ানাথের কোন অধিকার থাকবে না। সবটা পোয়াস্তি হয়ে যাবে। সে জন্যই গয়ানাথ পুরোনো ম্যাপ অনুযায়ী নদীর সীমা নির্দেশ করতে বলছে, বর্তমানে নদী যেখানে, সেখানে নয়। এর ফলে চৌদ্দ-পনের বছর পর কোনো কারণে নদী সরে গেলে বা চর পড়লে গয়ানাথ তা তার বলে দাবি করতে পারবে—কারণ ম্যাপে ঐ এলাকাটা তারই নামে আছে। সুহাস নদীর তীরে তাকিয়ে থাকে। দেখে যে মাটি ভেঙ্গে পড়ছে তা সবই গয়ানাথের।

সুহাস আনমনে তিস্তার জলে একটা কুটো ছুঁড়ে দিয়ে জোতদার গয়ানাথ সম্বন্ধে ভাবে। পুরোনো স্মৃতি মনে করে—নক্‌শাল বাড়ি, বুড়াজোত, মঙ্গল বাড়িজোত, কালীর জোত। সেই নামগুলির মতো 'গয়ানাথের জোত, মিলিয়ে সুহাস যেন কেমন হয়ে যায়। 'সুহাস এখন জোতদারের বিচারক একটা জয় বোধ করে। কিন্তু আবার 'গয়ানাথের জোত'—এই নামে সেই জয় যেন মিইয়ে যায়। গয়ানাথ তার হাত দিয়েই নদী, নদীর জলের

মাটিও নিজের নামে লিখে নিতে চাইছে। তার একাজে সুহাস বাধা দিলে গয়ানাথ মামলা করবে, আপিল করবে, আপিলের আপিল করবে। সুহাস আত্মকরুনা অনুভব করে। তবে তিস্তা গয়ানাথের এতটা জমি নিয়েছে বলে তার হাকিম হতে পেরেছে। 'জোতদার বিরোধী মিত্রশক্তি' না ' শ্রেণি সংগ্রামের মিত্রশক্তি' আবার 'বামফ্রন্ট সরকার কৃষকের মিত্র সরকার, আবার 'সুহাস কৃষকের মিত্র হাকিম।'

'সুহাস ভাঙ্গা গাছের ওপর বসেই ছিল' সঙ্গে বিনোদবাবু। গয়ানাথ সদলবলে কী প্রমাণপত্রসহ হাজির হয়। ভিড়ের ভেতর তার কাপড় আটকে যায়। চিৎকার করে বাঘারুকে ডাকে। সুহাস বাঘারুকে দেখে সেই চেয়ার মাথায় মানুষটার কথা মনে করে। সুহাস ও গয়ানাথের কথোপকথনে জানা যায় ওরা তিস্তার পূর্ব পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের উত্তর-পূবে চালসা সরাসরি পশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট, চালসা থেকে বোদাগঞ্জ সম্পূর্ণটাই ফরেস্ট ছিল। সুহাস প্রশ্ন করে—'তখন নদী ছিল না? গয়নাথ উত্তর দেয় 'সেটাই ত বলি স্যার, নদী থাকে; ফরেস্টও থাকে, মৌজাও থাকে, কিছুই যায়না।'

গয়ানাথ নদীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে সুহাসকে দেখায় দুজন মানুষ ভেসে যাচ্ছে। তারমধ্যে একজন বাঘারু। যেখানে ওরা ভাসছে গয়ানাথ দেখায় ওখান থেকেই তার মৌজা শুরু। যেখানে বাঘারু আর সঙ্গে ডোয়াডাববির মইনুদ্দিন পাক খাচ্ছে ওখানে বৈকুণ্ঠপুর ও বোদাগঞ্জও এক হয়ে ছিল। গয়ানাথের ঠাকুরদার মৌজা ছিল ওখানে। গয়ানাথ ওটাকে নদী বলে স্বীকার করে যদিও পুরোনো কাগজপত্র তার আছে। কিন্তু নদীর বর্তমান সীমানার জল তার মতে বর্ষার জল। বাঘারু এলে দেখা যাবে এই জলে সে ডুবছে না। তাই এখানে সে দাগ নম্বর চায়, নদী ঘোষণার পরিবর্তে। সুহাস বুঝতে পারেনি গয়ানাথ এভাবে তিস্তার জলে লোক নামিয়ে তাকে এভাবে অপ্রস্তুত করাবে। বাঘারু ও মইনুদ্দিন পারের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। গয়ানাথ দেখায় এখন যেখানে ওরা সাঁতার কাটছে ওখানে বাঁদিকে 'আঠার নম্বর দাগ মউয়ামারি মৌজা আর ডাইনে 'পাঁচনম্বর হাঁসখালি মৌজা।' 'দুইখানিই মোর দাগ। ষোল আনা নিজ খতিয়ান।' বাঘারু আরও কাছে এলে গয়ানাথ দেখায় ওখানে সাত নম্বর দাগে একটা পুকুর যা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে অংশে বন্দোবস্ত। বাঘারুকে আবার ডাইনে ঘুরে সিধা আসতে বলে এবার বাঘারু যেখানে আসে 'এইঠে শুরু হইল স্যার, সিদাডোবা, হাতিডোবা, বাঘা ডোবা।'

গয়নাথ আবার বাঘারুকে বাঁয়ে যেতে বলে এবং বোঝায় গয়ানাথের কতটা জায়গা সুহাসবাবুরা নদীর

জায়গা বলে চিহ্নিত করতে চায়। নদীর পারের কাছে আসা বাঘারুকে এবার নদীর জলে হাঁটায়। নিজের খতিয়ান খুলে দাগ নম্বর মিলিয়ে গয়ানাথ সুহাসকে তার জমির প্রকৃত অবস্থান দেখায়। সুহাস 'ঠিক আছে' বলে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। এই সময় একটি লোক সুহাসবাবুর সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকটা এসে সুহাসবাবুর কাছে গয়ানাথ বর্মনকে মাল থানার ক্রান্তি অঞ্চলের এক কুখ্যাত জোতদার বলে জানায়। শুনে গয়ানাথ ধমকের সুরে বলে ওঠে 'খবরদার রাধাবল্লভ'... মোক জোতদার কহিবার চাও, কহ, কিন্তু মোক কুখ্যাত কহিবা না।' ভিড়ের ভেতর থেকে 'কমরেড' ডাক শোনা যায়। সুহাস ভাবে তাহলে কি এই রাধাবল্লভ কমিউনিস্টপার্টির লোক। এখানে কি অনেক পার্টি আছে। এরপর আপাদমস্তক ভেজা, নেংটি পরা, শালগাছের মত শরীর—বাঘারু এসে সুহাসের সামনে দাঁড়ায়। সুহাস তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

সার্ভে পার্টি যখন বন থেকে বেরিয়ে এসে গয়ানাথের চেয়ার যেখানে পাতা ছিল, সেখানে দাঁড়ায় তখন জায়গাটাতে একটা জন সমাবেশ হয়েছে বলে মনে হয়। একটু দূরে আপল চাঁদের ভেতরের পাকা রাস্তায় একস্থানে আনন্দপুর চাবাগানের গাড়ি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এ্যাম্বেসেডর আর একটু এগিয়ে। দুই গাড়ির বাবু সাহেবরা গাড়ির ভেতরে। একজন গার্ড পিঠে বন্দুক নিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করছে। দুই গাড়ির দাঁড়াবার জায়গা থেকে একটা লিক ফরেস্টের দিকে ঢুকে গেছে। লিকটার মুখে একদল মদেশিয়া গোল হয়ে বসে গল্প করছে। এর পাশেই চা দোকান, জ্যোৎস্নাবাবুর সেরেস্তা। নেপালী, মদেশিয়া, সার্ভে পার্টির লোকজন সব মিলিয়ে এখানটায় বেশ ভিড়। চরের কৃষকরাও বসে চা বিস্কুট খাচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন এরা সারা দিনের জন্যই এখানে এসেছে।

রাধাবল্লভ দলবল নিয়ে এসে এই ভিড়ের মধ্যেই দাঁড়ায়। সকালে এখানে উকিল বা মোক্তার নিয়ে ঝান্ডা গেরে চাটাই মাদুর পেতে বসার কথা ছিল—সার্ভের ব্যাপারে সঠিক কাজ আদায় করার জন্য। সবার সামনে বক্তৃতা করার কথাও ছিল।

হৃষিকেশের 'রিপিট দিবেন না, যা বলা হই গিছে তারপর থিকা বলেন এইসব কথার পর রাধাবল্লভ বক্তৃতা শুরু করে। বক্তৃতায় বলে যে মাল-লাটা-ক্রান্তি অঞ্চলে অনেক কুখ্যাত জোতদার আছে। কৃষকদের শোষণ করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আনন্দপুর চা বাগানে জোতের জমি ও চায়ের জমি দুই-ই আছে। শ্রমিকদেরকে দিয়ে ধানচাষ, আর কৃষকদেরকে দিয়ে চা-চাষ করিয়ে এবং তাদের উপযুক্ত মজুরী না দিয়ে শ্রমিক কৃষক উভয়কেই বঞ্চিত করা হচ্ছে। হৃষিকেশ এ বক্তৃতায় বাধা দিয়ে সার্ভের মিটিং করতে বলে। রাধাবল্লভ একটু

বিরতি নিয়ে আগের কথার প্রসঙ্গ ছাড়াই সরাসরি জমির কথায় চলে আসে। বলে যে, যে কৃষকেরা জোতদারের গুলি, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করে খাশ জমি দখলে রেখেছে, যে কৃষকেরা ফরেস্টের জমি দখল রেখে চাষ করে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছে সে সব জমির বন্দোবস্ত সেই সেই কৃষকের নামে করতে হবে। আর ফরেস্টের জমি দখলকারী জোতদারদের কাছ থেকে সেসব জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন আধিয়ারদের দিতে হবে। চরুরা কৃষকদের উদ্দেশ্যেও বলে যে জোতদাররা নতুন তৈরি হওয়া চর নিজেদের কায়েম জমি বলে দখল নেয়-তা-চলবে না। তাতে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের অধিকার স্বীকার করতে হবে। তবে পূর্ববঙ্গের কৃষকেরা যে এখানকার মদেশিয়া ও রাজবংশীদের চরে ঢুকতেই দেয় না—বলা শেষ না করতেই পূর্ববঙ্গীয় যে দলটা চা খাচ্ছিল তারা রে রে করে ছুটে আসে। বুদ্ধিমানকে আক্রমণ করে। বুদ্ধিমানও রুখে দাঁড়ায়। রাধাবল্লভ প্রসঙ্গ ান্তরে যায়।

'চরের জমিতে জোতদারও নাই, আধিয়ারও নাই, শুধু গুড় আছে, চাটো আর চাটো, চাটো আর চাটো' বলে হৃষিকেশ চরুয়াদের বিদ্রুপ করে নিজে কুব্জার মতো পিঠটা বাঁকিয়ে নাচতে থাকে। হৃষিকেশ এবার চরের দলটার দিকে তাকিয়ে গান ধরে—

ও-ও আমার চরুয়া হালুয়া ভাই—
তোর গুনের সীমা নাই—
তোর এতোখান জমিতে ভোখো না মেটে—
তোর প্যাটের সীমা নাই—।
ও-ও আমার চরুয়া হালুয়া ভাই—
তোর প্যাটের সীমা নাই—
তোর গলার তলায় প্যাটখান শুরু
হাটুর তলায় যায়।

'চারদিকে হাততালির তুমুল সমর্থন।' পাট পাটকরা বাব্‌রিচুল, ঝকঝকে দাঁত আর সুপুষ্ঠ মুখে হৃষিকেশকে পেশাদারী গায়কের মতই মনে হচ্ছিল। ভিড়ের ভেতর কে একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে রাধাবল্লভ ও আলবিশকে বাইরে নিয়ে যায়। কিন্তু সমবেত সবাই হৃষিকেশকে গান চালিয়ে যেতে বলে। সে আবার গান

শুরু করে—

ও-ও রে মোর চরুয়া হালুয়া রে-এ

মোর প্যাটের ভোখো তো মিটাইলিরে

(কিন্তুক) মোর তলপেট ভরে নাই—

তলপেট চেপে ধরে হৃষিকেশ বারবার 'তলপেট ভরে নাই' বলে কোমর দুলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চরের দলটার দিকে ধোঁয়া ছাড়ে।

তখন আনন্দপুরের বীরেনবাবু ও ফাগু ওরাওঁ রাধাবল্লভকে খোঁচামেরে বাইরে এনেছিল। তারা রাধাবল্লভের সঙ্গে কথা শুরু করে চা বাগানের ভেস্ট জমি সম্পর্কে কিছু সমস্যার কথা বলে। কিন্তু রাধা বল্লভের সোজা উত্তর যে চা বাগানের জোতল্যান্ডের ভেস্ট জমিতে তাদের কৃষকরা যে দখল নিয়ে চাষ করেছে সেজন্য তারা সরকারের কাছে পাট্টা চাইবে। এ কথার উত্তরে বীরেনবাবুরা জানায় যে এ বিষয়ে বোঝাপরায় না এলে দাঙ্গা বাঁধতে পারে। বীরেনবাবু রাধাবল্লভকে আরও জানায় যে এখন ক্ষমতায় সিপিএম, সুতরাং যা করার এখনই করে নেওয়া ভালো। পরের ভোটে সিপিএম হেরে গেলে ঝামেলা হতে পারে। এছাড়া সার্ভে অফিসারও এক সময়ের নকশালিয়া, কাজগুছিয়ে নিতে সুবিধা হবে। আসলে বীরেনবাবুরা কোম্পানীর পক্ষ নিয়ে যে কথাটা বলতে চায় তা হলো কোম্পানী চায় তাদের ভেস্টল্যান্ড সরকারের কাছ থেকে লিজ নিতে—কারণ তবে তারা বাগান বাড়াতে পারবে—শ্রমিকদেরও কাজে নিয়োগ করতে পারবে বেশী করে। অর্থাৎ ওরা ভেস্টল্যান্ডকে ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল ল্যান্ড বানাতে চায়। সেজন্য সেই ভেস্ট জমি যে কৃষকেরা দখল করে আছে তা ছাড়াতে হবে। কিন্তু আলবিশরা জানায় এটা কোম্পানির একটা চালাকি। একটা ছুতো করে কৃষক উচ্ছেদ করতে চায়। বীরেনবাবু বলে তাহলে চা বাগানের শ্রমিকরাই বা কেন তাদের হক ছাড়বে। এভাবে দুজনে ক্রমে বচসা শুরু হয়। উভয়ে উভয়কে একজন কোম্পানীর পক্ষে একজন রাজবংশীদের পক্ষে কথা বলার জন্য দোষারোপ করে।

বীরেনবাবু বুঝতে পারে তার একটা ভুল কথায় রাধাবল্লভ রেগে গিয়ে চলে যাচ্ছে। ফাগুকে আবার তাকে ধরে আনতে বলে। ফাগু রাধাবল্লভের পথ আটকায় ও বলে ' তোমকো ভি কৃষক সমিতি লাল ঝান্ডা, হামকো ভি মজদুর ইউনিয়ন লাল ঝান্ডা। তো বাতচিত ত হোনাই চাহে। রাধাবল্লভ অভিমানের সুরে বলে যে কোথায়

তারা কৃষক উচ্ছেদ বন্ধ করতে বলবে, তা নয় কোম্পানীকে দিয়ে উচ্ছেদ করাচ্ছে। ফাণ্ড বীরেনবাবুকে কৃষক উচ্ছেদ যাতে না হয় সেদিকে নজর দিতে বলে। এবার বীরেনবাবু রাধাবল্লভকে জমিটা মাপামাপি করতে বলে। রাধাবল্লভ তাতেও আপত্তি জানায়। বরং বলে জমি মাপতে তারা দেবে না। বীরেনবাবুর বক্তব্য হলো মাপামাপি হলে বোঝা যাবে কার কতটা জমি দখলে আছে। তখন তো কোম্পানীও সরকারকে বলতে পারে তাদের আইন অনুযায়ীই কৃষকদের পাট্টা দিতে। 'দিয়ে থুয়ে যা থাকবে সেটা কোম্পানি বাগানের জন্য লিজ নেবে।' রাধাবল্লভ বীরেনবাবুর এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। এবং মজদুরদের সঙ্গে কৃষকদের এ এক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা বলে অভিযোগ আনে। রাধাবল্লভ বীরেনবাবুর সঙ্গে এভাবে তর্কবিতর্ক সেরে একটা গোলমালের আশঙ্কা করে ভগতকে তাড়াতাড়ি জমিতে যাওয়ার জন্য বলে। আলবিশ বুদ্ধিমানকে হৃষীকেশের গানের আসরে খুঁজে পেয়ে উঠতে বলে। বুদ্ধিমান পনের বছর ধরে কৃষক সমিতি করছে। বর্তমানে খাশজমি দখলে রাখাটাই প্রধান কাজ। আলবিশের ইঙ্গিত বুঝে সে জমি সংক্রান্ত গোলমালের কথা অনুমান করে। হৃষিকেশকে বীরেনবাবুর ঔদ্ধত্যের কথা বুদ্ধিমানকে বলে। আরও জানায় যে বীরেনবাবু প্রস্তাব দিয়েছে যে কৃষকেরা দু' বিঘা করে নিয়ে বাকি জমি ছেড়ে দিতে। এভাবে কথা বলে এগোতেই ওরা দেখে সার্ভের লোকেরা চেইন ফেলে জমি মাপছে। মদেশিয়া কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে দেখছে। রাধাবল্লভও আছে তাদের মধ্যে। সুহাস, বিনোদবাবু, প্রিয়নাথ, অনাথ সবাই দাঁড়িয়ে বীরেনবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

বুদ্ধিমান এসে রাধাবল্লভের কাছে কী হয়েছে জানতে চায়। রাধাবল্লভ পুরোনো ঘটনা পুনরাবৃত্তি করে বীরেনবাবুদের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গ আনে। এবং জানায় যে বীরেনবাবুরা কৃষকদের মাথাপিছু দুবিঘা করে জমি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। আরও জানায় ওদের ঐ সিটিং চলাকালীন সার্ভের লোকেরা জমিতে চেইন ফেলে মাপামাপি শুরু করে দিয়েছে। তাহলে আসল উদ্দেশ্যটা কী ওদের। সেজন্য কৃষকদের ছেলেমেয়েরা এসে চেইন চেপে ধরে বসে আছে। ওদিকে চাবাগানের শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকরা এসে চেইনে বসা বেটিছোয়াদের ধমকাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। রাধাবল্লভের কথায় সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রাধাবল্লভ বলতে থাকে তারা দখলি জমি ছাড়বে না। জমি মাপতে দেবে না। চা কোম্পানি ও আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবে।

বড় উঁচু আলটা যেটা পশ্চিমে হাতির রাস্তার সঙ্গে মিশেছে সেখান থেকে সুহাস আলে দাঁড়িয়ে থাকা

বুদ্ধিমানের দিকে এগিয়ে এলো। ওখানে দাঁড়িয়ে রইল চেইন ম্যানরা ও বীরেনবাবু। সুহাস কাছাকাছি আসতেই বুদ্ধিমান স্লোগান তুলল—

খাশজমির দখলদারি—ছাড়ছি না, ছাড়িম না।

খাশ জমি মাপামাপি—নাহি চলে গা, নাহি চলে গা

খাশ জমির—পাট্টা চাই—লোন চাই, সার চাই।

বুদ্ধিমানের গলা থেকে সুহাস স্লোগান নিয়ে - তার সঙ্গে যোগ করে—

'কৃষকদের বিরুদ্ধে বাগানের মালিক ও আমলাদের ষড়যন্ত্র—ব্যর্থ কর, ব্যর্থ কর। এদের স্লোগানের সঙ্গে সবাই গলা মেলায়। সুহাস একটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। একদিকে কৃষকদের জমায়েত, অন্যদিকে চা-শ্রমিকের লাইন। সুহাস কৃষকদের সামনে এসে শান্তগলায় চেইনটা ছেড়ে দিতে বলে, জমি মাপা হচ্ছে না জানায়। রাধাবল্লভ বলে যে তারা তাদের বামফ্রন্ট সরকারের চেইন আটকাতে চায় না কারণ বামফ্রন্ট সরকার জনগণের বন্ধু সরকার। কিন্তু যাদের চক্রান্তে খাশ জমিতে চেইন ফেলা হয়েছে তাদের বিচার করতে হবে। উত্তরে সুহাস বলে খাশ জমি মাপা তাদের উদ্দেশ্য নয়, দাগ নম্বরওয়ারি মাপতে গিয়ে খাশ জমিতে চেইন পড়েছে মাত্র—এ কোনো ষড়যন্ত্র নয়। সুহাস কর্মীদের চেইন গুটিয়ে নিতে বলে। এদিকে লালঝান্ডা তুলে চা বাগানের মজুররা আওয়াজ তোলে

'খাশ জমি কো সেটেলমেন্ট—করণে হোগা, করণে হোগা

খাশ জমিনমে আধিয়ারি—নাহি চলে গা, নাহি চলে গা

বামফ্রন্ট সরকারকো কানুন—মাননে হোগা মাননে হোগা।'

একদিকে কৃষক সমিতির লোকজন, আর একদিকে চা-বাগানের মজুর, মাঝখানে সুহাস। একটা গন্ডগোলের আশঙ্কায় বুদ্ধিমান, হৃষিকেশ ও আরও কাউকে ডাকতে ছুট দেয়। সুহাস আগেই আন্দাজ করেছে যে—কৃষক সমিতির সবাই এক দেড় দুই হাল করে খাশ জমি দখল করে আছে। জমি মাপলে তা বেরিয়ে পড়বে। সেই জন্য তারা জমি মাপতে বাধা দিচ্ছে। এবং সেজন্যই কৃষকেরা তাড়াতাড়ি রেকর্ড করাতেও চাইছে। চা-কোম্পানীর মতলবটাও সুহাস বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এসব বিশ্বাসের মধ্যে সুহাস থাকতে চায় না। তাই বিনোদবাবুর ওপর একটু বিরক্ত হয়, প্রথম দিনেই খাশজমিতে চেইন ফেলার জন্য। সুহাসবাবুর বক্তব্য থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

চা শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে ফাগু বক্তৃতায় বলতে থাকে যে চা-বাগানের মজুর ও কৃষকদের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। কৃষক শ্রমিকের বন্ধুত্ব বজায় থাকবে কারণ তাদেরও লাল ঝান্ডা, শ্রমিকদেরও লাল ঝান্ডা। উভয়েরই একই পার্টি। বক্তৃতার পর ফাগু স্লোগান দেয় 'ইনকিলাব কিন্তু স্লোগানটার সঙ্গে যেন 'আদায়-অনাদায়ের 'বাঁচা মরার ঘনিষ্ঠতা নেই'।

সুহাস বাগানের দলকে তাদের এস্টেট অফিসারকে আসতে বলে। ওরা বীরেনবাবুকে ডাকতে যায়। এদিকে সুহাসবাবু রাধাবল্লভকে বলে যে এই বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করা তাদের কাজ নয়। সরকারের কাজ আটকে গেলে আখেরে সরকারেরই ক্ষতি—তারা যেন বাম সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে। আরও বলে যে সরকারের খানাপুরী বুঝারতের কাজ হয়ে গেছে, মৌজা ম্যাপও আছে। কিন্তু কার দখলে কত জমি আছে তা সরকার রেকর্ড করতে বারণ করেছেন। চাইলে একটা লিস্টি তারা দিতে পারে। কিন্তু রেকর্ড এখন হবে না। ভগত বলে সে লিস্টি চাইলে দেওয়া হবে-তবে-বাগানের শ্রমিকদের, খাশ জমি মাপাতে এতো উৎসাহ ও দাবি কেন।

বীরেনবাবু এসে পড়ে। তাকে লক্ষ্য করে রাধাবল্লভ সুহাসবাবুকে বলে যে এই বীরেনবাবুই কৃষক ও বাগানের চা শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে। বীরেনবাবু পেছন ফিরে রাধাবল্লভকে ধমকিয়ে বলে 'রাধাবল্লভ, বি কেয়ার ফুল'। সুহাসবাবু বীরেনবাবুকে বাধা দেয়। ঐ সময়ে কৃষকদের দলটাও এসে স্লোগান দেয়।

গানের জায়গায় হৃষিকেশ মৌজ করে সিগারেট খাচ্ছিল। চরের লোকেরা খবর দেয় যে আনন্দপুরের জমিতে কৃষক সমিতির লোকদের সঙ্গে চা-বাগানের মদেশিয়াদের মারামারি লেগে গেছে। শুনে হৃষিকেশ দৌড়াতে শুরু করে সেদিকে। হৃষিকেশ একটা গাছের ডাল ভাঙ্গার তেষ্টা করে। বুদ্ধিমান, হৃষিকেশকে একটা লাঠি দেয়। দুজনে দুটো লাঠি নিয়ে রে রে করে-হাতির রাস্তা ধরে ছুটতে থাকে।

সামনে হাতির রাস্তার ওপরে ভিড় ছিল। ওদের ছুটে আসা দেখে সরে যায়। ওরা ঢাল বেয়ে নিচে নেমে যায়। একটু দূরে অপেক্ষমান কৃষক সমিতির লোকেরা ওদের দুজনকে পেয়ে উৎসাহ পায়। সমবেত স্লোগান তোলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ। মদেশিয়ার দলটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পেছনে সরে। বীরেনবাবুও ওদের সঙ্গে সরে। রাধাবল্লভ চীৎকার করে ওঠে 'ই-ন-কি-লা-ব'। মদেশিয়ার দল আরও পিছোয়। আরও চাপ সৃষ্টি করার জন্য রাধাবল্লভ ফের চীৎকার করে ই-ন-কি-লা-ব ধ্বনি তুলে এগিয়ে যায়।

কিন্তু তাদের আচমকা থেমে যেতে হয়। কারণ ঢিবির ওপর থেকে তিনজন মজুর রাধাবল্লভের দিকে

চিয়াড়ি (ধনুক) তাক্ করেছে। হৃষিকেশ নিজের দলের দিকে মুখ তুলে 'চিয়াড়ি জোতো', চিয়াড়ি জোতো, বলে হাঁক ছাড়ে। কিন্তু কেউ চিয়াড়ি জোতে না।

বুদ্ধিমান রাধাবল্লভকে স্লোগান দিতে বারণ করে। কারণ এখন তীর ছুঁড়লে তিনের জায়গায় ত্রিশজন মরবে। এখন ছুটে গিয়ে ওদের ওপর হামলে পড়াও যাবে না। রাধাবল্লভ ও হৃষিকেশের কপালের শিরা দপ্‌দপ্ করছে। আলবিশ কিছু একটা টের পায়। বোঝে চিয়াড়ি ছোড়ার চরম সময়টা পার হয়ে গেছে। সে চট করে কৃষক সমিতির দিকে মুখ ফিরিয়ে সবাইকে বসতে বলে। সবাই বসে পড়ে। এখন আর তীর ছোঁড়া যায় না। কিন্তু চট করে ধনুক নামাতেও পারছে না—আত্ম সম্মানের ব্যাপার।

'মাঠের ভেতর সুহাস একা দাঁড়িয়ে। অদূরেই এতোসব কান্ড ঘটে গেল। তার মনে ভাসছিল দশ বছর আগে তার নকশাল জীবনে এরকম মদেশিয়ার তীর, টোটা, জমির লড়াই। আজ সে সব স্মৃতি। কোনো ঝিলিকই খেলে গেল না মনে। দশ বছর পর আজকের দিনের ঘটনাও শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে। সুহাসবাবু বিনোদবাবুদের উদ্দেশে চেইন ফেলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। কারণ এই চেইন ফেলার কারণেই এতো গোলমাল বেঁধে গেল। আর যেন এমন ভুল না হয়।

সুহাসরা যাওয়ার উদ্যোগ করতেই রাধাবল্লভ, হৃষিকেশ, আলবিশরা সুহাসবাবুকে ডাকে, বীরেনবাবুও আসে। বোধ হয় সুহাসবাবুর মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির আশায়। নিজেরা মিটিয়ে ফেললে তো মান থাকে না। সুহাস 'ওদের সব ঝামেলা মিটে গেল কিনা জানতে চায়।

ভগত দেখতে পায় এম, এল, এ, আসছে 'আরে এম, এল, এ আসি গেলাক, এম, এল, এ।' বিনোদবাবুরা চলে যায়। এম, এল, এ আসার জন্য সুহাসবাবুকে থাকতেই হয়।

বীরেন্দ্রনাথ বর্মন এম.এল.এ, ধুতি পাঞ্জাবী পরা ছোটখাট চেহারা বড় আল পথ ধরে আসছে। তার পেছনে জোতদার গয়ানাথ ও বাঘারু চেয়ার উল্টো করে মাথায় নিয়ে। এম.এল.এ কে দেখে মদেশিয়া ও কৃষকদের ভিড়টার গোছালো ভাবটা এলোমেলো হয়ে যায়। গয়ানাথের নির্দেশে বাঘারু মাথায় চেয়ার নিয়ে ভিড়টার পেছন দিয়ে ঢুকে সামনে আসে। ততক্ষণে গয়ানাথ ও এম.এল.এ সাহেব ভিড়টার সামনে এঁসে পড়েছে প্রায়। বাঘারু আচমকা চেয়ারটা এম.এল.এ সাহেবের সামনে পাতে। এম-এল-এ সাহেব চেয়ারের মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ায়। বাঘারুও তার নেংটি পরা 'পুরানো শাল গাছের মত' শ্যাওলা ছাতা ধরা ঢ্যাঙা শরীরটা নিয়ে বেসামাল

ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঘারু এতটাই খাপছাড়া যে কৃষক মজুরের সমাবেশও অচল। 'হেই বাঘারু সরি যা কেনে।' বাঘারু চলে গেলে সেই ফাঁকা জায়গায় ঢুকে সুহাসবাবু এম,এল,একে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করে। এম-এল-এ সাহেব এখানে কোন প্রবলেম, মারামারি হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সুহাসবাবু 'না' বলে। এম.এল.এ সাহেব তার ফুল বাড়িতে একটা সমস্যার কথা জানিয়ে, সেখানে যেতে হবে বলে অভিমত প্রকাশ করে।

বীরেনবাবু চা বাগানের জিপগাড়ি দিয়ে এম-এল-এ কে এগিয়ে দিতে চায়। এম-এল-এ রসিকতা করে বলে তাতে তো তার হাটার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর এম.এল.এ সবার উদ্দেশ্যে সেটেলমেন্টের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলে যে সরকার চান সেটেলমেন্টের মাধ্যমে আধিয়ার রেকর্ডটা করে ফেলতে। আর তিস্তা ব্যারেজের জন্যই এটা দরকার। 'এখন আধিয়ার মানে যে আধিয়ারই, তা ত নাও হতে পারে। কিন্তু চাষটা কে করে সেটা রেকর্ড হওয়া দরকার।' সে ব্যাপারে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা পরে মীমাংসা করা হবে। এরপর রাধাবল্লভের দিকে তাকিয়ে সম্মতি আদায় করতে চায়। রাধাবল্লভ— চোখবুজে, হেসে, ঘার কাত করে এম,এল-এ সাহেবকে একদিন সময় নিয়ে আসতে বলে, যাতে সবশুনে, বুঝে তবে মীমাংসা করতে পারে। বেলা অনেক হয়েছে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে বলে এম.এল.এ ফুলবাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ নেয়।

এম-এল-একে এগিয়ে দেওয়ার জন্য রাধাবল্লভ, হৃষিকেশ, ফাগু, বীরেনবাবু সঙ্গে চলে। চলতে চলতে ফাগু'সব ঠিক হয়ে যাবে বলে যে রাধাবল্লভ খানিকটা উষ্মা, খানিকটা রসিকতা করে বলে যে ফাগুর সব কিছুতে 'ঠিকবাত' আর হৃষিকেশের সবকিছুতেই লাঠি। আসলে এদের যে যা বোঝায় তাই শোনে। এম-এল-এ বলে সেটাই সবচেয়ে বড় ঠিক বাত যেটাতে পার্টির লাভ সবচেয়ে বেশি। এখানে মারামারি, দাঙ্গা হলে সরকারের বদনাম হত, পার্টির ক্ষতি হত। এসব কথাবার্তা বলতে বলতে রাধাবল্লভরা দাঁড়িয়ে পড়ে। এম-এল-এ কে সেখান থেকে বিদায় জানাতে ওদলাবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটার দিকে ওরা সবাই এগোছিল। জিপটার কাছাকাছি আসতেই বীরেনবাবু ড্রাইভার বাহাদুরকে ডাকে এবং ফুলবাড়ি যাওয়ার নদী পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসতে বলে। অমনি গয়ানাথ বলে ওঠে যে তার বাঘারু এম-এল-এ কে নদী পার করে দেবে চিন্তা নেই। এরপর ফাগু সামনের সিটে এম-এল-এর পাশে বসে। গয়ানাথ বাঘারুকে নির্দেশ দেয়—'হে বাঘারু, পাছত ওঠ্ কেনে।'

জিপ গাড়িটা স্টার্ট নিয়েছে। বাঘারু অত্যন্ত অনভ্যস্ত অবস্থায় নিজেকে জিপের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। 'তার

লম্বা, পেশল, নগ্ন রোমহীন বাঁ পাটা জিপের পেছনে শূন্যতার ফ্রেম জুড়ে অনেকক্ষণ থাকে। তার মাটিল্যাপা, থ্যাবরা, হুকওয়ার্মের ফুটোয় দাগি পায়ের তলাটা, খুব সাদাসিধে সোজা টাঙানোই যেন, ওখানে, পোস্টারের মত।' চলন্ত জিপের ঝাঁকুনিতে কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ওলোট পালট খেয়ে বাঘারু শেষ পর্যন্ত জিপের মেঝেতে বসে, পিছন ফিরে ফরেস্টের দিকে তাকায়।

এ কোন্ ফরেস্ট! তার চির চেনা ফরেস্ট থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। জিপের চলনে বাঘারু দেখতে পাচ্ছে কালো পিচের রাস্তা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে আর দুপাশের বন দুদিকে দৌড়াচ্ছে। আচমকা জিপটাকে থামিয়ে বাহাদুর ফের আনন্দপুরের রাস্তার দিকে মুখ করে থামিয়ে বলে 'উতরো', মাথায় ঠোক্কর খেয়ে বাঘারু হুড়মুড় করে নেমে পড়ে। 'লাল সেলাম' জানিয়ে ফাণ্ড ফেরার জিপে ওঠে। বাঘারু রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এম-এল-এ পেছন থেকে ডেকে বলে 'চলেন ভাই, ঝট্ করি নদীখান পার করি দেন।'

'বাঘারু হাঁটতে শুরু করে। পেছনে এম-এল-এ। বাঘারু একটা ছোট ডালকে লাঠি বানায়। সেটা দিয়ে দু-পাশের জঙ্গল সরায়। একটুখানি বন পেরলেই মাঠ। মাঠ পেরলেই নদী। নদী পেরলেই ফুলবাড়ি।'

বনের গন্ধ মেখে ওরা দুজনে ফরেস্টের পথে পা বাড়ায়। বাঘারু আগে আগে লাঠি দিয়ে পথের লতাপাতা সরিয়ে যায়। পেছন থেকে এম-এল-এ তার নাম জিজ্ঞাসা করে। বাঘারু বলতে লজ্জা পায় কারণ 'যত টাইম যাছে, মোর নাম খান সলসল করি বড় হয়্যা যাছে। এ্যালায় এত খান বাড়ি গেইছে যে ঐ নামখানে মুই আর আঁটো না। ঢল ঢলাছে।' তবু এম-এল-এ শুনতে চায়। বাঘারু এই শর্তে রাজি হয় যদি এম,এল-এ তার নামটা ছোট করে দেয়। ছোট নাম চাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বাঘারু বলে 'সগারই ত ছোট হয় বাবু', যেমন গয়ানাথ রায় বর্মন খান হয়্যা গিছে গয়া জোতদার, 'রাধাবল্লভ হয়্যা গিছে রাধু লিডার', আর 'আগত আছিল বীরেন্দ্র মোহন রায় বর্মন, এ্যালায় হছে এ্যামেলিয়া।' এম-এল-এ বলে 'তার তোমাক মানষিলা ত বাঘারুই কয়?' বাঘারু বলে গয়ানাথ ভোটের জন্য তাকে আর একটা নাম দিয়েছে 'ফরেস্ট চন্দ্র বর্মন।' কিন্তু বাঘারু ফরেস্টের মধ্যে ফরেস্টার সাহেবকে দেখে নিজেই নিজের একটা নাম নেয় 'ফরেস্টার চন্দ্র বর্মন', এখানেই শেষ নয়, বাঘারু সব মিলিয়ে তার নাম রেখে দিয়েছে 'ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন।' এম-এল-এ বাঘারুর পেছনে উদোম পিঠে ও পাছায় নানা দাগ দেখতে পায়। বাঘারু আবার বলে 'বর্মন এই ঠে অনেক মিলিবে, ফরেস্ট চন্দ্রও অনেক পাবেন, রায়বর্মনও আছে, কিন্তু বাঘারু বর্মন এই একোখান।' প্রসঙ্গক্রমে বাঘারু বলে যে

বাঘারু নামের আগেও তার আরও নাম দিল। ' মোর জন্মিবার আগতও মোর একখান নাম আছিল।'

' মোর মাও তো গয়ানাথেরই আছিল।' গয়ানাথের কাজ করার জন্য বনে কাঠকুড়োতে যেত। তাই সে পেটে এলে 'স্যালায় সগায় মোক ডাকিবার ধইচছে— 'কুড়ানিয়ার ছোয়া', আবার জঙ্গলেই বাঘারুর জন্ম হয়। ওর মা একা একাই গাছকাটা কুড়াল দিয়ে নাড়ি কাটে। 'ওর তানে ত সগায় মোক কহিত ' কুড়ালিয়া কাটাও।

গয়ানাথের তো জগৎজোড়া জমাজমি, বনজঙ্গল, গরু মোষ, হাতি ঘোড়া। তেমনি আপলচাঁদটাও গয়ানাথের। সেখানেই একদিন দুপুর বেলা বাঘারু ঢুকেছে। হাতে একটা দেড় হাতি 'গাঁঠিয়া লাঠি'। বনের গাছপালা ঝোপঝাড়ে আঘাত করে করে যাচ্ছে। এমন সময় এক ঝোপ থেকে একটা বাঘ এসে এক পা পাছায় এক পা ঘাড়ে দিয়ে ওর হাঁ করা মুখখানা বাঘারুর ঘাড়ের কাছে নিয়ে এসেছে। এবার চলছে বাঘে বাঘারুতে ঠেলাঠেলি বাঘারু তার দেড় হাতিয়া লাঠিটা বাঘের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বাঘারু বাঘকে ঠেলতে থাকে। বহুক্ষণ এভাবে চলার পর বাঘারু বড় বাঘের মত হালুম হালুম ডাক ছাড়ে। ভয়ে বাঘ ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালায়। পুরো ঘটনাটা বাঘারু অভিনয় করে দেখায়। এরপর দু মাস না ছ'মাস বাঘারু জলপাইগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়। ' সেইঠে মোর নাম হয়্যা গেইল বাঘারু।'..... 'তা ধরো কেনে, পুরা একখান পালাটিয়া গান বান্ধ্যা হয়্যা গেইল—কুড়ানিয়া ছোয়া, কুড়ালিয়া কোটা, বাঘারু, ফরেস্টুয়া চন্দ্রবর্মন।'

আগে আগে হেঁটে যাওয়া বাঘারুর পেছনে বাঘের থাবার দাগ দেখতে পায় এম-এল-এ। বাঘারু এবার এম-এল-এর কাছে একটা 'মানষির নাম' চায়। যে এম-এল-এ বাগানের মানুষকে ঝান্ডা দিয়েছে, বস্তির মানুষকে দিয়েছে জমি সে বাঘারুকে একখানা নাম দিতে পারবে না বলে বাঘারু।

জঙ্গলটা পার হতেই 'নিধুয়া পাথার।' তার পরেই নদী। বাঘারু এম-এল-কে পার করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। প্রথমে ঘাড়ে বসিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এম-এল-এর এক হাতে ব্রিফকেস, অন্য হাতে জুতো। কিন্তু এম-এল-এ প্রায় পড়ে যায় যায়। সে নামতে চায়, বাঘারু নামিয়ে দেয়। এবার বাঘারু পিঠে ঝুলিয়ে নেয়। তাতেও ভীষণ অস্তস্তি বোধ করে এম-এল-এ। আবার নামিয়ে দেওয়া হয়। এবার 'বাঘারু তার আপাদমস্তক ন্যাংটো শরীরের সঙ্গে দুহাতে জাপটে নেয় এম-এল-এ-কে'। ধুতি-পাঞ্জাবী-জুতো-ব্রিককেস সহ একটা আস্ত এম-এল-কে বিসর্জনের ঠাকুরের মতো উঁচু করে বুকে জড়িয়ে ধরে বাঘারু জলে নামে।

মাঝনদীতেই তিস্তাপারের এই বৃত্তান্তের আদি পর্ব শেষ হয়। এম-এল-এ ফুলবাড়িতে যাচ্ছে একটা কালভার্ট তৈরির ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনের গোলমালের ব্যাপারে আলোচনার জন্য। 'তারমানে, এঞ্জিনিয়ার, কনট্রাকটর, ওভারসিয়ার, সিমেন্টের মিকচার, লোহা, বালি, পার্সেন্টেজ, ইউনিয়ন, কৃষক মজুর, লিডার, অফিসার থেকে এম-এল-এ, আবার এম-এল-এ থেকে মিটিং, মিটিং ইত্যাদি। এখানে বাঘারু বর্মন অবান্তর আবার যতক্ষণ কোন 'পথহীন ফরেস্ট, বা ব্রিজহীন নদী' পথে না পড়ে।

বনপর্ব : বাঘারুর নির্বাসন

ক্রান্তির হাটের-হাট খোলায় সন্ধ্যা নেমে গেছে। রাস্তার ওপারের মিষ্টির দোকানের হেজাকের আলোতে হাটের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়েছে। সুহাস বারান্দায় বসেছিল। একদল লোক সামনের মাঠটা পার হয়ে তার দিকে আসছে। সুহাস অনুমান করে ওরা সার্ভের ব্যাপারেই কিছু বলার জন্য হয়ত আসছে। সুহাস শুনতে পায় 'আপনার এখানে একটু বসব'। হাটার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারে এম-এল-এ সাহেব। এম-এল-এ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলে 'আপনার এখানে একটু বসব।' সুহাস 'আসুন, আসুন' বলে অভ্যর্থনা জানায়। সুহাসের ইঙ্গিতে প্রিয়নাথ চেয়ারটা এনে বসতে দেয়। এম-এল-এ ব্রিককেসটা মাটিতে রেখে এমন ভাবে চেয়ারটা টেনে বসে যাতে সামনে বারান্দা ও কোনাকুনি মাঠটা পড়ে। সুহাস প্রিয়নাথকে একটু চায়ের কথা বলে, সুহাস এম-এল-এর আসার কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। হয়ত কিছু কাগজপত্র রাখতে দেবে, হয়ত রশিদ দেবে এরকম কত কিছু।

সুহাসকে এম-এল-এ জিজ্ঞাসা করে এখানে কোন গোলমাল হয়নি তো! সুহাস 'না-আ' জবাব দেয়। বলে—কেনই বা গোলমাল হবে। তখন এম-এল-এ গোলমাল হতে পারার নানা কারণ একে একে বলতে থাকে। কেউ এসে বলতে পারে ম্যাপে গাছটা না দিতে, হতে পারে জমির সীমা মাপতে গিয়ে একজনের সীমা আর একজনের সীমায় পড়ে গেল। তখন তার দখল নিয়ে মারামারি। প্রসঙ্গক্রমে সুহাসবাবুরা যে কোনো জোতদারের বাড়িতে যাচ্ছে না—তাকে জোতদাররা ভয় পেয়েছে তা এম-এল-এ সাহেব জানায়। সুহাস এ ব্যাপারে হেসে উত্তর দেয়—'আমরা তো আর প্রপারটি রাইট মানে সম্পত্তি কার সে সব ঠিক করছি না, সে সব ত সিভিল কোর্টের ব্যাপার।' এম-এল-এ সাহেব বলে সরকারের ভালোমন্দ নির্ভর করে অফিসারের ভালোমন্দের ওপর। সুহাস জিজ্ঞাসা করে—'আপনাকে তো নিশ্চয়ই এসেম্বলিতে প্রায়ই বলতে হয়।' এম-এল-এ উত্তরে বলে যে মাঝে মাঝে বলতে হয় লোকাল ব্যাপার নিয়ে। অন্যান্য সময় কমরেডরাই বলেন।

এবার এসেম্বলি ভালো লাগে কিনা এম-এল-একে জিজ্ঞাসা করে সুহাস। এম-এল-এ একটু হেসে সত্যি কথাটা বলে ফেলে 'প্রথম থিকেই বলি। বড় ঘুম পায়।' এয়ার কন্ডিশান বলে বাইরে থেকে এলে খুব ঘুম পায়। সেজন্য এম-এল-এ ভাত ছেড়ে রুটি খাওয়া ধরেছে। কিন্তু 'মাথা ধরা খান মোর এ্যালায়ও সারে নাই।'

এম-এল-এর সঙ্গে আসা দলটা চায়ের দোকানে, সিঁড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। ওদের সামনে একটা কালিপড়া হারিকেন জ্বলছে। এম-এল-এ সারা দিনই ব্যস্ত ছিল। দুপুরে-ফুলবাড়ি গিয়ে আবার সন্ধ্যায় ক্রান্তির হাটে ফিরে আসা সোজা ব্যাপার নয়। তবে এসব ব্যস্ততা তো এম-এলএদের থাকেই। 'এম-এল-এ মানেই চলছে হয় হেঁটে, নয় গাড়িতে, না হয় প্লেনে, না হয় ট্রেনে।' এমন ঘটনা সাধারণত ঘটে না যে এম-এল-এ খবর না দিয়ে বা আগে না বলে এভাবে ক্রান্তির হাটে এসে পড়েছে। এখানকার লোকেরা জানতে পারল ফুলবাড়ি থেকে আসা লোকদের কাছেই বা দোকানে। জানা গেল ফুলবাড়িতে নাকি ফুল ঝোরার ওপর নির্মিয়মান একটা কালভার্টের রেলিং এম-এল-এর এক লাথিতেই ভেঙ্গে পড়েছে। সেজন্য মাল বাজারে লোক গেছে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে এখানে ডেকে আনতে।

এই সময় গেরিমাটি রঙের জামাপরা এক ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এম-এল-এ-র সঙ্গে আলাপ করে জানতে চায়, এম-এল-এ কখন এসেছে ফুলবাড়িতে লাথি মেরে ব্রিজ ভেঙ্গেছে কিনা। এম-এল-এ জানায় তার কাছে ইঞ্জিনিয়ার আসবে। কারণ কাল জলপাইগুড়িতে মিটিং আছে। এরপর এম-এল এ সাহেব ঠান্ডা হওয়া চা এক চুমুকে শেষ করে। এ অবস্থা দেখে সুহাস আর এক কাপ চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করায় এম-এল-এ খুশি হয়ে রাজি হয়। চা-খাওয়ার বিষয়টি নিয়ে সুহাস মনে মনে ভাবে যে এম-এল-এ সাহেবের কলকাতা ও নাগরিকতার অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে। এবং সেই টানেই তিনি এখানে এসেছেন অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লোভে।

রাস্তায় আলো ফেলে মোটর সাইকেলের আওয়াজ তুলে গয়ানাথ এসে হাজির হয়। সিঁড়ির ওপর থেকে তার মোটর সাইকেল আরোহনে রসিকতা করে কেউ বলে 'ব্যাস, ভটভটি জোতদার আসিগেইল।' নতুন নাম করনে গয়ানাথ খেপে যায়। এম-এল-এ গয়ানাথ কাকা বলে ডাকতে থাকে। এম-এল-এর ডাকে গয়ানাথ আসে বটে কিন্তু তার রাগ কমেনি। সে পেছন ফিরে আসিন্দিরকে গালাগাল করতে থাকে। এম-এল-এ গয়ানাথকে শান্ত করার জন্য বলে ' হে কাকা, ক্যানং বুদ্ধি তোমার, জোয়াইক (জামাই) কছেন অ্যালং প্যালং? '

গয়ানাথ এম-এল-এর সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছে তার অজুহাত খোঁজে। ভাবে সেই তো বাঘারুকে

এম-এল-এর সঙ্গে দিয়েছিল। সুতরাং তার কোন অসুবিধা হয়েছিল কিনা তা জিজ্ঞাসা করতেই পারে। এবার জিজ্ঞাসা করে কেন অত তাড়াতাড়ি ফুলবাড়ি গেল আর এলো। কেনই বা এখানে এসে বসে আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে বাঘারুর কথা আনে। এম-এল-এ বাঘারুর প্রসঙ্গে বাঘারুর সঙ্গে তার কি কি কথা হয়েছে— যেমন তার নাম, বাবার কথা, তার বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা, মা'র কথা সবই তোলে এবং বাঘারু বেশ ভালো বলে সার্টিফিকেট দেয়। এবং নিজে থেকেই বলে তাকে গয়ানাথ কোন আধিয়ারি দিয়েছে কিনা। গয়ানাথ বাঘারুকে ভুল বোঝে। ভাবে বাঘারুই বুঝি এম-এল-কে ধরে একটা আধিয়ারি দেবার কথা বলেছে। প্রকাশ্যে এম-এল এ-কে বলে যে তারাই তো তাকে আধিয়ার বানিয়ে ছাড়ছে। গয়ানাথ বারান্দা থেকে নেমে রাস্তায় পা বাড়ায়। রাস্তায় গাড়ির হেডলাইটের আলো ফেলে পাঁচজন ক্যাম্পের ঘরের সামনে আসে। ঐ পাঁচজনের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে বলে ' হে-ই বীরেন দা, তুমি কি আর মিটিং ডাকার জায়গা পাও নাই নাকি; এই কাদা মাঠ। এম-এল-এ পা নামিয়ে সোজা হয়ে কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। এবার এম এল এ চিৎকার করে মণিদার উদ্দেশে বলে আরে মণিদা, আপনি আবার কোথা থেকে আসছেন। মণিদা জবাব দেয় 'তুমি গিয়ে লাথি মেরে সব কালভার্ট ভাঙতে পারো আর আমি এইটুকু আসতে পারি না?' সিঁড়ির কাছ থেকে কেউ বলে সিমেন্টের পরিবর্তে বালি দিয়ে কালভার্ট বানালে ছোট ছেলেরাও তা ভাঙতে পারে। এরপর ইঞ্জিনিয়ারের প্রসঙ্গ এলে অন্য একজন অফিসে ইঞ্জিনিয়ারকে পাওয়াই যায় না বলে অভিযোগ করে।

এদিকে গেরিমাটি রঙের জামাপরা ভদ্রলোক আর একটি লোকের মাথায় সতরঞ্চি বয়ে এনে টানটান করে পেতে দেয়। মণিবাবু, এম, এল, এ নেমে আসে। আর একজনও মণিবাবুকে নমস্কার জানিয়ে নেমে আসে। সে গয়ানাথ।

সুহাসের দরজা পর্যন্ত একটা বড় সতরঞ্চি পেতে ও সতরঞ্চির মাথায় দুটো চেয়ার দিয়ে মিটিং এর কাজ শুরু হয়। হাটকমিটির ভদ্রলোক এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা করা যায়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করে। সবাই জুতো খুলে সতরঞ্চিতে গিয়ে বসে। পেছন থেকে ইঞ্জিনিয়াররা বলে দরকার হলে যেন তাদের ডাকা হয়। এতে এম এল এ সাহেব খানিকটা বিরক্তির সুরেই বলে, কথা হবে আপনাদের সঙ্গে আর আপনারা ওখানে থাকবেন কেন। ইঞ্জিনিয়াররা একে একে উঠে আসে। এম এল এ সাহেব গয়ানাথকে মিটিং এ বসতে বলে, প্রিয়নাথের হাত থেকে ব্রিককেসটা নিয়ে এম এল এ মিটিং শুরু করে ফুলবাড়ির লোকদের প্রথমে বলতে বলেন। উপস্থিত ফুলবাড়ি লোকদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায় কে বলবে কথা। অবশেষে এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক—ত্রিশ

বছর ধরে ফুলঝোরাব্রিজ হওয়ার ইতিহাস শুরু করে। তার বিশ বছর বয়সের সময় খগেনদাশগুপ্ত যখন মন্ত্রী তখন ব্রিজ হওয়ার কথা চলছিল। মনিবাবু বিরক্ত হন। তবু ভদ্রলোক কথা বলতেই থাকে। একবার নাকি ব্রিজ হয়ে গেছে বলে রটনা হয়ে যায়। সবাই প্রতিবাদ করলে জলপাইগুড়ির অফিসের কাগজপত্রে খোঁজ পড়ে ব্রিজ হয়েছে কিনা। মন্ত্রী খোঁজে কলকাতার কাগজ, এখানকার মানুষ খোঁজে ফুলবাড়িতে কোথায় ব্রিজ? গল্পটা শুনে সবাই হেসে উঠল। এবার একটি ছেলে কথা বলতে চায়। এম এল এ সাহেব অবশ্য মজা করেই গল্পটা শুনছিল।

সেই ছেলেটি— হেমেন বলতে ওঠে। কিন্তু বলতে পারে না, বসে পড়ে। এবার বলতে ওঠে জব্বর। 'ফুলবাড়ির সবচেয়ে বড় জোতদারের ছেলে।' জব্বর কংগ্রেস বাড়ির ছেলে। সাতষট্টি সালে সিপিআই এ এসেছে। তারপর দুবার পার্টি বদলিয়ে আবার বামফ্রন্টে। সে বলতে শুরু করে এই বলে যে ফুলঝোরার ব্রিজ তৈরি হয়েছে, কিন্তু ঠিকাদারের কাজে কেউই খুশি নয়। সবার ভয় ব্রিজটা ভেঙ্গে পড়বে। সেই আশঙ্কা সত্য হল—এম এল এ সাহেবের নিজের পায়ের আঘাতেই রেলিং ভেঙ্গে পড়ায়। এটা সৌভাগ্যও বটে। নইলে নানা কথা হতে পারত। এম এল এ-র ইঙ্গিতে জব্বর বসে পড়ে।

এম এল এ তিনবার গলা ঝাড়ে। ইঞ্জিয়ারদের দলটা দেয়াল ছেড়ে সোজা হয়। মণি আর একটা সিগারেট ধরায়। মণি বুঝতে চায় বীরেন ব্যাপারটার সমাধান চায় না পাকাতে চায়। ততক্ষণ বীরেনবাবু কথা শুরু করেছে। গয়ানাথরা শতরঞ্চির মাঝখানে এসে বসে। এম এল এ বলছে যে ফুলবাড়ির লোকেরা কনট্রাকটরের ব্যাপারে তাকে, সরকারকে ও ডিপার্টমেন্টকে অনেক চিঠি দিয়েছে। কিন্তু সে কোনো জবাব দিতে পারেনি। এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তিনি কি পেয়েছেন সে চিঠি জিজ্ঞাসা করা হয়। এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বলার জন্য প্রস্তুতি নেন। বলেন এ ব্যাপারটা অফিসের এস এ-ই ডিল করেন তিনিই বলতে পারবেন। এম এল এ ভেতরে ভেতরে রেগে যায়। বলে তার এমন সরকারী অফিসের কথা জানা আছে যেখানে 'কোন নতুন বিয়ে বসা মেয়ের চিঠি আসিলেও অফিসার নিজে পড়িছেন।' সবার মুখে চাপা হাসি। মণিদা বুঝতে পারেনি বীরেনবাবু এত গুছিয়ে অপদস্থ করতে পারে। এরপর এম এল এ এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করে কেন তার লেখা চিঠির উত্তর পায়নি সেও কি ডিলিং অফিসার বা ডিলিং ক্লার্কের জন্য। ফুলবাড়ির ঐ ব্রিজটা দেখতে যাবে বলে জানালেও সেখানে মিস্টার মন্ডলকে পাঠানো হল—তিনি নিজে গেলেন না কেন। এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সেটা বুঝতে পারে নি বলে জানায়। এম এল এ জানায় যে

অভিযোগটা এলাকার মানুষের কনট্রাক্টরের বিরুদ্ধে তাই এ্যাসিস্ট ইঞ্জিনিয়ারকেই সেখানে আসতে হত। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্পেসিফিক , পার্টিকুলার কমপ্লেন না হলে এনকোয়ারি-করা মুশকিল হয় বলে জানান। কিন্তু এম এল এ বলে যে ফুলঝোরার ব্রিজে ব্যবহৃত মশলায় ঠিকমত বালি সিমেন্টের মিশেল হচ্ছে না এ রকম কথা কি শোনেন নি তারা। জনসাধারণ ত ইঞ্জিনিয়ার নয় যে এর চেয়ে পার্টিকুলার কিছু বলতে পারবে। 'একজন কনষ্ট্রাক্টর কেন ওরকম করবে?' ইঞ্জিনিয়ারের এই কথায় সভায় হাসির রোল পড়ে। সেই মাঝময়সী ভদ্রলোক কাকা ছড়া কাটে — 'ঠিকাদার আর ইঞ্জিনিয়ার/দ্যাশ খান কইরল ছারখার।' বর্ষাকালে নদী ভাঙলে বোল্ডার ফেলার কাজে ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারের বার আনা চৌদ্দআনা ভাগাভাগির কথা তোলে। ইঞ্জিনিয়ার অস্বস্তি বোধ করেন। এম এল এ কাকাকে চুপ করতে বলে। ফুলঝোরার রেলিং সম্পর্কে এম এল এ বলে যে আজ সকালে ঢালাই হয়েছে। সন্ধ্যার মুখে পা দিয়ে একটা চাপ দিতেই ঝরঝর করে ভেঙ্গে গেল। মিষ্টার মন্ডল তখন সেখানেই। এবার ইঞ্জিনিয়ার সুযোগ পান। তিনি বলেন যে কোনো ঢালাই চব্বিশ ঘন্টা না গেলে ঠিক জমে না। বারো ঘন্টার মধ্যে ধাক্কা দিলে হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশনের রেলিং পর্যন্ত ভেঙ্গে যাবে। এম এল এ সাহেব দেখছে বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে, ঠান্ডা মাথায় বলে এটার একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ইঞ্জিনিয়ার বলে নিশ্চয়ই করা যাবে তবে সব জায়গার নমুনা নিয়ে ল্যাবোরেটারিতে পাঠাতে হবে এবং যতদিন ফল না বেরয় ততদিন সব কাজ বন্ধ থাকবে। মণিবাবু বুঝতে পারে না বীরেনবাবু এতো সব ঝামেলায় যাচ্ছে কেন। ব্রিজের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কী সুবিধা হবে। কিন্তু এম এল এ সমবেত জনতার বারবার মত জানতে চান ব্রিজ বন্ধ থাকলে তাদের কোন অসুবিধা হবে কিনা।

কন্ট্রাকটরের পক্ষ থেকে একটা লোক কিছু বলার অনুমতি চায়। অনুমতি পেয়ে লোকটি বলে যে তার কনস্ট্রাকটর বড় কাজ নেয়, এসব ছোট কাজ করে না। সে ও তার ভাই রাজমিস্ত্রীর কাজ জানে। সেই লো রেটে টেন্ডার দেয় কোম্পানীর নামে। কাজ করে লাভও করে। এখন যদি এতসব টেস্ট ইত্যাদি করা হয় তবে কোম্পানীর বদনাম হবে। কনট্রাকটর তাকেও বরখাস্ত করবে। সেজন্য তার মত গরীবের দিকে চেয়ে যদি বিবেচনা করা হয়। মণি এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তার আগেই এম এল এ অফিসারদের দোষ দিয়ে টেস্ট মেস্ট করার কথাতেই অনড় থাকে।

এবার লোকটি একটু ভূমিকা করে আর একটি কথা বলে। 'আমরা যখন প্রথম এইখানকার কাজ ধরি, মানে

সাইটে আসি, তখনই এখানকার একজন এসে বলেন আমরা সরকারের পার্টির লোক, আমাদের পাঁচ বস্তা সিমেন্ট দিতে হবে।' ঐ লোকটি তার ঘরের বাইরের জায়গাটা সিমেন্ট করতে চেয়ে এই সিমেন্ট দাবি করেছিল। দিতে রাজি না হওয়ায় এই ঝামেলা। সে এতোদিন বলেনি। আজ তার বিপদ তাই কথাটা বলে ফেলল। ফুলবাড়ির লোকেরা 'নাম কহেন, নাম কহেন' বলে একসঙ্গে ফুসে ওঠে। এম এল এ-ও ভীষণ রেগে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের একহাত নেয়।

মণিবাবু ফুলবাড়ির লোকদের ধমক দিয়ে বসিয়ে একটা মীমাংসা সূত্র বের করে। সে সবার উদ্দেশ্যে বলে যে রাগারাগি করে কোন লাভ হবে না। এম এল এ সাহেব দুঃখ পেয়েছেন। এটা সবার দুঃখও বটে। এবার ফুলবাড়ির দুজন, এম এল এ, ইঞ্জিনিয়ার ঠিকাদার সবাই মিলে মালবাজারে একদিন বসে মিটিং করে সব মীমাংসা করে নেওয়া যাবে। দরকার মতো ব্রিজের কোন অংশ ভেঙ্গে নতুন করে বানানো হোক। এ নিয়ে আর হিল্লি দিল্লী করে লাভ নেই। ঠিক এই সময়ে গয়ানাথ একজন লোককে দিয়ে চা নিয়ে ঘরে ঢোকে।

কথাবার্তা, ঝগড়া ঝাঁটি, রাগারাগি, মিলমিশের মধ্যে মিটিং শেষ হলো। মণি, এম এল এ, ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদাররা গাড়ি করে মালবাজারে গেল। এখানে রয়ে গেল সুহাস, গয়ানাথরা।

গাড়িটা দু'চার মিনিট চলার পরই ইঞ্জিনিয়ার এম এল এ সাহেবকে তার সেন্টিমেন্টে আঘাত দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এম এল এ আবার পুরোনো কথা তুলে তার চিঠি পেয়ে না আসার প্রসঙ্গ আনে। আসে জব্বরদের কথা, ঠিকাদার ভদ্রলোকের কথা। উভয়েই উভয়ের কথার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। লোকাল ইস্যু বাড়তে দিলে বাড়তেই থাকে। এসব এখন থাক। ইঞ্জিনিয়ার রেলিংটার ব্যাপারে নিজে দায়িত্ব নিচ্ছেন বলে এম এল এ-কে জানান।

সুহাস মিটিং এর কেউ না হলেও এটা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না যে যদি এম এল এ সাহেবের ডাকে ইঞ্জিনিয়ার ফুল বাড়িতে উপস্থিত হতেন তাহলে কোন সমস্যাই হত না। সব ইঞ্জিনিয়ারের অফিসেই মিটমাট হয়ে যেত। ইঞ্জিনিয়ার যে আইন কানুনের কথা বললেন তা তো তার বেলাতেও খাটে। আর— জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক মণিবাগচিকে গাড়ি করে আনা ও নিয়ে যাওয়া কেন তাও বুঝে নেয় সুহাস। কারণ ঐ ভদ্রলোকই তো ইঞ্জিনিয়ারদের নিরাপত্তার শুধু গ্যারান্টি দিলেন না, এম এল এ-র সঙ্গে ঝগড়ার মীমাংসা করেও দিলেন।

গয়ানাথ তার বাড়ির উঠোনো ঢুকেই 'বাঘারু বাঘারু' বলে চিৎকার করে ডাকে। বাঘারু সামনে এসে শাল গাছের মত দাঁড়ায়। এবার তাকে জিজ্ঞাসা করে এম এল এ সাহেবকে সে কী কী বলেছে। বাঘারু উত্তর দেয় সে তার নামের কথা, তার জন্মের কথা বলেছে। আধিয়ারির কথা বলেছে কিনা গয়ানাথ ঝাঝালো স্বরে জিজ্ঞাসা করে। বাঘারু উত্তর দেয় 'না'। কিন্তু গয়ানাথের বিশ্বাস সে এম এল এ-কে আধিয়ারির কথাও বলেছে। এবং সেজন্য বাঘারুকে আদেশ করে—'তুই কালি সূর্য উঠিবার আগত এই তিস্তাপার ছাড়ি চলি যাবি। হু-ই নাগরা কাটাত ডায়না নদীর চরত মহিষের বাথান আছে, ঐঠে থাকিবু। বুঝলু? আর কান্দুরা ঐঠে আছে। পাঠাই দিবি। বুঝলু?'

পরদিন তিস্তা পেছনে ফেলে সূর্য ওঠার আগেই বাঘারু তিস্তাপার ছাড়ে। অত ভোরে তার সঙ্গী আকাশের সাদা চাঁদ। সামনে কুয়াশায় ঢাকা। বাঘারু ঘাড় কাত করে আকাশের দিকে তাকায়। বাঘারু গোচিমারির ঢালে নামে, চাঁদটা তার মাথার ওপরে আসে। এবার সে চাঁদের মুখোমুখি হয়। চাঁদকে দেখে বাঘারু হেসে ফেলে। বাঘারু চাঁদের সঙ্গে খেলা করে মুখ ডানে ঘুরিয়ে, বাঁয়ে ঘুরিয়ে, চাঁদের দিকে ঢিল ছুঁড়ে। বাঘারু উঁচুতে ওঠে। সামনে গাছ গাছালি দেখা যাচ্ছে। চাঁদটা কখনো কখনো ফরেস্টের আড়ালে চলে যাচ্ছে। 'সে হাঁসখালি বাঁধে উঠে পড়ে।' আপল চাঁদের ভেতর দিয়ে ওদলাবাড়ির দিকে যাওয়া রাস্তাটাকে বাঁয়ে রেখে সিধে হাটে বাঘারু। চাঁদটা ফরেস্টের মাথায় চলে যায়। বাঘারু যত বাগানের দিকে এগোয় চাঁদটা তত তিস্তার দিকে পিছোয়।

'এখন এই ফরেস্ট; খেতবাড়ি, নদী, হাট, বাড়ি-টাড়ি-বস্তি, এই বাতাস ভেজা ঘাস, আলপথ, বাঁশ-ঝাড়, চা-বাগানের ফ্যাক্টরির নল' এইসব নিয়ে বাঘারু র এক নতুন দুনিয়া তৈরি হয়েছে একদিনের জন্য। সেই নতুন জগতে শুধু বাঘারু আর চাঁদ।

বাঘারু আনন্দপুর চা বাগানে এসে পড়ে। চারদিকে শুধু চা বাগানের বেড। ছায়া দেওয়ার জন্য ছাতার মতো গাছ। বাগানের চারদিকে জলের নালী। কাটাতারের বেড়া। বনবাদার মাঠ ঘাট পেরিয়ে এসে বাঘারু বাগানের বাবুদের বাড়ি-ঘর, টিনের চালের সবুজ রং, জানালা-দরজার সবুজ দেখতে পায়। চাবাগান ছেড়ে বাঘারু মাঠে নামে। নিচু জমির আল দিয়ে চলতে চলতে বাঘারু দেখে সামনে আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। 'বাঘারু খুশি হয়ে ওঠে।' সে এখন বারঘড়িয়ার মাঠে। সে ডাঙ্গার দিকে ছোটে। দেখে সূর্য উঠছে। এমন সূর্যোদয় সে আগে কখনো দেখেনি। সে শ্যাওড়া গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাঘারু কান্তদীঘি-কুমার পাড়ার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। পূবে কুমলাই, মাথা চুলকা, ধূপঝোরা। আরও পূর্বে কি তা বাঘারুর জানা নেই। পূবের আগুন রঙা আকাশটার দিকে বাঘারু চেয়ে। এত দূর থেকে ফরেস্ট ছাই ছাই। ফরেস্টের ছাই ছাই আর দিগন্তের ছাই ছাই মিলে গেছে। বাঘারু একবার ডাইনে আপন চাঁদের দিকে তাকায়, গাছের মাথায় আগুন রঙ, পেছনে শেওড়া গাছটার দিকে তাকায়, পাতাগুলি বৃষ্টি ধোওয়া। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখে 'সারা শরীল খান কায় অং মাখাছে'। ঘাসের দিকে তাকায়—ঘাসগুলো যেন আয়না। এই বারঘরিয়ার মাঠটায় ঠিক সময়ে না এলে বাঘারু এমন সূর্যোদয় দেখতে পেত না। তাই সে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখে। গয়ানাথ গাছহীন, গয়ানাথের লাঙ্গলহীন বাঘারু ধরমতলায় সূর্যোদয়ের সামনে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে। এই বোধটা বুঝে নিয়ে সে নিজের শরীরের দিকে শুধু তাকায়। শরীর সর্বস্ব বাঘারু মুক্তির আনন্দে শরীর দিয়েই হাসে। নিজের হাসি দেখে সে আরও হেসে ওঠে। সে তো তার হাসিকে চেনে না। তাই এতো হাসি পায়। দুই হাতে মুখ ঢাকতে চায় বাঘারু। দুহাত আজলা হয়ে যায়। সেই আজলায় কতো রং এসে জমে। বাঘারুর সেই রং তার শরীরে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। 'শরীরটা এই প্রথম তার নিজের হয়ে উঠছে যেন।' বাঘারু তার কাঁধে, ঘাড়ে, পিঠে, বাহুতে, কোমরে, উরুতে, কটিতে সর্বত্র আলোর উষ্ণতা নিতে চায়। সেজন্য সে আলোর দিকে ছুটে যায়। 'বাঘারু মাটিতে গড়িয়ে পড়ে-মাঠি থেকে আলো সর্বাঙ্গে মাখতে থাকে।'

'বারঘরিয়ার মাঠ ছেড়ে বাঘারু নিপুছাপুরের দিকে চলতে শুরু করে' চলতে চলতে বিড় বিড় করে গান ধরে, হাঁটতে হাঁটতেই দোলে

উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর চিক চিক্যানি দিয়া

উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর আগুন-টকটক হয়্যা

খুলি দিছু-দেহবাড়ি ছ্যাঁকা দিয়াযান

জল যাউক, হিম যাউক, খাড়াউক শরীল খান।

মায়েরা কোলের বাচ্চাকে চপচপ তেল মাখিয়ে সূর্যের দিকে দোলাতে দোলাতে এ গান করে। বাঘারুর তো কোন শিশু নেই। তাই বাঘারু তার নিজেরেই শিশু। নিজেই নিজেকে দোলাক আর গান করুক। এভাবে একটার পর একটা ছড়া বাঘারুর মনে আসে। এই কবিতার সঙ্গতিতেই লাল রং সরে গিয়ে আকাশে নীল রং ছড়িয়ে পড়ে। 'ছড়ায় শিশু ছাড়া সকাল নেই। শিশু ছাড়া কবিতা নেই। বাঘারু এখন তাই নিজেই নিজের

শিশু।'

নিপুছাপুর চা বাগানের শ্রমিকরা সবাই বেরিয়ে পড়েছে। কোদাল, বাঁকাদা, কলম ছুরি কাঁধে কাঁধে ঝুঁলিয়ে তারা হাঁটছে। পরনে কারো হাফপ্যান্ট, কারো হাফ খাগি প্যান্ট, কারো খাটো ধুতি। গায়ে নানা আকারের নানা রঙের গেঞ্জি। চুলের ছাঁটও নানা রকম— পেছনে বাবরি, দুপাশে বাবরি, সামনে সিঙ্গারা ইত্যাদি।

মেয়েদের শাড়িগুলো চড়া রঙের, উঁচু করে পরা। 'আঁচল নেই'। চুলের বাহার দেখবার মতো। কারও উঁচুতে খোপা বাঁধা, কারও দু বেণী গিঁট দিয়ে বাঁধা, কারও চুল ছোট, ঘাড়ের কাছে। প্রায় সবার চুলেই ফুল। কারও কারও দুলুনিতে প্রায় সব বাচ্চাই ঘুমে।

মেয়ে মরদ, বুড়ো বুড়ি, ছোকরা ছুকরি সবাই এক সঙ্গে বাঁশির শব্দ শুনে কাজে চলেছে। কাজের জায়গায় যেতে একটাই গতি।

দলটার সব অংশ জুড়েই ট্রানজিসটার বাজে। গানের তালে কেউ হাততালি, কেউ তুড়ি মারছে।

এতো লোকের একসঙ্গে হাঁটা, গান শোনা, কথাবলা, তুড়ি মারা সব মিলে একটা অর্থহীন কোলাহল উঠছে। এই এতো কিছুর মধ্যেই তারা একটা উৎসবের আমেজ অনুভব করে। 'কাজে যাওয়াটা ত শ্রমিকদের রোজকারই উৎসব।'

নিপুছাপুরের সেই উৎসবের ভেতর বাঘারু আটকা পরে গেছে। যত হাঁটছে, পাশের ঘরবাড়ি ফাঁক ফোকর থেকে শুধু লোক বেরিয়ে আসছে। ততক্ষণ যে ভিড়টা তৈরি হয়েছে সেটা তার হাঁটার সঙ্গেই ছুটছে। বাঘারু দু একবার থামতে চেয়েও পারেনি। ভিড়টা যেদিকে যায় সেদিকে বাঘারুকেও ছুটতে হচ্ছে। বাঘারু বেখাপ্পা উদোম ন্যাংটি পরা শরীর নিয়ে এদের সঙ্গে মিশতে পারে না। সে তিস্তার টানে পুরানো শাল গাছের মতো ছোটে। মেয়েদের একটা দল বাঘারুর পেছনে গিয়ে পড়ে। তারা বাঘারুর এই আকস্মিক আর্বিভাব ও সম্পূর্ণ আলাদা অবয়ব দেখে হাসাহাসি জুড়ে দেয়। ক্রমশ সে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। মাথায় ফুলপরা মেয়ে সারিবদ্ধ হতেই একটা নাচের তাল এসে যায়। ওরা বাঘারুকে ঘিরে নাচতে থাকে।

আরে ও রাখোয়াল, তাড়াতাড়ি এসো

পাহাড় থেকে এক বুনোভালুক নেমে এসে

আমাদের নাচের সারি ভেঙ্গে দিল'

'বাকল খুবলে নেয়া অর্জুন গাছের মত' চেহারা নিয়ে বাঘারু দুই চা বাগানের মধ্যে চলে যাওয়া সবুজ রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে থাকে। বাঘারু চার দিকের কাজের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখে কী ভাবে চা বাগানের মজুরেরা চা পাতা তুলে পিঠের থলিতে রাখছে। বাঘারু তার নিজের আঙ্গুল দিয়ে পাতা তোলা নকল করে। বাঁদিকে একজন পুরুষ বাঁকানো দা দিয়ে চা গাছের ডাল কাটছিল। বাঘারু তাও নকল করতে চায়। সামনে বাবুদের দেখে এখন সে একটা কাজ পেতে চায়। অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চায় তার কাজ। বাবু বলেন করতে পারলে কর। ডানে বাঁয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে বাঘারু সোজা ঝোপটার দিকেই এগিয়ে যায়। সামনে এসে দেখতে পায় তারিকা গাছের বেড়া। তারিকা গাছে বাঘারু ফল খোঁজে। তারিকার পাতা এখানে কারও লাগে না। কিন্তু বাঘারুর দরকার। যেখানে সে যাচ্ছে সেখানে যদি এ পাতা পাওয়া না যায় তাহলে সে ঘর ছাবে কেমন করে। কিন্তু এত বড় বড় পাতা সে কেমন করে কাটবে। সে চারদিকে পাথর খোঁজে পাতা কাটবে বলে।

বাইরে বেরিয়ে যেতে বাঘারু ঝোপের ফাঁক খোঁজে। অনেক সময় শেয়াল গর্ত করে রাখে। তেমন একটা গর্ত পেলে ওটাকে আর একটু বড় করে বাঘারু গলে যাবে সেদিকে। কিন্তু বাঘারু পয়সা খোঁজার মত পাথর বা ফাঁক খুঁজতে বেড়ার ধারের দিকে কোমর বেঁকে যাচ্ছিল। হাতি যেমন করে কাঁটা গাছ পেরোয় সেভাবে এক জায়গায় এক পা উঁচু করে বেড়ার ওপারে দিয়ে ভর দিতেই হুড়মুড় করে পড়ে যায়। মাটি ভেঙ্গে বাঘারু ঢাল বেয়ে নিচে পড়ে যায়। নিচের জমিতে পাথর ছড়ানো। বাঘারুর সারা শরীর পাথরে মাখামাখি হয়ে যায়, যেন 'পাথুরে মূর্তি। বাঘারু সেই পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সে একটা চকচকে কালি পাথর পায়। একটু চটে যাওয়ার জন্য একদিকে ধার আছে। গাছের গোড়ায় মারলে ভাঙবে কি না পরীক্ষা করবার জন্য দু হাতে চাপ দেয়। পাথরটা ভেঙ্গে যায়। আর একটা পাথর দেখে এগিয়ে যায়। দ্যাখে পাথরটা মাটিতে গেড়ে আছে। আবার খোঁজে। এবার একটা গোল জাম্বুয়ার মত পাথর পায়। সেটাকে পাথরের ওপর মারে। খান খান হয়ে যায়। এবার আরও নিচে ছড়ানো ছিটানো পাথরগুলোর দিকে যায় খুঁজতে এভাবে সে আরও নিচে নামে। একটা মানুষের মাথা দেখতে পায়—পাথরের তৈরি, ওটাকে তুলে সে সামনের উঁচু পাথরটার ওপর বসিয়ে দেয়।

নিচে থেকে বাঘারু চা বাগানের বেড়াটার দিকে তাকায়। তারিকা পাতাগুলি ঘরের চালের মত সাজানো। গোটা ছয়েক পাতা জুড়ে দিয়ে লাগালে বাঘারুর কোমর পর্যন্ত পুরো ঢাকবে। তাহলে ছটা পাতা কাটতে হয়। বাঘারু একটা ছোট লোহার পাতের বান্ডিল দেখতে পায়। ধরতে গিয়ে ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়ে।

অবশেষে বাঘারু পাথরটা পেয়ে যায়। তার বা পা টা হঠাৎ একটা খাড়া ধারালো জিনিসের ওপর পড়ে যায়। 'মনে হল তার পায়ের মাংসের ভেতর ধারটা একেবারে বসে গেল।' ব্যাথায় বসে পড়লেও সে পা না দেখে কিসে কাটল তা খোঁজে। কুড়োলের আগার মত, ধারালো একটা পাথর মাটির ভেতর থেকে উঁচু হয়ে আছে। বাঘারু পাথরটাকে টেনে তুলে আন্দাজ করার চেষ্টা করে কিসের মতো। দেখে পাথরটার একটা দিক ধারালো। আকারের দিক থেকে একে 'পরনা মিয়া পাথ্থর' বলে ভেবে নেয় বাঘারু। পাথরটা হাতের মুঠোয় ধরে বাঘারু তারিকা গাছের দিকে ছোটে। টাল বেয়ে ওপরে ওঠে। বাঘারু তারিকা পাতা বাছতে শুরু করে— এমন পাতা যার মাঝখানের খাঁজটা গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত নিটোল।

বেড়ার পাশেই চা বাগান। সেজন্য তারিকা গাছের বেড়া যত্ন করে লাগানো। সেই পাতা বাঘারু কেটে নিতে চায়। পাতা খোঁজে। প্রথমে একটা পায়। কিন্তু সেটা কাটা সহজ নয়। আবার খোঁজে। এবার একটা পাতা পেয়ে যায়। পাথর দিয়ে কোপ মারে। থেললে যায় পাতার গোড়া। রস বেড়িয়ে আসে।

কাটা তারিকা পাতাগুলি ও পাথরটা মাথায় নিয়ে বাঘারু ডেমকা ঝোরায় নামছে। ডেমকা ঝোরা ছোট্ট নদী। পাড় উঁচু। বাঘারু জলে নামে নদী পার হওয়ার জন্য। পাড় এসে গেলে আগে পাতা ও পাথর নামায় তারপর নিজে ওঠে। হাঁটতে শুরু করে। একটা কাঁচা রাস্তা ধরে বাঘারু সামনের এক টাড়িতে এক বড় বাড়ির ভেতর ঢুকতে যায়। সেখানে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। বাঘারুর পায়ের আওয়াজ শুনে শুয়ে শুয়েই 'ঘেউ' শব্দ করে ওঠে। তবুও বাঘারু পাশ কাটিয়ে চলতে থাকলে ঘেউ ঘেউ আওয়াজ তুলে তাড়া করে। বাঘারু ঐ বাড়িটাতে ঢুকতে যাবে এমন সময় বাড়িটা থেকে দশ বারোটা কুকুর এসে বাঘারুকে ঘিরে চিৎকার করতে থাকে। বাঘারু একেই গতিতে হাঁটছে দেখে অবশেষে কুকুরগুলো একে একে ডাক বন্ধ করে।

বাঘারু হায় হায় পাথারের সেই নিধুয়া ডাঙ্গাটায় উঠেছে। ঘাস নেই গাছ নেই, চাষ, বাড়ি কিছু নেই। লাললাল পাথরে ছাওয়া চড়াই দেখে বাঘারু ভাবে এখানে ধারালো পাথরের বোধ হয় অভাব নেই। মাল নদীর ওপারে শুরু হল ফরেস্ট। মাঝে হাইওয়ে, চা-বাগান, রেল লাইন, নদী, নদীর চর আছে। কিন্তু সবই ফরেস্টের মধ্যে। ফরেস্টের ভিতরে ডায়না ফরেস্টে বাঘারুকে পৌঁছতে হবে। এসময় একটা কুকুর তাকে দেখে লেজ নাড়ায়। ভাবটা এমন যে তারও ওপারে যেতে হবে। কিন্তু এ কুকুর এল কোথেকে। তাহলে তারই পেছন পেছন এসেছে। 'কুত্তা আর গাই যা কত্তয়াবেন তাই', সেই যে একডজন কুকুর-বাঘারুকে ঘিরে ধরেছিল।

সেখান থেকেই একটা পিছু নিয়েছিল বাঘারুর। বাঘারু কুকুরটাকে ডাকে 'সিও' 'সিও' কুকুরটা সোজা হয়ে যায়। বাঘারু বলে ' মোক ঢক দেখাছে'। বাঘারু আবার 'সিও' 'সিও' করে ডাকে। 'কুত্তা আর গাই, যা কওয়াছেন তাই', বাঘারু কুকুরটার এত কাছে আসে যে ধরে ফেলতে পারে কিন্তু ধরে না। এভাবে অনেকক্ষণ ধরে কুকুর ও বাঘারু খেলা চলে।

বাঘারু কুকুরটাকে নিয়ে ঝোপ ঝাড়ের গাছপালার দিকে যায়। কুকুরটা নিজের মত করেই চলছিল। নদীটা পেরুতে পাতা ও পাথর বাঁধার প্রয়োজন, এখনও বাঘারু কিছু কুড়িয়ে পায়নি। একটা ঝুরি ওয়ালা পাকুড় গাছ দেখতে পায় বাঘারু। ঝুরি ধরে টান দেয়। কিছু হয় না। এবার ঝুলে পড়ে। ঝুড়ি খসে পড়ার আগে ছিড়ে যায়; বাঘারুসহ ঝুরিটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে। পাথরটা লকেটের মত করে লতায় ঝুলিয়ে বুকে বেঁধে নেয়। এরপর বাকি লতাটা কুকুরের গলায় পেচিয়ে দেয়।

এইবার বাঘারু নিজের বুকে পাথর ঝুলিয়ে সরাসরি নদীর পার চলে আসে। তারপর দেখতে দেখতে হাসে। বাঘারু জলে নামে। জলে পা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় পাতাগুলো হাতের পাশে ভেসে কাঁধে লাগে। একবার ভাবে পাথরটা কোমরে নিলে ভালো হত। কিন্তু সে সময় তো নেই। পেছনে ফেলে আসা জনপদের দিকে না তাকিয়ে সে জলে নামতেই থাকে। জল পার হলে ওপারে অরণ্যভূমি। সেখানে তার নির্বাসন। বাঘারু মাল নদীর জলে গা ভাসিয়ে দেয়। ভাসতে ভাসতেই দেখে তার কুকুরটা তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। পিঠে ভাসমান পাতার বোঝা, গলায় ঝোলানো পাথর অপর সঙ্গী কুকুরকে নিয়ে বাঘারু ওপারে, ফরেস্টে তার নির্বাসনে চলে যায়।

শীতের শেষে ফরেস্টে আগুন লাগিয়ে, মরা গাছ কেটে বা পুড়িয়ে ফরেস্ট পরিষ্কার করা হয়। তখন গরু মোষ চরাবার জন্য বিট অফিস থেকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। আগুন লাগানোর পর ফরেস্ট-ফাঁকা ফাঁকা লাগে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এক সময় কচি-ঘাস গজিয়ে সারাটা ফরেস্ট সবুজ হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে ফরেস্টের বিভিন্ন এলাকা গোরু মোষের বাথানে ভরে উঠতে থাকে।

সারা ফরেস্টে গোরু মোষ রাখার দুটো কারণ। প্রথমটা হল এতে যে ফিসসংগ্রহ হয় তা বিট অফিসার থেকে সাধারণ কর্মচারী সবাই'র ভাগ থাকে। দ্বিতীয় কারণটা হল মালিকদের স্বার্থ। তারা ফরেস্টে গোরু রেখে সারা বছর গোরুর খাবার খরচ, রাখার জায়গা, ঘর ছাউনির খরচ থেকে রেহাই পায়।

ফরেস্টের অনেকখানি খোলা জমিতে চাষও হয়। বাথানদার তার জোতদারের জন্য সে চাষ করে। ফসলের অংশ ফরেস্ট ওয়ালারা পায়। এছাড়া থাকে 'ফরেস্ট ভিলেজার'। তারা ফরেস্টের কাঠকুড়োয়, ফরেস্ট পাহারা দেয়, আর বিনিময়ে চাষ করে। সে ক্ষেত্রেও জোতদারদের সহযোগিতা পায়। এভাবে 'ফরেস্টের জমিতে জোতদারের আধিয়ারি, ডুয়ার্সের গভীর অরণ্যে কৃষিকার্যের বিস্তার' সাধিত হয়।

ব্যাপারটা অর্থনীতির এমন সরল অঙ্ক নয় যে বাথানের ছুঁতোয় বনে ঢুকে নানা জায়গায় জোতদারি করা। বিনি খরচায় দুধ বেচে দৈনিক লাভও এর সঙ্গে যুক্ত। বনের ভেতর পশুখাদ্যের প্রচুর্য্য ও বাথান দিয়ে থাকা মানুষের পেটের ক্ষিদে দুটোই মেটে এই ব্যবস্থায়। কিন্তু জোতদারির ফলে বনের সুসঙ্গতিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আগে হাতে চাষ হতো। ফলে ক্ষেত্রটা ছিল ছোট। ফসল রক্ষা করারও সুবিধে ছিল। কিন্তু এখন হাল বলদে চাষ করায় জমির পরিমান বেড়ে গেছে। ফসল রক্ষার জন্য ওষুধপত্রেরও ব্যবহারও হয়েছে। আবার এতো ফলনের লোভে বনের পশুপাখিরাও এসে ফসল খেয়ে নষ্ট করে যাচ্ছে। ওষুধ ছিটানো ফসল খেয়ে অনেক সময় হরিণ-হাতি গণ্ডাররা বিষক্রিয়ায় মারা যায়। তাদের মাংস খেয়ে শিয়াল-কুকুর-বাঘ মারা পড়ে। আবার কাছে নদী থাকলে মরা পশু নদীর জলে ভাসে। বিষ বহু দূর পর্যন্ত ছড়ায়। রক্ষা—যদি এই সময় প্রবল বৃষ্টি হয়।

জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের অবস্থাটা অতটা খারাপ হয়নি। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'এক জায়গায় যে নানা রকম ঘটনা ঘটছে না তা নয়। যেমন কয়েক বছর আগে ফরেস্টের এক ব্লকে সম্বর হরিণের একটা পাল বিষক্রিয়ায় মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এরকম ফালাকাটাতেও ধানক্ষেতে দুটো গণ্ডার মরে যাওয়ার কথা শোনা যায়। এইসব কীটনাশকের বিষক্রিয়ার ফল।

এইসব বাথানদারির পেছনে একটা ইতিহাসও আছে। বাথানে গরুমোষ রাখার ঘটনা শুরু হয়েছে বড় জোর দশ পনের বছর আগে। ১৯৬২-তে চীন ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। হাইওয়েতে শুধু মিলিটারি ট্রাকের অবিরাম আসা যাওয়া। কয়েক মাস পর যুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু যুদ্ধ থামার পর সারাটা ডুয়ার্স জুড়ে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা বছরের পর বছর ধরে। সরু রাস্তা বড় হয়। কাঠের কালভার্ট ঢালাই হয়, ছোট ছোট নদীর ওপর পাকা ব্রিজ হয়। জলপাইগুড়ির ওপর বড় পাকা ব্রিজ হয়। দার্জিলিং পাহাড়ের তলদেশ থেকে আসাম পর্যন্ত হাইওয়ের দুপাশের জঙ্গলে মিলিটারি ক্যাম্প বসে। শহরের বাইরেও শহর তৈরি হয়। কম জনবসতির এই সব জায়গায় সহজেই সেনা নগর গড়ে উঠতে পারল। এতো যে বাইরের লোক এলে। তার প্রভাব কিন্তু বাইরে তেমন পড়ল

না। কারণ এই সব জায়গার খাদ্য, সব্জির কনট্রাক্টর - সাব কনট্রাক্টররা সবাই বাইরের। শুধু একটা জিনিস স্থানীয় ভাবেই সংগ্রহ করতে হয় - তা হল দুধ। এই দুধের চাহিদাটাই ছড়িয়ে পড়ল ব্যাঙডুবি, মিরিক থেকে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত। টাড়ি বা বস্তি থেকে লোক লাগিয়ে দুধ সংগ্রহ করা হয়। প্রথম প্রথম এরকম স্থানীয় লোকেরাই দুধ জোগান দিত। এখন বড় রাস্তার ধারে ফরেস্টের কাছাকাছি গরু মোষের বড় বাথান তৈরি হয়েছে। এখন এক জায়গা থেকেই লরিতে করে এসে ফানেল ভর্তি করে দুধ নিয়ে যাওয়া হয়। 'ডায়না নদীর ব্রিজের নিচে, ল্যাটারাল রোডের পাশে গয়ানাথের এমনই এক বাথান'। ইউ আকৃতির মাইল পঞ্চাশেক লম্বা ফরেস্টটার ম্যাপে নানা জায়গায় নানা নাম। একটা ল্যাটেরাল রোড চালসা থেকে বেরিয়ে ইউ এর মত দুটো যোগ করেছে।

'বাঘারুর নির্বাসন ভূমি যে ধনুকের মত বাঁকা - এই ল্যাটেরাল রোডটা তার ছিলা।' ছিলা আর ধনুকের মাঝখানের শূণ্যতায় ডায়ানা নদী। এই নদীর কোনো পাড় নেই। তিন দিক জুড়ে পাহাড়। এই নদীর একটা অংশ দিয়ে পাথুরে নদীটা তীব্রবেগে ছুটে চলেছে। এত পাথরে ধাক্কা খায় যে অজস্র বাঁক নিয়ে তাকে ছুটতে হয়। ডায়ানাকে দেখতে হয় লম্বালম্বি তলা থেকে ওপরে। নদীর বুক জুড়ে বালি আর পাথর। এত পাথর যে মনে হয় নদীটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বড় বোল্ডার ছাড়া অজস্র নুড়ি বিছানো সমগ্র নদীর বুক। আপল চাঁদের তিস্তায় এরকম পাথরের ছড়াছড়ি নেই। ওখানে জলের তলায় পাথরে পাথরে ঘর্ষণ লাগে 'তিস্তার কামান'। পশ্চিমে 'গাটিয়া' ও 'জলঢাকা' নিচে গিয়ে ডায়ানায় মিশেছে। তিন তিনটি নদীর জল ডায়নার বুকে এঁটে যায়। 'পশ্চিমে তিস্তা আর পূবে ডায়ানা - এই তো সম্ভাব্য বিস্তৃততম তিস্তা পার।' 'ডায়নার এই চরে গয়ানাথের বাথান'। বালি আর পাথরে ডায়নার বুকটা অসমান বলে জলের ধারা নালা দিয়ে ছড়িয়ে যায়। মাঝখানের চর সবুজ ঘাসে ঢাকা। চরের ভেতর চরতে দিলে গোরুমোষ নিজের পছন্দ মত ঘাস জোগাড় করে খায়।

বাঘারু নির্বাসিত হয়েছে এই ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে। একটি পাথরে বাঘারু শুয়ে আছে পাহাড় ও ব্রিজের মাঝখানের ফাঁকটায়। তিন দিক থেকে তিনটি মোরগ একসাথে ডেকে ওঠে। রাত্রির শেষ ঘোষণা করে, কোন কোন পাখি পাখা নাড়ে, ডাকে, লেজঝাপটায়। ঝি ঝি-র আওয়াজ ডেকে ডেকে নিঃশব্দকে আরও গভীর করে তোলে। সেই পাখিটা গাছের উঁচু ডাল থেকে নেমে অন্য ডালে বসে। বসে বসেই পাখা ঝাপটায়। তারপর আঁধো অন্ধকারে একটা কাতর ক-অ-অক ধ্বনি তোলে। বাঘারুর পাথরটাকে পাক খায়। তারপর ঝুপ করে নদীর বুকে নেমে যায়।

পাখিটা পাখা মেলে ঘুরে ঘুরে বাঘারুকে দেখে। আরও নানা ভঙ্গি করে বাঘারুর দিকে দু'পা এগোয়। শিয়রের কাছটায় আসে। তার লেজটা বাঘারুর কপালে ঠেকায়। উড়ে যাওয়ার মত করে পিঠটা নিচু করে, কিন্তু ওরে না। পাথরের ওপর পাথরের মত শুয়ে থাকা বাঘারু জাগে কিন্তু নড়ে না। এবার পাখিটা উড়ে গিয়ে জলের ওপর খাড়া একটা পাথরের ছুঁচলো মাথায় বসে। বাঘারু পাখিটাকে পুরো দেখতে চায়। না পাখিটার খাওয়ায় মন নেই— সে দোসর খোঁজে, 'দোসর চাহে'। বাঘারু ডেকে ওঠে। পাখিটা ভাবে সঙ্গীর ডাক। তার সারা শরীর সঙ্গীর জন্য ডেকে উঠেছে। তাই বার বার কাঁপন ধরে। রাত পোহাতে না পোহাতেই পাখিটা এখানে চলে আসে সঙ্গীর খোঁজে। বাঘারু পাখিটার এমন ঘোরাফেরা দেখে বলে— 'শালো পাথরের বনত দোসর খুঁজিবার ধইচ ছিস? মানষিক দেখিবার পারিস না?'

তারাহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে বাঘারু ভোখাকে ডাকে। ভোখা বাঘারুর পায়ের কাছে এসে আদর নেয়। কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে। বাঘারু বলে - 'শালো আলসিয়া'। ঘুমাতে বলে।

ভোখা যেহেতু ডাকে নি, ঘুমিয়ে আছে, তাহলে বাথানও ঠিক আছে। বাঘারু পায়ের আঙুল দিয়ে ভোখার পেটের নরম চামড়ায় ছুঁয়ে দেয়। ভোখা চুপ করে থাকে। পাটা জড়িয়ে ধরে। রাত শেষ হয়। বাথান এখনও জাগেনি। একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে বাঘারু সবচেয়ে নিচের পাথরটায় নামে। সামনে নদীর জলের রাশি রাশি ফেনা ও জলের কল্লোল।

এইবার বাঘারু নদীর বুকে বাথানের মাঝখানে নেমে পড়ে। ডায়নাকে অভ্যেস করে নেওয়ার জন্য বাঘারু ফেনাওয়ালা ডায়নার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে মনে মনে বলে ডায়না কেমন নদী যেখানে ডুবতে চাইলে ডোবা যায় না। কিন্তু জল চলেছে দিনরাত। বাঘারু নদীতে নামে। স্রোত পা টলাতে চায়। মাঝনদীতে একটা পাথরের ওপর দাঁড়ায়। বাথানটাকে একটু সাজিয়ে নেবার জন্য, দুধিয়াল গুলোকে বাঘারুর পাথরটার পশ্চিমে নিয়ে যায় বাঘারু। না হলে দুধের গাড়ি এলে হাঙ্গামা বাধে। মোষগুলো বাঘারুর পাথরটাকে তিনদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায়। জায়গাটাতে জঙ্গল নেই শুধুই বালি ও পাথর। মোষগুলো বেশি ছড়াতে পারে না। বাঘারু বুড়িয়ালের কাছে এসে পড়ে। গলাটা একটু চুলকিয়ে দেয়। ভরপোয়াতি মোষটাও চলতে শুরু করেছে। 'র কেনে র' বলে বাঘারু পেছন থেকে একেবারে সামনে চলে যায়। বাঘারু একটার গলা টেনে ধরে আর একটাকে যাওয়ার জায়গা করে দেয়।

ডায়না ব্রিজের উপর দুধের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা ছাড়া বাঘারুর আর কোন কাজ নেই। এক কাজ থেকে

আর এক কাজের বিচ্ছিন্নতা সহজেই গান দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। 'কাজে কাজে অবিচ্ছিন্নিতার সেই গানে এত বিরহ আসে কোথা থেকে?'

'বাথান বাথান করিসেন মইষাল রে - এ - এ

(অ তোর) বাথান করিলেন ঘর

বাথান হইলেন আউলা ঝাউলা রে - এ - এ

(অ তোর) বাথান ভরা গোবর।

অ-মোর মইষাল বন্ধু রে - এ - এ'—

বাঘারু নিজেই মইষাল, মোষ তার জানা, বাথান তার জানা, মইষালনি হওয়া জানা আর কতটুকু। সে নিজে মইষালনিও। এ বিরহ তারই। না বাজানো দোতারার ঝোঁকে ঝোঁকে তাই তার গান —

'বাথানে বারোশ মইষ

ও মোর মইষাল একেলা ঘুরেন,

ঘরত মোর এই যৈবনখান

কাপড়ে বান্ধি রাখেন।

অ - মোর মইষাল বন্ধু রে - এ - এ'।

বাঘারুর গানের উত্তরে ভোখা ডেকে ওঠে। বাঘারু গান থামিয়ে বলে 'শালো'। এরপর কান খাঁড়া করে ট্রাক আসার শব্দ শুনতে পায়। ট্রাকটা এসে থামে। ভোখা ডাকতে ডাকতে ডাক বন্ধ করে। দুধিয়াল মোষগুলোকে বাঘারু ঠিকঠাক করে রেখেছে। ট্রাকের লোক নেমে বাঘারুর হাতে পাইপটা দিয়ে হেসে বলে ' লেও, পেট্রোল চালাও।' বাঘারু বোঝে তাকে কী করতে হবে? সেও শিখে গেছে রসিকতা। সেও হেসে জবাব দেয় - মোর প্যাটরোল খান দ্যান আগত।' লোকটা তাকে সিগারেট দেয়।

ট্রাকের ক্লিনার বাঘারুর ভোখাকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। ভোখার কেরামতি দেখে ক্লিনার এখান থেকে এমন একটা কুকুর নিতে চাইলে ড্রাইভার রসিকতা করে বলে বাঘ নিতে।

একটা সাদা রাবারের পাইপের আগায় হাতের মত চার আঙ্গুলের পাতা। আঙ্গুলের মাথা গোল। বেলুনের মুখের মত দুধের বাটে লাগিয়ে দিয়ে ট্রাকের পাম্প মেশিন চালিয়ে দিয়ে আঙুল গুলো দুধের বাটে চাপ দেয়। দুধ বেড়িয়ে আসে। নল দিয়ে ট্রাকের ড্রামে জমা হয়। বাঘারু প্রথমে তা জানতো না, পরে শিখে গেছে। দোয়ার

কাজে প্রথমে মোষের বাটে দুধ আনতে বাট চুষতে বাছুর লাগে। সে জন্য চারটে বাছুর আনা হয়েছে।

সারা দিনের পর এই দুধ দোয়ানোর সময়টাতেই যেন বাথানটা সচল হয়ে ওঠে। বাছুর আর দুধিয়াল ছাড়া অন্য মোষ গুলোর তো তেমন কাজ থাকে না। বিশেষত বুড়িয়াল, বলদখান, বুড়ি মইষানি তলাতেই থাকে। ছোকরা ছুকরি মোষ গুলো রাস্তার ওপরে ও আশে পাশে ঘোরাঘুরি করে। বাঘারু মোষের পেটের তলায় মাথা ঢুকিয়ে বাট পরীক্ষা করে - বাছুরের চাট পড়েছে কিনা। বাট শক্ত না নরম, শুকনো না ভেজা। বাছুর বাটে মুখ রাখতেই মৈষানির পেট সুড় সুড় করে ওঠে। পেছনের পায়ে শিহরণ ওঠে। কখনো একটা পা ঝারে। বাটে টান পড়তেই দুধিয়াল বড় হালকা বোধ হয়। শরীরটায় আরামবোধ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে দুধ দেয়া হয়ে গেলে বাঘারু ট্রাকটার পাশে এসে দাঁড়ায়। ট্রাকের লোকটা একখানা কাগজ বের করে তাতে বাঘারুর টিপসই নেয়। বাঘারু ভাবে সে যে দুধ নিল এ তার রসিদ। কনট্রাকটর জোতদারকে দেবে। একটা দুধিয়ালির বাটে ঘা হয়েছে বলে বাঘারু তিন দিন তাকে দোয়াতে দেয়নি। সে জন্য সে রসিদে দাগ দিয়েও রেখেছে। দুধ নিয়ে ট্রাকটা সোজা চলে যায়।

ডায়না ফরেস্টের ভেতরে বাঘারু বুড়িয়ালের পিঠের ওপর শুয়ে। শুয়ে শুয়ে দুলতে দুলতে আকাশ দেখছে। এমনই অলস ভাবে কাটছে তার বেলা। বুড়িয়াল একটা ছোট সাইজের হাতির সমান মোষ। ওর আর বাচ্চা হবে না। তার দোহারা চেহারা খাড়া সিং নিয়ে সে বাথানের একজন হয়ে আছে। কেউই বুড়িয়ালের বাচ্চা নয়, কিন্তু বুড়িয়াল সবার মা। বুড়িয়ালের মত কিছু বুড়ো মোষ আছে যে গুলো আগে বাপ মোষ ছিল। এখন ' কোন মইষানির প্যাটত বাচ্চা দিবার পারে না।' এই সব মোষের দাম কম। কিন্তু প্রয়োজনে কিনতে হয়েছে সে গুলো। এগুলি থাকলে বাথানটাকে ফরেস্টের মত পুরনো মনে হয়। ফরেস্টে কোন শাল গাছ পড়ে থাকলে তা সড়াতে এদের কাজে লাগে। ' কারও উমরার বাচ্চা না হয়, উমরায় সগায় বুড়া বাপ।' বাছুর চারটেও হয়তো এদের কারোর নয়। বাট চাটার জন্য আনা হয়েছে। হয়তো এদের মা অন্য বাথানে বা বাড়িতে। সেজন্য 'এই বাছুর গিলান কারও বাথানের বাছুর না হয় , কিন্তু সবগুলা মইষানির এই চারিটাই বাছুর, এই চারিটাই।'

দুধিয়ালরাই বাথানের আসল জিনিস। এরাই তো দুধ দিয়ে বাথানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সবার একসঙ্গে বাচ্চা হলে আবার একসঙ্গে বন্ধ হবে। তাই সবার একসঙ্গে বাচ্চা হওয়াও চলে না। বিপদের সময় তো ওই দুধিয়াল গুলোকেই আগে বাঁচাতে হয়। 'বাথানের সব মোষই দুধিয়াল না, কিন্তু দুধিয়ালরাই বাথানের সব।'

দুধিয়াল ছাড়া আর যাদের কদর বেশি বাথানে তারা হল মাদি মোষ 'ডবকানি'। বাথান চালু রাখার জন্য এরা। এরা কখন গাভীন হবে, কখন বাচ্চা দেবে, কটা গাভিন হবে - এসব হিসেব রাখতে হয়।

এই মোষগুলোকে গাভিন করার জন্য' আছে ' ওয়ালিপাড়া'। বাথানে একটার বেশি রাখা যায় না। তার তিনটি কাজ খাওয়া, ঝিমানো আর বাচ্চা তৈরি করা। বাথানের সাবধানতার একটি বড় কারণ, পাশাপাশি কোন বাথান থাকে তাহলে সেই বাথানে ওয়ালিপাড়া এসে এখানকার দু'একটা মইষানিকে ভাগিয়ে নিতে পারে। এছাড়া 'একোই' (একা) 'খুটা অরনা' (বুনো) থাকে। সেও ভাগিয়ে নিতে পারে। মোষ যদি বাথান ছেড়ে পালাতে চায়, কারও সাধ্যি নেই তাকে আটকাবার। সে জন্য লক্ষ রাখতে হয় কোন মইষানির শরীর গরম হলে তা যেন নষ্ট না হয়। গরমের সময় কোন মইষানি যদি 'অরনা'র (বুনো মোষের) সঙ্গে ভাব করে তবে তার 'দোমাচা' বাচ্চা হয়। তার গায়ের জোর বেশি— মার বুকে দুধও বেশি। সেজন্য এরকম চাওয়া হয় মইষানি বাথানে থাকুক কিন্তু বাচ্চা হোক 'দোমাচা'। ' এই তো বাথান - 'কায়ও কারো না। সগায় সগার। ..... এই ওয়ালিপাড়া, এই কুমারীপাড়া, এই অরনা, এই দোমাচা সব গয়ানাথের।'

' যায়লার জন্ম হইছে, যায়লার জন্ম হয় নাই, যায়লা জন্মিবে, যায়লা মরিবে' সব গয়ানাথের।'

বাঘারু ভাবে ডায়না থেকে তিস্তা পর্যন্ত সব গয়ানাথের। বুড়িয়ালের পিঠে শুয়ে সে আকাশ দেখে, বন দেখে, শুকনো নদী দেখে (ছড়া), দেখে পোরালিবাড়ি (পোরাবন)। তাকে এই নির্বাসনে পাঠানোর পর তার প্রথম প্রতিক্রিয়া - সে বলে 'গয়ানাথ মোক এইঠে পাঠাছে। বাথান করিবার। মুই আধি চাহ নাই। মোক বাথান দিছে, এইঠে মোক কায়ও খুঁজি পাবেন না। মুইও কাক পামনা। মুই এইঠে আগত আসি নাই রো। মুই এইঠেকার বন চিনি নাই রো। গয়ানাথ মোক এইঠে পাঠাছে। মোর অচেনা জায়গাটাত পাঠাছে। মোক উদাস করিবার তানে পাঠাছে—'

বাঘারু বুড়িয়ালির চওড়া পিঠে শুয়ে কোশলবাড়ি (হরতকি গাছের জঙ্গল) দেখে। সে এই জায়গাটার নাম দিয়েছে কোশলবাড়ি। ' হে গয়ানাথ মোক এইটে পাঠাছে অচিনা দেশত। আর মুই এখানকার বাড়ি বানি নিছু। বাঘারু বাড়ি।' বাঘারু নিজের মনেই খিকখিক করে হাসে। সে গয়ানাথকে বলবে যে বাঘারুর ঠিকানা 'নদীর নাম ডাইনং, থানার নাম নাগরাকাটা, গ্রামের নাম বাঘারুবাড়ি। বুড়িয়াল চালতা বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বাঘারু বুড়িয়ালের পিঠের ওপর উঠে দাঁড়ায়। তিন-চারটা পাকা চালতা পেরে ফেলে। একটা চালতা মোষের শিংএ ফুটো করে মুখে পুড়ে রস খায়। পাকা চালতার গন্ধে চারদিক ভরে যায়। তার মনে পড়ে চালতা

বনে হাতি আসে। সে একবার চোখ তুলে এদিক ওদিক তাকায়।

মোষের পিঠে বসে হঠাৎ বাঘারুর গলায় ওই পাখিটার মত অ-অ-অ-অ-ক, ক-অ-অ-ক ডাক আসে। শেষের 'ক'টা শোনাই যায় না এমন খাদে নেমে যায়। সে দেখতে পায় সেই ওয়ালিপাড়া (ষাঁড়টা), ভর পোয়াতি মইষানিটাকে এমন ঢুসাছে যে মইষানিটা পড়ে যাবে এক্ষুণি। অমনি বাঘারু ভোখাকে ডাকতে থাকে। ভোখা ছুটে এসে ওয়ালিপাড়া ও মইষানির মাঝখানে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে। তার মধ্যেও পাড়াটা আবার ঢুস দেয়। এবার ভোখাকে তাড়ানোর অবকাশে মইষানি একটু পেছিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। বাঘারু ইতিমধ্যে ওদের কাছাকাছি এসে পড়ে।

বাঘারুর চিৎকার, ভোলার ছোটাছুটি আর বাঘারুকে নিয়ে বুড়িয়ালের ছোটায় অন্যান্য মোষ গুলো নাড়া পড়ে। ওড়াও আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-ক করে ডাক শুরু করে। ফলে বাঘারু পৌঁছানোর আগেই জায়গাটাতে একটা হৈ-হল্লা শুরু হয়ে যায়। বুড়িয়াল বুঝে যায় তাকে কী করতে হবে। সে তীব্রগতিতে বাঘারুকে সওয়ার করে পাড়া ও মইষানির মাঝখানে ঢুকে যায়। সাহস পেয়ে ভেখাও ঢুকে আক্রমণ করে। বাঘারু হেট হেট করতে থাকে। ফলে ওয়ালিপাড়া মইষানিকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

বাঘারু এবার মইষানির কাছে যায়। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেখে কোথাও জখম হয়েছে কিনা। চোয়াল আর গলার সংযোগ স্থলে নরম মাংসের জায়গাটা দেখে নেয়। বাঘারুর হাতের ছোঁয়া পেয়ে মইষানির আনন্দ হয়। সে মাথাটা উঁচু করে। পাশের মোষ গুলোও বুঝে যায় সব মিটে গেছে। ওরা কেউ বসে পড়ে, কেউ চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ বা মাটির গন্ধ সোঁকে। বাঁ দিকের বন থেকে কাঠকাটার আওয়াজ বাঘারু শুনতে পায়। দাঁড়িয়ে দেখে শুধু ডাল পালা ছাঁটা হচ্ছে না, গাছ টেনেও নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে কোথাও ট্রাক গাড়ি আছে। বাঘারু দেখে তাকে কিছু লোক দেখছে। ওরা পেছন থেকে ' হে-এ-ই শুনো , এই শুনো' বলে ডাকে। প্রথমে বাঘারু দাঁড়ায় না। বরং দৌড়ায়। লোকটাও দৌড়ায়। এবার বাঘারু থামে। দেখে খাকি প্যান্ট পড়া ফরেস্ট গার্ড। লোকটা থেমে হাত দিয়ে বাঘারুকে ডাকে। বাঘারু কাছে এলে সে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করে। বাঘারু বাথানে থাকে বলে জানায়। তখন জিজ্ঞাসা করে এখানে কেন সে এসেছে। গাছ কাটার শব্দ শুনে—বাঘারু উত্তর দেয়। গার্ড বলে সে যেন তাড়াতাড়ি চলে যায় কারণ - গ্রহণ লাগবে। বাঘারু চলে যাওয়ার উদ্রেক করে। অমনি গাছ কাটার কনট্রাকটর জানতে চায় বাঘারু তার দু'চারটে মোষ দিয়ে ট্রাকের কাছে কটা গাছ টেনে দেবে কিনা। বাঘারু প্রথমে রাজি হয় না কারণ গ্রহণ লাগবে। তাকে বাথান নিয়ে নেমে

যেতে হবে ডায়নার চরে। ওরা পয়সা দেবে—বলে। আবার বাথান নিয়ে রাত পাহারা দিলে আরও বেশি পয়সা দেবে। বাঘারু শুধু গাছ টেনে দিতে রাজি হয়। কারণ তার মনে পড়ে সকালে দুধ দোয়ার গাড়ি আসবে। সে মোষ আনতে বনের আড়ালে চলে যায়।

একটা মোষের পিঠে চড়ে, আর তিনটা পেছনে করে বাঘারু মোট চারটা মোষ নিয়ে আসে। দুটো দুটো করে একটা একটা করে দড়িতে বেঁধে মোষ গুলো দু'বারে চারটি গাছ নালিটার পারে নিয়ে যায়। সমস্ত ঘটনাটা যেন বাঘারুর নেতৃত্বে ঘটে যায়।

বুড়িয়ালের পিঠে চড়ে বাঘারু গোটা বাথান নিয়ে ফরেস্টের উতরাই থেকে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে নামছে। মাঝে মাঝে মুখে টর-র-র-অ আওয়াজ করছে। বুড়িয়ালও বাথানটাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য আওয়াজ করছে আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-ক, আঁ-আঁ-আঁ -ক। ভোখা বুড়িয়ালের পাশে ছুটে চলেছে। বাছুর চারটে পেছিয়ে পড়েছে। প্রায় সব সময়ই আছে বুড়িয়াল আর বাঘারু ওদের সামনে। মোষগুলোর গতিটা হঠাৎ একটু শ্লথ হয়। বাঘারু নেমে গিয়ে দেখে সামনে একটা গর্ত। গর্তকে পাশ কাটিয়ে যেতে একটু সময় লাগছে। বাঘারু ওদের একটু সাহায্য করে। সবাই নেমে যায়, থাকে শুধু বাঘারু ও বুড়িয়াল। গর্তটা পাশ কাটানো বুড়িয়ালের অসম্ভব। এমন চওড়া পেট অগ্যতা বাঘারু কয়েকটা গাছের ডাল যোগাড় করে গর্তে সাঁকোর মত করে ধরে। বুড়িয়াল পার হয়। বাঘারু আবার তার পিঠে চরে বসে। এবার দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। অন্য মোষগুলো সবাই চলে গেছে। একটু অস্পষ্ট—বাঘারু মোষের ডাক শোনে— কিন্তু ভোখার কোন শব্দ নেই। শুধু লেজ নাড়ছে। কিছু ঘটেছে কি? হঠাৎ বাঘারুর সন্দেহ জাগে 'পোয়াতিয়াটার বাচ্চা হওয়া ধরিল নাকি? এ্যালায়?' বাঁকটা ঘুরেই বাঘারু দেখে সত্যি সত্যি ভর পোয়াতি মইষানি পেছনের দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু নামলেই সেই নদীর বুক। বাঘারু চেষ্টা করে মইষানিকে নদীর বুকে নামানো যায় কিনা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বাঘারু দেখে মইষানির বাচ্চার মাথা দেখা যাচ্ছে। বাঘারু বাচ্চা বেড়িয়ে আসার পথটাকে দু'হাতে টেনে আরও ফাঁক করে দেয়। এবার মাথাটা অনেকটাই দেখা যায়। দু'হাতে ধরে, দু'হাত বেয়ে রক্ত, শ্লেষ্মা জল পড়ছে। বাচ্চা হওয়ার দৃশ্য দেখে বাথানের সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছে। মইষানির ফাঁকটা আরও বড় করে বাছুরের মাথা আরও বেড়িয়ে এসেছে। এবার বাঘারু হাত ছেড়ে দিলেও মাথাটা ভেতরে ঢুকবে না। বাঘারু তার হাঁটু দিয়ে ছোট করে একটা গুতো দেয় তলপেটে। এরপর বাঘারু ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে মাথাকে হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তার নাগালে আসে। মাথা চেপে ধরে গায়ের জোরে বাছুরটাকে

টানে। এরপর আরও অনেক কসরৎ করে মইষানির পেট থেকে বের করে আনে বাছুরটাকে। মাটিতে ঘাস পাতার ওপর শুইয়ে দেয়। 'মইষানির পেটের ভেতর থেকে ঝিল্লির থলি, জল, রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে।'

বাঘারু আর দেরি করে না। মইষানির নাড়ি ছিঁড়ে বাছুরটাকে আলাদা করে দেয়। বাঘারুর জিভ টাকরানিতে সামনের মোষ গুলো চলতে শুরু করে। বাঘারু মোষগুলোকে হেট হেট করে তাড়াতে থাকে। বাথানে গ্রহণ লেগে গেছে বলে বাঘারু মুখে আওয়াজ দেয়।

বাঘারু ঘাসপাতায় বাছুরের শরীরে ক্লেদ মুছে দিয়ে কোলে নেয়। গর্ভের ভেতর যেমন ছিল তেমন ভাবে। বাঘারুর কোলে থাকে বাছুরটি। বাঘারুর কোল যেন তার দ্বিতীয় মাতৃগর্ভ। বাঘারু বাছুরটাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে থাকে। বিয়ানি মইষানি পাশে পাশে বাছুরের গা চাটতে চাটতে এক সঙ্গে যায়। চিই রো চিইরো বলে একঝাঁক পাখি বনের ভেতর থেকে উঠে এসে নতুন বাছুর ও বুড়িয়ালকে ছুঁয়ে কোথাও উধাও হয়ে যায়।

গ্রহণ লেগেছে বলে বাঘারু উচ্চস্বরে হাঁকতে থাকে। ভোখা ছুটে এসে বাঘারুর নোয়ানো পিঠে পা তুলে দেয়। তারপর বুড়িয়ালের পিঠে ওঠে। বাঘারু যেন তার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেছে। সে টর -র -র -র অ - অ, টর - র- র-র-র-অ-অ অ- করতে থাকে। বাঘারু চারদিকে তাকায় কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার। গ্রহণ লেগে গেছে।

বাঘারুর কোলে রক্তে শ্লেষায় জড়ানো নতুন বাছুর। পাশে বুড়িয়াল, নতুন বিয়ানি মইষানি সবাই মিলে ওরা ছুটতে ছুটতে নদীর পাথুরে বুকে ঢুকে যায়। গ্রহণ লেগেছে, সূর্যের আলো ধীরে ধীরে কমে আসে। জঙ্গল-পাথর-পাহাড়ের প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। মোষগুলি বাথানের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে। নরবরে বাছুরটা দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আবছায়ায় গাছ গুলো হঠাৎ লম্বা হতে থাকে। পূর্ণ গ্রহণের সময় মোষ গুলো আ-আ-আ করে ডাকে। ভোখা লেজ-মাথা নামিয়ে কান্নার সুর তোলে। বিয়ানি মইষানি তার বাছুরের গা চেটেই চলে। জঙ্গলে একপাল হরিণ ছুটে পালায়। শেয়াল-মোড়গ একসঙ্গে ডেকে ওঠে। বাদুড় উড়ে যায়।

সারাটা শরীর দিয়ে পাখিটা ডেকে চলে ক-অ-অ্ম-অক, ক-অ-অ-অ-ক। প্রথমবার, দ্বিতীয়বার বাঘারু খেয়াল করে না। তৃতীয়বারে শুনতে পায়। সেও চাপা স্বরে পাখিটার ডাকে সারা দেয়। পাখিটা আর ডাকে না। বাঘারু আবার ডাকে। কিছুক্ষণ পরে পাখিটা একটু চাপাস্বরে ডেকে ওঠে। শুধু যেন তার দোসর জানতে পারে সে অন্ধকারে কোথায় আছে। বাঘারু আবার ডেকে ওঠে। আবার। ডাকতে ডাকতে ডায়নার দিকে এগিয়ে যায়।

ফরেস্টের অন্ধকারে যে বাঁকে নদী সেঁধিয়ে গেছে—বাঘারু সেখানে এসে দাঁড়ায়। জলের ওপর দিয়ে পাখিটার গভীর কুহর ভেসে আসে। বাঘারু দুই হাত ঠোঁটের কাছে এনে পাখিটার মতনই ডাকে।

'পাখি আর বাঘারুর ডাকাডাকি ঘিরে গ্রহণের অকাল আঁধার বনজঙ্গলের আওয়াজে ভরে ভরে ওঠে। এখনই গ্রহণ শেষ হয়ে আবার সূর্যোদয় ঘটবে।'

সূর্যে গ্রহণ লেগে যাওয়ায় বাঘারুর আজ বিকেল ও সন্ধ্যেটা দুবার এসেছে। আর তার বাথানে এসেছে নতুন এক অতিথি মইষানির বাচ্চা। বাঘারুর প্রতিটা দিনই এক। সে তো আর দিন কাটায় না— জীবন কাটায়। বাঘারুর প্রতিটি দিনই এক একটি পুরো জীবন। ভাষা মানে তো অর্থ, অলঙ্কার। বাঘারুর ঐ একখণ্ড নেংটি ছাড়া সারা শরীর নগ্ন, ঢাকা নেই। বাঘারুর মত আর এক নগ্ন ভাষা কোথায় মিলবে। 'ভাষা মানে তো নাম'। বাঘারুর তো কোন নাম নেই।' সে ত শুধু বদলে যায় কুড়ানিয়া, বাঘারু, পাথরিয়া, মইষাল তার এই হয়ে ওঠার শেষ নেই।'

চর পর্ব : নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্তবাহিনীর সীমান্ত ত্যাগ

নরেশ তার টর্চটা নিবিয়ে বন্দুকের মত ভঙ্গি করে তিস্তা ব্রিজের দিকে দেখায়। তার প্রশ্ন রাত দশটা বাজা সত্বেও তিস্তা ব্রিজের আলো নেভানো হচ্ছে না কেন। ওর সঙ্গীরা তখন সবাই তিস্তা ব্রিজের দিকে মুখ ফেরায়। ওরা দেখে তিস্তা ব্রিজের আলো নেভেনি। তারা গুটি কয়েক মানুষ, কিন্তু আবছা অন্ধকারে মনে হচ্ছে অনেক। ওদের দাঁড়িয়ে থাকা মনে হচ্ছিল কোন মাটি বা চরে নয়, মোহনায় পথ হারানো নৌকোয়। ওদের দাঁড়িয়ে থাকা চরে তিস্তার প্রচণ্ড স্রোত এসে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে। বাতাসে দারুণ শব্দ। এই তিন দিনে ওরা কিছু অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ট্রাকের আওয়াজ, তিস্তা ব্রিজের আলো দেখে বিপদ কতটা ওরা কিছুটা বুঝেতে পারবে।

চোখে ছানি পড়া জগদীশকে নিয়ে কিছুক্ষণ ঠাট্টা তামাশা চলে। নরেশ বার কয়েক টর্চ জ্বালিয়ে নিবিয়ে তিস্তার ব্রিজ দেখে। এ'কদিন টর্চটাই তো ওকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। নিতাই চিৎকার করে কাউকে দেউনিয়ার রেডিওটা আনতে বলে। জগদীশ নিষেধ করে — কারণ এই ঝড় জলে রেডিও নষ্ট হয়ে যাবে। রেডিওটা আনা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক চলে। এরপর জগদীশ নকুকে বলে বন্যার খবরটা শুনে আসতে। নকু চলে যায়। জগদীশ নিজে একটা বিড়ি ধরায়। আর একটা এগিয়ে ধরে বলে কে নেবে। রাবণ রসিকতা করে বলে, ' বাপের তালই বসি আছে, দেখিবার পাস না?' দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে আঁজলা ভরা আগুনে ওরা দু'জনেই বিড়ি ধরায়।

বিড়ি খেতে ওদের পাশে দুজন এসে বসে বৃষ্টির ছাঁট পিঠে নিয়ে। নকু জগদীশের বাড়িতে রেডিওর খবর শুনতে যাবে। ওদের অপেক্ষা করতেই হবে। শিলিগুড়ি সেন্টার থেকে কিছু না বলায় ওদের মনে একটা আশ্বাস জোটে, বোধহয় কোন নতুন বিপদ হবে না। কিন্তু পুরনো বিপদ আর একটু এগিয়ে এলেই তো সর্বনাশ। দোমহনির গ্রাম সভার সঙ্গে যুক্ত এই চরের একজন সদস্য নিতাই। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় পার্টিতে এই বন্যা সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা। নিতাই খানিকটা উষ্মা প্রকাশ করেই বলে যে পনের দিন থেকে জল বৃষ্টি হচ্ছে, পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে, জল বাড়ছে — এতে পার্টির কি করার আছে। গজেন রসিকতা করে বলে যে এতোবড় একটা পার্টি, নিতাইকে না জিজ্ঞেস করে বন্যা আসবে এতো সাহস বন্যার। বন্যাকে ট্রান্সফার করে দিতে বলে। নিতাই একটা জুতসই জবাব খুঁজে বলে যে তাদের চর যদি ভেসেও যায় যেন মিলিটারি না পাঠায়, রিলিফ না পাঠায়। জগদীশ তাকে না রাগার পরামর্শ দেয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে ওদের ঠাট্টামস্করা।

এই বৃষ্টি বাতাস আর বন্যার মধ্যে এমন একটা আলো আকাশ থেকে ছিটকাচ্ছে - ' যাতে কিছুই স্পষ্ট হয় না, অথচ সব কিছুরই বাইরে একটা রেখা দেখা যায়।' যারা দঙ্গল হয়ে বসেছিল তারা এখন এই আলোয় অনেকটা স্পষ্ট। সূর্যের আলো দিনের বেলাতেও মাঝে মাঝে কমে গিয়ে অকাল সন্ধ্যা ঘনিয়ে আনছে। ওপরের পাহাড়ের বর্ষা মাটির তলায় ঢুকে - নদীকে দ্বিগুণ, তিন গুণ করে তুলেছে। জল যাতে সোজা পারে গিয়ে ধাক্কা মারতে না পারে সে জন্য 'বাঁধ থেকে 'লম্বা লম্বা স্পার' নদীর মধ্যে আনা হয়েছে। পাহাড়ে কত নদী, ঝোরা মিলে তৈরি হয়েছে তিস্তা। নানা জায়গায় এত স্রোত তিস্তা দিয়ে বয়ে যায় বলেই - তিস্তা নিজেকে এত বিস্তারে ছড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমে 'বোদাগঞ্জ-রঙধামালি-জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি, আর পুবে 'মাল-লাটাগুড়ি-দোমহনি-ময়নাগুড়ি-বার্নেশঘাট-বাকালি-মেখলিগঞ্জ' এই দুই পারের মাঝখানে তিস্তা মাইল মাইল ছড়ানো ছিটানো।' 'তিস্তা কোন নদী নয় এটা একটা ভূখণ্ড।' এই ভূখণ্ডের কোন অংশ জুড়ে কচি সবুজ ঘাস, আর কোন অংশ জুড়ে মাইল মাইল বনানী। কোনো বর্ষায় ডান আবার কোনো বর্ষায় বাঁ পাড় ভাঙ্গে। এমনকি একই বর্ষায় মাঝখানে খাতেরও বদল হয়। শরতে আবার তিস্তার নতুন চেহারা। যেখানে জল ছিল না, সেখানে জলের স্রোত। যেখানে ছিল সবুজ বা পাথুরে টিলা। কোথাও মাটির চরে কলাগাছে ' হালে বলদে' জনবসতি গড়ে ওঠে। তিস্তার বড় খাত বদলে যাওয়ায় নৌকাগুলো নদী বদল করে। 'তিস্তা তো একটা নদী নয় — একটা নদীর ভেতরেই অনেক নদী।' নদী বা সোঁতা গুলো যেন ঘুমন্ত হাতি। ঘুম থেকে জেগে - চারদিক দাপিয়ে

ছুটছে। কখনোও দল ছুট হয়ে অর্থাৎ মূল স্রোত থেকে ছিন্ন হয়ে প্রত্যার্পনের সব পথ মুছে দেয়, অথবা নদীর মূলধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে ছুটে চলেছে তার স্বাভাবিক বিস্তার নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে - দুদিকে ফেলে ফেলে যাচ্ছে তার মোষের বাথান নানা কিছু।

উত্তরে ময়নাগুড়ির চর থেকে দক্ষিণে কাশিয়াবাড়ির চর পর্যন্ত যে ভূখণ্ড তাতে যে জনবসতি তারা রাজবংশী নয়, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 'ভাটিয়া'। রাজবংশীরা নদীকে নদীর জায়গা ছেড়ে দিয়ে বনান্তরালে থেকে নদীকে ব্যবহার করত। সেই অর্থে নদীর সঙ্গে রাজবংশীদের কোন সম্পর্ক নেই। ' কারণ সম্পর্ক বলতেই তো দুইটি আলাদা জিনিসের ভেতরকার এক সংযোগ বোঝায়।' রাজবংশী সমাজ ও তিস্তা দুটো আলাদা জিনিসই নয়, তাই সংযোগের দরকারও ছিল না। সংযোগের দরকার হল যখন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ থেকে বেশি সংখ্যায় ভাটিয়ারা আসতে থাকলো। ভাটিয়াদের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক হচ্ছে আক্রমণের, সংঘাতের, জয় পরাজয়ের, দখল বেদখলের।' তারা এ নদীকে চেনে না। ' তারা যে নদীকে চেনে তার তল দেখা যায় না।' তার চৌহদ্দি চিহ্নিত, 'মানুষের বাঁচা মরার লড়াই।' আর এ নদীর কোন চৌহদ্দি নেই। তবু এরই মধ্যে তারা জীবনের অনুষঙ্গ খুঁজে পায়। জলে পায় সেই জলের গন্ধ।

পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্ররা চর চেনে। নিজের পছন্দ মত চর বেছে নিয়ে তারা বসতি গড়তে লাগল। তাদের ঘর হল রাজবংশীদের থেকে আলাদা আদলের। তিস্তার ভয় থাকলেও আশ্বাস ছিল - কোথাও না কোথাও চর জাগবেই। ১৯৫০ সালের বন্যায় তিস্তার চর টর কোথায় উড়ে চলে গেল। ফরেস্টের পর ফরেস্ট ধ্বংস হয়ে গেল। নমঃশূদ্ররা বুঝল তিস্তার বন্যার স্বরূপ। বৈঠা দিয়ে জলের বেগ সামলাতে পারলেও, নদীর তলার পাথরে নৌকার তলা ফেসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। ১৯৫০ এর বন্যায় ' সেই প্রথম জলপাইগুড়ি শহরে বন্যার জল ঢুকলো।' বন্যা নেমে গেলে নমঃশূদ্ররা আবার ওই চরেই ঘর তুলতে শুরু করল। সব দিক থেকে খোলা ও স্বাধীন তিস্তা এই ৫০-র বন্যার পড়ে বাঁধের বন্ধনে আটকা পড়তে শুরু করল। শহর ঘিরে বাঁধ হলো, ওদলাবাড়ি থেকে কাশিয়াবাড়ি পর্যন্ত তিস্তার দু'পাড়ে বাঁধ বেড়ে যেতে লাগলো। তিস্তার ওপর দুটো ব্রিজ হল। একটা রেলব্রিজ ও আর একটা রোডব্রিজ। ১৯৬৮ সালের বন্যা তিস্তার ব্রিজের পাশ ভেঙে শহর প্লাবিত করেছে। এই বন্যা প্রমাণ করল ব্রিজ বাঁধ বন্যা প্রতিরোধে নিশ্চিত নয়। তবে এসবে বন্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। এর মধ্যে তিস্তা ব্যারেজের কাজ প্রথম দফায় শেষ হয়েছে। আচমকা পাহাড় থেকে তিস্তার জল যাতে প্লাবন না ঘটাতে পারে সেই জন্যই এই ব্যারেজ। ৫০,৫২,৫৪ সালের বন্যার সময় চরের কৃষকরা

চরে ততটা কায়েম ছিল না। কিন্তু ৬৮-র বন্যায় তাদের কায়েমি বসবাস জলে ভেসে গিয়েছিল। তবে আবার চরে ফিরে এসে কৃষি করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। ৬৮-র বন্যা তিস্তার ভূখণ্ডকে যেভাবে পাল্টে দিয়েছে চরের মানুষেরাও নিজেকে সেভাবে বদলে নিয়েছে। এই বন্যাই যেন চর ও চরুয়াদের প্রধান ভূখণ্ডের সঙ্গে স্থায়ী ভাবে সংযুক্ত করল। নম:শূদ্র চাষিরা উত্তরবঙ্গের এই পাহাড়ি নদীকে একরকম করে জিতে নিল। 'ভূগোলের ওপর ইতিহাসের জয় ঘটল।'

রাজবংশীরা কোন দিন চরে বসতি স্থাপন করেনি। নম:শূদ্ররাই চরের মূল বাসিন্দা। কারণ ওরাই তো চরকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। রাজবংশীরা বসবাসের দাবিও তোলেনি। তারা তো কায়েমি জমিতে বসবাস করে। তবে নম:শূদ্ররা যেখানে কায়েমি জমিতে বসবাসের জন্য গেছে সেখানে কখনো কিছু কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। যেমন বার-চৌদ্দ বছর আগে ক্রান্তি থানার ঝাড়মাঝগ্রাম এলাকায়। চরে এধরনের হাঙ্গামা কখনোই হয়নি। বরং চর বাস যোগ্য হলে কোথাও রাজবংশীরা বাড়ি ঘর বানিয়েছে। জন সংগঠনের দিক থেকে এই সমস্ত চরে এখন রাজবংশী ও নম:শূদ্রদের মিলিত বসবাস। সে জন্য ভাষার মধ্যেও মিশ্রণ দেখা দিয়েছে। জগদীশ বারুই ও রাজবংশী রাবনের খিস্তির ভাষা এক। বাতাসে ওরা জগদীশ ও রাবন কেউ-ই গন্তব্যস্থলে যেতে পারেনি। এরা পিঠে ঘাড়ে বৃষ্টির শানিত ঝাপটা নিয়ে ব্যাপারটা দেখছে। কিন্তু নকু বাতাসের অনুকূলতায় এগিয়ে আসতে পেরেছে। জগদীশ তাকে দেখতে পায়নি। তবে মনে হয়েছে কুয়াশা ঠেলে কেউ একটা আসছে। জগদীশ জোর গলায় নকুকে ডাকে। নকু দাঁড়িয়ে পড়তেই জগদীশ চিৎকার করে রেডিওতে কী খবর বলল জানতে চায়। রাতে আবার নিউজ হবে কিনা জানতে চায় রাবন। নকু উত্তরে 'না' বলে। বরং সাইরেন বাজানো হয়েছে জানায়। নিতাই নরেশকে জিজ্ঞেস করে এখন বাজে কয়টা। টর্চের আলোয় নরেশ দেখে এগারোটা বাইশ।

তিস্তা বাজার থেকে এখানে ফ্লাড আসতে যদি ছয় ঘন্টা সময় লাগে তবে পৌঁনে একটার পর কটা নাগাদ বন্যা আসবে - এনিয়ে নিতাই, জগদীশ, গজেনের মধ্যে নানা কথাবার্তা চলে। অবশেষে ভোর চারটায় ফ্লাড আসবে বলে হিসাব ধরা হয়।

নরেশের কথাটা যেন কাউকে শোনানোর জন্য বলা হয়। কিন্তু সবাই শুনতে পায় যেন সাবধানবাণীর মত। সবাই ভাবতে থাকে শেষ রাতে জল এসে পড়েছে আর যে যার মত আত্মরক্ষার জন্য ছোটাছুটি করছে। আগে তো একা একা বাঁচা, পড়ে হিসেব হবে কে গেল, আর কে রইল। এখানকার প্রায় সবারই ৬৮-র বন্যার অভিজ্ঞতা আছে। নিতাই - জগদীশ পনের ষোলো বছর আগে তাদের বয়স আর কত। চার ছ'ঘন্টা পর বন্যা

আসার মুহূর্তে ওরা আর চরের মানুষ থাকে না। ওদের কাছে চর আর মাটি সমান। এই চরটার অবস্থান তিস্তার রোড ব্রিজ আর রেল ব্রিজের উত্তরে, রায়পুর চা বাগানের পাশে। ব্রিজের আলো, কনক্রিট সেতু, জলপাইগুড়ি শহর পাকা বাড়ি ওদের যেন বহু ভরসা বড়নিরাপত্তা।

মঙ্গলবার রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বুধবার থেকে জল বাড়ছে। বাতাস নদীর ভেতর থেকে জলকনা বয়ে নিয়ে এনে সারা আকাশে জলকুয়াশা সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে যেন চরটা নদীর ভেতরে ঢুকে গেছে। তবু ওরা ওতটা বিপদ ভাবে নি। ভাবল শুক্রবারের রেডিওর খবর শোনার পর। ৬৮-র বন্যা রাতে আচমকা এসেছিল। সেই আচমকার মধ্যে বাঁচার একটা তড়িৎ গতি ছিল। কিন্তু এবার এই চার ঘন্টার মধ্যে বন্যা আসবে জেনেও বাঁচার কোন উপায় বের করা যাচ্ছে না। ৬৮-র বন্যার আগাম খবর কারো জানা ছিল না। এবার আগাম জেনেও যেন সবাই নিরুপায়। এবার বন্যা আসার সিগনাল দেওয়া হয়েছে, সাইরেন বেজেছে, তিস্তা ব্রিজে আলো জ্বলছে, ব্রিজের আশে পাশে ভাঙন রোধের জন্য সার দিয়ে হয়তো বোল্ডারের ট্রাকও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাঁচার কোন নিরাপত্তা যেন চরের মানুষ অনুভব করতে পারছে না। ৬৮-র বন্যায় লোকেরা ভেবেছিল আগে জানলে বাঁচতো। এরা জেনেও বাঁচার উপায় বের করতে পারছে না। এ বন্যার খবর কোথা থেকে দেয়, রেলের ব্রিজে গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে কিনা এ নিয়ে আবার কথা শুরু হয় - নরেশ, জগদীশ ও নিতাইয়ের মধ্যে। তখন হঠাৎ গজেন বলে ওঠে যে বেলা আড়াইটা নাগাদ একখানা রেলগাড়ি রেলব্রিজ দিয়ে পাড় হয়েছে। সবাই হ্যাঁ, হ্যাঁ করে ওঠে মনে পড়ে যায়। সুতরাং আবার জল আসার হিসেব শুরু হয়। সিদ্ধান্ত হয় বন্যা আসবে সেই সকাল বেলা।

ওরা সবাই মিলে যখন ভেলা বানানো, মশাল তৈরি ইত্যাদির কথা বলাবলি করছিল তখন যেন বাতাসটা আড়ালে আবডালে ছিল। কথা শেষ হতেই তিস্তা থেকে আসা জলকুয়াশা আর বাতাস এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের এই শরীর গুলোই যেন জল বাতাসের একমাত্র অবলম্বন। মাইল খানেক লম্বা ও মাইল চারেক চওড়া এই চরটার দক্ষিণ দিকটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। ওদের হাঁটতে হচ্ছে পুবদিক থেকে 'বাতাসের বাঁধা সঙ্গে নিয়ে'। তাছাড়া জায়গাটাও একটু চড়াই। দূর থেকে এদের দেখলে মনে হত কতগুলো বালির স্তম্ভ বাতাসের টানে হেঁটে চলেছে। একদিনে এখানকার ভূগোলে যেন একটা পরিবর্তন এসে গেছে। ওরা বালিয়াড়ির ওপর অপেক্ষা করে নৌকা আসার, রেসকু আসার, মিলিটারি নৌকা আসার। ওদেরই ভেতর থেকে আবার প্রশ্ন হয় ' ক্যানং করি মিলিটারি মানষি বুঝিবার পারে এ্যানং বালুবাড়ি আর ধান্ধিনা

পাথারের পাছত একখান চর আছে।' মিলিটারির ভটভটি নৌকা নিয়ে জগদীশ রসিকতা করে। এদিকে নিতাই হঠাৎ বালিয়াড়ির মাথায় ডুবে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সারা শরীরে ভেজা বালি নিয়ে নিচ থেকে বেড়িয়ে আসে। নিতাই আবার হাঁটতে শুরু করে।

রাবন জগদীশের উদ্দেশ্যে বলে - সে যেন আবার তিস্তার ভেতর ঢুকে না যায়। বালিয়াড়ি পার হতে ওদের একটা লাইন হয়ে যায়। ওরা বালি পার হয়ে মাটিতে পা রাখে। চেনা মাটিতে আঙুল আঁকড়ে ধরে। সামনে অশ্বিনী রায়ের ধানি জমি। পাঁচ বিঘে পাকা ধান। আজ রাত শেষে জলে ডুব যাবে। এর আগে নতুন চাষের ধান সিঁড়ির মত উঠে গেছে। ধানক্ষেত গুলো কাঁচা। কাঁচা ক্ষেতও ভাসবে জলে। এদিকে দু'নম্বর মিস্ত্রিপাড়া পড়বে প্রথমে। বাড়িঘরের ওপর চলকুয়াশা লেগে আছে। ওরা মিস্ত্রিপাড়ায় যায় খবর দিতে। সেখান থেকে নাওয়াপাড়া। নাওয়াপাড়ার পরে এক ছোট খাল। সেটা পেরিয়ে মহিন্দর পাড়া। এর ডান পাশে বাঁশ ঝাড়, সেটা পেরিয়ে সরকার পাড়া দু'নম্বর। এভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা গ্রামখানিতে ওরা সর্বত্র খবর দেয়। নাওয়াপাড়া পাড় হয়ে বাঁক নিতেই দীননাথের মুদিখানায় ওরা দেখে একদল ছেলে কলার ভেলা তৈরি করছে। ওরা তাদের উৎসাহ দেয়। সিদ্ধান্ত হয় যে এখনই গরু-বাছুর গুলোকে পার করে দেওয়া হবে। নিতাইরা চরের ভেতরের রাস্তায় শক্ত আল দিয়ে এক রকম দৌড়াতে থাকে। এবার বাতাস ওদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ওই দক্ষিণের বালুবাড়ি দিয়ে যখন ওরা বাতাস ঠেলে ঠিক তার উল্টো - তাই অনেক আরামদায়ক। গজেন, রাবণ, নিতাই তিনজনে বিড়ি ধরায়।

নদীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে নিতাই, রাবণ, গজেন আর অমূল্য। দেখে মনে হচ্ছে যদি বন্যা আসে তাহলে এই এতটুকু খালের মত তিস্তা পার হতে আর কী। কিন্তু ওরা এও জানে বন্যার জল ঢুকলে এই খাল আর খাল থাকবে না বিরাট আকার ধারণ করবে। এদিকে পার হওয়া ছাড়া তো কোন উপায় নেই। বন্যা ঢুকলে বিশেষ করে ক্ষতি করবে স্পার গুলো। ও গুলোই জলে ধাক্কা মেরে স্রোত এদিকে ঠেলে দেবে। ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নদীটাকে মাপে। এখন গরু গুলোকে ছেড়ে দিলে কোনাকুনি ভাবে ওপারে উঠতে পারে। ওরা ভাবে ওদের হিসেব নিকেশ ভুল হচ্ছে না তো। নিতাই, গজেন জলে পা দিয়ে স্রোতের টান অনুভব করে। বোঝে এখনও বন্যা আসেনি। কারণ জল এখনও গরম। নিতাই জলে গন্ধ সোঁকে। প্রতিদিনকার গন্ধ। যদিও কয়েকদিনের বৃষ্টিতে গন্ধটা একটু তরল। রাত বন্যার দিকে এগোচ্ছে। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে - এই খালের জল রামকান্তর জোত পর্যন্ত এগোবে। এই চরটা পুরোটাই জলের তলায় চলে যাবে। নিতাই , গজেন জলে

হাত দিয়ে আঁজলা ভরা জল নিয়ে দেখে জলে বালি। ' এ্যাহন পুরানা নদীই আছে—' সে হাঁটু জলে ছিল একটু উঠে এসে ধুতিটা কায়দা করে বুকের কাছে ধরে। নিতাই হেঁটে হেঁটে জলের ভিতর চলে যায়। জলে হেঁটে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল — রওনা দেওয়া গরুগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া, এখন পুরোনো নদী — পথঘাট সব চেনা। নিতাইয়ের গলা পর্যন্ত জল দেখা যাচ্ছে। অমূল্য রাবণকে জিজ্ঞাসা করে গরু গুলো রওনা দিয়েছে কিনা। ' বাতাস পুব দিক থেকে পশ্চিমে আসছে।' রাবণ যেন শুনতে পাচ্ছে বন্যা এসে চরকে ভাসিয়ে দেওয়ার আগেই এই চরের প্রথম উদ্বাস্তুর দল চর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর কোন দিন তারা চরে আসবে না।

গরু গুলোকে দল বেঁধে বাঁধে তুলে দিয়ে আসলে বন্যা আসাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তখন শূন্য গোয়ালে সারাটা গ্রাম একটা শোকাবহ পরিবেশ। সব কিছু তখন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। জলকুয়াশা তাড়িত পাল পাল গরুগুলো যখন হাম্বারবে গোয়াল ছেড়ে শেষ রাতে বাঁধের দিকে ছুটতে লাগে, তখন মনে হয় যেন বস্তি উৎখাত হয়ে যাচ্ছে।

অপরিসর রাস্তায় এত গরুবাছুর চলতে বেশ অসুবিধায় পড়ে। এর গায়ে ওর ধাক্কা লাগে। একটু বড়ো বাছুর সবাইকে ঠেলে এগিয়ে যেতে চায়। ওকে ধরবার জন্য আবার ওর মা পেছনে ছোটে, তাতে আরও অসুবিধা বাড়ে। কোনোটা মায়ের বাটে মুখ ঢোকানোর চেষ্টা করে, সামনের পা দুটো ভেঙ্গে মাটিতে পড়ার উপক্রম হয়। প্রফুল্ল পালের বুড়ি গাইটা বেশ মোটা, হাঁটতে পারে না, অথচ ওকে পালের মধ্যে দৌড়াতে হয়। দেড়া গজেনের সদ্য বিয়ানো বাছুরটাকে জগদীশের মোষের পিঠে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মা জিভ বের করে বাছুরটাকে চাটতে চায়, কিন্তু নাগাল পায় না।

ক্ষেতবাড়ি শেষ হলে ওরা নদীর পাড়ের বালিতে পা ফেলে। বালুবাড়িতে নেমে তাদের গতি আরও কমে যায়। গরু গুলি ছড়িয়ে পড়তে চায়। কিন্তু ছেলেরা কঞ্চি হাতে গতি ও লাইন নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে ওরা ধীর হয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হয়। নিতাই, গজেন, অমূল্য, রাবণ জলের কাছে ও পাড়ে বসেছিল। পালটা কাছে আসতেই অমূল্য নদী সাঁতরে ওপারে যায়। গরু গুলো ওপারে গেলে তো দেখতে হবে। গজেন আপত্তি করলে নিতাই তাকে বলে ওপাড়ে যেতে। গজেন জলে নামে। অসমান জলের তলে কিছুক্ষণ হেঁটে ডুব দেয়। ততক্ষণে গরুরপালটা বালুবাড়িতে এসে গেছে।

নিতাই পালটার মুখোমুখি দাঁড়ায় কোন নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে কিনা চিন্তা করে। 'নিতাই আকাশের দিকে তাকায়— আকাশ একেবারে মাটির বুকের ওপর নেমে এসেছে।' সমস্ত আকাশটায় যেন বন্যা হয়ে চরের

পৃথিবীর ওপর এক্ষুণি আছড়ে পড়বে।

নিতাই গরুর পালের দিকে তাকায়। আর দেরি করা চলে না। এবার পালটাকে জলে নামাতে হবে পার করার জন্য। সেজন্য বালিশ সালিশকে পালের মাঝখান থেকে মোষটাকে আনতে বলে। মোষটার পিঠে গরুর বাছুরটা—সহ মোষটাকে টানতে থাকে জলে নামাবার জন্য। নিতাই জিভ টাকরায়। মোষটা প্রথমে এগোতে চায় না। পরে দড়ির টান পেয়ে আস্তে আস্তে জলে নামে।

মোষটার পাশ দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে নিতাই বুঝে যায় ' বানার জল ঢুকে গেছে।' সে যেমন বুঝতে পারছে জলে ভেসে থাকা গরু মোষ গুলোও তেমনি বুঝতে পারছে যে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। নিতাই মোষটার পিঠে বসে থাকা বাছুরটাকে ধরার জন্য গজেন-অমূল্যকে ডাকে। মোষটা সামনের পা তুলে পেছনের পা তুলে আস্তে আস্তে পাড়ের দিকে এগোয়।

বাঁধ আর নদীর মাঝখানটা পাথর দিয়ে বাঁধানো হয় - যাতে বৃষ্টির জলে পার না ভাঙ্গে। গরু বা মোষের পক্ষে এই পাথর বাঁধানো জায়গাটায় হেঁটে যাওয়া খুবই মুশকিল। পাথরে গরুর ক্ষুর পিছলে যায়। আবার কোথাও পাথর জালে আটকা বলে গরুর পা জালে আটকে যায়। গজেন আর নরেশ গরু মোষ গুলোকে পাড়ে তোলার জন্য একটা রাস্তা দেখে রেখেছে। কিছুটা পাথর বিছানো থাকলেও মাটির পথও আছে। সেই বোল্ডার হীন নালীর পথটার দিকে গজেন ও নরেশ মোষটাকে নিয়ে যায়।

গজেন মোষটাকে নিয়ে আধাআধি উঠে পেছন ফিরে গরুর পালের দিকে তাকায়। দেখে গরু গুলো ধীরে ধীরে উঠছে। কিন্তু ওদের গায়ের জলে পথটা পিছল হয়ে যাচ্ছে।

গজেন তাকিয়ে দেখে বালিশ সালিশ, বলরামের ছোয়া, আর গোটা তিনেক ছোয়াছোটো বাঁধের ওপর গরুর খোঁটা দিচ্ছে। মোষটা দাঁড়িয়ে পড়ার পেছনে গরুর লাইনও দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাড়ে আর নতুন গরু তুলবার জায়গা নেই।

নিতাইদের চর থেকে আট দশ মাইল ভাটিতে আর একটি চরের কথা লোক মুখে প্রচারিত এবং নামকরণও করা — দুই নম্বর চর। বছরে প্রায় ৮ মাস এই খাতটা শুকনো থাকে বলে ক্রমে এটাতে মানুষ কলাগাছ, সুপারি গাছ পুতে ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করে। শীতকালে রবি ফসলও হয়। জমির উঁচুনিচুর হিসাবে এই দু'নম্বর তিস্তারও নিচে।

তিস্তার বড় খাত আর দুই নম্বর চরের মাঝখানে কচুয়া আর একটি চর। এখানে তো পাকা বাড়িও আছে।

তবে বন্যায় যে প্লাবিত হয় না তেমন নয়।

এখন মণ্ডলঘাট পর্যন্ত তিস্তার বাঁধ দেওয়া হয়েছে। মণ্ডলঘাঁট চৌপত্তি থেকে যেন গোল হয়ে গেছে। বাঁধটাকে তাই চৌপত্তির অংশ হিসাবে ধরা হয়। মাঝখানে কিছু জায়গা জঙ্গলা। বন্যার সময় এই জঙ্গল পরিস্কার করে ক্যাম্প তৈরি করা হয়। দুই নম্বরের মানুষ জনই এখানে আসে। দুই বাঁধের মাঝখান দিয়ে তো নদী বয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়াররা নাকি ইচ্ছে করে দুই দিকে বাঁধ দিয়ে এই জায়গাটা শুকনো রেখে দিয়েছে যাতে কখনো ভীষণ বন্যা এলে এ নদী দিয়ে বেরতে পারে। যতদিন এমন ঘটনা না ঘটে ততদিন আর এক জায়গা পতিত থাকবে কেন - তাই দখল করে চাষাবাদ হচ্ছে। নদী নিয়েও দখল ভাগাভাগি আছে।

নদী তো আসলে মাটিই। আর মাটি মানে গাছ, চাষ, ঘরবাড়ি, জনবসতি। তখন মনেও হয় না এ মাটি আসল মাটি নয়। নদীস্মৃতি হয়ে থাকা মানুষের সংখ্যা ক্রমে কমে আসে, কমে আসে নদীকে ডাক নামে ডাকার মানুষ। কোন এক সময় এই জায়গাটা যে দু'বাঁধের মাঝখানে নদী বেরবার পথ হিসেবে রাখা হয়েছিল সে আর চেনা যাবে না। এই দু'নম্বর চরটি অবশ্য এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি। যে গুলি পৌঁছে গেছে সেগুলি হল মঞ্জুলি, তার নিচে প্রেমগঞ্জ বা বাসুসুবার চর, দোমহনি বা পদমতির চর, মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ির মাঝখানে নোয়াপাড়া থেকে দহগ্রামের বহু পুরনো চর। বা তার আগেই কাশিয়াবাড়ি, বোয়ালমারি এমনকি কচুয়া ও। এখনও এসব জায়গায় জমি নিয়ে মাঝে মাঝে দখলের লড়াই চলে।

হঠাৎ তিস্তার জল ঢুকে গেলে আলে আলে ভাগ করা মালিকানাও ঢেকে যায়। জল সরে গেলে পুরনো জমির লড়াই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যখন মনে হয় জল নদীময় পাতাল থেকে উথলে উঠছে তখন বাঁধের নিচ থেকে ভাদই চিৎকার করে মহেশ্বর জোতদারকে ডেকে বলে - 'বাবা গে বাঁশ ফেলি দাও, বাঁশ ফেলি দাও।' এ এলাকার সব চেয়ে বড়ো জোতদার মহেশ্বর দেউনিয়া, একজন অধিয়ারের হুকুমে বাঁশ ফেলে দেয় একটার পর একটা। শ্রেণি সংগ্রামের এমন নিস্পত্তি মানব ইতিহাসে আর কোথাও ঘটে বলে জানা নেই।

এখানে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বুধবার থেকে। আজ শনিবার বৃষ্টি চলছেই। মাঝে বৃহস্পতিবার সকালের দিকে একটু থেমে ছিল। রোদও উঠেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আবার ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি। রাত দশটায় 'কমলা সংকেত'। চরে বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার নির্দেশ। শুক্রবার রাতে আবারও এলো সেই নির্দেশ। রেডিওর এই ঘোষণাতেই যেন বৃষ্টি একেবারে ঝাপিয়ে পড়ে, সবকিছু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়। শনিবার নেহাত ভোর হতে হয় বলেই যেন ভোর হয়। জল কাল সন্ধ্যার তুলনায় অন্তত আড়াই গুণ বেড়েছে।

মনে হয় পাহাড়ে ধস নেমেছে এবং ধসের ফলে নতুন নতুন গোপন হ্রদ সৃষ্টি হয়ে তাতে জল জমে আছে। যদি একসঙ্গে এসব হ্রদ ফেটে জল বেরুতে থাকে তাহলে বাঁধের ওপরে জল উঠবে।

দেখতে দেখতে বাঁধে লোকজন আসা শুরু করেছে। এই দু'নম্বর বাঁধে সবচেয়ে আগে আসে আব্দুল। ' তার রকম সকম দেখে মনে হয় সে 'সাগাই' খেতে এসেছে। সে একটা ভাঁজ করা বিছানা, একটা ভাঙ্গা ছাতা, একটা এ্যালুমিনিয়ামের মগ, একটা হাঁড়ি নিয়ে এই ভেজা ঘাসের মধ্যেই বসে পড়ে। আব্দুল কোন জায়গায় বসবে একটু খোঁজাখুঁজির পর একটা ঝাঁকড়া কুল গাছতলাকেই বেছে নিল। কুল গাছের নিচু ডালে ওর সংসার ঝুলিয়ে রাখতে পারবে। প্রথমে সে তার তুলোর কম্বলটা খোলে। কোনো বন্যার সময় এটা সে পেয়েছিল।

আব্দুল কারও কোন কথার জবাব দেয় না। সে কম্বলটা নিয়ে ব্যস্ত। কম্বলটাকে তলার ভাঁজের মধ্যে শুইয়ে উবু হয়ে সে কম্বলটাকে সমান করে। তারপর রেখে দেয়। তার পরনে খাকি ফুলপ্যান্ট, গায়ের শার্টটা ভেতরে গোঁজা, শার্টের ওপরে একটা সোয়েটার।

আব্দুল কম্বলটার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দড়িটা বাণ্ডিলটার নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে নানাভঙ্গি ও নিপুনতায় বাণ্ডিলটাকে বাঁধে। উপরে একটা এমন ফাঁস বানায় যাতে বাণ্ডিলটা হাতে অথবা লাঠিতে ঝুলিয়ে রাখা যায়। কিছুক্ষণ নিবিষ্ট ভাবে বাণ্ডিলটা দেখে নিয়ে ওটাকে তুলে ওই কুল গাছের একটা ডালে ঝুলিয়ে দেয়। এভাবে অন্য একটি ডালে ঝোলায় ওর ডেকচি, মগ ও লাঠি। তার কাজ শেষ। সে হাত ঘষে।

এ এলাকায় আব্দুলকে সবাই চেনে। তাকে ঠিক পাগল বলা যায় না, একধরনের ভবঘুরে, খেয়ালি মানুষ। সে কারও বাড়িতে থাকে না। কারও কাছে খাবার চেয়ে খায় না। সে যা কাজ করে তাতে খাবারের চেয়ে বেশি মজুরী পেতে পারে। ও কোন ক্ষেত খামারে কাজ করে না। ও ভিড়ের মধ্যে বেশি মানুষের মধ্যে থাকতে চায়। এখানে বন্যা আসবে। বাঁধে লোক জড়ো হবে। ক্যাম্প বসবে। এখানে আব্দুলের কতো কাজ। তাই কুলগাছে বিছানাপত্তর টানিয়ে সে প্রস্তুত কাজের জন্য। মইনুদ্দিন ডিলার, গামবুট পরা দারোগার মত দেখতে একজন, আরও কয়েকজন অফিসার। ওরা সবাই আব্দুলের পাশে এসে দাঁড়ায়। আব্দুল একবার ওদের দিকে তাকিয়ে নদীর দিকে মুখ ফেরায়।

মইনুদ্দিন ডিলার গলাতুলে মহেশ্বর জোতদারকে ডাকে, ডি সি সাহেব এসেছেন এখবরটা দেওয়ার জন্য। মহেশ্বর হাত জোর করে নমস্কার জানায় ডিসিকে। ডেপুটি কমিশনার জিজ্ঞাসা করেন চরের সবাই উঠে এসেছে কিনা। মহেশ্বর না বলায় ডি সি পঞ্চায়েতের লোকজনকে খোঁজেন। পঞ্চায়েতের মেম্বার এক মাষ্টার মশাই

সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে তারা ভেবেছিল জল নেমে যাবে। ডি সি সাহেব ডিস্ট্রিকট পঞ্চায়েত অফিসার মি. সান্যালকে ডাকেন— পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েতের লোকেদের মিট করতে, তিনি আসছেন- আর মোবাইল সিবিল এমার্জেন্সির অফিসারকে বলেন এখুনি নৌকা পাঠাতে। দুই অফিসার চৌপত্তির দিকে চলে যান। ভিড়ের একটা অংশ সেদিকে চলে যায়। ডেপুটি কমিশনার ভিড়ের বাকি অংশে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। আব্দুল ভিড়ের ভেতরে থেকেও যেন ভিড়ের বাইরে। তাকিয়ে আছে নদীর দিকে।

আব্দুলের মত ডেপুটি কমিশনারও নদীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দেখছেন জলের রঙ ঘোলা থেকে ঘোলা। 'মাইল মাইল বিস্তৃত সেই জল ধাতুপাতের মত পড়ে আছে স্রোতের বিভ্রম জাগিয়ে।' বুঝি কোথাও কিছু ঘটে গেছে বা ঘটবে এমন থমথমে চারদিক। ডেপুটি কমিশনার মৈনুদ্দিন ডিলারের কাছে জানতে চান এদিকে কোথাও চিড়ে গুড় পাওয়া যাবে কিনা। ডিলার ঘুঘুডাঙ্গার কথা বলে। সিবিল মোবাইল এমার্জেন্সির অফিসারটি এসে এখানে কোথাও নৌকা পাওয়া গেল না বলে জানায়। যে একটি নৌকা পাওয়া গেছে সেইটিই লাগাবার নির্দেশ দেন ডিসি সাহেব আর মহেশ্বর জোতদারেরটাও নেওয়া হবে পরে।

নৌকায় যাবে বলে আব্দুল জলে কিনারায় চলে যায়। ওর কথা ডেপুটি কমিশনার জিজ্ঞাসা করায় মহেশ্বর হেসে ওকে 'পাগল' বলে। পাঁচজন লোক নিয়ে একটা নৌকা ভেসে আসছিল। আব্দুল ঝাঁপ দিয়ে জলে নেমে নৌকাটার কাছে যায়। ডেপুটি কমিশনার পঞ্চায়েতে কী ব্যবস্থা করল তা দেখার জন্য পা বাড়ান। আসামের সিল্কের চাদর গায়ে দেওয়া এক ভদ্রলোক ডিসিকে একটু বসতে বলে। সাহেব এগোতে চান কিন্তু লোকটি আগলে ধরে বলে যে ডেপুটি কমিশনার সাহেব কেন নিজে এলেন। একটা বাচ্চা ছেলে চা নিয়ে এলো। ডিসি সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে পঞ্চায়েত অফিসের দিকে চলতে থাকেন। ডেপুটি কমিশনার যেতে যেতে একটা জায়গা দেখিয়ে এক সময় খুব ভালো ধান হত এবং সেগুলো আটঘট্টির বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি সে সময় এখানে ছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তখন তিনি প্রবেশনে ছিলেন বলে জানান।

ডেপুটি কমিশনার পঞ্চায়েত অফিসে ঢোকেন। পঞ্চায়েতের মেম্বারদের খোঁজ করেন এবং বলেন যে এলার্ট করা সত্বেও কেন গ্রামকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়নি। এরপর অফিসকে সর্বদা জঞ্জাল মুক্ত রাখার পরামর্শ দেন। বন্যার ব্যাপারে তার কাছে পঞ্চায়েতের কেউ গেছে শুনে তিনি পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করান। মহেশ্বর জোতদারের কাছ থেকে নৌকাটা নিয়ে রেসকিউর কাজ অব্যাহত রাখতে

বলেন। আর ঘুঘুডাঙ্গা থেকে চিড়ে গুড় এনে তা যথাযথ বিলিবন্টনের কথাও বলেন। এরপর তার গাড়িকে আসতে বলেন।

অফিসারদের আসা, সিবিল এমার্জিন্সির লালগাড়ি, নৌকা ভাড়া করা, ঘুঘুডাঙ্গা থেকে চিড়ে গুড় আনানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে কার্যত বন্যাকে সরকারি ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। জল আরও বাড়লেও হেলিকপ্টার ও সৈন্য নামবে। 'ঐ দুটো দিয়ে বন্যার আর এক স্তর বোঝানো হবে।

ভাদই-কান্দুরা-কানকাটু জলে নেমে যায় ওপারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গরুগুলোকে - একত্রিত করে আনবার জন্য।

জলের অনেক নিচ থেকে কান্দুরা ভাদইকে ডেকে বলে গরু এখনই ছাড়বে কিনা। উত্তর আসে 'না ছাড়ু'। কথাটা ছড়িয়ে পড়ে - 'এখন গরুগুলিকে ছেড়ো না।' ভাদই-কান্দুরা-কানকাটুরা এখন শুকনো খাতে। সেখানে এই বাতাস ও আওয়াজ নেই। মহেশ্বর বাঁধে কাউকে দেখতে পায় না — সবাই চৌপত্তিতে। ভাদই চিৎকার করে মহেশ্বরকে বাঁশ ফেলতে বলে। মহেশ্বর অনেকগুলি বাঁশ ফেলতে গেলে মোবাইল এমার্জেন্সি মহেশ্বরকে থামতে বলেন - কারণ ও বাঁশ গুলো দিয়ে কাউসেড বানানো হবে। মহেশ্বর দু'বার বাপ তুলে গালাগাল করে বাঁশ ফেলতেই থাকে। এমার্জেন্সি শুনতে পায় না। এই নির্জন বাঁধে এখন মহেশ্বর ও এমার্জেন্সির জোগান দেওয়া বাঁশ গুলি দিয়ে লম্বা করে জুড়ে জুড়ে দিচ্ছে ভাদই। এখন গরু গুলোকে দুই সারির মাঝখানে ছেড়ে দিলে সিঁধে বাঁধে উঠবে। বেশি জল হলেও বাঁশের নিশানা ধরে চলা যাবে। আরও বেশি জলে সব ডুবে গেলে, এমনকি বাঁধ থেকেই লোক সরাতে হলেও ওই নিশানা দেখে বোঝা যাবে ঐ জলের নিচে তাদের ঘরবাড়ি কোথায়। এখন আকাশের যা অবস্থা তাতে ফের যদি বৃষ্টি নামে, যদি পাহাড়ে গোপন হ্রদ গুলো হঠাৎ একই সঙ্গে ফেটে যায়, তাহলে এখানে নতুন নদীর সৃষ্টি হবে। ভাদই-কান্দুরা-কানকাটু সেই নতুন নদীর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ওরা তিনজনেই সাঁতরে ডাঙ্গায় ওঠে গরু গুলিকে একত্রিত করে - বাঁধে নিয়ে আসার জন্য কান্দুরা দক্ষিণের ডাঙ্গায়, ভাদই উত্তরের ডাঙ্গায়। কানকাটু মাঝের ডাঙ্গা থেকে গরুগুলোকে জলে নামায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যে জলমগ্ন ডাঙ্গায় ভাদই বাঁশ বেঁধে রেখে গিয়েছিল সেখানে গরুর পাল নিয়ে উপস্থিত হয়।

'তিস্তার মধ্যে নোয়াপাড়া, মেচিয়াপাড়া, সয়েদপাড়া, দহগ্রাম — এই চারটি চর বা ছিট মহল। এনিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছে। কারণ এই চারটি জায়গা আগেকার পূর্ব পাকিস্তান ও

এখনকার বাংলাদেশকে কোনো এক চুক্তি অনুযায়ী দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে পাটগ্রাম থানা ছিল জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে। তিস্তা এখানে বরাবরই সীমান্ত বাহিনী। মণ্ডলঘাটের পর তিস্তা পুবপারে মেখলিগঞ্জ আর পশ্চিমপারে হলদিবাড়ি এই দুই জায়গার মধ্যে দিয়ে তখনকার কোচবিহার রাজার ষ্টেট, এখনকার কোচবিহার জেলা পার হয়ে পাটগ্রামের পশ্চিম সীমা দিয়ে রংপুরের দিকে চলে যেত। তখন পাটগ্রামের পশ্চিমের এই নদীই ছিল রংপুর আর জলপাইগুড়ির মাঝখানের সীমান্ত। এই নদীর একেবারে মাঝখানে, পাটগ্রামের একেবারে ভেতরে নোয়াপাড়া, মেচিয়াপাড়া, সয়েদপাড়া, দহগ্রাম ও আরও অনেক নাম না থাকা চর আসলে ছিল কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহল ও সেই কারণে কোচবিহারের ভারতভূক্তির পর ভারত ইউনিয়নের ও পশ্চিমবঙ্গের অংশ।'

মাপে যাই হোক বাস্তবে ভারতে বাংলাদেশীয় ও বাংলাদেশে ভারতীয় অংশ গুলোতে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ ছিটমহল গুলোকে নিজের মত করে সাজালেও চর, নদী, রাষ্ট্র, সীমান্ত, বর্ডার আউটপোষ্ট যেমন থাকার তেমনি থাকে। আর থাকে প্রত্যেকের সীমান্তবাহিনী, অস্ত্রভাণ্ডার ইত্যাদি। যে সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য এতো ব্যবস্থা আসলে থাকে না সেই সীমান্তটি-ই। উভয় দিকে এমন কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে উভয় দিকের মানুষজনই হাটেবাজারে যায়। না গিয়ে উপায় থাকে না। সে রকমই একটি হাট সয়েদহাট। হাটটা চলেই দু'দেশের লোকজনের দ্বারা। এই হাটের পশ্চিমদিকটা বাংলাদেশের— আর পূর্বদিকটা ভারতের। অনেক সময় নানা বিষয়ে বেশ মজাও হয়। হাটে শুধু চরের লোকেরা আসে না, পাশ্ববর্তী গ্রামের লোকেরাও আসে।

'তিস্তা এখানে সমতলের বিস্তার পেয়েছে।' চরের ওপর কাটা তারের বেড়ার মতো তিস্তাও অনেক সময় অনতিক্রম্য ভাবে সীমান্তরক্ষা করে। এখন বন্যার সময় সমস্ত সীমান্ত চিহ্নকে লোপাট করে দেয়। নাউয়াপাড়া থেকে নিচের ছ'নম্বর দহগ্রাম পর্যন্ত সব গুলোকে চরের ওপর দিয়ে তিস্তা বয়ে চলেছে।

ভারতের সীমান্ত চৌকি, ভামনির ছাউনি আর বাঁশের বেড়া দেওয়া একটাই ব্যারাক। ব্যারাকের দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা অফিস আর পশ্চিম ও উত্তর দিকটা ' প্রাইভেট'। এই প্রাইভেটের দিকে একটা লম্বা ঘর জোয়ানদের থাকবার জন্য। এদিকে একটা আলগা রান্নাঘর। আর একটা আলগা ঘর অস্ত্রপাতি রাখবার। বারান্দায় দু'জন শান্ত্রী পোষাক পরে পাহারারত। সামনে জাতীয় পতাকা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে। ফ্লাগ ওড়ানোর জায়গাটা কর্দমাক্ত।

এই জায়গাটা আসলে ছিটমহল। মাটি পুরনো ও শক্ত। কমান্ডন্টের সোজাসুজি পশ্চিমে একটা আমগাছ

আর ঐ বন্দুকের ঘরের পেছনে একটা সিসু গাছ ছাড়া ক্যাম্পের চারপাশে মাইল খানেক জায়গার মধ্যে কোনো গাছ পালা নেই, কেটে ফেলা হয়েছে।

ভারতের সীমান্ত চৌকাটাই একটু বেখাপ্পা। এখানে তিস্তার ঘোলাটে জলস্রোত ছাড়া দেশ নেই, কিন্তু সীমান্ত আছে। বাংলাদেশের সীমান্ত চৌকির প্রাধান্য বেশি। কারণ বেশি জায়গা জুড়ে তো ওড়াই। তিস্তার ধেয়ে আসা বন্যায় বাংলাদেশের চৌকির লোকেরা হয়তো নৌকা করে চলে গেছে কেউ কেউ। কিন্তু ভারতের তো সরে যাওয়ার জায়গা নেই। সরতে গেলে বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে হবে।

কমান্ডান্ট, বিভূতি ঘোষ, বটুক বর্মণ, নিত্যানন্দ আসন্ন বন্যার বিপদ নিয়ে নিজেদের করনীয় সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছে এমন সময় ওদিক থেকে সাইকেলে চেপে বৃষ্টিতে ভিজে আজিজ এসে বলে ' রেডিও টেলিফোনবাজি হয়রান হই গেছি..... কমান্ডার পাঠি দিসে।' ভারতের কমান্ডান্ট অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে তারা ফোন করেছিল নাকি! আজিজ 'হ্যাঁ' বলায় কে তখন ডিউটি করছিল তার খোঁজ পড়ে। কিশোরীচাঁদ নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করে। এবার আজিজ তার আসার কারণ বলে যে তাকে পাঠানো হয়েছে এদিকে কোন 'ফ্লাডওয়ার্নিং' এসেছে কিনা জানতে। কিশোরচাঁদ এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে জবাব দেয় 'না'। কামান্ডান্ট জানতে চায় কিশোরীচাঁদ এখবর জানল কেমন করে, সে তো ফোনের কাছে ছিলই না। যা হোক এবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে কোন খবর পাওয়া যায় কিনা জানতে বলে।

কিশোরীচাঁদ জানায় এতক্ষণে দু'নম্বর ভেসে গেছে। লোকজন চলে আসছে। শুনে কমান্ডান্ট আশঙ্কা প্রকাশ করে এই ক্যাম্পেও লোকজন এসে উঠবে তাহলে। এবার আজিজের কথা অনুসারে ফোনের দিকে হাত বাড়ায়। সেই মুহূর্তে আজিজ তার কামান্ডান্টের আর এক ম্যাসেজ বলে আজ রাতে এখানকার সবার নেমন্তন্ন। বলেই হে হে করে হাসতে থাকে। এরপর দুই কামান্ডান্টে কোন কথাবার্তা হয়। ওরা এদের সিকট করতে বলেছে কারণ — ' ফ্লাড নাকি সমানে বাড়তাছে। রাত্রীরে নাকি এই ক্যাম্পে জল টুইকবে।'

আমন্ত্রণ জানিয়ে আজিজ সাইকেল নিয়ে হাঁটতে থাকে। বিভূতি ঘোষ কমান্ডান্টের পেছনে চলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে ফ্লাড কি আসবেই। কমান্ডান্ট জবাবে বলে 'হ্যাঁ'। তাহলে তো সি ফট করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এরপর কমান্ডান্ট সবাইকে মিটিংয়ে ডাকে। কারণ সবাই সি ফট করে গেলে ইণ্ডিয়ায় সীমান্ত প্রহরায় কেউ থাকবে না। কমান্ডান্ট সব দায়িত্ব নিজে নিতে চাইছে না বলে জলপাইগুড়ির একটা পারমিশন পেতে চায়। কিন্তু জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সব জায়গায় ফোন ডেড, লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। তাই অগ্যতা

কমান্ডান্টকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। আর সিফট করতে হলে এখুনি করা ভালো, রাত হলে অসুবিধা আরও বাড়বে বলে বিভূতি ঘোষ বলে। কাস্টমসের লোকটি খুব জোর দিয়েই বাংলাদেশের ক্যাম্পে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়।

'যদি হেড কোয়ার্টার থেকে কোন মেসেজ আসে'- কমান্ডান্ট একটু দ্বিধান্বিত গলায় বলে। বটুক বর্মন এর জবাব দিয়ে বলে - ' নো রিপ্লাই হবে।' বুঝবে ফ্লাডে সব নষ্ট হয়ে গেছে। কমান্ডান্ট সিদ্ধান্ত জানায় এখুনি সবাই রওনা দেবে বাংলাদেশের ক্যাম্পে উইথ আর্মস। বাকি আর্মস আর্মারিতে থাকবে। তিনজন সসস্ত্র তরুন আর্মারির ছাদে ডিউটিতে থাকবে। তিনদিনের একটানা বৃষ্টিতে ক্যাম্পটা যেন চাপা পড়ে আছে। কারো কোনো কাজ নেই, সকালের পিটি, প্যারেড বন্ধ, সপ্তাহের রুটমার্চ বন্ধ, তরকারী চাষও চলছে না তাহলে রইলটা কী। আলসেমি কাটাবার জন্য হঠাৎ হঠাৎ কারও চিৎকার চেঁচামেচি।

কম্যান্ডান্টের হুকুমে সারাটা ক্যাম্প জেগে উঠল। উপেন, রামাশিস আর আসিন্দির আর্মারির ছাদে ত্রিপাল খাটাচ্ছিল। ত্রিপাল টানানোর পর এবার লাইট লাগানোর পালা। 'তিনজনের চেষ্টায় আর্মারির ছাতে ত্রিপলের ছাওনি উঠে যায়।'

ইতিমধ্যে সবাই ফ্লাগ তোলার মাঠে জড়ো হয়। প্রত্যেকেই ফুল ইউনিফর্মে। পায়ে গামবুট আর গায়ে-মাথায় ওয়াটার প্রুফ। বটুক বর্মন, পরশমণি, সুন্দাস, আষারু, সুভদ্র আর পঞ্চানন টানতে টানতে একটা ঠেলা গাড়ি নিয়ে আসে। এবার ওরা কাঁধে করে আনে দুটো পাঠা, দু'বান্ডিল কলাপাতা, পলিথিনের চাদর দিয়ে মোড়া ছোট ছোট কিছু প্যাকেট। অনেকেই বৃষ্টির মধ্যেই এসে পড়েছে। কমান্ডান্ট তার ঘর থেকে নিচে নামে। বৃষ্টির মধ্যে কমান্ডান্ট ওয়াটার প্রুফটা গায়ে দেয়। ঘোষকে জিজ্ঞাসা করে কতটা প্রস্তুত হয়েছে। ঘোষ জানায় আর্মারিতে ডিউটি দেবে- তিনজন নয়, ছ'জন। ওপরে ত্রিপাল টানানো হয়েছে। এই ছ'জন বাদে সবাই যাচ্ছে।

কমান্ডান্ট ঘোষের দিকে তাকাতেই ঘোষ সবাইকে 'ফলইন করায়'। ঘরে বারান্দায় যারা ছিল তারা দৌড়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়ায়। ' ঘোষের হুকুমে লাইনটা চলতে শুরু করে।' লাইনটা লেফট-রাইট করে আর্মারির দিকে যায়। আর্মারি থেকে যে যার অস্ত্র নিয়ে আবার লাইনে এসে দাঁড়ায়। বন্দুক কাঁধে ওঠা মাত্রই যেন লাইনটা অন্যরূপ নেয়। বৃষ্টিবাদল অবান্তর হয়ে যায়। যেন সত্যিই একটি সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমান্ত রক্ষার জন্য' তৈরি। কমান্ডান্ট ঘোষকে লাইনটাকে একটু মার্চ করিয়ে ছেড়ে দিতে বলে। এক জোয়ান এসে কমান্ডান্টের কোমরে রিভলবার সহ বেল্ট পড়িয়ে দেয়। ডান ঘাড়ের ওপর বন্দুকের নল দুলিয়ে লাইনটা চলতে থাকে।

'..... বৃষ্টিতে নুয়ে পড়া ঘাসে ঢাকা পড়ে পথটা পায়ে পায়ে তৈরি হতে থাকে।'

সমবেত আওয়াজ তুলে লাইনটা এগোতে থাকে। লাইনের পেছনের গাড়িতে জিনিস্ পত্র ও দুটো পাঁঠাও। ওটা দু'জনে টানছে ও ঠেলছে। চলতে চলতে ঘোষ নদীর আওয়াজ শুনতে পায়। ঘাড় ঘুরিয়ে কমান্ডান্টকে সে কথা জানায়। কমান্ডান্ট ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানায়। ঘাস বনের শেষে সেন্ট্রি বক্স। বাতাসে খোলা দরজা একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার খুলছে। সেন্ট্রিবক্সের তলায় কাঁটা তারের বেড়ার ভেতরে গেট। গেটটা ঠেলে সেই কাঁদা দিয়ে দলটাকে একটু বাঁয়ে বাইরে যেতে হয়। বেরতে গিয়ে লাইনটা ভেঙে যায়। ইচ্ছে মত হাঁটতে থাকে, থামে না। এখন আর লাইনে হাঁটার আওয়াজ নেই। কিন্তু নদীর আওয়াজ আর বাতাসের আওয়াজ মিলে যে ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে সেটা কানে আসে। কমান্ডান্ট নদী দেখে দেখে হাঁটতে থাকে।

ভারতের এই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার লোক আছে, নদীয়ার বেশী। বিহারী, নেপালী আছে। পাঞ্জাবীও ছিল ট্রান্সফার হয়ে গেছে। যেন দহগ্রামে এক ইণ্ডিয়া। কিন্তু বন্যার সময় ইণ্ডিয়া তাদের ভুলে গেছে। 'বোঝা যাচ্ছে ইণ্ডিয়া অনেক বড় দেশ।'

কমান্ডান্ট দেখছে নদীর জল এইসব এলাকায় যে তীব্র গতিতে ঢুকছে তাতে কিছুক্ষণের মধ্যে ভেসে যাবে। কমান্ডান্ট ঘোষকে দেখিয়ে বলে এতক্ষণ ক্যাম্পের উত্তর ও দক্ষিণপাড়া ভেসে গেছে। ওদের ক্যাম্প আসার কথা ছিল। কোথায় উঠল, চারদিক তো ফরেন ল্যাণ্ড। ঘোষ জবাব দেয় ফরেন ল্যাণ্ডেই হয়তো উঠেছে। নদী দেখতে কয়েকপা এগোতেই দিগন্ত বিস্তৃত নদী ওদের কাছে এসে পড়ে। আকাশ নদী যেন এক হয়েছে। হুহু করে বাতাস বইছে। পাঁঠা দুটো উচ্চস্বরে চেঁচাচ্ছে।

কমান্ডান্ট ঘোষকে বলে যে এই পাঁঠা দুটো দিয়ে তো আজ পিকনিক হবে। হবে, তবে নেমতন্ন তো করেছে ওরা। এরপর বৃষ্টি আরও চলবে। জলও বাড়বে, সুতরাং ওদের ক্যাম্পে আরও ক'দিন থাকতে হতে পারে। তাই ক্যাম্পে রেখে আসা চাল ডাল গুলো আনলে বোধহয় ভালো হয়। কিন্তু এই কাদা মাটিতে আনা তো সহজ হবে না। সামনে বাংলাদেশের সবুজ টিনের চালের ক্যাম্প দেখা যায়। এরা চারদলে বিভক্ত হওয়া জোয়ানরা একত্র হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। এখান থেকেই লাইন তৈরি করতে হবে। এতক্ষণে ভারতীয় বাহিনী অসহায় বোধ করতে থাকে, আশ্রয়ের জন্য তাদের বাংলাদেশে যেতে হচ্ছে। তারা একবার বাংলাদেশের ক্যাম্পের দিকে তাকায়, একবার পেছনে ফেলে আসা ভারতীয় ক্যাম্পের দিকে। বন্দুক গুলো হাতে চেপে ধরা। ঘাড় সোজা, খুব শক্ত। ঘোষের লেফট, রাইট আওয়াজে তালে তালে পা ফেলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী

বাহিনী বাংলাদেশের ক্যাম্পে এসে ঢোকে।

তাদের দেখতে পেয়ে বাংলাদেশের কমান্ডান্ট লুঙ্গি পড়ে গায়ে শার্ট চাপিয়ে বেরিরে আসে। ইতিমধ্যে ঘোষের নির্দেশে ভারতীয় বাহিনী প্রথমে অ্যাটেনশন, পড়ে ষ্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ হয়ে দাঁড়ায়। অমনি বাংলাদেশের কমান্ডান্টার ভারতীয় কমাণ্ডান্টকে জড়িয়ে ধরে বলে যে রাইফেল কাঁধে মিলিটারি মাঠে তো ভয় পেয়ে গেছে তারা। এখনি তো সীমান্তে গুলি বিনিময় হয়ে যেত। এরপর সবাইকে বারান্দায় উঠে পড়ার ইঙ্গিত করে। ভারতীয় কমান্ডান্ট ঘোষকে পাঁঠা দুটোকে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর ভোজের কাজে লাগাবার জন্য কিচেনে পাঠাতে বলে। এখন আর উভয় দেশের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। উভয় দেশের মধ্যেই বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য একই রকম। শুধু রামাশিস ও পরশমণি হিন্দী ভাষী। রামাশিস ও পরশমণি কিচেনে গিয়ে নিরামিষের কথা জানালে ওরা হো হো করে হেসে সবাইকে জানিয়ে দেয় যে এরা দু'জন ভেবেছে যে তারা এদের বড় গোস্ত খাইয়ে দেবে— সে জন্য আগে থেকে নিরামিষের কথা বলতে এসেছে। রামাশিসরা লজ্জায় পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি তাদের দলের পেছনে আশ্রয় নেয়।

মানুষ গুলো একসাথে মিশে গেলেও ক্যাম্পে দু'দেশের আলাদা জিনিস গুলো চোখে পড়ছে। একসঙ্গে দাঁড় করানো বন্দুক গুলো আলাদা, ঝুলানো ইউনিফর্ম গুলো আলাদা। দেয়ালে, কপাটে সাঁটা নায়ক নায়িকাদের ভারতীয় জোয়ানরা চেনে না। দুদেশের সিগারেটের প্যাকেট আলাদা।

দীর্ঘ দিন ধরে উভয়ে উভয়কে চেনে জানে, হাটে বাজারে দেখা হয়, চৌকিতে দেখা হয়। সে জন্যই বাংলাদেশের কমান্ডান্ট নেমন্তন্ন করেছে। আজ এটা পিকনিকের আনন্দ। বাংলাদেশের কমান্ডান্ট ভারতীয় কমান্ডান্টকে স্কচ খেতে আপ্যায়ন করে।

কমান্ডান্টের ঘরে কমান্ডান্ট বিশ্রামরত। বিছানার তলায় বাক্সে রাখা স্কচ বের করে কমান্ডান্ট টেবিলে রাখে। বাংলাদেশে ফরেন লিকারের সহজ প্রাপ্যতা নিয়ে আলাপ হয়। কমান্ডান্টের সামনে স্কচের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে নিজেরটা হাতে নিয়ে নিজের চৌকিতে বসে। কমান্ডান্ট রাজবংশী ছেলে, রংপুরে বাড়ি। তাই সুযোগ পেলেই রাজবংশী ভাষায় কথা বলে। স্কচের গ্লাস হাতে নিয়ে দু'জনে রসিকতা করে ফ্লাডের নামে টোষ্ট করে 'থিচিয়ার্সফর ফ্লাড'। ফ্লাডের প্রসঙ্গে জানা যায় এই ক্যাম্পের নিচে ত্রিপালের নিচে কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। তার মধ্যে ইণ্ডিয়ার লোকও আছে। কমান্ডান্ট টিভির খোঁজ করায় কমান্ডান্ট বলে একটু পরে সিনেমা হবে— তখন দেখা যাবে এখন তো লেকচার চলছে। এখানে টিভি এক, নদী এক, ফ্লাড এক শুধু টাইমটা

আলাদা। এরপর আসে তিস্তা ব্যারেজ প্রসঙ্গ। কমান্ডান্ট বলে তিস্তা ব্যারেজ হলে আর ফ্লাড হবে না। জল স্লুইজ গেটে আটকানো থাকবে। কমান্ডান্ট বলে তাহলে তো বাংলাদেশ শুকিয়ে মরবে। ফ্লাডের জলপলিতেই তো রংপুর উর্বরা। তখন তো চাবি থাকবে ভারতের হাতে। জল দিলে বাংলাদেশ বাঁচবে, না দিলে শুখা— কমান্ডান্ট বলতে থাকে। কমান্ডান্ট কমান্ডান্টের গ্লাসটা ভরে দেয়।

ঘোষ ছ'জন জোয়ানের সঙ্গে আবার তাদের ক্যাম্পের দিকে রওনা দেয় যতটা পারবে চাল-ডাল নিয়ে আসবে। ঘোষ মাঝে মাঝে নদীতে টর্চ মেরে জলের অবস্থা দেখতে চায়। কুয়াশার জন্য দেখতে পায় না। মনে মনে হিসেব কষে। কত চাল-ডাল নতুন রেশন আনা পর্যন্ত লাগবে আর কত বাঁচাতে পারবে বেচে দেওয়ার জন্য। চলতে চলতে ঘোষ আসার সময় যে সব খাঁড়ি পেরিয়ে এসেছিল তা খোঁজে। পায় না। তাহলে কি সে সব আসলে খাঁড়ি ছিল না—নদীর পার ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে। একটু পরে সে ক্যাম্পের কাটা তারে বেড়া দেখতে পায়। সেন্ট্রি বাক্সের গেটটা পার হতেই টর্চ জ্বালিয়ে দেখতে পায় বন্যার ঘোলা জল। ঘোষ টর্চটা নাড়িয়ে গাড়ি নিয়ে ওরা এসে পৌঁছেছে কিনা জানতে চায়। ওরাও চিৎকার করে ওদের উপস্থিতি জানান দেয়। ঘোষও গুদামের দরজায় পৌঁছে যায়। যতটা টানতে পারবে তাই নেওয়ার কথা বলে। ওরা এক বস্তা চাল আর এক বস্তা আটা এবং ছোট একবস্তা ডাল নিতে পারবে বলে জানায়।

ওদের রওনা করে দিয়ে ঘোষ আর্মারির দিকে যায়। টর্চ ফেলে ছাদের ওপরে ডিউটিরত জোয়ানদের ডেকে ভালো আছে কিনা জানতে চায়। ওরা ভালো আছে বলে জানায়। পরদিন বদলি এলে ওরা যেন বাংলাদেশ ক্যাম্পে চলে যায় — সেকথা বলে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

ঘাসবনে জলের ওপর টর্চের আলো ফেলে ঘোষ এগিয়ে চলেছে। খোলা গেটটা বন্ধ করতে যাবে এমন সময় 'বাবু' বলে ডেকে সেন্ট্রিবাক্সের তলা থেকে কে বেরিয়ে আসে। ঘোষ দেখে বৃষ্টিতে ভেজা একটি মেয়ে। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার সঙ্গীরা তাকে ফেলে কোথায় চলে গেছে। বন্যায় সে কোথাও যেতে চায়। তাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গ নিতে চায়। ঘোষ জিজ্ঞাসা করে সে বাংলাদেশের না ভারতের। সে ভারতেরও না বাংলাদেশেরও না, তার কোন বাড়িই নেই বলে সে জানায়। মেয়েটি ইণ্ডিয়ার না বাংলাদেশের সঠিক জানতে ভোটের কথা রাজীব গান্ধী না এরশাদের কার নাম শুনেছে বলে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই সে কিছু জানে না বলে জানায়। মেয়েটিকে যতবার প্রশ্ন করা হয় ততবারই সে জানায় তার দেশ নেই। ততক্ষণে জোয়ানরা গাড়ি নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ঘোষ একবার ভাবে মেয়েটিকে নিয়ে

ক্যাম্পে তার ঘরে নিয়ে যাবে। তারপর তা না করে সে মেয়েটিকে ভেজা মাটিতেই শোয়ায়। এরকম ঘটনা ঘোষের জীবনে বহু ঘটেছে। অসহায়, দেশ-ঘর-বাড়িহীন একটি মেয়েকে ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে চরপর্ব শেষ হলো। জল, আকাশ, দেশীয় সীমান্তের উর্দ্ধে নয়। একমাত্র বাতাস আর আলোর কোন সীমানা নেই। সীমায় সীমায় এত ভাগাভাগি অথচ কত মানুষ মানুষী আছে যাদের কোন নির্দিষ্ট দেশই নেই। 'সীমান্ত শুধু তাদের ধর্ষিত জীবনকে আরো একটু বিড়ম্বিত করে মাত্র। সে বিড়ম্বনা থেকে তিস্তাপারেরও দেশহীন মানুষেরও কোনো মুক্তি নেই।'

বৃক্ষপর্ব: বাঘারুর প্রত্যাবর্তন

গয়ানাথ আর আসিন্দির আপলচাঁদের ভেতরে দাঁড়িয়ে শনিবার রাত তিনটার সময় তিস্তার ফ্লাড দেখছিল। তাদের ঠিক পেছনে বাঘারু দাঁড়িয়েছিল শালগাছের মত। ফরেস্টের ভেতরে গাজল ডোবায় তিস্তাপাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে একটা সোঁতা মত করে ফেলেছে।

গয়ানাথ আসিন্দিরকে জিজ্ঞাসা করে যে কটা গাছ ভেঙ্গে পড়েছে। আসিন্দির একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দেয় 'চারটা'। গয়ানাথ নিবিষ্টভাবে তিস্তার দিকে তাকিয়ে চোখে জল মাপে। জল একটু বেড়েছে মনে হওয়া মাত্র সে বাঘারুকে জল বেড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। বাঘারু ঝপ করে ঐ সোঁতাটায় ঝাঁপ দেয় জল মাপার জন্য। ওখানে সে একটা কাঠি পুঁতে রেখেছিল। কাঠিটা দেখে সে বলে 'নাই রো'—তারপর উঠে আসে একটা অর্জুন গাছের শেকড় ধরে। এই অর্জুন গাছটা কখন উপড়ে পড়বে সে নিয়ে গয়ানাথ চিন্তা করে। আসিন্দির দেরি না করে অর্জুন গাছটাকে ভাসিয়ে দিতে বলে। গয়ানাথ বাঘারুকে বলে কুড়ালটা নিয়ে আসতে।

বাঘারু কোনো গাছে বিঁধিয়ে রাখা কুড়াল খানা একটানে খুলে নিয়ে গয়ানাথের পেছনে এসে দাঁড়ায়। গয়ানাথ টের পায়না। কারণ সে তখনও জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাঘারু ডাক দেয় 'দেউনিয়া'। বাঘারুকে দেখে গয়ানাথ কুড়াল দিয়ে গাছ কেটে ভাসিয়ে দিতে বলে।

বাঘারু তিস্তার বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে নয়, তাকিয়ে থাকে তার পায়ের কাছের জলের দিকে যেন তার সঙ্গে ঐ বিশাল জলের কোনো সম্পর্কই নেই।

বাঘারু গাছটা কেটে জলে ভাসানোর জন্য প্রস্তুতি নেয়। নাইনলের দড়ির বান্ডিলটা বা হাতে ঝুলিয়ে ঝুঁকে পড়া গাছটার ডালের কাছে চলে গিয়ে দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগাবার মতো করে বাঁধে। দড়ির বাকি অংশ লম্বা করে ফরেস্টের দাঁড়িয়ে থাকা কোনো গাছের সঙ্গে বেঁধে দেয়। তারপর পেছনে নেংটিতে গোঁজা কুড়োলটা বের

করে মাটির সঙ্গে লেগে থাকা শিকড়ে এক কোপ মারে। কোপটা সঠিক জায়গাতেই লাগে। তারপর কয়েকটি কোপ খেয়ে গাছটা নদীর দিকে কিছুটা হেলে যায়। এক সময় ধীরে ধীরে জলের স্রোতে পড়ে যায়। বাঘারু দেখে ফরেস্টে বাঁধা গাছে নাইলনের দড়ির টান লেগেছে। স্রোত গাছটাকে টানছে। এবার বাঘারু ডাঙ্গায় গাছে বাঁধা দড়িটাকে খুলে অন্য একটি গাছে বাঁধে। এবং গয়নাথকে এ কথা জানায়। প্রথম গাছটা ভাসাতে পেরে বাঘারু আরও তিনটি গাছ ভাসিয়ে একসাথে বেঁধে দিতে হবে কীভাবে তা বুঝতে পারে।

যে তিনটে গাছ গয়নাথের সামনের পাড়ের নিচে রাখা আছে সেগুলোর সঙ্গে একত্রে বেঁধে দেওয়ার জন্য বাঘারু শেষ গাছটিকে কেটে দড়ি দিয়ে বেঁধে জলে ভাসায়। জলে পড়ে থাকা তিনটি গাছের ডালপালা-গয়ানাথকে আড়াল করে রেখেছে। তিস্তার জল যখন খলখল ছলছল আওয়াজ না করে গুমগুম আওয়াজ করে তখন বুঝতে হবে জল পাতাল থেকে উঠে আসছে। সে জলে ভেসে যাবে গাঁ-গঞ্জ, বাড়ি-টাড়ি সব। তিস্তার ভাঙ্গনে জলে পড়ে যাওয়া গাছ কেটে ছেঁটে বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিয়ে কয়েকদিন পর জল নামলে ভাটিতে যেখানে ঠেকবে সেখানে গিয়ে গাছের দখল নিয়ে কাছের কোন 'স' মিলের কাছে বেচে হাজার হাজার টাকা লাভের ব্যবসায় নেমেছে আসিন্দির আর গয়ানাথ। কিন্তু এখন তিস্তার ভয়ঙ্কর বন্যা যেভাবে পঞ্চাশ আশি এক একশ বছরের শেকড় সুদ্ধ গাছগুলিকে উপড়ে দিচ্ছে তা সে গয়ানাথ-আসিন্দিরকে খড়কুঠোর মত ভাসিয়ে নিতে পারে তা ভেবে তারা আতঙ্কিত হয়।

গত শনিবার সকাল থেকেই গাজোলডোবার কাছে তিস্তা আপলচাঁদের পাড় ভাঙ্গতে শুরু করে। সেখানেই ফরেস্টের সঙ্গে গয়ানাথের পৈতৃক এক খতিয়ানের সম্পত্তি ছিল এক সময়ে। শেষ সেটেলমেন্টে গয়নাথের সব জমিই ফরেস্টের সঙ্গে করে দেওয়া হয়েছে। গয়ানাথ সেটেলমেন্টের বিরুদ্ধে আপিল করে এবং জলপাইগুড়ি কোর্টে সিভিল ও ফৌজদারি মামলা করে পূর্বাবস্থা বহাল রাখার আবেদন জানিয়ে। আদালতও একটা সময় পর্যন্ত কার্যকর রাখার আদেশ দেন। কিন্তু সময় পার হয়ে গেলে গয়ানাথ আবার দরখাস্ত করে। আদালত এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় গয়ানাথের উকিল জানায় যে — ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাহলে ঐ বিতর্কিত জমির গাছ কেটে নেবে।

সরকার পক্ষের উকিল এবার তিস্তা ব্যারেজের প্রসঙ্গ এনে ঐ জমির প্রয়োজনীয়তা দাবি করেন। আদালত তিস্তা ব্যারেজের মাষ্টার প্লান চান। দিন চেয়ে পরের দিনও দেখাতে না পারায় ঐ জমির ব্যাপারে পূর্বাবস্থা

বহাল থাকে।

সোম-মঙ্গলবার থেকে ক্রান্তি হাট গাজোলডোবা-আপলচাঁদ এলাকার আকাশে ঘন মেঘরাশি জমা হতে থাকে। বৃষ্টি বাতাস খ্যাপা হাতির মত এলোমেলো। এরকম থাকলে তিস্তার জল অবশ্যই বাড়বে। শুক্রবার থেকে ওপরে ভাঙ্গন চলছে খবর আসে। গয়ানাথ তাতে আর কী করবে। কিন্তু শনিবার গাজোল ডোবায় ভাঙ্গনের কথা শুনে আর থাকতে পারে না। জামাইকে ডেকে ভটভটি নিয়ে তৈরি হতে বলে জমি দেখার জন্য। গয়ানাথ তার জামাইকে আদেশ দেয় ভালো একটা টর্চ, বাঘারু, কুড়াল, এক দু বান্ডিল নাইলনের মোটা দড়ি নিয়ে আসতে। চিড়ে গুড়ও আনতে বলে রাত পাহারা দিতে হবে বলে। আসিন্দির চলে যাওয়ার পর গয়ানাথ তিস্তার দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা চেয়ে থাকে। তিস্তার আকাশ, মাটি, জল, বাতাস মাপে। জল বাতাস পূর্ণ এই নদী অববাহিকার আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার কর্মসূচি তৈরি করে নেয়।

ফ্লাড যেন সত্যি গয়নাথের কথা শুনল। যে জায়গাটার ভাঙ্গন ধরে সোঁতার মত হয়েছিল সেখান দিয়ে জল ঢুকল। স্রোতের পথে আরও দুটো গাছ জলে পড়ল। আসিন্দির বাঘারুকে মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে এলো কুড়াল আর নাইলনের দড়িসহ। অর্জুন গাছটা পড়েনি। 'বাঘারু চতুর্থ গাছটিকে ভাসিয়ে আগের তিনটি গাছের কাছে নিয়ে আসে।'

বাঘারু দাঁড়িয়ে আছে বাঁ হাতে নাইলনের দড়ির বান্ডিল জড়িয়ে যার অগ্রভাগ জলে ভেসে থাকা গাছের সঙ্গে বাধা। সে অপেক্ষমান গয়ানাথের আদেশের জন্য। আদেশ পেয়েই বাঘারু তার মুঠোর দড়ি ছেড়ে দেবে, তখন স্রোতের টানে গাছগুলো একটু দূরে চলে যাবে।

আসিন্দির অধৈর্য হয়ে গাছগুলো ছেড়ে দিতে বলে। গয়ানাথ আর একটু অপেক্ষা করতে চায়। 'বানার ক্যানং টান' সেটা আন্দাজ করার জন্য। তা না বুঝতে পারলে গাছগুলো কোথায় চলে যাবে বলা মুশকিল। আসিন্দির মজা করে গাছের গায়ে 'গয়ানাথ এ্যান্ড কোম্পানি' লিখে দিতে বলে। গয়ানাথ অন্ধকারে জলের দিকে তাকিয়ে খানিকটা স্বগতোক্তির মতো করে বলে যে এমন করে গাছগুলোকে বেঁধে ভগবানের নাম নিয়ে ছেড়ে দেবে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে। তখন কোথায় গিয়ে খুঁজবে। বাঘারু গয়ানাথের কথা শুনতে পেয়ে উত্তর দেয় যে যেখানে গাছগুলো ঠেকবে তার পূব পশ্চিমে হয়ত বন্যা বয়ে যাচ্ছে, কে আর দেখবে। গয়ানাথ ভাবে পূব পশ্চিম যদি ভেসে যায় তবে এই ভেলার মত গাছে যে প্রিয়জনকে সে ভাসাচ্ছে তাকে খুঁজে

পাবে কোথায়। আর গাছগুলিকে না পেলে তো তার হাজার হাজার টাকা লোকসান। গাছগুলো যেন গয়ানাথের ময়ূরপঙ্খী। যদি এগুলো পাকিস্তানে ভেসে যায়। এই দুশ্চিন্তার অবসানে গয়ানাথ চিৎকার করে বাঘারুকে ডাকে। বাঘারু সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকে গাছগুলোর সঙ্গে ভেসে যেতে বলে। যেখানে গাছ গিয়ে ঠেকবে সেখানে যেন সে গাছের সঙ্গে থাকে, এরা খুঁজে বের করবে।

বাঘারু গাছগুলো আরও শক্ত করে বেঁধে লাফ দিয়ে ভাসমান গাছগুলোর ডালে উঠে বসে। এরপর গয়ানাথের নির্দেশে আসিন্দির যে দড়িটার একটা দিক ফরেস্টের গাছের সঙ্গে বেঁধে গাছগুলোকে এতক্ষণ টেনে রাখা হয়েছে—তা খুলে দেয়। একটু আন্দোলিত হয়ে বাঘারু সমেত গাছগুলি বন্যার জলে ভেসে চলে অনির্দিষ্ট ঠিকানায়।

পাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্রই বাঘারু বুঝতে পারে সে ডাল সমেত ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু সে আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করে না। বাঘারু দড়ির বান্ডিলটা গলায় ঝুলিয়ে নিতে নিতে বুঝে ফেলে যে গাছটা আর ডুববে না। এবার সে একটা ডালের ওপর শুয়ে পড়ে হাত দুটো দিয়ে ডালটাকে জড়িয়ে ধরে গাছের সঙ্গে মিশে যেতে চায়।

গাছ চারটি যখন নদীর আর একটু ভেতরে যায়, গাছ আর মাটি পায় না; তখন গাছগুলি আরও ডুবে যায়। বাঘারুর পিঠের ওপর দিয়ে জল বয়ে যায়। জলের নিয়মে গাছগুলো ঘুরতে থাকে। গাছের গোড়া আকাশের দিকে ওঠে। বাঘারু সেদিকে যেতে চায় আশ্রয়ের জন্য। সে এমন একটা আশ্রয় পেতে চায় যেখান থেকে সমগ্র নদীটাকে দেখতে পাবে। জলের ধাক্কায় গাছ আবার ঘুরলে বাঘারু গাছের ডালে উঠে বসে। তখন তার সামনে খোলা নদী। তেমন বিপদ দেখলে এখান থেকে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছের ডালপালার চাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। পাড়ের শেষ প্যাঁচটা আসিন্দির খুলে দেয়, বাঘারু 'বাতাসের আর বৃষ্টির দেওয়াল ভেদ করে আরও অন্ধকারের দিকে ছুটে যাচ্ছে।'

যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারার ভয়ে বাঘারু নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। এমন ভয় পেয়ে যায় যে বাঁ হাতটার কনুই দিয়ে নিজের চোখ চেপে ধরে। সে মনে করতে থাকে যদি স্রোতের বেগ একটু কমে যায় তাহলে ভালো হয়, কিংবা কিছুক্ষণের জন্য হলেও কোথাও গাছগুলো আটকে যায়। কিন্তু তা হয় না। বাঘারু এমন করে একসঙ্গে রাত্রির নদী, অন্ধকার, প্রবলস্রোত, বাতাস, বৃষ্টি নদীর মাঝখান থেকে কখনও দেখেনি।

নৌকার গলুইয়ের মত সামনে কান্ড ও শেকড় নিয়ে দুদিকে পা ঝুলিয়ে বাঘারু বসে আছে। গাছ উল্টে যাওয়ার ভয় সে এখন পাচ্ছে না। এই গাছগুলোকে তো সেই কেটে জলে ফেলেছে। কোথায় কত ডাল পালা সে জানে। যদি এর ভেতর সেঁধিয়ে যেতে পারত তাহলে সে পেয়ে যেত একটা বড়ো আশ্রয় যা গয়ানাথের বাড়িতে বাঘারুর ঘরের চেয়ে অনেক ভালো। সে আসন্ন সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করে। 'তাঁর আগে বাঘারুর এখন অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকা।'

এভাবে কত সময় কেটে যায় বাঘারু বুঝতে পারে না। কতক্ষণ আগে গাজোল ডোবা ছেড়েছে সে আন্দাজ করতে পারে না। যদি আকাশে চাঁদ থাকতে থাকতে সে ভাসতে পারত তাহলে হয়ত অনুমান করে একটা হিসেব বের করতে পারত। কিন্তু গয়নাথের সেই অর্জুন গাছটার অপেক্ষা করতে করতে সে সময় পেরিয়ে গেল। এখন এই অন্ধকারে সে কতক্ষণ ভেসেছে তা বলবে কী করে।

বাঘারু জলের অন্তর্ঘাতী কল্লোল শুনতে পায়। এই কল্লোল তার শরীরের ওপরে হাওয়ার পরাক্রান্ত আক্রমণের সঙ্গে মিশে যায়। 'এই দুই আঘাতের মাঝখানে চোখ বুঝে বাঘারু ভেসে থাকে।' ক্রমশ আওয়াজ তার শ্রুতির বাইরে যেতে থাকে। কতক্ষণ এ ভাবে কেটে যায় সে জানে না। তারপর পাখির ডাকাডাকির আওয়াজ তার কানে আসে।

পাখির ডাকে বাঘারুর তন্দ্রা জড়ানো চোখ খুলে যায়। সে কুড়োলের হাতলটা ধরে। ওপরে তাকাতেই দেখে গাছের পাতা ভরা ডালে, দু-একটা পাখি। বাঘারুর পুরো সচেতনতা ফিরে এসেছে। এখন সূর্যের আলো ফুটে ওঠে নি। তার মনে প্রশ্ন জাগে পাখি কোথা থেকে এল। তাহলে কি গাছগুলি কোনো চরে ঠেকেছে। নাকি পাড় বা চর থেকে এসেছে ডালে বসেছে কিংবা এগুলো গাছের সঙ্গেই ভেসে এসেছে।

নদীর স্রোতের বিপরীতে বৃষ্টি ও বাতাস বয়ে চলেছে। এরই মধ্যে বাঘারু বসে আছে ' বেলা ঠাকুরের' ওঠার অপেক্ষায়। এই স্রোত, বৃষ্টি ও বাতাসে বাঘারু অস্থির হয়ে ওঠে। কোথায় সে ঠেকবে, কখন গয়ানাথ, আসিন্দির এসে গাছ ও তাকে উদ্ধার করবে। অন্ধের মতই সে বসে থাকে। বাঘারু চার দিকে তাকিয়ে দেখে ভেসে যাওয়া গাছের পাতাগুলো কতটা স্পষ্ট হচ্ছে। পাখিগুলো আলোর মুখে বসবার জন্য চারটি গাছের ডালগুলোতেই স্থান বদল করে বসেছে। আর সমবেত ভাবে ডেকে উঠছে। পাখিগুলো বাঘারুর নাগালের বাইরে উড়তে থাকে। পাখিগুলো বুঝতে পারছে না বাঘারু আর তারা একই ডালে চড়ে ভেসে যাচ্ছে।

পাখিগুলি আবার ভয়ার্ত হয়ে ওঠায় বাঘারু দেখার জন্য পুরোনো জায়গায় গিয়ে বসে। 'গাছ গিলা গয়ানাথের, পাখি গিলা গাছের, পাখি গিলা গয়ানাথের না হয়।' বাতাসে গাছগুলো যত ওলট্ পালট হবে-গাছে বসবাসকারী, পাখি, পিঁপড়ে, সাপ সবই আরও বেশি করে গাছের সঙ্গে লেপটে যাবে। সেজন্য পাখিগুলো বাতাস জলে উড়ে আবার গাছেই সেঁটে বসে। সে দেখে পাখিগুলো আসলে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে অমন ভয় পাচ্ছে। তারা গাছ পাতার মত অনড় আশ্রয়েও আছে আবার আশ্রয়টি সবেগে কোথাও ভেসে চলেছে। জলের কাছে গেলে তাই তারা ভয়ে চিৎকার করে উঠছে।

এতক্ষণে বাঘারু চিনতে পেরেছে গাছ চারটির মধ্যে একটি শাল, একটি খয়ের, একটি সিসু, আর একটি অচেনা। সে মাঝের শালটির ওপর যেতে চায়—তাহলে পাখিগুলোকে সে ভালো ভাবে দেখতে পাবে। খয়ের গাছের বাঁকা কান্ডটা বেয়ে বাঘারু মাঝের শালগাছটির ওপরে গিয়ে ওঠে। গাছটি জলে ডুবে যেতে থাকে। 'তার হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবে থাকে।'

এখন যেখানে বসেছে এই উঁচু ডালটা বাঘারুর খুব পছন্দ। কারণ এর অবস্থান গাছগুলির মাঝখানে, উঁচুতে চারদিক দেখতে পাওয়া যায়। অসুবিধা, বৃষ্টির ঝাপ্টা বেশি লাগে। পিঠ থেকে কুড়োলটা হাতে নেয়, ডালটার ওপরে একটা মাচান বানিয়ে নিতে। যতদিন ফ্লাড চলবে, ততদিন তো গাছ নিয়ে ভাসতে হবে। যতদিন গয়ানাথ খুঁজে না পায় ততদিন ভাসতে হবে। কাজেই এখানেই একটা স্থায়ী ঠিকানা দরকার, সেজন্যই মাচান বানানো, সে ডাল কেটে নিজের মাথার ওপরের আকাশটা পরিষ্কার করে ফেলে। তার সে গাছগুলোর ওপর প্রভুত্ব কায়েম হয়েছে। সে কাটা ছোট ডালগুলোকে কুড়িয়ে একটা মাচান তৈরি করে ফেলে। কিন্তু ডালগুলো বাঁধতে পারে না। চারদিক দেখে কোথাও সূতলি পাওয়া যায় কিনা। নিজের নাইলনের দড়ির বান্ডিলটার দিকে তাকায়, সেটা কেটে ছোট ছোট দড়ি বের করতে পারে, কিন্তু গয়ানাথকে তো সব বুঝিয়ে দিতে হবে।

অগত্যা তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। নাইলনের বান্ডিলটা খুলে দড়ি দিয়ে ছোট ছোট ডালগুলো পেচিয়ে মোটা ডালের সঙ্গে বেঁধে দেয়। তাতে দড়ি জালের মতো ছোট ডালগুলোকে আটকে রাখে। পড়ে যাওয়ার আর ভয় থাকে না। নাইলনের দড়িটা আবার গলায় ঝুলিয়ে বাঘারু মাচানে গিয়ে ওঠে। আধ শোওয়া হয়। আবার উঠে দাঁড়ায়। ছোটখাটো ডালগুলো কেটে মাচান বানাতে পেরে সে খুব খুশি হয়। তার মনে এমন ভাব আসে যে গাছগুলোকে এবং স্রোতটাকে অনেকটা খুশিমত চালাতে পারছে।

এবার সে একটা লাঠির প্রয়োজন অনুভব করে যা দিয়ে সে জল ও আকাশ দুয়েই ছুঁতে পারবে। প্রথমে খয়ের পরে সিসু গাছটার দিকে তাকায়। সিসু গাছটায় একটা সরু কাটা ডাল দেখতে পায়। সেটা তুলে এনে কুড়াল দিয়ে ছেটে নেয়। ভেতর থেকে কাটা গাছের গন্ধ বেরিয়ে আসে। গাছের ছালের রস ও গন্ধ নাকে পেয়ে বাঘারুর মনে হয় যেন সে বন্যায় ভেসে যাচ্ছে না বনের ভেতরেই আছে। লাঠিটা সে মাথার ওপর ঘোরাতে থাকে, মনের আনন্দে 'হে-হে-হে-হে' আওয়াজ তোলে। ডালের পাখিরা তাড়া খেয়ে আকাশে ওড়ে। পাখির ঝাক্‌টা এতটা ওপরে চলে গেছে যে আর নিচে নেমে ডালে বসতে পারছে না। বিপরীত বাতাসে শুকনো পাতার মতো নদীর জলে ঝরে পড়তে থাকে। বাঘারু বিহ্বল হয়ে তা দেখে তখন সে অনের দূরে, অসহায়।

বাঘারু মাচানে বসে পশ্চিম পাড়ের দিকে তাকায়। ঝরে পড়ে যাওয়া পাখিদের জন্য কষ্ট হয়। সে ঠিক করে ফেলে আর বাঁচাবার জন্য পাখিদের ওড়াবে না। ওরা নিজে থেকে যেমন করে বাঁচে বাঁচুক। পশ্চিম পাড়ের ফরেস্টে কিছু বাড়ি ঘর তার চোখে পড়ে। পশ্চিম পাড়টা তার অচেনা হলেও স্রোতের গতি সেদিকেই। হয়ত সে পাড়েই গিয়ে তার গাছ ঠেকবে। ঠেকলে ঠেকুক। তারপর তো গয়ানাথের কাজ খুঁজে বের করার। বাঘারু পুব পাড়ে তাকায়। রেলের ডিসট্যান্ট সিগ্‌ন্যাল ও কিছু গাছপালা সে দেখতে পায়। আর দেখতে পায় সব জলস্রোত পুবদিকেই ধেয়ে চলেছে। 'জল যাছে পুব পাখে, মুই গাছ গিলা নিয়ে যাছ পশ্চিম পাখে।' এর রহস্য তার বোধগম্য নয়।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে বাঘারু দেখতে পায় তিস্তার পশ্চিম পাড়ে চা বাগানের ফ্যাক্টরীর চোঙা আর বাঁধ। একটু পরে চোখে পড়ে তিস্তার মাঝখানে জল পর্যন্ত ডুবে থাকা কিছু গাছপালা আর টিনের চাল। 'চর আছিল, মানসিলা চলি গেইছে।' একবার বাঘারু ভাবে টিনের চাল আর গাছের মাথায় গাছগুলোকে বাঁধবে কিনা। এতক্ষণ বাঘারুর ভেসে চলা যেন স্রোত নিরপেক্ষ, তেমনি স্রোতও বাঘারু নিরপেক্ষ। কিন্তু বাঘারু যখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে তখন সে স্রোতের তীব্র গতি ও তীব্র কল্লোল অনুভব করে। একটা কাজ করতে পারে বাঘারু—নাইলনের দড়ির একটা ফাঁস তৈরি করে প্রস্তুত থাকতে পারে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ বা টিনের চালের দিকে তা ছুঁড়ে দিতে পারে। যদি লেগে যায় ভালো, না লাগলেও ক্ষতি নেই। এরকম ভাবতে ভাবতে টিনের চালা ও গাছগুলি কাছাকাছি চলে আসে।

যে চর থেকে বিশ বাইশ ঘন্টা নিতাই গজেন নরেশরা তাদের গরু বাছুরগুলোকে বন্যার ভয়ে বাঁধে তুলেছিল,

সেই চরের দিকে বাঘারু বৃক্ষারোহী হয়ে ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যেতে যেতে সে দেখতে পায় রংধামালি-রায়পুরের বাঁধ। বাঁধে বন্যা পীড়িত মানুষজনের সংসার। কিছুক্ষণ আগে এই চরে গাছ বাঁধার ইঙ্গিত সে পেয়েছিল, প্রাকৃতিক ভাবে যেন তা সফল হতে চলেছে। বাঘারু সক্রিয় হয়ে ওঠে এই চরেই নিজেকে আটকাতে। জলস্রোত যতই তাকে ভাসিয়ে নিতে চায় সে এখানে নিজেকে আটকাবেই।

চরে আটকালেই যে সে বাঁধে উঠতে পারবে এমন তো নয়। তবু ওতো মানুষ, গরুবাছুর দেখে মনে ভরসা জাগে এই স্থানটিই তার কাছে নিরাপদ। পশুর অনুভব শক্তির মতো সেও নিজেকে নিরাপদে রেখে কী ভাবে এই চরের গাছে বা টিনে আটকে থাকবে সে জন্য প্রস্তুত হয়। সে গাছগুলোর পেছন দিকে যাচ্ছে গাছগুলো থেকে চরের গাছ বা টিনের চাল ধরবার জন্য। যে গাছটাকে সে এতক্ষণ চিনতে পারে নি। এখন দেখে সেটা চাঁপা গাছ। একটা ডালে পা দিতেই ভেঙ্গে বাঘারু জলে পড়ে যায়। তরবরিয়ে ওঠে। চাঁপা গাছটার গোড়ার দিকে চলে আসে।

বাঘারু দেখে সামনে কয়েকটা সুপুরি গাছ। তার পশ্চিম পাশে দুটো একটা টিনের চাল জেগে আছে। হঠাৎ গাছগুলো গাছের মাথা জড়িয়ে ধরে হেলে পড়ে। সেই সুপুরি থেকে দুলে অন্য সুপুরি। এভাবে সে টিনের চালে গিয়ে বসে।

টিনের চালের ওপর বসে বাঘারু রংধামালি-রায়পুরের বাঁধের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানকার মানুষ-গোরু বাছুর সব দেখতে পায়। জল ছাড়া এসব দৃশ্য তার ভালো লাগে।

এখনও বন্যার জল বাড়ছেই। কোনো আন্দাজই পাওয়া যাচ্ছে না বন্যা কমবে কিনা। তবে বন্যা তো একদিন কমবেই। তখন গাছপালা নিয়ে এখানে এই চরেই অপেক্ষা করবে গয়ানাথের জন্য। বাঘারুর শরীর জানান দেয় তার খিদে পেয়েছে। এখানে তো সে ভাত পাবে না। সে গাছ গাছালির মাথার দিকে তাকায় কোথাও কোনো খাদ্য আছে কিনা। দেখতে পায় সুপুরি গাছে পাকা-কাঁচা সুপুরি। কিন্তু সুপুরিতে কি বাঘারুর খিদে মিটবে।

রবিবার রংধামালি-রায়পুরের বাঁধ থেকে দেখা যায় তিস্তা পুবদিকে ময়নাগুড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। দোমোহনি তাহলে তিস্তার মাঝখানে। সমস্ত সীমা লোপাট করে যতদূর চোখ যায় শুধু তিস্তার ঘোলা জল। বৃহস্পতিবার থেকে যে ঝড়-বৃষ্টি বাতাসের দাপট শুরু হয়েছিল তা বিরামহীন হয়ে আজও চলছে। বৃহস্পতিবার

তিস্তা তার নিজের খাত ভাসিয়েছে, শুক্রবার কায়েম চর ভাসিয়েছে। সেটা চলেছে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। কিন্তু রবিবারে তিস্তা আর কোনো আন্দাজের মধ্যে নেই। রবিবারের তিস্তার ওপর আটষট্টি সালের বন্যার স্মৃতি জেগে ওঠে। ফরেস্ট উৎপাটন করে তিস্তা এ কোন মূর্তিতে ছুটছে।

তিস্তার যখন এ অবস্থা তখন রংধামালি-রায়পুরের বাঁধের ওপর থেকে নিতাইদের চরের অশ্বিনী রায়ের বাড়ির চালের ওপর বসে থাকা একটি লোককে দেখা গেল। নজরে পড়ামাত্রই বাঁধের ওপর থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠল 'মানষি ভাসি যাছে, মানষি ভাসি যাছে।' এ কথা বড় ভয়ঙ্কর। ফরেস্ট ভেসে যাচ্ছে এ তো সবাই দেখছে, কিন্তু 'মানষি' ভাসা দেখে এদের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কী ওপরে কোথাও আটষট্টির বন্যা দেখা দিয়েছে? এর মধ্যে ছোটদের মধ্যে থেকে কেউ 'ঐ একখান ভাসি আসিছে' বলায় সবাই 'কোটত' 'কোটত' বলে চিৎকার করে ওঠে। নিতাই ঐ বস্তুটাকে কাঠ বলে জানায়। নরেশ নিতাইকে জিজ্ঞাসা করে যে অশ্বিনী রায়দের চালে যেটা বসে আছে সেটা মানুষ না কাঠ।

অমূল্য নিতাইকে বলে যে সে যেন রায়পুর চা বাগান থেকে ডেপুটি কমিশনারকে ফোন করে জানায় ঐ মানুষ ভেসে থাকার কথাটা। নিতাই ভোলার কথা ভাবে। ভোলার সাইকেলে চেপে সে ডেপুটি কমিশনারের কাছে যাবে। আবার এও ভাবে 'সে তো মোটে একখান মানষি, কোটত ভাসি আসছে কায় জানে।'

নিতাই মনে মনে ঠিক করে জলপাইগুড়ি শহরে গিয়ে পার্টি অফিসের লোকসহ সে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবে। রবিবার বলে কথা। রিলিফ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। রিলিফের চেয়েও বেশি জরুরী চরের ঐ চালে আটকে পরা মানুষটিকে রেসকু করা সেজন্য রায়পুর চা বাগানের ম্যানেজারকে বলা দরকার। তিনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।

বাঁধের মানুষের কাছে বাঘারু এখন একটা বড়ো দৃশ্য। বাঁধ থেকে তাকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। তিস্তার বন্যা মাপার বড় একটা উপায় যেন বাঘারু। ভেসে আসা বাঘা। সবাই দেখে বাঘারু অশ্বিনীরায়ের সুপুরি গাছে উঠল। আবার চালে নেমে এলো। এটা সবাই দেখতে পায়। কিন্তু যখন সে সুপুরি গাছ বেয়ে গাছের মাচানে ওঠে তখন আর কেউ তাকে দেখতে পায় না। এ ঘটনা বাঁধের মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে বলতে হয় 'তিস্তা রোজকার তিস্তা নয়— কোনো দৈবী খেলা চলছে এই বন্যায়, জল আর হাওয়া। বাঘারুর এরকম অন্তর্ধান বাঁধের লোকজনের প্রধান আলোচনার বস্তু হয়ে ওঠে।

রায়পুরের ম্যানেজার দুপুরে খেয়ে একটু শুয়েছেন। রঘু ঘোষের ডাকে জানলার পর্দা তুলে কথাবার্তা বলে। কখন মিলিটারি আসবে এ প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিবাবুকে ফোন করার প্রসঙ্গ ওঠে। রঘু ঘোষ ম্যানেজারবাবুর ঘরে ঢুকে ফোন করে। জানতে পারে আধঘন্টার মধ্যে মিলিটারি নৌকা চলে আসবে। এরপর রঘু ও ম্যানেজারবাবু বাঁধে চলে যায়। বাঁধের লোক জানতে চাওয়ায় আধঘন্টার মধ্যে মিলিটারি নৌকা এসে পড়বে, বলে। রায়পুরের সুদামবাবু এদের খবর দেয় যে কাকে রেসকু করতে আর মিলিটারি আসবে—সুপুরি গাছ থেকে লোকটি নাকি উধাও হয়ে গেছে। রঘু ঘোষ, ম্যানেজারবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে 'পড়ে যায় নিত গাছ থেকে?'

রঘু ঘোষ বানভাসিদের জিজ্ঞাসা করে তারা সত্যি একটা মানুষকে ভেসে আসতে দেখেছে কি না। কোনো উত্তর পায় না। অগত্যা অসীমবাবুর বড়শালী-রঘু ঘোষের দিকে তাকিয়ে বলে যে সত্যি একটা লোক ভেসে এসেছিল এবং তারপর সুপুরি গাছে উঠে কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

বাঘারুর টিনের চালের ওপর বসে থাকা, সুপুরি গাছে ওঠা এবং সেখান থেকে উধাও হয়ে যাওয়া কাহিনিটা আর সাধারণ ঘটনা থাকে না—তিস্তা বুড়ির অনেক অলৌকিক কাহিনির একটি হয়ে যায়। এরকম উধাও করে দেওয়ার সাধ্য তো একমাত্র তিস্তা বুড়িরই আছে।

এজন্য বানভাসি মানুষগুলোর কাছে ঘটনাটা একটা নতুন মাত্রা পায়। বর্ষার সময় বছরে বার কয়েক বন্যা হওয়া তিস্তার ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়। বড় বন্যা অন্তত একটা হবেই। কোন বন্যার সময় দীর্ঘ হয়ে দু তিনটে বন্যার সমানও হয়।

এবারের এই বন্যা দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়ল। বৃষ্টির বেগ একটু কমলেও একেবারে ছেড়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। তাই বানভাসিরা ভাবতে শুরু করেছে তাদের হয়ত নতুন কোন জায়গায় সরে যেতে হবে। কারণ বাঁধও নিরাপদ নয়। তবে অশ্বিনীরায়ের চালে ঐ একটি লোক ছাড়া আর তো কেউ ভেসে আসেনি—এতে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। আবার সেই লোকটাও যখন সুপুরি গাছে উঠে আর দৃশ্য থাকে নি তখন সে বন্যার হিসেবের মধ্যে পড়ে না।

মোবাইল সিবিল এমার্জেন্সি অফিসার তার লোকজন সহ বানভাসি মানুষদের অস্থায়ী শিবিরের ভেতর ঢুকে যেতে যেতে বলতে থাকে—' কে ভেসে এসেছে? কোথায়? কে দেখেছে? কিন্তু উত্তর শোনার অপেক্ষা

না করে এগোতে থাকে। এভাবে বন্যা দেখতে আসা লোকজনের ভিড়ে উপস্থিত হয়ে ভিড় সরিয়ে নদীটা দেখাতে চায়। কে ফোন করে লোক ভেসে আসার সংবাদ দিয়েছে জানতে চায়। ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন বলে 'রায়পুর চাবাগান' রঘুবাবু এসে অফিসারকে চালটা দেখায়। ইতি মধ্যে জগদীশ, নরেশও এগিয়ে এসে জানায় যে ঐ চালে একটা লোক এসে উঠেছে, সবাই দেখেছে। এখন দেখা যাচ্ছে না তো তারা কী করবে। অভিযোগের সুরে আরও বলে যে সকালে খবর পাঠানো হয়েছে এখন এই বিকেলে এলে কী আর পাওয়া যায়। এবার ঠিক হয় ওখানে গিয়ে দেখে আসার—আসল ব্যাপারটা কী। চরের লোকেরা তো অপেক্ষা করে আছে জল একদিন শুকোবে ওরা চরে ফিরবে নিজ নিজ বাড়িতে। কিন্তু একটা লোক জলে ভেসে এসে এভাবে দেখা দিয়ে সুপুরি গাছে উঠে উধাও হয়ে গেল তাতে এমন কথা ভাবতেই পারে যে 'সুপুরি গাছের মাথা দিয়ে যাদের যাতায়াত তারাও কি এসে চরটার দখল নিয়ে নিল নাকি?' আর সেজন্যই মিলিটারি দরকার, মিলিটারি নৌকা দরকার। লোকটা সুপুরি গাছে উঠে আর নেমেছে কিনা এ নিয়ে অফিসার ভিড়টাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু বারবারই ঐ একই জবাব আসে যে তারা সুপুরি গাছে ওঠা দেখেছে কিন্তু সেখান থেকে কোথায় গেছে তা দেখেনি।

অফিসার এটা বুঝে যায় যে চারপাশের ভিড়টা তাকে দিয়ে একটা কিছু না করিয়ে ছাড়বে না। সে এখন কী করবে ভেবে পায় না। এখন বেলা সাড়ে তিনটে। এখন নৌকা নিয়ে জলে নামলেও তো বেলার মধ্যে ফিরে নাও আসতে পারে। অফিসার আর একটি প্রশ্ন করে যে চরের লোকেরা সবাই এসে পড়েছে তো বাঁধে? কেউ রয়ে যায় নি তো? জগদীশরাই জবাব দেয় যে তারা শুক্রবারেই সবাই চলে এসেছে। এরপর অফিসার এখানে কারও নৌকা আছে কিনা জানতে চায়। ওখানকার নৌকার ভরসা কম। এরা বলে যে তাদের নৌকা নিয়ে বের হবার মত অবস্থা থাকলে তো তারা পুলিশ মিলিটারি ডাকত না। অফিসার বলে যদি এখানে কারও নৌকা থাকে তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে তা রিকিউজিশন করা হবে। তা না হলে সরকারের নৌকা পেতে অনেক দেরি হবে।

অফিসার বলে সরকার থেকে নৌকার ভাড়া দেওয়া হবে এবং মাঝিরও মজুরি দেওয়া হবে। সবাই নীরব হয়ে গেলে রঘু ঘোষ জিজ্ঞাসা করে এখানে কারো নৌকা আছে কিনা। অমূল্য ও নরেশ কী যেন কানে কানে বলাবলি করে। অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করে নৌকার কথা। এবার নরেশ বলে যে তারা চারজনে নৌকায় যেতে পারে-মাথা পিছু আড়াইশ টাকা মজুরি লাগবে-নৌকা ভাড়া আলাদা। অফিসার নৌকা কোথায় জিজ্ঞাসা

করে। কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না। তখন অফিসার রাগত স্বরে বলে ওঠে যে বন্যার সময়-এরকম সুযোগ নিলে কিন্তু সেটা বেআইনী। ওরা মুখ নিচু করে মাটিতে আঁকিবুকি কাটে।

এদিকে জগদীশ বারুই মাঝখান থেকে কিছু কমিশন খেতে চায়। অমূল্যরা তা বুঝতে পারে। বাঘারুর নিরুদ্দেশ নিয়ে এখানে দরকষাকষি চলে। তার জন্য এখানে এতসব কান্ড হচ্ছে।

অফিসার এবার ওদের সাফ জানিয়ে দেয় যে সে এতক্ষণ অপেক্ষা করে আছে রেসকু করার জন্যই। কোথাও নৌকা না পেলে সে আর কী করতে পারে। ওপরে এটাই রিপোর্ট করবে। অবস্থার কোন পরিবর্তন না দেখে অফিসার জিপের দিকে চলে যায়। নরেশ সবাইকে ডেকে জিপ গাড়ি আটকাতে ছুটতে থাকে।

সকালে বাঘারুকে নিয়ে যতটা ব্যস্ততা দেখা গিয়েছিল এখন অফিসার এসে রেসকু করার কথা বললেও অতটা তৎপরতা কারও নেই। সারা দিনেও একটুও বৃষ্টি না কমার জন্য বন্যার বিপদ সম্পর্কেই এখন সকলের চিন্তা বেশি।

তারা আজকের দিনটাকেই ফ্লাডের চরম দিন ভেবেছিল। কিন্তু বৃষ্টি না কমায় চরের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল। ওদের আশঙ্কা তাতে জমি ও চর একাকার হয়ে যাবে। তখন তারা ঘর বাঁধবে কোথায়।

তাদের চর থেকে একটা মানুষকে উদ্ধার করা মানে তো তাদেরই লোককে উদ্ধার করা। কিন্তু অমূল্য নরেশ যে লোকটাকে নিয়ে বিকেলে এরকম রাজনীতি করবে তা ভাবা যায় না। সকালে খবরটা এ মুখ থেকে ওমুখ হয়ে যেতেই বিকেলে যে ওকে নিয়ে এমন হাজার টাকা ব্যবসা করার সুযোগ হাতে আসবে তা কল্পনাও করা যায়নি।

নরেশরা অফিসারকে ধরে ফেলে। অফিসারও নরেশের চিৎকার আগেই শুনে ফেলেছে। খানিকটা আসারপর — সেপাই দুজনের কথা অফিসারের মনে পড়ে যায়। ওদের ওখানে রেখে আসা হয়েছে আরও কোন লোক নদীতে ভেসে আসে কিনা দেখার জন্য। নরেশ অমূল্যের ছুটে আসা দেখে অফিসার খানিকটা ঘাবড়েও যায়। ভাবে, এভাবে চলে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। করারই বা কী ছিল। ওরা একেবারে এতো টাকা চেয়ে বসল। অত খরচ করায় ক্ষমতা তো তার নেই।

অফিসার ড্রাইভারকে রায়পুরের দিকে গাড়ি ঘোরানোর কথা বলতেই নরেশরা তাকে জিজ্ঞাসা করে সত্যি

চলে যাচ্ছে কিনা। তাহলে ঐ লোকটার রেসকুর কী হবে? অফিসার আর নরেশদের মধ্যে দর কষাকষির পর সাড়ে সাতশ টাকা রফা হয়। ওরা অফিসারের জিপে ঐ বাঁধের দিকে চলে যায়। নরেশ অশ্বিনী জোতদারকে ডাক দিয়ে বলে কাদাখোয়াকে খবর দিতে। বালিশও সবাইকে কথাটা জানায় যে এখনি নৌকা ভাসবে। অশ্বিনী জোতদারের মানষি কাদাখোয়াকে খবর দেওয়া হয়। কাদাখোয়া, যার পরণে একটা নেংটি, মাথায় গামছা জড়ানো যেন বন্যায় ভেসে আসা কোন কাঠ। অশ্বিনী তাকে নৌকা ভাসানোর কথা বলে। গামছা জড়ানো মাথা নিয়েই সে বাঁধে ওঠে। কাদাখোয়া ঘুমের মধ্যেই নৌকা শুনে বুঝে ফেলেছিল কোথায় যেতে হবে। সে সেই রংধামালির দিকেই ঘুম জড়ানো চোখে হাঁটতে থাকে। এখান থেকে উত্তরে বাঁধটা যেখানে বাঁয়ে ঘুরেছে সেখানেই বাঁধা আছে নৌকাটা। কাদাখোয়া সেদিকে যায়। সবাই বুঝে ফেলে নৌকা ছাড়তে একটু সময় নেবে। কারণ নৌকাটা এমনি ভাঙ্গা চোরা, তার ওপর লগিও নেই। কয়েকটা বাঁশের লগি ছাড়া এই স্রোতে নৌকা বের করা যাবে না।

বাঁধের ওপর ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে নিয়ে অফিসার নৌকাটার অবস্থার কথা বলে। তার কথায় কেউ কান দেয় না। তখন অফিসার তার সেপাই দুটো কোথায় গেল খোঁজে। মানে নৌকাটা আসছে। ততক্ষণে নৌকাটা এক টুকরো কাঠের মত স্রোতের মুখে এই বাঁধের লোকজনের কাছাকাছি এসে পড়েছে। বাঁধের ওপর অফিসার, রঘু ঘোষ, লিলি, গোপা, অফিসবাবুর বড় শালী, সুদামবাবু, হাটের কেউ কেউ উপস্থিত ছিল। সবাই দেখে নৌকটা বেঁকে চলছে। এটা নৌকার পক্ষে বিপদ। নরেশ, অমূল্য, কাদাখোয়ারা সমবেত চেষ্টায় ওটাকে সোজা করার চেষ্টা করছে। নৌকার মাথার দিকে নরেশ ও অমূল্য, পেছন দিকে কাদাখোয়া লগি মারছে আর তুলছে। তিনজনেরই কাজ নৌকাটাকে স্রোতের বিপরীতে রাখা। তিনজনের চেষ্টায় একসময় নৌকা চরের দিকে ধেয়ে যায়। কিন্তু চরে নৌকাটা আটকানো বড় শক্ত হয়ে পড়ে। অফিসার একটি ছেলের জামা ধরে টেনে বলে নৌকা পৌঁছে গেছে কিনা। এমন সময় সেখানে জগদীশ আসে। জগদীশকেও একই কথা জিজ্ঞাসা করে। 'পৌঁছে গেছে' বলে জগদীশ উত্তর দেয়। এবার অফিসার জিজ্ঞাসা করে ওরা ফিরবে কখন। জগদীশ বলে 'ক্যান? এহনই? দেরি করব ক্যান?'

অশ্বিনী রায়ের চাল ও সুপুরি গাছ বাঁয়ে রেখে নৌকাটা চরের মধ্যে ঢুকে একটা গাছে ধাক্কা খায়। নরেশ একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে। কাদাখোয়া এক হাতে গাছটাকে ধরে আর এক হাতে নৌকাটাকে ধরে জলে ঝাঁপ

দেয়।

অমূল্য সেই পুরোনো দড়িটা দিয়েই গাছের ডালের সঙ্গে নৌকাটাকে বাঁধে। তারপর তারা সবাই বাঘারুকে দেখতে পায়।

'বাঘারু তার গাছগুলোর মধ্যে মাচানের ওপর দাঁড়িয়েছিল।' ওদের নৌকা এসে চালের ওপারে অমন ভাবে লাগায় সে বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাঘারু যখন দেখে, ওরা তাকে দেখেছে তখনই সে বসে পড়ল। এখন ওদের দিকেই সে হাঁটু জড়িয়ে বসে আছে। নরেশ চিৎকার করে বাঘারুকে বলে 'আরে, তুমি ঐ চালের উপুর বইস্যা ছিলা? সেই তখন?'

বাঘারু কিছুই বোঝে না। তখন অমূল্য আবার ডাক দিয়ে বলে—'শুইনছেন? এই দেইনিয়া, শুইনছেন? বাঘারু কোন জবাব দেয় না। বুঝতেই পারে না তাকে কেউ ডাকছে কিনা। ওরা বাঘারুর দিকে জল ছিটোয়, লগি দিয়ে জলে মারে। কিন্তু বাঘারু এসবের কী অর্থ, বোঝে না। বাঘারু হয়ত বুঝেছে—এরা এসে এখানে গাছ জড়িয়ে জিরোচ্ছে। 'শরীর ছাড়া সে কী দিয়ে বুঝবে?'

নরেশ অমূল্য অস্থির হয়ে উঠেছে লোকটাকে এখনও কথা বলাতে না পেরে এদের আসার কারণ বোঝাতে না পেরে। তাই মরিয়া হয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে-'কী শুইনবার পারেন না? বোবা না কালা?

এবার বাঘারু বোঝে যে ওরা হয়ত তার কাছে কিছু চাইবে। প্রথমে কুড়াল দেখায়, তারপর নাইলনের দড়ির বান্ডিল। ওদের মাথায় বুদ্ধি খেলে। ওরা দড়ির একটা মাথা চায়—তাহলে সেটা ধরে ওর কাছে নৌকা নিয়ে যেতে পারবে। সেভাবে ওরা বারবার ভঙ্গি করে দড়ি ছুঁড়তে বলে।

বিকেল আর বেশি নেই। এখনও তাদের অভীষ্ট পুরণ হয়নি। রাত হলে কী করেই বা তারা এখানে থাকবে। বন্যা আসার আগে যারা চর ছেড়ে বাঁধে আত্মরক্ষা করেছে। তারা বন্যার জলের ভেতর রাত কাটাবে কেমন করে। ওদের গৃহকাতর অস্থিরতার সময়েই বাঘারু ওদের কথার অর্থ বুঝতে পারে। 'সে দড়ি ফেলে দিয়ে দুই হাত আকাশে তুলে তাদের আশ্বস্ত করে।'

বাঘারু বুঝে ফেলে মাচান থেকে ওদের দিকে দড়ি ছুঁড়ে দিলে ওরা ধরতে পারবে। আর সেই দড়ি টেনে সে গাছগুলোর তলায় পৌঁছে যেতে পারবে। বাঘারুর গাছ ওদের তিনজনের ভার সইতে পারবে না ভেবে বাঘারু আবার টিনের চালে যাওয়াই সিদ্ধান্ত নেয়। সেজন্য সে আবার সুপুরি গাছে ওঠে। সেখান থেকে টিনের চালে।

বাঁধ থেকে চিকার ওঠে 'নামইছে, নাইমছে।' চালের ঐ লোকটি বাঘারু না কে তা নিয়ে বাঁধে জল্পনা কল্পনা চলে। কেউ বলে লোকটা নরেশ। কেউ বলে ভেসে আসা লোকটা, আবার কেউ বলে নেংটি পরা যখন তখন ওটা কাদাখোয়াই হবে। অফিসার দুপাশ ঘাড়ঘুড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে লোকটিকে পেয়েছে কিনা।

বাঘারু টিনের চালের কিনারে এসে তার কাছে জড়ানো নাইলনের দড়ি জলে ফেলে দেয়। স্রোতের বেগে দড়ি সোজা হলে অমূল্য লগি দিয়ে দড়িটা টেনে নেয়। দেখে মনে হয় বাঘারুই ওদের উদ্ধার করতে এসেছে। প্রথমে নরেশ অমূল্যেরা দড়িটা টানতে ভয় পাচ্ছিল। কারণ ওরা জানে না দড়ির বিপরীত দিকটা কোথায় বাঁধা। তাই ধীরে ধীরে টেনে দেখে দড়ি কতটা শক্ত। বাঘারু চিৎকার করে বলে—'টানেন টানেন না ছিঁড়িবে না ছিঁড়িবে।' যখন ওরা বুঝতে পারে দড়ি ছেঁড়ার ভয় নেই—তখন দড়ি খুলতে বলে। কাদাখোয়া দড়িটা খুলতেই নৌকোটা গাছ থেকে সরে যায়। জোরে টানার সাহস না দেখিয়ে তারা আস্তে আস্তে দড়িটা টেনে ঐ গাছগুলোর কাছে পৌঁছে যায়। বাঘারু দড়িটা টিনের চালের তলার বাটামে গুঁজে দেয়। কাদাখোয়াও বাঘারুর গাছগুলোর একটা মোটা ডালে দড়িটা বেঁধে দিয়ে ডালটা ধরে। অমূল্য ও নরেশ সুপুরি গাছ বেয়ে চালে গিয়ে ওঠে। কাদা খোয়া নৌকার ভেতরই থাকে। 'মুই এইঠে থাকি, নৌকোর ভিতরত্, এই ঠে।'

এদিকে বাঁধের ওপর ভেসে আসা লোকটি চালের ওপর কোনটা এ নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কারণ ওরা বাঁধ থেকে দেখতে পাচ্ছে নরেশ অমূল্যকে। ওদের তো চেনাই যাচ্ছে। আর নেংটি পরা লোকটি নিশ্চয়ই কাদাখোয়া হবে। কাদাখোয়াও নেংটি পরা। কাদাখোয়া যে নৌকায় বসে আছে সেটাতো ওদের জানার কথা নয়। তাহলে সেই চালে উঠে উধাও হওয়া লোকটি কোথায়। এটা প্রায় সবার সিদ্ধান্তই হয়ে গেল ঐ লোকটি নেই।

অফিসার রঘু ঘোষের ওপর অভিযোগ তুলে বলে যে তারাই তো বাগান থেকে ফোনের পর ফোন করে আনালো লোক রেসকু করার জন্য। এখন লোক কোথায়। রঘু ঘোষ, ম্যানেজারের কথা বলে। ম্যানেজার এখানকার লোকদুজনের কথা বলে। এভাবে কার ওপর কে দোষ চাপাবে সে নিয়ে যেন একটা প্রতিযোগিতা চলে।

বাঁধের ওপর থেকে চালটাকে যত কাছে মনে হয়েছিল, চালের ওপর থেকে বেশ দূর বলে মনে হয় নরেশের। সে ভিড়টাকে দেখতে পায়, কিন্তু বাঁধটাকে কাছের বলে মনে হয় না।

নরেশ বাঘারুকে জিজ্ঞাসা করে যে সকালে সে এই চালে উঠে ছিল কিনা। বাঘারু 'হ্যাঁ' বলে। ফের জিজ্ঞাসা করে তাহলে গাছের চরে সে কোথায় উঠে গেল। বাঘারু বলে সে গাছে ছিল। এবার তাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলা হয়। সে যেতে রাজি হয় না। অমূল্য এই চালে বসে তার নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে আর মনে করে তারও চালটা তো এরকম ভেসে থাকতে পারত। বন্যা যেন কিছুটা হলেও পক্ষপাতিত্ব করেছে। তারপর রেগে মেগে বলে বাঘারু যেতে না চাইলে না যাক—তারা চলে যাচ্ছে। নরেশ অমূল্যর দিকে তাকিয়ে চলে যে এটাকে নিয়ে না গেলে তো তারা টাকা দেবে না।

নরেশ বাঘারুকে দেউনিয়া, সম্বোধন করায় বাঘারু বলে সে দেউনিয়া না। তার দেউনিয়া গয়ানাথ জোতদার। গয়ানাথ তাকে গাছের সঙ্গে ভাসিয়ে দিয়েছে। বন্যার জল কমলে গয়ানাথই তাকে খুঁজে নেবে। সুতরাং গাছ ফেলে সে যাবে কী করে। এবার নরেশ যুক্তি দিয়ে বলে যে তার দেউনিয়া তো তাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, গাছ যেখানে ঠেকবে সেখানে থাকতে। তাহলে এই জলের ভেতর দেউনিয়া দেখবে কেমন করে। তার চেয়ে গাছ নিয়ে বাঁধে যাওয়া ভাল। ওখানেই তো দেউনিয়া তাকে খুঁজতে আসবে। ওখান থেকে তো এতদূর দেখা যাবে না। যুক্তিটা বোধ হয় বাঘারুর পছন্দ হয়। আবার তার খিদেও পেয়েছে। নরেশরা বাঁধে খাবার মিলবে বলেও জানায়। অফিসারের কথা শুনে বাঘারু একটু ঘাবড়ে যায়। ফরেস্টের গাছ যদি অফিসার নিয়ে নেয়। নরেশ বলে বন্যায় ভেসে আসা গাছের কোনো অফিসার নেই। ওরা বাঘারুর হাত ধরে টানাটানি করে। বাঘারুও বাঁধ অনেক নিরাপদ, খিদে মুক্তির জায়গা ভেবে পা বাড়ায়।

অমূল্য বাঘারুর হাতটা ধরেই আছে। ঐ অবস্থাতেই নিচে নামতে বলে। এখন সমস্যা হল গাছগুলোকে নিয়ে। যদি গাছগুলো ছেড়ে যাওয়া যেত তাহলে চারজনে নৌকায় বেশ চলে যেতে পারত। কিন্তু বাঘারু তো গাছ ছেড়ে যাবে না। তখন কাদাখোয়ার নেতৃত্বে গাছের বাঁধন খুলে অবস্থাটা বুঝবার চেষ্টা করা হল। বাঁধন খোলামাত্র গাছগুলি দুলে উঠল। ওদের নৌকাটা গাছের দিকে সেঁধিয়ে গেল। এরপর কাদাখোয়া ও বাঘারু দুজনে গাছের উপরের মাচানে গিয়ে উঠল। কাদাখোয়া লগিটা নিয়ে শুধু বাঁয়ে মারতে থাকে। একটা লগি বাঘারুর হাতেও ধরিয়ে দেয়। বাঘারুও লগি মারতে থাকে। 'যেন গয়ানাথের এক বাঘারু এখন দুটো মানুষ হয়ে গেছে, ক্রমাগত বাঁয়ে লগি মেরে ওরা কোনাকুনি বাঁধের দিকে যেতে থাকে।

বাঁধের ওপর থেকে ওরা দেখাতে পায় যে অমূল্য, নরেশ আর কাদাখোয়া সুপুরি গাছে চড়ার পরে নৌকার

বদলে একটা বিরাট গাছের বহর নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। বাঘারু, কাদাখোয়াকে মাচানে দেখা যায় না, নৌকাতেও না। বাঁধের ওরা নানা কথা ভাবতে থাকে। তাহলে কী অশ্বিনী রায়ের কলা আর লিচু গাছ কেটে কেউ নিয়ে পালাচ্ছে। নাকি সকালের ঐ লোকটাই সব কেটে দিয়েছে। কেউ বলে নরেশ-অমূল্যরা ওখানে থাকতে কাটবে কেমন করে। তাহলে ওরাইবা এখন কোথায়।

জগদীশ বারুই চিৎকার করে বলে যে গাছগুলি পাড়ের দিকেই আসছে। সবাই দেখে পাড়ের দিকেই আসছে। বিস্ময়টা আরও বাড়ে। সবাই পাড়ের দিকে দৌড়োয় দেখতে। কিন্তু এটা বুঝতে পারে না — গেল তিনজন মানুষ নৌকা করে, আসছে নৌকার বদলে গাছ। কী করে এতো স্রোত কেটে এতবড় গাছের বহর কোনাকুনি আসছে—এই হিসেবটা কিছুতেই মেলাতে পারছে না। সকালের চালের মানুষটা উধাও, তিন তিনটে মানুষ নৌকা শুদ্ধু উধাও, বদলে এতোগুলি গাছ স্রোত কেটে আসছে এ এক রহস্য নয় কি। রঘু ঘোষ, লিলি, অফিসার এর মধ্যে যেন নতুন ঝামেলা দেখতে পায়। এসব দেখার চেয়ে ঘরে ফেরাই ভাল বলে অভিমত প্রকাশ করে। গাছগুলো একটু ঘুরতেই কাদাখোয়াকে দেখা যায়। সবাই কাদাখোয়া, কাদাখোয়া বলে চিৎকার করে ওঠে। ঐদিকে গাছগুলি পাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। গাছগুলো আর একটু ঘুরতেই দেখা যায় কাদাখোয়ার পাশে আর একটি লোক, কাদাখোয়ার মতই নেংটি পরা। তাহলে কী সকালের সেই লোকটি-ই, তবে নরেশ অমূল্য কোথায়।

গাছগুলো বাঁধের বাঁকটার দিকে যেতে থাকে। বাঁকের আড়াল থেকে একটা সমবেত চিৎকার ভেসে আসে।

চিৎকারটা থামে না। বরং একটু বেড়ে যায়। তারপরই দু একটি বাচ্চা ওদিক থেকে এদিকে দৌড়ে আসে। এবার গাছগুলো আর একটু এগোতেই দেখা যায় গাছগুলোর সামনের নৌকায় নরেশ আর অমূল্য দাঁড়িয়ে। তাদের মাথার ওপরে গাছের ডালের মধ্যে কাদাখোয়া আর বাঘারু। বাঘারুর হাতে সেই নাইলনের দড়ি। সেই দড়িরই একটি দিক পাড়ের লোকজনের হাতে। আর ঐ দড়ি ধরে গাছ আর নৌকা টানতে টানতে নিয়ে আসছে। পাড় থেকে চিৎকার করে জানাতে থাকে — যে ঐ মানুষটাকে পাওয়া গেছে, ফরেস্ট সহ ভেসে এসেছে, ভেসে আসছিল, ফরেস্ট পেয়ে ধরেছে ইত্যাদি নানা কথা।

নরেশ পাড়ে নেমেই 'স্যার কোথায়'—জিজ্ঞাসা করে। সে বাঁধের দিকে উঠতে থাকে। উঠতে উঠতে দড়িখানা বেঁধে রাখতে বলে। বাঁধে পা দিয়েই অফিসারকে দেখে, লোকটিকে এনেছে, এ সংবাদ দেয়। অফিসার নরেশের

পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে তাকে নিয়ে পাড়ে যায়। তাদের মাথার ওপরে কাদাখোয়া ও বাঘারু তখনও গাছের ডালে বসা। নরেশ তাদের নেমে আসতে বলে, স্যার, ভাইস্যা আইছে সেই ফরেস্ট থিক্যা—গাছ গাছালি নিয়্যা।'

অফিসার বাঘারু ও কাদাখোয়ার কব্জি ধরে—ঝাকিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। কাদাখোয়াকে তো বাঁধের সবাই চেনে। ওর হাত ঝাকানিতে সবাই মজা পেয়ে হাততালি দেয়।

অফিসার নরেশ ও অমূল্যর দিকে চেয়ে বলে যে এবার তাহলে তার ছুটি। নরেশ 'হ্যাঁ' বলে পেমেন্টের কথা উল্লেখ করাতে অফিসার বলে যে এখন পাঁচশ টাকা দিচ্ছে বাকিটা কাল অফিসে গিয়ে নিতে। ওরা বাঁধে উঠতে থাকে। বাঘারু আর কাদাখোয়াও ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠে। বাঘারুর সঙ্গে দড়িটাও ওপরে উঠে আসে। অফিসার বাঁধের বিপরীত দিকে নেমে যায়। এর মধ্যে অশ্বিনী রায় কাদাখোয়াকে ডাকে, জানতে চায় তার বাড়িঘর কেমন আছে। আর ঐ মনিষিটা গুয়া গাছে কেন উঠেছে।

বাঘারু তার গাছগুলোকে নিয়ে একটু সরে গিয়ে বেঁধেছে। সে তার মাচানেই থাকে। মাঝে মধ্যে বাঁধের ওপর উঠে আসে। বাঁধের লোকেরা ভুল করে কখনও বাঘারুকে কাদাখোয়া ও কাদাখোয়াকে গাছারু বলে ডাকে। এখানে এসে বাঘারুর একটা নতুন নাম হয়েছে 'গাছারু'। 'গাছারু' নামটা পূর্ববঙ্গের ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী 'গাছুয়া' হয়নি। হয়েছে তিস্তাপাড়ের ভাষারীতি অনুযায়ী।

বাঘারু এখানে এই বাঁধে গয়ানাথ ও আসিন্দিরের জন্য অপেক্ষা করে। একদিন না একদিন আসিন্দিরের ভটভটি চড়ে গয়ানাথ আসবেই রংধামালির বাঁধে। গয়ানাথের জন্য অপেক্ষা দিয়ে এই পর্ব শেষ হতে পারে।

নিতাই যে রিলিফের ব্যবস্থা করেছে তাতে বাঘারুও যুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু বন্যা আরও বেশী স্থায়ী হলে কাপড় জামা, কম্বল ইত্যাদির ব্যবস্থা হলে তখন বাঘারুর পুরোনো নাম দরকার হবেই—গাছারু দিয়ে হবে না। চরুয়া বানভাসি হিসেবে তার নাম রেকর্ড না করার বেশ কয়েকটা কারণ আছে। তার মধ্যে একটি হলো—নরেশ ও অমূল্যর মত সেও এই গাছ সম্পত্তির মালিক। দ্বিতীয় কারণ হল বাঘারুকে ও গাছগুলোকে গয়ানাথ এতদিন এখানে কখনই ফেলে রাখবে না। গাছগুলোকে এখানে কোথাও বিক্রি করে বাঘারুকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবে।

তিস্তার দিকে তাকিয়ে এখন আর মনেই হয় না যে ওখানে ঐ চরে একটা গ্রাম ছিল, তাদের ভরভরন্ত

সংসার ছিল। বানভাসি চরুয়ারা অবশ্য এই বাঁধেই তাদের দৈনন্দিনের ব্যস্ততা নিয়ে এসেছে। কেউ কেউ শহুরে জীবনের স্বাদও পেয়ে গেছে—সিনেমা টিনেমা দেখছে। কেউ আবার দিন বাজারের কাছে মেয়েদের পাড়ায় যাতায়াত করছে। কেউ বাড়ির জিনিস পত্র যেমন জমিয়ে রাখা সর্ষে, তক্তা, বাঁশের জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারছে।

বাঘারু গাছ নিয়ে এভাবে পড়ে থাকায় সবার নজর পড়ে। একদিন রংধামালির এক আড়তদারের নজরে পড়ে যায়। সে প্রস্তাব দেয় গাছগুলি তার কাছে বেঁচে দিতে। ভয় দেখায় পুলিশের। বাঘারু সম্মত না হলে তাকে বোকা বলে গালাগালি করে।

বাঘারু গয়ানাথের এত কাজ করে সেকি এই সামান্য গাছ বিক্রি করার কথাটা বোঝে না। কিন্তু বাঘারু শরীর দিয়ে বোঝে, মন দিয়ে নয়। সে গয়ানাথের অপেক্ষায় দিন কাটায়। বাঘারু যেখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না। তার সামনে, নিচে, পাশে নানা জনে নানা কথাবার্তা বলতে থাকে।

অফিসারের মনে পড়ে যায় লোকটার নাম ঠিকানা তো নেওয়া হয়নি—নরেশকে বলে জানতে। নরেশ প্রথমে 'হেই শুনিছেন' তারপর 'হেই গাছুয়া মানষি' বলে বাঘারুকে ডাকে। বাঘারু অফিসারের গাড়ির দিকে থেকে বাঁ দিকে চোখ ঘোরাতেই নরেশকে দেখে ফেলে। নরেশ তখন তাকে হাতে ইসারা করে কাছে আসতে বলে। বাঘারু যেখানে জিপের সামনে ভিড় শেষ হয়েছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। নরেশ স্যারের সঙ্গে কথা বলার জন্য বাঘারুকে আসার পথ করে দেয়। কিন্তু বাঘারু যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। জিপের ভেতর বসে কাগজ কলম বের করে—অফিসার বাঘারুকে তার নাম জিজ্ঞাসা করে। কোন উত্তর না পাওয়ায় অফিসার নরেশকে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে বলে। নরেশ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে—'মোর নাম ঠিকানা নাই রো। মোর দেউনিয়া।' শুনে নরেশ হাসে। নরেশের হাসি দেখে অফিসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে নরেশ বলে ওর নাকি কোন নাম ঠিকানা নেই। ওর মালিক গয়ানাথের নাম লিখতে বলে। গয়ানাথের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে বলে যে গয়ানাথ সব জায়গাতেই থাকে। এখানেও আসবে। সে কোথায় জলে ভেসেছে বললে উত্তর দেয়—গাজল ডোবায়।

অফিসার ইংরেজি বানানে 'গাজোল ডোবা' লিখে ফেলে। এবার তার নামটা মানাতে পারলেই হয়ে যায়।

সেই মত নরেশ আবার তার নাম জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এবারও তার কোন নাম নেই বলে জানায়। তখন কম্বল, কাপড়, ত্রিপল চিড়াগুড় ইত্যাদি রিলিফের লোভ দেখিয়ে বললে বলে 'গয়ানাথের নাম দেন কেনে।' 'অফিসার ততক্ষণে, গয়ানাথ জোতদারের জমিতে কর্মরত একজন কৃষি শ্রমিক' কথা কটি লিখে ফেলে।' বেশ ক'দিন ধরে চলায় তিস্তার সেবারের বন্যাটা খবরের কাগজের খবর হয়ে উঠল। কলকাতা থেকে আসা খবরের কাগজের লোকদের সাধারণত বন্যা প্লাবিত দুটি জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হত। এক জলপাইগুড়ি শহর থেকে আটমাইল ভাটিতে মন্ডল ঘাটের দুনম্বর চর, আর মাইল চার পাঁচ উজানে এই রংধামালির বাঁধ।

সরকারী হিসেবে বাঘারুর গুরুত্ব হোক আর না হোক— খবরের কাগজ ও টিভির লোকদের নজরে পড়ে যায় বাঘারু। ক্যামেরাম্যান অন্যান্য ছবি নিতে নিতে ভিউফাউন্ডারে বাঘারুকে পেয়ে যায়। দড়ির বান্ডিল গলায় ঝুলিয়ে বাঘারু গাছের ডালের মাচানে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে জল থেকে ফুঁড়ে বেরচ্ছে। ক্যামেরাম্যান একেবারে জলের ধারে গিয়ে শাল-চাঁপা-খয়ের সিসু গাছ সহ প্রায় এক ফরেস্ট নিয়ে উত্থিত বাঘারুকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের সামনে দাঁড় করিয়ে ছবিটা নেয়। কাগজের ফটোগ্রাফারও টিভির ক্যামেরাম্যানের পেছনে হাজির হয়ে একটার পর একটা ছবি নিতে থাকে। এর মধ্যে একটু রসিকতাও চলে—' লোয়ার পার্টে টেলিফেলো না', 'দেখিস আবার-নেংটির-ভেতরের লোমসুদ্ধ তুলে ফেনিস না' ইত্যাদি। 'টিভির ক্যামেরা ম্যান অবিশ্যি একেবারে তলা থেকে আকাশ পর্যন্ত একটা দারুন প্যানিং করেছে—বন্যার জল, ক্লোজআপে আবর্ত, গাছের ডালপালায় জলের স্রোতের আঘাত, আরও ডালপালা, বাঘারুর দুটো পা—ক্লোজআপে ধীরে ধীরে হাঁটু, উরু, কোমর, নেংটি। মিডিয়াম শটে পেট, বুক, তারপর মাথা। সেখান থেকে বাঘারু ধীরে ধীরে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে, আকাশে, নদীতে স্থাপিত হয়।'

'গয়ানাথের আসা পর্যন্ত এসবের মধ্যেই বাঘারুর বৃক্ষপর্ব কাটে।'

মিছিল পর্ব : উত্তরখন্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি

জামাই আসিন্দিরের মোটর সাইকেলের পেছনে বসে গয়ানাথ জোতদার জলপাইগুড়ির উকিলবাবুর কাছে যাচ্ছে। এখন তাকে সবাই 'ভটভটি জোতদার' বলেই ডাকে। তিস্তা ব্যারেজের কাজ ও সেই সূত্রে সেটেলমেন্টের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে গয়ানাথের আর বিশ্রাম নেই। একটার পর একটা মামলা করে চলেছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে, ব্যারেজের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু ষ্টে

অর্ডারও বের করতে পেরেছে গয়ানাথ। ক্ষতিপূরণের মামলাও জিতেছে একটা কিন্তু গয়ানাথা এটা বুঝতে পেরেছে ব্যারেজটা হচ্ছেই। তাই তার ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। চৌপত্তিজোড়া একটা ফেস্টুন তার নজরে পড়ে। 'উত্তরখন্ড সম্মিলন হচ্ছে ময়নাগুড়িতে।'

দোকানে ফিরে গিয়ে রসগোল্লা খেতে খেতে গায়নাথ উত্তরখণ্ডের সম্মেলনের পোষ্টারের কথা আসিন্দিরকে শোনায়। আসিন্দির গায়নাথকে উত্তরখণ্ডে 'জয়েন দেওয়ার' পরামর্শ দেয়। কারণ এটা রাজবংশীর পার্টি। সেও তো ব্যারেজের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে কতো। সিগারেট খাওয়ার জন্য আসিন্দির বাইরে গেলে চা খেতে খেতে গয়ানাথ বিষয়টা সম্পর্কে ভাবে।

গায়নাথ বরাবর কংগ্রেসের লোক। জোতজমিতে বসত দেওয়া কয়েক'শ লোক তার কথাতেই ভোট দেয়। ফরেষ্ট তারই একথা সবাই জেনেও কোন লাভ হয়নি। কংগ্রেস্ কোন সুবিধা দিতে পারেনি। ' তাহলে, গায়নাথ আর মানষির দল কংগ্রেসের পাকে থাকিবেন এই কথাটার ত কোনো লাভ নাই। তা হাইলে এই সব মানষিক নিয়া গয়নাথ নিজের জোরখান তো দেখাবার পারে।' এরকম একটা চিন্তা করতে করতে গায়নাথ উকিলবাবুর বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ে। উকিলবাবুর বাড়িতে এসে শুধু উকিলবাবুকে তার মুখটা দেখানো কাজ। এরপর দরকার মত উকিলবাবু তাকে ডাকতে পারে, মুহুরি দিয়ে খবর দিতে পারে অথবা একেবারে কোর্টে যাওয়ার সময় কোর্টে যেতে বলতে পারে।

গয়নাথ উকিলবাবুর সামনে ফাঁকা চেয়ারে বসে। উকিলবাবু জানায় কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে আরও কিছু কাগজপত্র কপি করে পাঠাতে হবে।

গয়ানাথ কিছুটা সংকোচে কিছু বিনয়ের সঙ্গে উকিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করে কলকাতার মামলা শেষ হওয়ার কোন আন্দাজ মিলেছে কিনা। 'ওদিকে ত ব্যারেজের থাম্বাগিলান নদী খানক অর্ধেক করি দিবার ধরিছে।' উকিলবাবু বলে, তবুও তো জানা গেল ব্যারেজের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এদিকে তো আঠারো মাসে বছর। গায়নাথ জানায় যে কাজ হলে জমি ফেরৎ পাবে কেমন করে। তখন উকিলবাবু বলে তার তো ক্ষতিপূরণের মামলা, জমি ফেরতের তো নয়। তখন গয়নাথ সে কথা স্বীকার করে অন্য যুক্তিতে আসে। তার বক্তব্য জমি ফেরৎ না দিক কিন্তু তার ভেস্ট ল্যাণ্ড থেকেই ব্যারেজে যাওয়া সমপরিমান জমি ফেরৎ দিক। উকিলবাবু এ যুক্তি ঠিক বলে মনে করে। তবে একটু নিচু স্বরে গায়নাথকে বোঝাবার ধরনে উকিলবাবু বলতে থাকে — যে ব্যারেজ বানানো সরকারের কাজ। আদালত এমন রায় চট করে দিতে পারেন না, যাতে ব্যারেজের কাজ বন্ধ

রেখে, বা ব্যারেজ ভেঙে গায়নাথের জমি ফেরৎ দিতে হয়। তবে পুরনো ভেস্ট থেকে ক্ষতিপূরণের কথা নিশ্চয় বিবেচনা করবেন। এরপর উকিলবাবু উত্তরখণ্ড আন্দোলনের কথা আনে, বলে উত্তরখণ্ড তো পশ্চিমবঙ্গ ভেঙে কামতাপুর রাজ্য চায়। তা হলে সেখানকার হাইকোর্ট ব্যারেজ ভেঙে গায়নাথের সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়ার রায় দিতেও পারে। ময়নাগুড়ির বিরাট কনফারেন্সের কথাও উল্লেখ করে, এরপর উকিলবাবু গায়নাথকে জিজ্ঞাসা করে, সে উত্তরখণ্ডে আছে কিনা। উকিলবাবু যদি জমির বদলে উত্তরখণ্ডের কথা এত বেশি জোর দিয়ে বলে তাহলে গয়ানাথ উত্তরখণ্ড হবেই না বা কেন? গায়নাথ পেছনে মুহুরির কাছে গিয়ে দলিলের নকল বিষয়ে আলোচনা করে। মুহুরি তাকে— কোর্টে যেতে বলে। গয়ানাথ উকিলবাবুর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

গয়ানাথের বাবার আমলের জোতদারি থেকে তার আমলের জোতদারি অনেক বেড়েছে। জমি একটু কমলেও চাষ বেড়েছে অনেক বেশি। জমি ফেরৎ পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলে গায়নাথই তো উত্তরখণ্ডের নেতা হয়ে বসত। আর কামতাপুর রাজ্য হবে এমন বিশ্বাসও গায়নাথের নেই। তবে পাছে রাজ্য হয়ে যায় - সেজন্য সরকার ভয় পায়। ভয় যখন পায় তখন ভয় দেখাতে দোষ কী? তাতে তো অনেক কিছু সুবিধা পাওয়াও যেতে পারে। উত্তরখণ্ডে যোগ না দেওয়ার সংকোচ আসলে গয়ানাথের পার্টি না করার সংকোচ। তার ধারণা পার্টি করলে দেউনিয়া হওয়া যায় বটে কিন্তু জোতদারির ক্ষতি হয়। 'দেউনিয়াগিরির পয়সা বেশি , নগদ পয়সা, কিন্তু জোতদারি নাই।' গয়ানাথ তাঁর অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন মিশিয়ে এমন একটা ধারণা তৈরি করে ফেলেছে। বাস্তবে হয়তো এর বিপরীতও দেখা যায়। আসলে সে আপাদমস্তক জোতদার। জোতদারির প্রয়োজনের বাইরে সবই তার কাছে অপ্রয়োজনীয়, অনিয়ম। এই ভাবনাকে জীবনদর্শন বলা যায় না। ভোটাভুটির সময় কংগ্রেসকে ভোট দেয়— বিয়েসাদি নেমন্তন্ন খাওয়ার মত করে। উত্তরখণ্ডে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সে নিতে চায় সেই রকম জীবনদর্শন থেকেই । সে ভাবতে শুরু করেছে— 'এ্যালায় টাইম পড়ি গেইসে পাবলিকের। যে -কাম তোমরালা পাবলিক জোগাড় করি করিবেন না, সে কাম হবার না হয়। আধিয়ার পাবলিক হয়্যা গিছে, সেইলার কাম হছে। জোতদার গিলারও পাবলিক হবা নাগিবে — স্যালায় কাম হবে।'

কিন্তু তার কামটা কী সে তা জানে না। তবে এটুকু বোঝে যদি পাট্টি পুট্টি পাবলিক নিয়ে আসে তার জমি দখল করতে তাহলে তাকেও পাবলিক নিয়ে তা প্রতিহত করতে হবে। 'উত্তরখণ্ড গয়ানাথের পাবলিক।' গায়নাথ এটা ভালো করেই বোঝে যে এখন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখলে চাষাবাদ ভালোই হবে। আর উত্তরণ্ডের দিকে গেলে সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে। তাছাড়া উত্তরখণ্ড যদি গায়নাথের মত

জোতদারের সমর্থন পায় তাহলে 'উত্তরখণ্ড গিলা চাহিবে মোক উশুল করিবার আর লাল পার্টি চাহিবে মোর মানষি গিলাক উশুল করিবার।' তবুও গয়ানাথের তো এখন পাবলিক দরকার। উত্তরখণ্ড ছাড়া তার পাবলিক জোগাবে কে। এসব ভাবতে ভাবতে গয়ানাথ কাছারির দিকে হাঁটা শুরু করে।

সন্তোষ মুহুরি যদি দেরি করিয়ে দেয়, তাহলে তো ময়নাগুড়িতে নামতে পারবে না, তাই কাছারিতে গিয়েই মুহুরিকে তার তাড়ার কথা জানায়। মুহুরি প্রথমে একটা ছোট নোটবুক , পকেট থেকে বের করে। তাতে না পেয়ে একটা বড় ডায়েরির পাতা উল্টিয়ে ,'পেয়েছি', 'পেয়েছি' বলে জানান দেয়। কী কী লাগবে জিজ্ঞাসা করলে মুহুরি একটা ইনল্যাণ্ড বের করে ২৩১ নম্বর পর্চাটার উল্লেখ করে। আবার ২৩৩ নম্বর দাগের কথা বলায় - গয়ানাথ জানায় ওই নম্বরে কোন জায়গা নেই। এই ফাঁকে গয়ানাথ চায়ে চুমুক দিয়ে নেয়। মুহুরি চাবিটা তার হাতে দিয়েই বলে যে ওটা নিয়ে গিয়ে ওতে যা যা চেয়েছে তা যেন জোগাড় করে রাখে। গয়ানাথ মুহুরিবাবুকে নমস্কার জানিয়ে চিঠি নিয়ে হাঁটা শুরু করে। পি ডব্লিউ মোড়ে, স্কুল বোর্ডের অফিসের সামনের একটা চায়ের দোকানে বসে। অসিন্দিরের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আসিন্দির এসে পড়ে। আসিন্দির জানায় সে কোর্ট থেকে মুহুরি বাবু হয়ে এখানে এসে এতক্ষণ হর্ন দিচ্ছে। গয়ানাথ একটু অপ্রস্তুত হয়। পরে আসিন্দির মোটর সাইকেল চালানো শুরু করলে গয়ানাথ বলে 'ময়নাগুড়িত পঞ্চানন মল্লিকের ঘরত্ যাম।' আসিন্দির জিজ্ঞাসা করে তবে কি গয়ানাথ উত্তরখণ্ডে যোগদান করবে। আচমকা আসিন্দির মোটর সাইকেলটা থামায়। মোটর সাইকেলটা কাঁপতে থাকে। সেই মুহূর্তে গয়ানাথ তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। 'ধরিম তো উত্তরখণ্ড ধরিম। মুই না ধরো তো তোক দিয়া ধরাম। না ত তোর এই কোর্ট আর হাকিম করি আর জোতজমি সামলিবার পারিবেন না হে।' গয়ানাথের ইচ্ছা এই মুহূর্তে সে যোগদেবে না, আসিন্দির যোগদান করুক। চলন্ত মোটর সাইকেলে গয়ানাথ একথা বোঝাতে পারে না।

ময়নাগুড়ির চৌপত্তি মরণচাঁদের দোকানে দু'জনে দুকাপ চা খেতে খেতে গয়ানাথ আসিন্দিরকে তার কৌশলের কথা আলোচনা করে। এখনই তার উত্তরখণ্ডে যোগ দেওয়া ঠিক হবে না। বরং জামাই আসিন্দির যোগদান করুক। কারণ তার মামলা আছে। সে যোগ দিলে মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে। এছাড়া জামাই যোগ দিলে, জামাই তাকে দলে আনতে পারে এই ভয় থাকবে— তাতে কাজ বেশি হবে। গায়নাথের এই কৌশল আসিন্দির মানতে চায় না। তার মতে যেতে হলে দু'জনেরই যাওয়া উচিত। তাতে বেশি নাড়া পড়বে। ' লিডারি করিবার চাহেন তো লিডারি করিবার নাগিবে। লিডারি কি হাউলি দিয়া হয়? না হয়।' গয়ানাথ উত্তরখণ্ডে 'জয়েন

দিলে' সেটা যে একটা হৈ হৈ ব্যাপার হবে আসিন্দির গয়ানাথকে সে কথা জানায়।

ওরা যখন পঞ্চানন মল্লিকের বাড়ি যায়, তখন তিনি ঘুমুচ্ছিলেন। একটা ছেলে কাঁসার ঘটিতে জল ও স্টেইনলেস ষ্টিলের গ্লাসে জল দিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে পঞ্চানন মল্লিক এসে উপস্থিত হন। তাঁর পরনে গেঞ্জি ও ধুতি। গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে পৈতে দেখা যাচ্ছে। নমস্কার বিনিময়ের পর গয়ানাথই প্রথম কথা শুরু করে। বলে, জলপাইগুড়ি কোর্টে যাওয়ার সময় সে উত্তরখণ্ডের সম্মেলনের পোষ্টার দেখতে পায়। তাই সে সম্পর্কে জানার জন্যই এসেছে- সে তো — রাজবংশীদের পার্টি। পঞ্চাননবাবু একটু সংশোধন করে বলেন যে প্রধানত রাজবংশীদের। আসলে সব মানুষের। কামতাপুর রাজ্যের দাবি যারা সমর্থন করে তাদের সবারই দল উত্তরখণ্ড। গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে তিস্তা ব্যারেজ সম্পর্কে উত্তরখণ্ড কিছু বলে কিনা। পঞ্চাননবাবু উত্তর দেন যে সে সম্পর্কে অবশ্যই তাদের বক্তব্য আছে। এবার গয়ানাথ তার পুরোনো যুক্তি উপস্থাপিত করে। বলে - সে চায় যে জোতদারের ব্যারেজে জমি গেছে সেই জমির সম পরিমান জমি তাদের ভেস্ট জমি থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। যুক্তিটা পঞ্চাননবাবুও সমর্থন করেন। তবে 'জোতদার' কথাটার পরিবর্তে 'কৃষক' শব্দটি ব্যবহার করার কথা বলেন। 'কৃষক' শব্দটি কমিউনিস্টরা ব্যবহার করে বলে গায়নাথ আপত্তি তুললে পঞ্চাননবাবু কৃষকের প্রকৃত অর্থ তাকে বুঝিয়ে দেন এবং সে জন্য এ শব্দ কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয় সেকথাও জানান। গয়ানাথ কৃষক হওয়ার চেয়ে জোতদার হওয়ারই পক্ষপাতি। তাই পঞ্চাননবাবুর কথা শুনে একটু থমকে যায়। আসিন্দির তক্তপোশ থেকে উঠে এসে বলে যে ' উত্তরখণ্ডের কৃষক আর লাল পার্টির কৃষক এক নহে, আলাদা।' পঞ্চাননবাবু সম্মতি সূচক মাথা নাড়েন। গয়ানাথের ঘোর কাটে না। তাহলে 'মুইও কৃষক, মোর জোয়াইও কৃষক, মোর মানষি বাঘারুখানও কৃষক।' পঞ্চাননবাবু গয়ানাথকে ফের এ ভাবে বোঝান যে জোতদার বললে সব মানুষকে বোঝানো হয় না। বেশি মানুষকে দলে আনতে হলে কৃষক শব্দটি ব্যবহার করাই সঙ্গত।

কামতাপুর রাজ্যে তিস্তা ব্যারেজ থাকবে কিনা গয়ানাথের এই সরল প্রশ্নে পঞ্চাননবাবু একটু গম্ভীর হয়ে যান। পরে বলেন যে প্রশ্নটা তো জমি অধিগ্রহণ নিয়ে, ব্যারেজ নিয়ে নয়। তাই 'নদীর জমি দিয়া নদীর ব্যারেজ বান্দো।' তাহলে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারটা আসে না। গয়ানাথ একথায় খুশি হয়। এবার প্রশ্ন তোলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে— কামতাপুরে তা থাকবে কিনা। পঞ্চাননবাবু উত্তর দেন যে কামতাপুর রাজ্য তো ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য হবে। তাই ভারতের আইনকানুন এখানে বলবৎ থাকবে। শুধু লক্ষ থাকবে সেই আইন কৃষক বিরোধী যেন না হয়। সেই সঙ্গে গয়ানাথের দলে যোগ দানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। গয়ানাথ

তিনচার মাস পর উত্তরখণ্ডে যোগ দেওয়ার কথা জানালে — পঞ্চাননবাবু বলেন যে সে যোগ না দিলে সম্মেলনে ব্যারেজের কথা বলবে কে? সেই তো লিডার হয়ে ব্যারেজ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে। গয়ানাথ তার জামাইকে বাইরে রাখতে চায়। কারণ তাতে সরকারের বিষ নজরে পড়বে না। পঞ্চাননবাবু বলেন— তাহলে আসিন্দির সাংস্কৃতিক শাখায় পার্টনার হোক। এরপর ওদের হাত তুলে বিদায় জানিয়ে দলের সম্পাদক বীরেন্দ্র বসুনিয়া সহ তারাই ক'দিন পর দেখা করবে বলে জানান।

'নিখিলবঙ্গ উত্তরখণ্ড সমিতি'র পক্ষে প্রথম সম্মেলনের প্রস্তুতি ময়নাগুড়িতে জোরকদমে চলছে। সম্মেলনের শেষে প্রতি সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সম্মেলনে যোগ দিতে কারও পয়সা লাগবে না। কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ফার্স্ট ক্লাস পনের টাকা, সেকেন্ড ক্লাস দশ টাকা, থার্ড ক্লাস পাঁচ টাকা। চেয়ারগুলো ডোনার আর কমপ্লিমেন্টারি কার্ড যাদের দেওয়া হবে তাদের জন্য। সম্মেলন সকালে আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বিকালে। দু'দিন নবরঙ্গ অপেরার 'কুলটার কুল' ও 'প্রমোদতরনী' পালা। এতে তিনজন ফিল্ম এ্যাকটর আছে— সানু ব্যানার্জী, এলবার্ট সেন ও মোনা গুপ্তা। হিন্দী ও বাংলা গানের আসরে গাইবেন মান্না দে - অনুপজালোটা। আছে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের সামাজিক নাটক। একদিন সারারাত ধরে ভিডিও ফিল্ম দেখানো হবে। শেষ দিনে বম্বের শ্রীদেবীর নাচ। পরদিন সকালে অনুষ্ঠান মণ্ডপ থেকে বিরাট শোভাযাত্রা যাবে জল্লেশ মন্দিরে। সেখানে জল্লেশ্বর শিবের সামনে হবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

সম্মেলনের জন্য যে অনুষ্ঠান হচ্ছে তা নয়। এরকম অনুষ্ঠান প্রতি বছরেরই হয়ে থাকে। তবে এ বছর অনুষ্ঠানটা 'উত্তরখন্ড ফাংশান' নাম পেয়ে গেছে। তের জনে শেয়ার কিনে অনুষ্ঠান করছে। এদের সঙ্গে উত্তরখন্ড সম্মেলনের সরাসরি যোগাযোগ নেই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পোষ্টার লাগানো হয়েছে উত্তরখণ্ডের সর্বত্র। এমনকি আসাম, বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতেও। পোষ্টার হিন্দী, নেপালী ও অসমীয়া ভাষাতেও করা হয়েছে। ডালখোলা, কিষাণগঞ্জ, পাণ্ডু, বঙ্গাইগাঁও, গৌহাটি-আলিপুরদুয়ার জংশন, দার্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের নানা জায়গায় টিকিট বিক্রির সেন্টার খোলা হয়েছে। ছ'দিনের অনুষ্ঠান। শেষদিনের অনুষ্ঠানের টানেই অন্যদিনের অনুষ্টানের টিকিট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে যারা আসবে তারা তো ট্রাক ভাড়া করে আসবে। কিন্তু পাশাপাশি ১৫/৩০ কিমির মধ্যে যারা আসবে তাদের জন্য ফিরতি পথে বাসের ব্যবস্থাও করা থাকবে।

শেষদিনের অনুষ্ঠানের দিন ময়নাগুড়ি শহর যে পুরো জ্যাম হয়ে যাবে সে কথা হলফ করে বলা যেতে

পারে। অবশ্য সে জন্য ময়নাগুড়ি থানা সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আসামের বাস পুবে, আর বিহারের বাস পশ্চিমে দাঁড় করানো হবে। তরাইয়ের বাস গুলিও বেশ দূরত্বে দাঁড় করানো থাকবে। কারও সঙ্গে যেন কোন মুখোমুখি না হয়। সব বাসের গাড়ির মুখ থাকবে শ্রীদেবীর মঞ্চের দিকে—বিশেষ দূরত্বে।

ময়নাগুড়ি থানার বড়বাবুর কাছ থেকে বীরেন্দ্র বসুনিয়া একটা চিঠি পান। তাতে জানানো হয়েছে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠেয় একটি মিটিংয়ে যেন তিনি তার বারো জন সদস্য সহ উপস্থিত থাকেন। সঙ্গে উত্তরখণ্ড সম্মেলন কমিটির উদ্যোক্তাদেরও নিয়ে আসেন। এই মিটিংয়ে মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী ও বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন।

বার দুয়েক চিঠিটা পড়ে ফতুয়ার পকেটে রেখে বীরেনবাবু কপি ক্ষেতে নেমে পড়েন। শীতের সময় বাড়ির সংলগ্ন জমির কিছু অংশে ফুলকপি, বাঁধা কপি, মটর শাক করেন বীরেনবাবু। তাঁর কিছু খেতি জমি আছে। তাতে সারা বছরের খাবার হয়ে যায়। চার মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বড় ছেলে জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে বি এ পাশ করে বাড়িতে জমি জমা দেখা শোনা করে। পুকুরে মাছের চাষ করে। ছোট ছেলে কলকাতায় ওকালতি পড়ছে। ছেলের জন্যই আজও সেরেস্তা ধরে আছেন বীরেনবাবু। ময়নাগুড়িতে বসেই বরাবর প্র্যাকটিস করে আসছেন জলপাইগুড়ি কোর্টে। বীরেনবাবু ওকালতি পেশাটাকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন। আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে তাঁর বড় ভালোলাগে। ফৌজদারি মামলা করেন— তবে বেশি ঝোঁক সিভিল কেসে।

বীরেনবাবুও প্রথমত রাজবংশী। নইলে কেন তিনি উত্তরখণ্ডের সম্পাদক হয়ে সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন, সেরেস্তা আগলে আছেন ভবিষ্যতের একজন রাজবংশী উকিল জলপাইগুড়ি বা হাইকোর্টে বসাবার জন্য। বীরেনবাবু তাঁর জমির ছোট্ট দুটি টুকরোয় তরকারি লাগান। বাকি দেড় বিঘে মত জমি পড়েই থাকে। এদিকে এখন এধরণের পতিত জমিতে তরকারি চাষের জন্য কিছু তরকারি চাষি কিছু টাকার বিনিময়ে ক'মাসের জন্য লিজ নিচ্ছে। পুরোনো রাজবংশী বাড়ি ছাড়া কাদেরই বা দু'তিন বিঘের জমি আছে বাস্তু ভিটেয়। সুতরাং এভাবে রাজবংশী বাড়ি গুলো পয়সার লোভে জমি লিজ দিয়ে ক্রমশ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছে। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ধুপগুড়ি অঞ্চলে রাজবংশী পরিবারে এরকম সংখ্যা হ্রাসের কারণ এই দাদনের চক্রে পড়ে যাওয়া।

বীরেনবাবুর পঁয়ত্রিশ বছর প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতায় দুশ্চিন্তা যে আগামী কয়েক বছরে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি,

ফালাকাটা এরকম জংশন শহরে ডুয়ার্সে রাজবংশীরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। আইনের পথে এ ঠেকানো যাবে না। একমাত্র উপায় সমস্ত রাজবংশীকে এক হয়ে আসামের মত আন্দোলন করা। ' বিদেশী খেদাও' না হোক এ আন্দোলনে রাজবংশীর জমি অরাজবংশী কেউ কিনতে পারবে না এরকম একটা ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ রাজবংশী অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্রতা দাবি করা। আপাতত তার নাম উত্তরখন্ড দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে পাল্টে দেওয়া যেতে পারে।

কপি ক্ষেত থেকে বীরেনবাবু কুঁয়োর পাড়ে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বারটা সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় ওঠেন। জামা কাপড় পড়ে স্ত্রীকে 'উত্তরখন্ডে যাচ্ছি' বলে বেরিয়ে পড়লেন সম্মেলনের উদ্দেশ্যে।

বীরেনবাবুর মত একজন উকিল, বয়স্ক মানুষ, সারাটা জীবন যিনি কাটিয়েছেন জেলা শহরের কেন্দ্রে, জেলার রাজনীতি-প্রশাসন দেখেছেন গভীর ভাবে। দারোগার চিঠি কেন লেখা হল, কী কারণে — তা তো জলের মতই পরিষ্কার।

' ওরা চাইছে সম্মিলন ও অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা ভাগাভাগি ঘটিয়ে সম্মিলনটাকে বন্ধ করতে। বামফ্রন্টের সরকার ও সরকারের পার্টি গুলির কাছে বম্বের কোন সিনেমা ওয়ালি শ্রীদেবীর নাচ অনেক নিরাপদ। কিন্তু রাজবংশীরা আলাদা ভাবে বসে কিছু কথাবার্তা বলবে তা অনেক বেশি বিপজ্জনক 'উগ্রপন্থী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'।'

অমন চিঠিটা পেয়ে তিনি নিজের ফতুয়ার পকেটে রেখে কপির ক্ষেতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। চিঠিটাকে এমন উপেক্ষা ও অপমান আসলে ' নিজের ও নিজেদের বহু বহু প্রাচীন উপেক্ষা ও অপমানের শোধ' নেওয়া।

বীরেনবাবু পায়ে হেঁটে চৌপত্তিতে মরণচাঁদের দোকানে একবার উঁকি মেরে বি.ডি.ও অফিসের পাশে সম্মেলন স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে নকুলকে পেয়ে গেলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে চিঠিটা বের করে নকুলকে পড়ে শোনালেন— 'জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে মিটিং, নর্থবেঙ্গলের মন্ত্রীরা থাকবে, তোমাদের তের জনকে থাকতে হবে আর উত্তরখণ্ডের লোকজনদের সঙ্গে নিতে হবে।' নকুল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে এখনও হাঙ্গামা মেটেনি? কবে মিটিং। বীরেনবাবু সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন 'পরশু দিন'। নকুল উত্তেজিত হয়। বীরেনবাবু তাকে থামিয়ে বলেন যে - এসব সম্মেলন বন্ধ করার চেষ্টা। যা হোক ফাংশান ও কনফারেন্সের লিডারদের একবার মিটিংয়ে বসার পরামর্শ দেন, যাতে ওই দিন যথাযথ বক্তব্য রাখতে পারে। নকুল অত্যন্ত বিরক্তি ও অভিমানে এসব মিটিং টিটিং-এ না বসার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

বীরেনবাবু ওদের সবাইকে কাছে ডেকে একটা লিষ্ট বানাতে বলেন যাতে মিটিং ডাকতে সুবিধা হয়। আর

জলপাইগুড়ির মিটিংয়ে যা যা বলা হবে, ওরা কী প্রস্তাব দেবে, তার উত্তরে কী বক্তব্য হবে, সব যেন ঠিক করে ফেলা হয়। বীরেনবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নকুলের দিকে তাকিয়ে বলেন যে রাত্রে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করা হয়। আর তের জন পার্টনারের মধ্যে কেউ যেন এমন না বলে 'উত্তরখণ্ড শেষ দিনের জল্পেশ্বর অভিযান আলাদা জায়গায় নিয়ে যাক।' কারণ এটা মেনে নিলে মনে হবে যেন সরকার উত্তরখণ্ডকে শাস্তি দিচ্ছে আর তারা এর সুযোগ করে দিল। রাত সাড়ে নটা নাগাদ বীরেনবাবুর বাড়িতে নকুল, জগদীশ, সুরেন, নবীন, তিলক, তরনী, বাবুরা এসে আলোচনায় বসল। সুরেনই প্রথম কথা শুরু করে বলল যে তারা এই সিদ্ধান্ত করেই ফেলেছে যে উত্তরখণ্ড সম্মিলনি আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটাকে যদি আলাদা করা হয় তবে তারা তা করতে দেবে না। বীরেনবাবু দেখে নেন এখানে যারা এসেছে তাতে ফাংশানের কর্মকর্তাই বেশী।

বীরেনবাবু চিঠির কথা তুলে বলেন যে ফাংশান কমিটির তেরজনকেই মিটিংয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। কথা বলার জন্য নকুলরা দেবনাথ মাষ্টার ও শিলিগুড়ির উমা উকিলের নাম উত্থাপন করে। বীরেনবাবু এ প্রস্তাব সমর্থন করেন তবে— দেবনাথ রাজবংশী সমাজের একমাত্র পি এইচ ডি — ইউনিভার্সিটিতে চাকরির চেষ্টা করছেন, তার কথা বলেন। আর উমাপদ তো কংগ্রেস করে। জগদীশ বলে উত্তরখণ্ডের প্রায় সবাই তো কংগ্রেসের লোক। বীরেনবাবু কোচবিহারের সন্তোষের নাম উল্লেখ করেন। সন্তোষ এখন অ্যাডভোকেট, ষ্ট্রংলি আরগু করতে পারে।

সবাই চুপচাপ হয়ে গেলে তরনীবাবু বলে যে আগে থেকে একটা উপায় ভেবে রাখা দরকার। যদি ওরা এখন প্রস্তাব দেয় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ থেকে শেষদিনে মিছিল বের করা চলবে না। মানে শ্রীদেবীর নাচের জায়গা থেকে জলপেশ অভিযান বাতিল করতে হবে। তবে নিজেদের ভেবে রাখা দরকার বিকল্প কোন জায়গা — চৌপত্তি। চৌপত্তি থেকে মিছিল বের হলে তো বোধহয় ক্ষতি হবে না।

'সে রকম আপোসের কথা ভাবতে হবে বৈকি।' বলে বীরেনবাবু অভিমত প্রকাশ করেন।

জলপাইগুড়ির বাংলো ধরণের সার্কিট হাউসটা ইংরেজ আমলের। প্রধানত সাহেবদের জন্যই এটা তৈরি। সেখানেই মিটিং বসে। সেদিনের মিটিংটা ময়নাগুড়ি নিয়ে বলে ছোট। তবে শ্রীদেবীর ফাংশান বাতিল হতে পারে শুনে অনেকে এসে বাইরে ভিড় করেছে। মিটিংয়ে এসেছেন জলপাইগুড়ির এম এল এ, কোচবিহারের এম এল এ ও ডুয়ার্সের আর এক এম এল এ এবং বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী। এঁরা সবাই ভেতরে। কিন্তু ময়নাগুড়ির এম এল এ বাইরের ভিড়টার সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। যেহেতু ঘটনাটা ময়নাগুড়ির তাই তার দায়িত্ব বেশি

বোঝা যাচ্ছে। পেছন থেকে একজন এম এল এ কে হেমেনদা সম্বোধন করে এই কুরুক্ষেত্র মিটমাট করতে বলে। একটা যুক্তি আসে — যদি কংগ্রেস এমন সম্মেলন ও শ্রীদেবীর নাচ করত তাহলে কি বাধা দেওয়া হত? অমনি ভেতর থেকে পর্যটনমন্ত্রীর ডাক আসে। এম এল এ ভেতরে চলে যান। ভিড়টাও কমে যায়।

মিটিংয়ের টেবিলটা ঘিরে বসে আছেন ডেপুটি কমিশনার, অ্যাডিশনাল ডিসি, অ্যাডিশনাল এস পি, এরা সবাই বসেছেন সোফাতে। ময়নাগুড়ির ওসি ভেতরে একটা কাঠের চেয়ারে বসেছেন। পর্যটনমন্ত্রী বেরন নি। শিল্পমন্ত্রী বেরিয়ে সুবিমলবাবুর খোঁজ করছেন। বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। সাধারণ রীতি অনুযায়ী জেলায় এধরনের মিটিংয়ে কোন কেবিনেটমন্ত্রী উপস্থিত থাকলে তাঁকেই সভাপতি করা হয়। শিল্পমন্ত্রীরই সেক্ষেত্রে সভাপতিত্ব করার কথা। সুবিমলবাবুর ডানদিকের চেয়ারে বনবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভুবনমোহন রায়। উনিই একমাত্র রাজবংশী মন্ত্রী। তাঁর পাশে ময়নাগুড়ির এম এল এ হেমেনবাবু। তারপর থেকে উত্তরখন্ড ও অনুষ্ঠানের লোকজন।

কথা কে আগে শুরু করবে তা নিয়ে একটু ইতস্ততঃ দেখা যায়। সবাই এর ওর দিকে তাকান। অবশেষে বীরেনবাবু কোচবিহারের সন্তোষবাবুকে বলেন বলতে।

সন্তোষবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন যে আজ বুধবার। শনিবার ফাংশান। প্রপার পারমিশান নিয়ে ফাংশান করা হচ্ছে। লাখ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে, খরচ হবে— হাজার হাজার মানুষ আসবে। এ অবস্থায় এই মিটিং ডাকা হল কেন?

সুবিমলবাবু কথার উত্তরে গম্ভীরভাবে জানিয়ে দেন যে যারা ফাংশানের পারমিশান নিয়েছে তাদের তো ফাংশান বন্ধ করতে বলা হয়নি। তারা ফাংশান করবে। কিন্তু যারা পারমিশান নেয়নি তারা ফাংশানের সঙ্গে মিশে কোন কনফারেন্স করতে পারবে না। হঠাৎ সবাই চুপ করে যায়। সুস্থির স্পষ্ট ভাষায় বলে ওঠে — তাহলে তাদের মিটিংয়ে ডাকা হল কেন? শুধু জানিয়ে দিলেই তো হত যে তাদের পারমিশান না থাকায় কনফারেন্স বন্ধ করতে হবে। তারপর তারা যা করার করত। সুস্থিরের কথার পেছনের সারিতে গুঞ্জন শুরু হয়। সুবিমলবাবু মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে একটু কড়া ভাবেই বলেন যে উত্তরখন্ড কি খণ্ড তারা কোথায় সম্মেলন করবে এ ব্যাপারে সরকারের কোন মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু ফাংশানের জায়গায় ওসব করলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেই জন্যই সরকার বলছে 'ফাংশানের জায়গায় ফাংশানই হবে, কোন সম্মিলন টম্মিলন করা চলবে না। এটাই সোজা কথা।' মিটিংটা আবার চুপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর

ডিসি সুবিমলবাবুকে বলেন যে এই সব কালচারাল ফাংশানের ব্যাপারে তারা দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপেনবাবু ও সমীরবাবুকে ডেকেছেন। উপেনবাবু মানে উপেন বর্মন বলে দিয়েছেন যে এই সব কালচারাল ফাংশানের সঙ্গে কোন পলিটিক্যাল ব্যাপার যুক্ত করা উচিত নয়।' শিল্পমন্ত্রী কথাটা সবার সামনে বলার জন্য অনুরোধ করেন। উপেন বর্মনের মত 'রাজবংশী সমাজে আর কোন লোক সারা দেশে এত সম্মানিত নন'। কিন্তু তিনি কখনো নিজের রাজবংশী পরিচয়কে ছোট করে দেখেন নি। উপেন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার ক্ষমতা উত্তরখণ্ডীদেরও নেই, সরকারেরও নেই।

উপেনবাবুর নাম করে মিটিংয়ে সরকারের পক্ষ সমর্থন করার একটা চেষ্টা সন্তোষবাবু ধরে ফেলায়, বিষয়টাকে হাল্কা করার জন্য সুবিমলবাবু সন্তোষবাবুর সঙ্গে একটু রসিকতা করেন। উভয় পক্ষই একটু হাসাহাসি হয়। হাসিটা থামলে বিমলবাবু হাত তুলে কিছু বলবেন বলে জানান। সন্তোষবাবু বীরেন্দ্র বসুনিয়া সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করে তাঁকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই সঙ্গে দেবনাথ রায় রাজবংশী সমাজের প্রথম পি এইচ ডি-র উপস্থিতিও ঘোষণা করেন। বীরেনবাবুকে দেখে হেমেনবাবু, ভুবনমোহনবাবু কাকা ও দাদা সম্বোধন করে একটু খাতির করেন।

বীরেনবাবু একটা প্রশ্ন তোলেন যে ব্যাপারটাকে প্রকৃত পক্ষে কোন দিক থেকে -আইনের দিক থেকে নাকি রাজনীতির দিক থেকে না প্রশাসনিক আইনশৃঙ্খলার দিক থেকে দেখা হবে। একটু অপেক্ষা করে ফের বলতে থাকেন যে পর্যটনমন্ত্রীর কথায় যারা পারমিশান নিয়েছেন তারা ফাংশান করতে পারবেন, কিন্তু সম্মেলনের পারমিশান না থাকায় তার সঙ্গে সম্মেলন করা যাবে না - এটা আইনের প্রশ্ন। আবার সম্মেলন-অনুষ্ঠান এক জায়গায় হলে এটা আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন, আবার কংগ্রেস-উত্তরখণ্ডের কথা উঠেছে এটা রাজনীতির প্রশ্ন। কোনটা নিয়ে আলোচনা হবে আগে সেটা ঠিক হোক। ময়নাগুড়ির এম এল এ আইনের কথা বাদ দিয়ে আইনশৃঙ্খলার কথাটা ধরতে বলেন। কারণ একই দিনে শ্রীদেবীর নাচ ও সম্মেলন হলে কী করে পুলিশ সামলাবে। একথার জবাব স্বরূপ বীরেনবাবু বলেন সম্মেলন হচ্ছে সকালে, একটার মধ্যে শেষ। তাহলে পাঁচ ঘন্টা পর শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান হলে কী অসুবিধা হবে। হেমেনবাবু এবার উত্থাপন করেন জল্পেশ যাত্রার কথা। সে যুক্তিও নস্যাৎ করে দেন বীরেনবাবু এই বলে যে রাত সাড়ে ১১টায় ফাংশান শেষ হলে অন্ততঃ ছ'ঘন্টা পর জল্পেশ অভিযান কোন সমস্যা ডেকে আনবে না। তাছাড়া এ তো তীর্থযাত্রা। বরং এসব কাজে সরকার সহযোগিতা করে থাকেন। সন্তোষবাবু বীরেনবাবুর এই যুক্তিটিকে 'লিগ্যালটেলেন্ট' বলে সুবিমলবাবুকে ঠেস দেন। অনুষ্ঠানের ও সম্মেলনের

সম্পাদক বীরেনবাবুর বক্তব্যের প্রভাব নষ্ট করে দেবার জন্য এবং একটু সমীহ করেও শিল্পমন্ত্রী বীরেনবাবুকে বললেন তার কথা গুলো অঙ্কের দিক থেকে ঠিক। কিন্তু সে অঙ্কের হিসেবটা মেলাবে কে? সুবিমলবাবুকে বিপক্ষের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল মনে হচ্ছে যেন। সন্তোষবাবু বীরেনবাবুকে সে অঙ্কের হিসেবটা বুঝিয়ে বলতে বলেন। শিল্পমন্ত্রী বুঝে গেছেন যে ফাংশান আর সম্মেলন কোনটাই আর বাতিল করা যাবে না। তবে যদি জল্পেশ্বর প্রোগ্রামটাকে কোন রকমে আটকানো যায়। সে জন্য আবার আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে বলেন যে শ্রীদেবীর ফাংশান দেখতে আসা বহু লোকই সেদিন যেতে পারবে না। তাদের সঙ্গে সম্মেলনের বিরাট সংখ্যক মানুষের ভিড়ে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তাছাড়া শ্রীদেবী তো একটা সেকস্ সিম্বল। এরকম একটা রাজনৈতিক সম্মেলনে তাকে আনারই বা কী দরকার ছিল। যা হোক মিছিলটা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হোক। সুস্থির তাদের কর্মসূচির অপরিবর্তনীয়তার কথা জানায়। এবার ময়নাগুড়ির এম এল এ হেমেনবাবু তার স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘ বক্তৃতায় বলতে থাকেন যে একদিন জল্পেশ অভিযান পিছলে এমন কিছুই ক্ষতি হত না। তা যখন রাজি হচ্ছে না তাহলে আসল কথাটা খুলে বলাই ভালো। তা হল প্রশ্নটা আসলে রাজনীতির। উত্তরখণ্ডীরা যখন রামগোপাল আগরওয়াল, সুখরাম বর্মন, আসিন্দির রায়ের মত চোরাকারবারী, তামাকের স্মাগলার ও ফরেস্ট কাঠ চালানকারীদের সঙ্গে মিলে, ওদের টাকায় শ্রীদেবীকে এনে সম্মেলন করে সেই লোক নিয়ে ধর্মস্থান জল্পেশ গিয়ে তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধে শপথ নেবে - তা হতে দেওয়া যায় কেমন করে। বীরেনবাবুই এই বিষয়টা বিচার করে বলুন।

হেমেনবাবুর বক্তৃতার পর মিটিংয়ের আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। যে কথা গুলো এতক্ষণ এড়িয়ে চলা হচ্ছিল হেমেনবাবু সেগুলোই বলে ফেলেন। বীরেনবাবুর আলোচনার পর শিল্পমন্ত্রী যে আপোসের একটা সুর এনেছিলেন তা উত্তরখণ্ডীরা মেনে নিলে হেমেনবাবু হয়তো কিছুই বলতেন না। কিন্তু হেমেনবাবু এত শক্ত কথা বলবেন তা কেউ-ই ভাবতে পারেনি। সুস্থির কিছু একটা বলতে উঠলে শিল্পমন্ত্রী তাকে বসিয়ে দেন। তখন সন্তোষবাবু বলতে থাকেন - যে হেমেনবাবু এখন রাজবংশীদের ঐতিহ্য পছন্দ না করতেও পারেন, জল্পেশ মন্দিরের মাহাত্ম্য ভুলে যেতে পারেন কিন্তু জল্পেশ্বর রাজবংশীদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তিস্তাবুড়ি মা গঙ্গা। তিস্তা নদী নয়, তিস্তা দেবতা। হেমেনবাবু তিস্তা ব্যারেজের পূজা করতে পারেন কিন্তু আমরা তিস্তাবুড়ির পূজাই করব। এভাবে রাজবংশীদের অপমান করা চলবে না। অবস্থা যখন এরকম একটু চরমে তখন ডি সি সাহেব শিল্পমন্ত্রীর কানে কানে উপেনবাবু, উপেনবাবু শব্দটি উচ্চারণ করেন। শিল্পমন্ত্রী উপেনবাবুর আসার সংবাদ দিয়ে

এ আলোচনা বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। মিটিংটা আপাতত ভেঙেই যায়। মন্ত্রী-আমলরা উপেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। উত্তরখণ্ডের লোকেরা উত্তেজনায় ছোট ছোট জটলা করে। এরই মধ্যে সুস্থির চিৎকার করে উঠলে সন্তোষবাবু তাকে কয়েকটি মোক্ষম কথা শোনাতে থাকেন। তিনি বলেন ওদের মত রগচটা লোকেদের জন্যই উত্তরখণ্ডের বারোটা বেজে যাবে। প্রথমত তারা সম্মেলনের পারমিশান নেয়নি। দ্বিতীয়ত দুটো ফাংশান এক সাথে করতে চায়। সব রাজনৈতিক দল যদি তাদের কাজ বন্ধ করতে চায়, তারা কিছু করতে পারবে না। শিল্পমন্ত্রীর প্রস্তাব মেনে ওদের জল্পেশ যাত্রা একদিন পেছানো বা স্থান পরিবর্তনে রাজি হওয়া উচিতছিল। যদি তারা কোন প্রস্তাবেই রাজি না হয় তবে সবটাই পণ্ড হয়ে যাবে। এরপর তিনি বীরেনবাবুকে ডাকতে বলেন। নকুল-জগদীশ এসে খবর দেয় উপেনবাবু বীরেনবাবুকে ডেকে কথা বলছেন। খানিকক্ষণ পরে সার্কিট হাউসের বারান্দা থেকে আবার মিটিং শুরুর ডাক আসে। মিটিংটা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। শুধু নতুন মুখ উপেনবাবু। শিল্পমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে তারা উপেনবাবুকে আজ আসতে বলেছিলেন। তিনি অসুস্থ, তবু এসেছেন সবার সঙ্গে দেখা করার জন্য। এক্ষুণি চলে যাবেন। উপেন্দ্রনাথ বর্মন, 'সেকেলের একজন রাজবংশী এম এ বি এল, শুধু নন দেশের যে দায়িত্ব তিনি পেয়েছেন সেখানেই তিনি কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন দিল্লী, কলকাতা, লণ্ডন, লস এঞ্জেলস, এই রাজ্যের বিধান পরিষদ একদিন পরিচালিত হয়েছে এই রাজবংশীর নির্দেশে। আর জীবনে তিনি কোন সময় ভুলে যাননি তিনি রাজবংশী'। তিনি স্মিত হেসে হাত জোর করে সবাইকে নমস্কার করে মিলেমিশে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বিদায় নেন।

সন্তোষবাবু এবার প্রস্তাব করেন যে যা হবার হলো- তারা পরদিন মিছিল বের করবে চৌপত্তি থেকে। হেমেনবাবু আবার আপত্তি তোলেন। বলেন—না করলেই ভালো হত- যদি করেনই তবে টাউনের বাইরে জমায়েতটা করুন। নকুল হাত তুলে সম্মতি জানায় এবং ফাংশানে মন্ত্রীদের স্বপরিবারে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানায়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিরাট প্যাণ্ডেল ব্লক অফিসের পাশের মাঠে। প্যাণ্ডেলটার চারদিক টিনের বেড়া। ভেতরে খড়ের ওপর ত্রিপল ও হোসিয়ান বিছানো। পশ্চিম দিকে তিনটি বড় বড় গেট। ভেতরে বাঁশ দিয়ে তিনভাগ করা ফার্স্ট, সেকেণ্ড ও থার্ড ক্লাস। কিছুটা অংশ জুড়ে চেয়ারের ব্যবস্থা করা। ষ্টেজের পেছনে গ্রিনরুম।

প্যাণ্ডেলের বাইরের মাঠে নানা রকম খাবারের দোকান। জিলিপি-সিঙারা বিক্রি হচ্ছে একটা বড় দোকানে। একটা বেলুনের দোকান, নকল বন্দুকে গুলিবিদ্ধ করার জন্য। চানাচুর-বাদাম-তিলের খাজা বিক্রি হচ্ছে কুপির

আলোয়। পান সিগারেটের দোকানে সাইকেল, মোপেড, স্কুটার, মোটর সাইকেল রাখার জায়গা।

বড় রাস্তা থেকে মাঠে যাওয়ার তেমন কোন রাস্তাই নেই। একটা কালভার্ট পেরিয়ে একটা সাধারণ রাস্তা। তাই শ্রীদেবীর গাড়ি সমেত ভেতরে ঢোকার জন্য একটা অস্থায়ী কাঠের কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে নালীটার ওপর যা জনসাধারণের নিষিদ্ধ।

'নিখিলবঙ্গ উত্তরখণ্ড সম্মেলন' লেখা নীল রঙের একটা ফেস্টুন লাগানো হয়েছে। পেণ্ডেলের পেছনে উঁচু করে, বড় রাস্তার দিকে মুখ করে। আর একটা লাগানো হয়েছে পান সিগারেটের দোকানের পাশে কোনাকুনি রাস্তার দিকে মুখ করে। বহু সংখ্যক গরুর গাড়ি রাস্তার দু'পাশের গাছের ছায়ায় রাখা হয়েছে। গ্রাম থেকে আসা মেয়েরা-বাচ্চারা রঙিন পোশাকে শোভিত হয়ে ওই গাছ তলাতেই অপেক্ষা করে 'যতক্ষণ ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য দেউনিয়া না আসে।'

সম্মেলনের উদ্বোধন হল শনিবার সকালে। আটটায় কথা ছিল। হল ন'টা নাগাদ। উদ্বোধনের পতাকা তুললেন রাজবংশী সমাজের প্রধান নেতা পঞ্চানন মল্লিক। আসাম ও দার্জিলিং থেকে আসা দু'জন প্রতিনিধি ও কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি বক্তৃতা করলেন। পার্টিতে নেই এমনও দু'একজন বক্তৃতা রাখলেন।

শ'দেড়েক লোক উপস্থিত ছিল। স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ী, ফাংশানের কিছু লোক, বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কিছু প্রতিনিধি ও ৭০-৭১ সালে লাটাগুড়ি এলাকায় কৃষকদের মুক্ত এলাকা তৈরি করতে গিয়ে কৃষকদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে, পরে জেলে যাওয়া একব্যক্তি। তার এক মুখ দাড়ি, পরনে পা-জামা ও পাঞ্জাবি। আরও দু'জন এসেছিলেন ধূপগুড়িও বীরপাড়া থেকে যারা আসলে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা। এদের নিজেদের কিছু জমিজমা আছে। আর করে মামলা মোকদ্দমা তদারকি। দেশি ভাষায় যাকে বলে 'দেউনিয়া গিরি'। সেখান থেকে কিছু আয় হয়। অবশ্য এখন পঞ্চায়েত টঞ্চায়েত হয়ে নতুন নেতা হওয়ায় ওদের কেউ দাম দেয় না। এরা ভরসা করে এসেছে উত্তরখণ্ড হলে যদি তারা আগের অবস্থা ফিরে পায়। তবে উত্তরখণ্ডের এরকম মিটিং মিছিলের সঙ্গে ওরা অভ্যস্ত নয়।

প্রথমে লাল তেকোনা কাপড়ের মাঝখানে শ্বেত পূর্ণ সূর্য অঙ্কিত উত্তরখণ্ডের দলীয় পতাকা তোলা হল। পরে পতাকার ব্যাখ্যা করে সভাপতি পঞ্চানন মল্লিক বলেন যে 'পৌরাণিক থেকে প্রাক ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত ত্রিকোন পতাকা প্রচলিত। ত্রিকোন অর্থ ত্রিগুণ— সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। রক্তবর্ণ মাতৃ রজঃ, সুতরাং শক্তির প্রতীক। শ্বেতবর্ণ পিতৃওজঃ বীজ- সুতরাং জ্ঞানের প্রতীক অর্থাৎ সূর্য জ্ঞানের প্রতীক। শক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ই উন্নয়নের

পথ। জৈবিক ত্রিগুনাত্মিক ত্রিকোণ শ্বেতসূর্য সমন্বিত পতাকা সম্পূর্ণ অহিংস গণতান্ত্রিক পথে জ্ঞানের আলোকে দলের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাকে লক্ষে পৌঁছানোর দৃঢ়তা ঘোষণা করে।'

পঞ্চানন মল্লিকের ভাষণে প্রাধান্য পেল 'ভারতীয় হিন্দুদর্শনে বিশ্বাস, ভারতের সংবিধানের প্রতি বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিশ্বাস, ও কলকাতার নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা।' তাঁর বক্তব্য শুরুই হল গীতার সেই শ্লোক 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং.....' দিয়ে তারপর তিনি বলতে থাকলেন যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ট রাজবংশী, সংখ্যালঘু মুসলমান, বাস্তুহারা নমঃশূদ্র বহু উপজাতি সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, শোষিত ও নির্যাতিত। এদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য উত্তরখণ্ড দল তৈরি হয়েছে। এই দল চায় ভারতীয় সংবিধানের ৩ নং ধারা অনুযায়ী কামতাপুর নামক ভারতভূক্ত এক পৃথক অঙ্গরাজ্য। ইতিহাস টেনে তিনি আরও বলেন যে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম অংশে গঠিত হয় কামতাপুর রাজ্য মহারাজা নর নারায়ণের রাজত্ব কালে তা সমগ্র উত্তরবঙ্গে সীমানা বিস্তার করে। উত্তরবঙ্গের কোন অংশ সিরাজদৌল্লার শাসনাধীন ছিল না। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করে বঙ্গদেশ ইংরেজরা দখল করলেও কামতাপুর ছিল স্বাধীন। ১৯৫৫ সালের ১৩ই মে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন উত্তরবঙ্গে এলে তার কাছে দাবি রাখা হয় উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য হিসেবে রাখার। কমিশনের সদস্য মাননীয় হৃদয়নাথ কুঞ্জর, মি. পানিকর ও অন্যান্য সদস্যগণ এর যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রস্তাব নেন। পরে ডাঃ বিধান রায় ও জওহরলালের কথানুসারে কামতা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঢোকানো হয়। এরপর বোম্বাই ভেঙে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট গঠন (১৯৬০), আসাম ভেঙে নাগাল্যাণ্ড (১৯৬২), মেঘালয় ও অরুণাচল (১৯৭১), মাদ্রাজ ভেঙে অন্ধ্র (১৯৫৩) গঠিত হয়। কিন্তু কামতাপুর হয় না।

তিনি বর্তমান অবস্থার কথা তেমন বললেন না। সে কথা বললেন একদা নকশাল আন্দোলনের বিরুদ্ধ নেতা জোতদার সম্পৎ রায়। তিনি উত্তরখণ্ড আন্দোলন শুধু রাজবংশীদের আন্দোলন বলতে চান না। এটা উত্তরবঙ্গের সবার আন্দোলন। উত্তরখণ্ডের আন্দোলনে রাজবংশী বেশি কেন তার ব্যাখা দিয়ে বলেন যেহেতু উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সংখ্যায় বেশি তাই যে কোন দলের আন্দোলনে রাজবংশীই বেশি থাকে। কম্যুনিষ্টরা যখন মিছিল বের করে তখনও সেখানে রাজবংশী লোকের সংখ্যাই বেশি দেখা দেয়। আসাম থেকে আগত বক্তা ভারতবর্ষের রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে এতদিন দিল্লী থেকে সারা ভারত কেন্দ্রীয় ভাবে শাসন করা হত। এখন সময় এসেছে আঞ্চলিক শক্তি গুলি মিলিত ভাবে ভারতবর্ষকে

শাসন করবে। সেই সূত্র ধরেই তিনি দক্ষিণ ভারতের ডি এম কে, এ ডি এমকে কী করে কেন্দ্রের কংগ্রেস বা জনতা পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে রাজ্য শাসন করে চলেছে সে উদাহরণ টেনে আনেন। এবং সেই উদাহরণের ওপর ভর করে কামতাপুরী আন্দোলনের বাস্তবিকতা দাবি করেন। তার আশা উত্তরখণ্ড আন্দোলনও সেই ভাবেই পরিচালিত হবে।

এরপর তিনি কংগ্রেস বিরোধী ও কংগ্রেস সমর্থক, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট বিরোধী ও কংগ্রেস কমিউনিস্ট সমর্থক এরকম যে মেরুকরণ রাজনীতি দেখা যাচ্ছে তা অস্বীকার করতে বলেন। বরং এরা যদি রাজবংশী প্রধান এলাকায় রাজবংশীদের মেনে নেয় তাহলে ওদের সমর্থন করা হবে— এরকম একটা ঐক্যবদ্ধরূপ থাকা দরকার বলে মনে করেন। উদাহরণ স্বরূপ গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন।

দার্জিলিং থেকে আসা ভদ্রলোক একজন অধ্যাপক। তিনি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ব্রিটিশরা তাদের ইচ্ছেমত প্রদেশ ভাগ করে রেখেছিল। যেমন মাদ্রাজ ছিল বিরাট প্রদেশ। সে রকম বাংলা- বিহার-উড়িষ্যা একসঙ্গে ছিল। স্বাধীনতার পর রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তৈরি হয়। তারা ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠন করতে লাগল। সে হিসেবে বিহারের কিছু অংশ বাংলায় এল। এর মূল ভিত্তিটা ছিল ভাষা ও জাতি। কিন্তু তখন বিহারের বাংলার আদিবাসীরা কিছুই বুঝতো না। এখানকার রাজবংশীরাও কিছু জানতো না। দার্জিলিংয়ের নেপালীরাও কিছু বুঝত না। তাই তারা সেদিন ভাষা ও জাতির জন্য পৃথক রাজ্য দাবি করেনি। আজ যখন চোখ খুলেছে তখন কেন নেপালীরা গোর্খাল্যাণ্ড দাবি করবে না বা রাজবংশীরা কামতাপুর চাইবে না। তিনি যুক্তি দিয়ে বোঝান যে খোদ ভারতের সীমানাই যখন বদলে যাচ্ছে যেমন সিকিম আসার পর সীমানা বদলে গেছে। তাহলে আরও একবার পশ্চিমবঙ্গ বা বিহারের মানচিত্র বদল হলে দোষ কী? নাকি তাতে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছোট হয়ে যাবে। তাহলে ব্রিটিশরাও তো বলতে পারত বাংলা ভাগ হলে পাকিস্তানের আয়তন ছোট হয়ে যাবে। সুতরাং ওসব ছেঁদো যুক্তি না দেখিয়ে লায়েক ছেলেকে যেমন সংসার পেতে দিতে হয় সেরকম রাজবংশী, নেপালীদেরও আলাদা সংসার পেতে দেওয়া হোক। ' আপনারা রাজ্যের সীমা নতুন করে ঠিক করার কমিটি আবার চালু করুন, তার রায় মেনে নিন।'

জলপাইগুড়ি শহরের সেই দাড়িওয়ালা ব্যাগকাঁধে ভদ্রলোক যাকে 'নাকশালিয়া' বলে ডাকা হয়- এবার তিনি বক্তৃতা মঞ্চে ওঠেন। তিনি উত্তরখণ্ড আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিস্তা ব্যারেজ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ভারতে ভাকরা নাঙ্গাল, হীরা কুঁদ প্রভৃতি বাঁধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও দামোদর,

ময়ূরাক্ষী, পাঞ্চেৎ, মাইথন বাঁধ হয়েছে। সব জায়গা থেকেই এই বাঁধের কারণে উৎখাত হয়েছে আদিবাসী-গরীব মানুষরা। কিন্তু ব্যারেজের কোনো সুফল তারা পায়নি। আগে যে নদীর জল তারা আঁজলা ভরে পান করতে পারত মুক্ত বাতাস বা আলোর মত - বাঁধ হওয়ার পর সে জল তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। ' এ কেমন উন্নয়ন যেখানে নদীর জলের ওপর তার স্বাভাবিক অধিকার কৃষক হারাবে।' এতদিন মানুষকে বোকা বানিয়ে এসব ড্যাম বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এখন তা হতে দেওয়া যাবে না। তিনি আরও বলেন কৃষকরা চাইলে তিস্তা ব্যারেজ বন্ধ করে দেওয়া যায়। যা হয়েছে তাও অকেজো করে দেওয়া যায়। ভদ্রলোক যে ব্যারেজের প্রসঙ্গ আনবেন উদ্যোক্তারা তা জানতেন না। কারণ এই বিষয়টা তারা গয়ানাথ জোতদারকে দিয়ে বলাবে ঠিক করে রেখেছিল।

গয়ানাথ ইতস্ততভাবে বক্তৃতা দিতে ওঠে। সম্পূর্ণ রাজবংশী ভাষায় খুব সরল ভাবে ব্যারেজের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখে। বলে যে এতদিন যে ব্যারেজ ছিল না তাতে কি ধান চাষ হয়নি, এবার ব্যারেজ হলে নদীর জলে কি ধানচাষ হবে। আলু, কুমড়ো কি জলে ভেসে আসবে। ব্যারেজের ফলে সমস্ত ডাঙা জমি ব্যারেজ টেনে নিচ্ছে। তাহলে মানুষ চাষ করবে কোথায়। গয়ানাথের বক্তৃতায় হাততালি পড়ে।

প্রবীন পঞ্চানন মল্লিকের কাছে উত্তরখণ্ড বলতে এক স্পষ্ট অতীতের কিছু আনুমানিক গৌরবের দিন ফিরে পাওয়া, আর সুস্থিরের মত তরুণের কাছে উত্তরখণ্ড হল আদিবাসী সত্তার এক লড়াকু সংগঠন। যা কৌমশক্তির জোরে আদায় করে নেবে তাদের ন্যায্য অধিকার রাজশক্তির কাছ থেকে। সেজন্য উভয়েরই দরকার রাজবংশী অতীতের এক গৌরবময় লোককথা যা ইতিহাস সমর্থিত।' ইতিহাস এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে —

কোচবিহারের এক রাজবংশী রাজবংশ কোচবিহারকে কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে এবং ১৯৪৯ পর্যন্ত দেশীয় করদ রাজ্য হিসাবে ৪৪০ বছর রাজত্ব করেছে। এই রাজবংশেরই একটি ভাগ এই প্রায় পুরো সময়টাই বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার হিসাবে শাসন করেছে। সেই সুবাদেই মালদহ থেকে দার্জিলিংয়ের তরাই অঞ্চলের বিরাট জনগোষ্ঠী নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দেয়।

সম্পৎ রায় যে একদা নকশাল আন্দোলনেরই বিরুদ্ধে নিজস্ব সৈন্যবাহিনী তৈরি করেছিল সেও এই উত্তরখণ্ড আন্দোলনে এসে যেতে চায়। মজার ব্যাপার একই উত্তরখণ্ডে এসে যেতে চায় আজও যে নকশাল আন্দোলনেই কৃষকের মুক্তি খোঁজে সেই নকশালিয়া ভদ্রলোক। সম্পৎ রায়ের কাছে রাজবংশী গৌরব তুচ্ছ। সে চায় তার

হাতে যে টাকা আছে এবং আরও অনেক টাকা আসবে তার বিনিয়োগ ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রই উত্তরখণ্ড। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই উত্তরখণ্ড আসবে। এই সম্পৎ রায়ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। আর এখানেই ওই নকশালিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মিল।

তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধে সম্পৎ রায় জোতদারদের ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখতে পাবে। আর ওই নকশালিয়া ভদ্রলোক পাবে ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ায় অসংখ্য রাজবংশী মানুষকে। ভারতের অর্থনৈতিক নিয়মেই রাজবংশী সমাজের ভেতরে এখন তাদের বোরো ও কোচ রক্ত খোঁজার ঝোঁক সংগঠিত হচ্ছে। যেমন ভারতের অর্থনীতির নিয়মেই শিখরা, তেলেগু বা অহোমরা আরও বেশি করে তাদের আত্মপরিচয় খোঁজার আগ্রহী হয়ে ভারতের রাজনীতির ভেতর ঢুকে পড়েছে।

'কিন্তু নিজেদের উপজাতিত্বের অতীতকে বর্তমানের মধ্যে আবিষ্কার করার মধ্যে অন্ততঃ রাজবংশীদের ক্ষেত্রে, একটা এমন গোঁজামিল আছে, যা মীমাংসা করা অসম্ভব। রাজবংশীরা রাজবংশীও থাকবে, আবার কোচ-বোরো উপজাতিও হবে— এ ব্যবস্থা কোন ভাবেই সম্ভব নয়।'

তারা যে উপজাতিত্ব স্বীকার করে সেই উপজাতিত্বই তাদের পরিচয়। এজন্য তাদের হজসন, ডালটন, বেভারলি, হান্টার, গ্রিয়ারসন, টমসন প্রমুখ সাহেবদের লিষ্ট মানতে হবে এমন নয়। কিন্তু এই উপজাতি পরিচয় পুনরুদ্ধারের পথে বাঁধা রাজবংশীরাই। তারা শত শত বছর ধরে যে নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিয়ে এসেছে এখন তারা উপজাতির পরিচয় দিতে চাইলেই তা গ্রাহ্য হবে কেমন করে।

কোচবিহারের আদিপুরুষ বিশু বা বিশাই। বিশাই-ই হয়ে গেল বিশ্বসিংহ। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে ঘোরাঘাট পর্যন্ত নিজের রাজত্বে নিয়ে আসার পর ব্রাহ্মণরা তাকে হিন্দু বানিয়ে ফেলল। পাঁজিপুঁথি ঘেটে সিদ্ধান্ত দেওয়া গেল যে রাজা ও তার লোকজন আসলে ক্ষত্রিয়। পরশুরামের ভয়ে পৈতে ছিঁড়ে তারা এই বনে জঙ্গলে পালিয়ে আসে। বিশাই ও তার ভাই শিসাই 'হরিয়া চাড়ালের ছেলে নয়' উভয়ই শিবের ছেলে। বিশ্বসিংহ শ্রীহট্ট থেকে একদল ব্রাহ্মণ এনে তাদের 'কামরূপী ব্রাহ্মণ' বলে একটা শ্রেণিই তৈরি করে। বিশ্বসিংহের পর থেকে কোচবিহারের রাজ পরিবার নারায়ণ পদবি গ্রহণ করে। তারা মদনমোহন ঠাকুর বাড়ি বানায়। জলপাইগুড়ির রায়কতরা হয়ে যায় বৈকুণ্ঠপুরের অধিবাসী।

শুধু রাজপরিবার নয়, পুরো জনগোষ্ঠীই নিজেদের রাজবংশী হিসেবে নিজেদের পরিচয় ঘোষণা করে। এভাবেই তারা উপজাতিত্ব অস্বীকার করে হিন্দুত্বে ঢুকে পড়ে। তিন'শ বছরের বেশি সময় ধরে এই হিন্দু

পরিচয়ে থেকে তারা উনিশ শতকের শেষ দিকে হিন্দুক্ষত্রিয় আত্মপরিচয়ে একটা আন্দোলন সংগঠিত করে।

রাজবংশীদের কোচ উপজাতির অন্তর্গত বলে নানা জনে মত প্রকাশ করেছেন। ১৮৯১ সালের আগে বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারী নিয়ে একটা মামলায় প্রিভিকাউন্সিলে বলা হয় যে রায়কতরা বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোচ উপজাতির অন্তর্গত, হিন্দু নয়। ১৮৯১-র সেন্সাস রিপোর্টে রাজবংশীদের কোচ চরিত্র স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ১৮৯১ -য় রিজলী মন্তব্য করেছেন 'উত্তরবঙ্গের কোচ অধিবাসীরা নিজেদের রাজবংশী ও ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়।'

কিন্তু কোচ উপজাতি পরিচয় অস্বীকার করার কথাও লেখা হয় পরবর্তীকালে। ১৯১১ সালে ওমেলি তার সেন্সাস রিপোর্টে লেখেন ' নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেওয়ার অধিকার চেয়ে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে একটা স্থায়ী ও গভীর আন্দোলন চলছে। তারা 'কোচ' থেকে পৃথক ভাবে বর্ণিত হতে চায়। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদের 'ক্ষত্রিয়' নামে নির্দিষ্ট করতে চায়। ..... একথা এখন সন্দেহাতীত সত্য রাজবংশী ও কোচ আলাদা জাত (কাষ্ট)।' ১৯২৩-এর সেন্সাসে টমসন লেখেন '১৯০১ -এ অনেক কোচ নিজেদের রাজবংশী বলে চিহ্নিত করেছে, এবং এখন রাজবংশীরা অনেকেই নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয় লিপিবদ্ধ করানোর জন্যে শক্তি প্রয়োগ পর্যন্ত করে।' ১৯২১ সালে রাজবংশীদের ভেতর পৈতে পরা ও ক্ষত্রিয় সমিতির আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে যে নিজেদের ক্ষত্রিয় হিন্দু পরিচয় প্রমাণ করাটা নিজেদের ভারতীয় পরিচয়ের সমার্থক হয়ে ওঠে।

'ক্ষত্রিয় সমিতির আন্দোলন -রাজবংশী সমাজের সবচেয়ে ব্যাপক ও গভীর আন্দোলন। তার ফলে রাজবংশী পরিবারের গঠন ও জীবনযাপন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়।'

ইতিহাসের কাল থেকে রাজবংশীরা নিজেদের উপজাতি পরিচয় জাতি পরিচয়ে মিশিয়ে দেবার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সর্বাবয়বে উপজাতি পরিচয় বহন করে চলেছে। নরনারীর যে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে রক্তের মেলামেশায় উপজাতি পরিচয় মুছে যেতে পারত সে সম্পর্ক বর্ণ হিন্দু সামজের জয়পুর রাজ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হিন্দু পরিচয় আদায় করতে পারলেও আপামর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

"ফলে তারা গত পাঁচশো বছর ধরে এক অদ্ভুত জীবন যাপন করে আসছে। তাদের সমস্ত অবয়বে কোচ জন্মচিহ্ন, তাদের পোশাক-আসাকে কোচ উপজাতির অভ্যাস, তাদের অলঙ্করণে কোচ সংস্কার, তাদের তৈজসপত্রে কোচ ঐতিহ্য, তাদের পরিবারের লোকজনের ভেতরকার সম্পর্ক কোচ ঐতিহ্য সম্মত, তাদের

বাড়িঘর কোচ রীতি অনুযায়ী তৈরী হয়। অথচ তারা কিছুতেই নিজেদের কোচ বলে স্বীকার করে না, কোচ পরিচয় তাদের পক্ষে প্রায় নিকৃষ্ট অপমান।" এখন রাজবংশী তার কোচ পরিচয় পুনরুদ্ধার করতে চাইছে ভারতের অর্থনীতির রাজনীতির নিয়মে। সে জন্য সে হিন্দুত্ব থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইছে।

'হিন্দু হওয়ার পাঁচশ বছর পর সে অহিন্দু হতে চাইছে। কিন্তু এই অহিন্দু হতে চাওয়ার আকাঙ্খা তার কোচ ঐতিহ্যের গৌরববোধ থেকে ও চৈতন্য থেকে জন্মাচ্ছে না, জন্মাচ্ছে তার টাকা পয়সার নগদ হিশেব থেকে। যে কোচ পাঁচশ বছর ধরে রাজবংশী থেকেছে সে কি আর ইচ্ছে করলেই আজ কোচ হতে পারে?' হতে চাইলে ভুলতে হয় তার রাজবংশী পরিচয়, পূজা আর ব্রাহ্মণ, উপাধি, সংস্কৃতি, নামধাম সবকিছু। 'এই উত্তরখণ্ড আন্দোলন ত তা নয়ই, বরং তার উল্টো।'

সম্মেলনটা যেমন ভাবে এগোনোর কথা ঠিক তেমন ভাবেই এগোতে লাগল। একদিন দেবনাথ রায় পি এইচ ডি ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপককে এনে 'উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির ওপর বক্তৃতা করানো হল। জানা যায় সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

(এক) উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকাকে স্বতন্ত্র অধিকার দিতে হবে।

(দুই) উত্তরবঙ্গের সমস্ত সরকারি কাজকর্মে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রাজবংশী ছাত্রদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ আসন নির্দিষ্ট আসন রাখতে হবে ও ভর্ত্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা তুলে দিতে হবে।

(তিন) তিস্তা ব্যারেজের জন্য অধিকৃত সমপরিমান জমি খাশ জমি থেকে কৃষকদের দিতে হবে আর কোন জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না।

এছাড়াও দুটো কার্যকরী প্রস্তাব হল —

(এক) যে ভাবে তিস্তা ব্যারেজ তৈরি করা হচ্ছে তাতে এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কারণ- এই ব্যারেজের ফলে কোথায় কী ভাবে জল যাবে, কী উপকার হবে তা পরিষ্কার ভাবে আজও জানানো হয়নি। বরং ব্যারেজ সম্পূর্ণ তৈরি হতে না হতেই তড়িঘড়ি উদ্বোধনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাই উত্তরবঙ্গের সামূহিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে যে কোন উপায়ে হোক এই উদ্বোধন ঠেকাতে হবে।

(দুই) উত্তরবঙ্গ থেকে চা, তামাক, কাঠ বাবদ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যে শুল্ক আদায় করে সেই অনুপাতে এই অঞ্চলের উন্নতির জন্য ব্যয় করে না। উত্তরবঙ্গের প্রতি এই উপেক্ষার প্রতিবাদ করে উত্তরবঙ্গবাসীকে

আহ্বান করা হচ্ছে যেন তারা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বয়কট করে। কেউ যেন প্রার্থী না হয়, কেউ যেন ভোট না দেয়। সুতরাং এই নির্বাচন সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার ও রবিবার নবরঞ্জন অপেরার যথাক্রমে 'কুলটার কুল ও প্রমোদতরণী', সোমবার গানের আসর, মঙ্গলবার কলকাতার এক গ্রুপথিয়েটারের পকেসিয়ান 'চক সার্কল' এবং বুধবারে সারারাত ধরে পর পর চারটি ভিডিও ফিল্ম দেখানো হয়। বৃহস্পতিবার একটাই প্রোগ্রাম শ্রীদেবীর নাচ।

যাত্রাপালা দুটির কিছুটা ঐতিহাসিক ও কিছুটা সামাজিক। নবাবী আমলে একটি মেয়ে কী করে কুল ত্যাগিনী হয়ে অত্যাচারি নবাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে করেছিল তারই কাহিনি হল 'কুলটার কুল'।

মোনা গুপ্তা - ফিল্ম অভিনেত্রী - যাত্রায় মেয়েটি পার্ট করে। তার অসামান্য শারীরিক নাচ দর্শকদের মুগ্ধ করে। 'প্রমোদতরণী' অনেকটা নীলদর্পণ নাটকের মত। এখানেও নীলদর্পণের মত বার দুয়েক ধর্ষণের দৃশ্য আছে। একবার এক সাহেব কর্তৃক প্রকাশ্যে। আর একবার মেয়েটির নিজের ঘরে অন্ধকারে। এখানেও মোনা গুপ্তা ধর্ষিতা মেয়েটির অভিনয় করেছেন। তার আগে তার ক্যাবারে নাচ দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

গানের অনুষ্ঠানের দিন শুধু রাজবংশী মদেশিয়া, নেপালি মেয়েরাই দর্শক নয়, এদের মধ্যে যুক্ত হয়েছে জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ির শহুরে মেয়েরাও। দু'একজন স্থানীয় গায়ক গেয়ে নেমে যাওয়ার পর প্রধান গায়ক হিসাবে মঞ্চে উঠলেন মান্না দে। প্রথমে একটা ভজন, তারপর একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে চলে গেলেন অন্য গানে। কী করে শ্রোতাদের মন জয় করতে হয় সেটা তিনি খুব ভালো করেই জানেন। সেই মত একটার পর একটা গান গাইলেন।

তিনি নেমে যাওয়ার পর এলেন চিত্রা সিং। তিনি প্রথমে একটু গুনগুনিয়ে নেন। তারপর নরম গলায় গান শুরু করেন। দর্শকের উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুরোধ রাখা হয় যেন কেউ চিত্রা সিংয়ের গান টেপ না করে। কয়েকটা গানের পর একটা ভজন গেয়ে সবাইকে গাইতে বলেন। হঠাৎ হারমোনিয়াম ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। ভজনের সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত প্রসারিত করে যেন নিজেকে আবিষ্ট করে তোলেন। দর্শকেরাও তার সঙ্গে মাথা দোলাতে থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি শুধু মাথা দুলিয়ে যান।

এরপর মঞ্চে আসেন অনুপজালোটা। বার বার হারমোনিয়াম বাজিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করে তোলেন। দর্শকদের দিকে এমন ভাবে তাকান যেন চেনা মুখ খুঁজছেন। এটা তার ভঙ্গি। তারপর উর্দুগজল গেয়ে এমন ভাবে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন যে তারা তাকে উর্দুতেই বাহবা জানাতে থাকে। এরকম দুটি গান গাওয়ার পর

তিনি হিন্দিতে বলেন যে - তিনি তো সবার সেবার জন্যই এসেছেন। একটা গান হলে তিনি জানতে চাইবেন তারা কি গান শুনতে চান। সবাই বলবে, যার কথা শুনতে পাবেন সেই মত গাইবেন। তারপর তিনি একটি করে হিন্দি গান গাইছেন আর হেসে বলছেন 'ফরমাইয়ে'। তিনি কখনো হাত বাড়িয়ে দেন, কখনও বা মাথা ঝাঁকিয়ে একটা লাইন বার বার গান।

উত্তরখণ্ড সম্মিলন উপলক্ষেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে প্রধানত সারা উত্তরবঙ্গে উত্তরখণ্ডের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু অনুষ্ঠানের চরিত্র দেখে মনে হয় যেন এই অনুষ্ঠান উত্তরখণ্ডের আদর্শ ও রীতির বিপরীতে। উত্তরখণ্ড বলতে বোঝায় রাজবংশী স্বাতন্ত্র্য, অতীত গৌরব, বর্তমান বঞ্চনা, ভবিষ্যতের কর্মসূচী। কিন্তু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিষয় - বাংলা-হিন্দি-গান, নাটক, যাত্রা, ভিডিও ফিল্ম, যা ভারতবর্ষীয় রীতি অনুসারী।

বুধবার সারারাত ধরে ভি সি আর এ চারটি ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান। একটু হাল্কা প্রোগ্রাম রাখা হল আগের দিন। ভিডিও ফিল্ম দেখতে তো বাইরের লোক আসবে না। আসপাশের মানুষজনই আসবে। একটা ইংরাজি 'ড্রাকুলা'। দুটো হিন্দি ছবি - 'শোলে' আর 'শাহেনশা'। একটি বাংলা 'প্রতিকার'। হলদিবাড়ির এক পার্লারের মালিকের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা গোপন প্রস্তাব ছিল 'ব্লু ফিল্ম' দেখাবার। কিন্তু পরে সেটা বাতিল হয়ে যায় পুলিশের ঝামেলার ভয়ে। চারটে ছবির কোনটা কখন দেখানো হবে এনিয়ে নানা বিতর্ক চলে। অবশেষে ঠিক হয় প্রথমে বাংলা, তারপর 'ড্রাকুলা', তারপর 'শাহেনশা' এবং সবার শেষে 'শোলে'।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা নাগাদ ময়নাগুড়ি শহরে পুলিশে ছয়লাপ। তিস্তা ব্রিজ থেকে ময়নাগুড়িতে ঢোকার রাস্তায়, ময়নাগুড়ি থেকে মালবাজার ও আসাম যাওয়ার রাস্তায় পুলিশ ভর্তি গাড়ি চলে গেল। চৌপত্তিতে একটা জিপ নিয়ে ডি এস পি সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বেলা একটা-দেড়টা নাগাদ বাইরের লরি-বাস আসা শুরু করল। অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে অন্ততঃ মাইল খানেক দূরে গাড়ি গুলিকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসামের দিক থেকে আসা গাড়ি গুলিকে ওই রকম দূরে একটা মাঠে ঢোকানো হচ্ছে। ওসি সাহেব গাড়ির পারমিট দেখতে চাইলে একটু ঝামেলা হওয়ায় দেখা বন্ধ করা হয়। পরিবর্তে দুই কনষ্টেবল গাড়ি পিছু ১০ টাকা করে নিতে থাকে। তাতে কাজটা খুব মসৃন ভাবে হয়ে যায়। তিস্তা ব্রিজের দিক থেকে বেলা তিনটার সময় গাড়ি আসতে শুরু করে। ওদিক থেকে বেশি আসে প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সি। ওরা অতদূর থেকে হেঁটে আসতে রাজি না হওয়ায় গোলমাল বাঁধে। ঠিক হয় একটু এগিয়ে নামিয়ে দিয়ে আবার পার্কিংয়ের

জায়গায় ঢুকতে হবে। খুশি না হলেও এটাই মেনে নিতে হয়।

ততক্ষণে তিন দিকে গাড়ি ভর্তি লোক সমাগম হতে শুরু করেছে। তিন দিক থেকে মেলার মত লোক অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হয়। ধূলোয় পথঘাট একেবারে অস্পষ্ট হয়ে যায়। জল্পেশের শিবরাত্রির মেলার অভিজ্ঞতা ময়নাগুড়ির মানুষের আছে। প্রতিবছরই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই ময়নাগুড়ির ওপর দিয়ে জল্পেশ যায়। কিন্তু আজকের শ্রীদেবীর নাচের জন্য যে মানুষের ঢল তাতে মনে হয় কয়েকটা জল্পেশ মেলা ময়নাগুড়ির পাশ দিয়ে বসেছে।

বিহার ও আসামের দিক থেকে যারা এসেছে তারা বাসেই তাদের সংসার নিয়ে এসেছে। বাস পার্কিং করার পর সতরঞ্চি পেতে নানা রকম খাবার খাওয়া শুরু করেছে। কেউবা কেরোসিনের ষ্টোভে লুচি ভাজছে। ফ্লাকস্ থেকে চা ঢেলে খাচ্ছে কেউ কেউ। খাবারের গন্ধের সাথে একটু মদের গন্ধও মিলে গেছে। কারও কারও গলায় শ্রীদেবীর গানের সুর, কারও কেসেটে। তবে কোন গোলমাল নয়।

শ্রীদেবী এলেন শিলিগুড়ি থেকে জঙ্গল পাহাড়ি পথে সেবক ব্রিজ পার হয়ে, ওদলাবাড়ি পার হয়ে, চালসা হয়ে, লাটাগুড়ি হয়ে। কারণ এপথে তাকে চিনে ফেলার বেশ অসুবিধা। ফেললেও লোকজমার কোন ভয় নেই। তিনটি গাড়ির প্রথমটিতে শ্রীদেবীর দেহরক্ষী, দ্বিতীয়টিতে তিনি স্বয়ং আর তৃতীয়টিতে তার সহকারী — বাদক আর মেকআপ ম্যানেরা। সবার পেছনে একটা পুলিশের গাড়ি। দ্বিতীয় গাড়িটার কাঁচ বন্ধ করা। ময়নাগুড়ি শহরে ঢুকতেই পুলিশের গাড়িটা এগিয়ে এসে প্রথম গাড়িটার আগে আগে চলতে শুরু করে। চারটি গাড়ি একই বেগে নতুন কালভার্টটা পেরিয়ে একেবারে গ্রিনরুমের সামনে এসে দাঁড়ায়। কখন যে শ্রীদেবী তাঁর গাড়ির দরজা খুলে কোলাপ্সিবল্ গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছেন, তা কেউই টের পায় না। দেখা যায় গাড়িগুলি থেকে যন্ত্রপাতি নামানো হচ্ছে।

পুলিশের গাড়ি সমেত তিনটি গাড়ি একই গতিতে কালভার্ট দিয়ে ঢুকে পড়ার পর লোকজন নেমে গেলে সারা রাস্তায় আওয়াজ ওঠে, ' এসে গেছে, এসে গেছে, শ্রীদেবী এসে গেছে।' এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আসার পর দর্শকদের নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে। অনুষ্ঠানের আয়োজন, গাড়ি পার্কিং, হেঁটে আসা, হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ — এসবই এখন বড় ব্যাপার — শ্রীদেবীর নাচ ও গানের চেয়ে। 'শ্রীদেবী এসে গেছে' রটনার পর থেকে রাস্তায় একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কে আগে প্যাণ্ডেলে ঢুকবে। পুলিশের দৌড়াদৌড়ি পড়ে যায়। একটু পড়ে মাইকে শোনা যায় পুলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে লাইন করে ঢুকতে বলা হচ্ছে। বাইরে

ভিড় এত বেড়ে যাচ্ছে দেখে ডি এস পি নিজে এসে গেটে কর্মকর্তারা যারা টিকিট পরীক্ষা করছিল তাদের বলেন যে এত পরীক্ষা না করে দর্শক হাত উঁচু করে টিকিট দেখালেই যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। নকুল, বটুক বর্মনরা সেটাই করতে থাকে। পুলিশ মাইকে এই নতুন ব্যবস্থার কথা প্রচার করতে থাকেন। আর একটা ঘোষণা হয় - ভেতরে ঢুকলে আর বেরতে দেওয়া হবে না। ফলে দু'রকম ঘটনা ঘটতে থাকে এক— দলের বা পরিবারের কাছে জমা রাখা টিকিট পুনরায় প্রত্যেকের কাছে বিলি, দুই— হঠাৎ লাইন ভেঙে পেছনে বসে পড়া বা দাঁড়িয়ে পড়া। শ্রীদেবীর নাচের অনুষ্ঠানটা খুব সহজ ভাবেই শুরু হয়ে যায়। দর্শকরা প্যাণ্ডেলে বসার পর দেখা গেল অধিকাংশই রাজবংশী ও মদেশিয়া। ফলে শ্রীদেবী তাদের প্রত্যাশা মতই অনুষ্ঠান শুরু করেছেন মনে হয়। অনুষ্ঠান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে প্যাণ্ডেলটা নীরব হয়ে যায়।

যিনি পয়লা নম্বরের শিল্পি, হিন্দি ফিল্মে যাঁকে যৌন বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় - তিনি বোধ হয় এই বিশাল দর্শক সমাগম অনুষ্ঠান করে করে দর্শকদের মনের উত্তাপ নিরসন করার কৌশলটা আয়ত্ব করে ফেলেছেন। সে জন্য অনুষ্ঠানের শুরুতে অন্য একটি মেয়ে এসে একটা নটরাজের মূর্তি স্থাপন করে তার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে চলে যায়। উৎসুক্য জনতা কিছুতা প্রসমিত হয়। তারপর আসেন শ্রীদেবী নাচার জন্য। সেই নটরাজ মূর্তিটি প্রণাম করার জন্য। তাতে দর্শকের উত্তেজনা আরও একটু নেমে যায়। প্রথম ধাক্কাকে এভাবে ভাগ করে করে দর্শককে কিছুটা অভ্যস্ত করা হয়। এবার মাইকে ঘোষণা করা হয় শ্রীদেবী ভরতনাট্যম নাচবেন। শ্রীদেবী যে কুশলতায় ভরতনাট্যম নাচতে থাকেন যে ভঙ্গিমায় নিজেকে উজার করেন - তাতে যেন তিনি প্রতিশোধ নিতে থাকেন যে দর্শকরা যৌন আবেদনময়ী নায়িকাকে সিনেমায় দেখে তিনি সে শ্রীদেবী নন। দর্শকের পূর্বস্মৃতি ক্রমশ লোপ পেতে থাকে।

নাচতে নাচতে তিনি ষ্টেজের বাইরে যান না। নাচটা থামান ষ্টেজের পেছনে। তারপর হেঁটে হেঁটে একেবারে ষ্টেজের সামনে এসে দাঁড়ান। সবাই দেখে তিনি 'ঘামছেন, বুক উঠানামা করছে, ঠোঁটটা একটু ফাঁক, কপালে চূর্ণ চুল। মুহূর্তে ভরতনাট্যমের বাঁধা ভেঙে ফিল্মের স্মৃতিতে থাকা শ্রীদেবী দর্শকের মনে ভেসে উঠতে থাকে।

ছবির শ্রীদেবীকে রক্ত মাংসের হিসেবে মিলিয়ে নিতে এত এত টাকা খরচ করে মানুষ অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে। তিনি যদি নিজেকে মিলিয়ে দিতে না পারেন তবে লাখ লাখ টাকার অর্ডার পাবেনই বা কেন। কিন্তু ছবির পর্দায় যা দেখানো যায় চোখের সামনে স্টেজে তা দেখানো যায় না। তাই তাকে হিসেব করতে হয় কতটা দেখাবেন বা চেনাবেন, আর কতটা অচেনা রেখে দেবেন। ষ্টেজে কতটা দেখাবেন, তা দেখিয়েই দর্শককে সেই

জায়গায় নিয়ে যাবেন যে সিনেমার শ্রীদেবী কতটা লোভনীয়। ভরতনাট্যমের পর একটু বিরতি। তারপর ষ্টেজের নিজস্ব মাইক্রোফোনে বেজে ওঠে 'হাওয়া হাওয়া-ই'। হাততালি, সিটি। দর্শকেরা বুঝে যায় 'মিষ্টার ইণ্ডিয়া'। দর্শকের চোখের সামনে ' মিষ্টার ইণ্ডিয়া'র শ্রীদেবীর সেই কালো ব্রার ওপর গোলাপী ওরনা ভাসতে থাকে। শ্রীদেবী মঞ্চে নাচতে থাকেন। আর দর্শকরা কালো ব্রা খুঁজতে থাকে। শব্দ করতে থাকে উই উই উই উই উই।

নাচ শেষ করে মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতেই হাততালি ও চিৎকার, সিটি দিতে থাকে। আওয়াজ ওঠে, ' সোলভা সাঁওন, নাগিনা, মিষ্টার ইণ্ডিয়া'। চিৎকার থামতে না থামতেই ষ্টেজের মাইকে গান বেজে ওঠে। দর্শকরা চিৎকার করে ওঠে - 'আউলাদ- আউলাদ'। অবিকল ফিল্মের পোশাক পরে এবার তিনি মঞ্চে ঢুকে নাচতে থাকেন। দর্শকরা নাচের তালে তালি দিতে থাকে - নাচ গানের সঙ্গে নাচতে গাইতে থাকে। দর্শক রাজবংশী মেয়েরা এর অর্থ বোঝে না। বরং মদেশিয়া মেয়েরা এদের এই দৃশ্য দেখে নিজেরাই হাসাহাসি করে। এর মধ্যে পুলিশের লোকজন ও উদ্যোক্তারা মিলে প্যাণ্ডেলের পেছনের বেড়া খুলে দেয়। নতুন দর্শক এত বেশি হয়ে গেছে যে ডি এস পি উদ্যোক্তাদের আর টিকিট বিক্রি করতে মানা করেন। উদ্যোক্তারা জানায় যে অনুষ্ঠান অর্ধেক হয়ে গেলে পেছনের বেড়া খুলে দেওয়া হবে। 'শ্রীদেবীর লোকজনকেও তাই জানানো হয়।'

বেড়া খুলে দেওয়া হয়ে গেলে আবার অনুষ্ঠান শুরু হয়। নাচ নয়, হাঁটা। সুপার হিট ফিল্ম 'নাগিনা'র, 'ভুল যায়ে তুম এ কহানী' এই গানের সঙ্গে বিলম্বিত তালে হাঁটা। কিন্তু এই হাঁটার মধ্যেই যেন একটা ছন্দ এসে যায়। ফিল্মে এই অংশে একট শিব মন্দিরের অলিন্দ, প্রাসাদ ও ঋষি কাপুর ছিল। এখানে কিছুই নেই। দর্শকরা নিজেদের ঋষি কাপুর ভেবে গান ও নাচটা উপভোগ করে। গানটা ছিল বিষণ্ণতার।

শ্রীদেবীর জন্য নির্ধারিত সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে। এখন বড় জোর দু'তিনটে নাচ হতে পারে। প্রত্যাশিত নাচ এখনও হয়নি। তবে হওয়ার সময় উপস্থিত। দর্শকরা ভেতর থেকে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এমন সময় মঞ্চে আবছা আলো নেমে আসে। আর প্রত্যাশামত ফিসফিসিয়ে গান ভেসে আসে 'থাকা থাকা ড্রিম্'। দেখা যায় শ্রীদেবী যেন একটা বিড়ালীর মত লাফ দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করেন। তাঁর গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা চাপা পোশাক। লাফ দিয়েই হাঁটছে আর কোমরে বিপরীত মোচড় দিয়ে শরীরটাকে কাঁপাতে থাকেন।

স্টেজের পেছন দিকে এভাবে কিছুক্ষণ লাফালাফির পর একে বারে ষ্টেজের মাঝখানে এসে দাঁড়ান। আলো একটু স্পষ্ট হয়। দেখা যায় তাঁর স্তন দুটি শরীর থেকে আলাদা হয়ে কাঁপছে। কিছুটা ছায়ায় মনে হয় স্তনে কোন

আবরণ নেই। 'থাক থাক দ্রি-ইম' এর তালে তালে নিতম্বও আবরণহীন হয়ে দুলছে। আলো আর একটু বাড়ে। দর্শকরা দেখতে পায় শ্রীদেবী ' এক অনন্ত রমনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে মোচড়ায়।' কোমড় থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সেই রকম আবর্তিত হতেই থাকে।

প্যাণ্ডেলের প্রায় লক্ষ মানুষ এক বিচ্ছিন্ন নিষিদ্ধ সম্ভোগে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এই সময় একটা বাচ্চা হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠায় দর্শকদের অনড়তা ভেঙে যায়। ' হিম্মৎ ঔর মেহন্নত' ফিল্মে এই দৃশ্যে জিতেন্দ্রর সঙ্গে শ্রীদেবী নেচেছিলেন। এখানে একা নাচছেন। কিন্তু প্যাণ্ডেলের কোন এক যুবক যেন তাকে সঙ্গ দেবার জন্য একই ছন্দে নেচে চলেছে।

এখন শ্রীদেবী মঞ্চের একেবারে সামনে এসে পড়েছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে শরীরটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে দিয়েছেন। তাতে তাঁর স্তন দুটি তীব্র হয়ে ওঠে। কোমর থেকে নিচের অংশটি এগিয়ে দিয়েছেন। ' তাতে তাঁর উরু দুটি শক্ত ও প্রখর দেখায়।' এই অবস্থাতেও তাঁর শরীরে আন্দোলন চলতে থাকে। কিছু যুবক রাস্তা ও রাস্তার ঢালে লুকিয়ে মদ খাচ্ছিল আর নাচছিল। থাকা থাকা দ্রি-ই-ম এর সঙ্গে নাচতে নাচতে তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় নগ্ন বাঘারুকে পেয়ে যায়। প্যাণ্ডেলের ভেতরে বেড়া খোলা আছে। বাঘারুকে মাঝখানে নিয়ে তারা ঢুকে পড়ে। ভেতরে তো নানা দল নীরবে নাচছিল। এই দলটিও তাদের সঙ্গে মিশে যায়।

ছেলেদের দলটা বাঘারুকে নিয়ে প্যাণ্ডেলের মাঝামাঝি এসে পড়ে। কিন্তু বাঘারু কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। বাঘারু দেখে বিদ্যুতের মত আলো চমকাচ্ছে। সেই আলোতে ' বেটি ছোয়াখান শুই পড়িছে'। শুয়ে পড়ে 'বেটি ছোয়াখান ঘুর পাক খাচ্ছে। ঘুর পাক খাচ্ছে আর উমরা তলপেট খান মাটিথে উপরত উঠি - আসিবার চাছে।' 'থাকা থাকা দ্রি-ই-মে'র আওয়াজ শ্রীদেবীর তলপেট সঙ্গমের কাল্পনিক আশ্লেষে উঠছে পড়ছে। প্যাণ্ডেলের এক অংশ উত্তেজনায় শক্ত হয়ে যাচ্ছে আর এক অংশ নাচকে উত্তাল করে দিচ্ছে। বাঘারু ওইখানে একা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে 'বেটিছোয়াখান ক্যানং তল প্যাটখান উঠাছে নামাছে।' সে প্রায় নগ্ন শরীরে 'মেয়েটির শরীরের আর্তনাদ দেখতে দেখতে বিমূঢ়বোধ করতে থাকে।' বাঘারু রাজবংশী শরীরের নগ্নতার সঙ্গে বম্বে ফিল্মের যৌন প্রতীক নায়িকা শ্রীদেবীর জ্যান্ত শরীরের একটা সংযোগ স্থাপিত হওয়ার মূহূর্তে গানটা থেমে যায়। শ্রীদেবীও মঞ্চ ছেড়ে চলে যান। বাঘারু লক্ষ লোকের মাঝখানে প্রায় উদোম শরীরে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঘারুর ওই নগ্নতা যেন দর্শকদের অপমান। ' বাঘারু ওই নগ্নতা নিয়ে মঞ্চের দিকে এমনই অনড় যেন ওই দাঁড়িয়ে থাকাটাই একটা বিদ্রোহ। যখন তার ওই নগ্নতার জন্য পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু করা

যাচ্ছে না ডি এস পি সাহেব এসে তাকে ধরে প্যাণ্ডেলের বাইরে নিয়ে যান। মাইকে শোনা যায় আজকের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বের ঘোষণা। সেই সঙ্গে আগামীকাল সকালে জল্পেশ মন্দির অভিযানের আহ্বান।

শেষ দৃশ্যে নাগিন ছবিতে শ্রীদেবী একটি শিবলিঙ্গের সামনে যে নেচেছিলেন তা পরিবেশিত হয়। মাইকে গান বেজে ওঠে। ' ম্যায় তেরি দুষমন, দুষমন তু মেরা, ম্যায় হ্যায় নাগিন, তু সাপেরা।' সাপের খোলসের মত টাইট পোশাক নয় - একটা ঢিলেঢালা আলখাল্লা মত পোশাক পরে তিনি মঞ্চে আসেন। মঞ্চে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে - জোড়াসনে বসেই শরীর দুলিয়ে যান। একটি ছোট্ট মেয়ে থালায় একটি বড় শিবলিঙ্গ, সাপজড়ানো রেখে যায়। আওয়াজ ওঠে 'জয়বাবা জল্পেশ্বর' দর্শকরা করজোড় কপালে তোলে। শ্রীদেবী এই শিবলিঙ্গের সামনে ভজনের ভঙ্গিতে হাতে তালি দিয়ে মাথা শরীর দোলাতে থাকে। গান শেষ হয়, কিন্তু শ্রীদেবী মঞ্চ ছেড়ে যান না। হাত জোড় করে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নমস্কার করতে থাকেন। তারপর শিবলিঙ্গটা মাথায় তুলে (উইংয়ের) দিকে হাঁটা দিতেই 'জয়বাবা জল্পেশ্বর' ধ্বনিতে প্যাণ্ডেলটা ভরে যায়।

পরদিন শুক্রবার জল্পেশ অভিযানের জন্য সমাবেশ শুরু হয় সকাল সাতটা থেকে। উত্তরবঙ্গের সব জেলা থেকে নেতারা এলেও জল্পেশ অভিযানের জন্য লোক সংগ্রহ করতে হয়েছে ময়নাগুড়ির আসপাশ, বাকালি, পদমতী, জোড়পাকুড়ি, বার্নেশ এই সব জায়গা থেকে। 'শ্রীদেবীর নাচ দেখি প্যাণ্ডেলত থাকি যাবেন, জল্পেশ করি ঘরত ঘুরিবেন।' এধরণের প্রচারটা বেশ ভালোই লেগেছিল। কিন্তু প্রচারের দুর্বলতার জন্যই আর পুলিশের তৎপরতার জন্যই হোক তারা শ্রীদেবীর অনুষ্ঠান শেষ হবার পর রাত ৩টার সময় ময়নাগুড়ি ছেড়ে চলে যায়।

'নিখিলবঙ্গ উত্তরখন্ড সমিতি' লেখা একটি ফেষ্টুন আর তিনকোনা কয়েকটি নিশান পুতে জমায়েতের স্থানে অপেক্ষা করা হচ্ছিল। কিছু লোকও জমেছে। কিছু, বাসে জল্পেশ মন্দিরে চলে গেছে। যারা জমে আছে তাদের মুখে গতরাতে শ্রীদেবীর নাচের কথাই শোনা যাচ্ছে। যারা সিনেমা দেখেনি তারা গানের সঙ্গে নাচের মিল খুঁজে পায়নি। ' কী দেখিম, মাটিত পড়ি গড়াগড়ি যাছে, যেন দেও ধরিছে। তোমরালা কহিছেন আহা-হা, মুই তো বুঝিবারই পারো না।' যাকে বলা হয় সে হেসে ওঠে বলে ' দেখিবার কী খারাপ নাগিছে? হ্যাঁ। উত্তরখন্ড পার্টির এ্যালায় এক্কেরে জয়জয়। কংগ্রেসের ঘর পারো নাই, কমুনিশের ঘর পারো নাই, এই উত্তরখন্ড পারিছে — স্যালায় বোম্বাইঠে শ্রীদেবীক এইঠে ময়নাগুড়ি আনিবার। উত্তরখণ্ড পার্টিটা শ্রীদেবীর পার্টি হয়্যা গেইছে।' লোকটি হঠাৎ চিৎকার করে ' শ্রীদেবী জিন্দাবাদ।' কেউ সারা দেয় না—হাততালি দেয়।

কয়েকটা মোটর সাইকেল ও সাইকেল নিয়ে সুস্থির ' উত্তরখণ্ড জিন্দাবাদ' করতে করতে এগিয়ে আসে। '

মিছিল সাজান', 'মিছিল সাজান' বলে সুস্থির চিৎকার করতে থাকে। পঞ্চাননবাবু ও গয়ানাথ জোতদার সুস্থিরের পাশে দাঁড়াতেই সুস্থির নবীনকে ফেস্টুন ধরে দাঁড়াতে বলে। আর একজন জোয়ান মানুষের দরকার হয়। গয়ানাথ বাঘারুকে ডাকতে থাকে। বাঘারু এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। গয়ানাথ তাকে ডেকে এনে সুস্থিরের সামনে 'ইমরাক নিশানখান দেন' বলে বাঘারুকে দেখায়। সুস্থির বাঘারুর বিশাল প্রায় নগ্ন চেহারাটা দেখে তার হাতে ঝাণ্ডাটা দিতে দ্বিধা বোধ করে। কারণ এটা রাজবংশীদের মিছিল হলেও সুস্থির অন্যান্য পার্টির মিছিলের মত করে মিছিলটাকে সাজাতে চায়। তাতে এরকম একটা লোক ঝাণ্ডা নিয়ে সামনে দাঁড়ালে তা মানানসই হবে কিনা সে কথা কিছুক্ষণ চিন্তা করে। গয়ানাথ ফের 'নিশানখান ইমরাক দেন কেনে, এ ধরিবার পারিবে' বলে পতাকাটা বাঘারুকে দিতে বলে। সুস্থির বাঘারুর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেয়। সুস্থির মিছিলটাকে সাজাতে থাকে। সবার আগে মোটর সাইকেল বাহিনী, তারপর নেতারা, তারপর ফেস্টুন, তারপর মেয়েরা, তারপর পুরুষেরা। বাঘারুকে নিশান হাতে কোথায় দাঁড় করানো যায় সেকথা ভাবতে থাকে সুস্থির। সমস্ত মিছিলটাকে একবার দেখে নেয়, তারপর ঠিক করে সাইকেলের পিছনে, মিছিলের মাথায় বাঘারুকে স্থাপন করা হয়।

সুস্থির 'উত্তরবঙ্গ জিন্দাবাদ' আওয়াজ তোলে। মোটর সাইকেলের লোকেরা খুব ভালো ধরতে পারে। তারাই স্লোগান জমিয়ে দেয়। ' কামতাপুর রাজ্য কায়েম করো, কায়েম করো। ' উত্তরবঙ্গ দিচ্ছে ডাক, ভোটের বাক্স খালি যাক।' ' কৃষকের জমিকাড়ি তিস্তা ব্যারেজ চলিবে না।' 'তিস্তা ব্যারেজের মিছিলে যোগ দিন, যোগ দিন।'

মোটর সাইকেল, সাইকেল ওয়ালারা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরত্ব সৃষ্টি করে ফেলেছে। যারা হেঁটে যাচ্ছে তারাও পিছেনে পড়ে গেছে। তবে মূল মিছিলটা ভাঙেনি। একই ছন্দে চলছে।

যে দু'জন 'বেটিছোয়া' ফেস্টুনটা ধরে ছিল তারা ফেস্টুনটা টানটান রাখতে পারছে না। নেতিয়ে পড়ে। তাতেও একটা দৃশ্য তৈরি হয়।

বাঘারুর হাতের ঝাণ্ডাটা শুরুতে ও শেষে একই রকম। বাঘারু ঝাণ্ডাটাকে খাড়া করে হাঁটে। মিছিলের মাথায় এই নেংটি পড়া বাঘারুর নিশান নিয়ে চলা যেন একটা অর্থ পায়। বাঘারুর পেছনে ও ফেস্টুনের সামনে ছিলেন বীরেন বসুনীয়া, পঞ্চানন মল্লিক, গয়ানাথ জোতদার, দেবমোহনবাবু, নবীন, তিলক, ধৈর্য্য মোহনবাবু, সম্পৎ রায় ও আরও ছ'সাতজন। এদের সঙ্গে মিছিলের বাকি অংশের তফাৎটা পোষাকেই ধরা পড়ছিল।

মিছিলটাকে যেন রীতিনীতি মানা একটা পুজোটুজোর মত লাগে। বাঘারু তাতে থেকে যেন তারই নেতৃত্বে মিছিলটা চলছে বলে মনে হয়। বাঘারু তো কোন দিন মিছিলে চলেনি। তার দেউনিয়ার আদেশেই সে মিছিলে ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে। এখন তাকে মিছিলের পরিচালক মনে হয়। কিন্তু তাকে পরিচালকের ভূমিকা দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ইচ্ছে করলে তাকে পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তা তো এখন আর পারা যায় না। এখন এই মিছিলের অর্থের সঙ্গে বাঘারু মিশে গেছে।

বাঘারুর হাতের নিশানটা আকাশে কেমন পতপত করে উড়ছে। নেতারা তা দেখতে পায় এবং গর্ব অনুভব করে। ' রাজবংশী সমাজের ভেতরে কয়েকশ বছর ধরে জমা হয়ে আছে বর্ণ হিন্দু সমাজের সঙ্গে তুলনা থেকে আসা এক হীনমন্যতা।' বাঘারুর হাতের পতাকার পেছনে তরাইয়ের সম্পৎ রায় থেকে পুণ্ডিবাড়ির কালিপ্রসন্নর বড় ছেলে পর্যন্ত' সবাই হেঁটে যেন সেই অভীষ্ট খানিকটা সিদ্ধ করছে। রাজবংশী পরিচয়েই তো তারা কয়েকদিন ধরে সম্মিলন করতে পারল, শ্রীদেবীকে এনে নাচাতে পারল এবং এই জল্পেশ যাত্রা করতে পারছে।

জল্পেশে পৌঁছে সাইকেলওয়ালা, মোটর সাইকেলওয়ালারা একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। মূল মিছিলটা পৌঁছায় বটে, যেন তারা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই এল, ফলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ও তিস্তা বুড়ির পুজো তেমন জমল না।

সুস্থির সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক করেই রেখেছিল। মিছিলটা মন্দিরের গায়ে পৌঁছালে বাঘারু ভাবে তাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বললে ঝাণ্ডাটা সে কি করবে। বাঘারু মন্দিরের কাছে আসতেই 'জয়বাবা জল্পেশ্বর' ধ্বনি ওঠে। সে পতাকার বাঁশটা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে। কতক্ষণ মাথা নুইয়ে থাকতে হবে তা সে জানে না। অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকায় চোখটা আঠা আঠা লাগে। তারপর পাশে ও পেছনে কাউকে দেখতে পায়না। ঝাণ্ডাটা কাঁধে নিয়ে সে কাউকে খোঁজে। পুকুর পাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোক গুলিকে দেখে বোঝে এগুলি মিছিলের লোক। বাঁশটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দেখে গয়ানাথ সহ আরও কয়েকজন দেউনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। আর কয়েকটি মেয়ে নেচে নেচে গান গাইছে—

'সগ্‌গ হতে নামিল তিস্তাবুড়ি

মনচে দিয়া পাও,

.....'

তিস্তা বুড়ির পুজো শেষ হয়। পঞ্চানন মল্লিক বলে ওঠেন 'তিস্তাবুড়ি আমাদের দেবতা হন। তিস্তাবুড়িকে বান্ধা আমরা সহ্য করিব না। আর একমাস পরে তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের দিন আমরা প্রতিবাদ মিছিল

নিয়া ঐ তিস্তা ব্যারেজের কাছে যাইব। আপনারা সব জায়গা হইতে সেদিন মিছিল লইয়া তিস্তা ব্যারেজে যাইবেন।' এজন্য যে যার জায়গায় হাটে, গাঁয়েগঞ্জে প্রচার যেন করে। এরপর ধ্বনি দেন — 'জয় বাবা জল্পেশ্বর, জয়বাব তিস্তাবুড়ির জয়'।

জল্পেশ্বর অভিযান, শপথ গ্রহণ ও তিস্তা বুড়ির পূজা জমে না উঠলেও খবরের কাগজের জন্য একটা রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেল।

তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন রোখার জন্য ব্যারেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মূল দায়িত্ব পড়ে গয়ানাথ ও আসিন্দিরের ওপর। তারা বেশ ভালো ভাবেই বোঝে যে তিস্তা ব্যারেজ বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবু এতদিন ধরে যে মামলা মোকদ্দমা চলছিল তার পাশাপাশি আর একটা উপায় হিসেবে এই আন্দোলন অবশ্যই সংগঠিত করা যেতে পারে। উত্তরখণ্ড সম্মিলনে মানুষের একত্র করার যে স্বাদ পেয়েছে তা অনেক মানুষ জড়ো করার মধ্যে দিয়ে আর একবার উপভোগ করতে চায়।

সেজন্য উত্তরখণ্ডের চ্যাংড়া নেতারা গয়ানাথের বাড়িতে মিটিং করে একটা লিষ্ট বানিয়ে দিয়েছে কোন কোন হাটে মিছিল করা হবে। গোচিমারির হাট, কুমারপাড়ার হাট মিলে সবসুদ্ধ অন্তত বিশটা হাটে মিছিল তুলতে হবে। গয়ানাথ প্রশ্ন তোলে যে হাটে কে মিছিল বানাবে আর কে লেকচার দেবেন। সেজন্য একটা মাষ্টার মানষি দরকার। সে লোক দিতে পারবে কিন্তু মিছিল বানাতে পারবে না, লেকচার দিতে পারবে না। ' মোর মানষি নিয়া মিছিল বানিবার নাগিবে তোমরালাক।'

স্থির হয় তিলকরায় বর্মন গয়ানাথের বাড়িতে থেকে কয়েকটা হাটে মিছিল তুলবে আর বাকি হাট গুলোতে তুলবে সুস্থির নিজে। একেবারে উদ্বোধনের দিন বিক্ষোভ মিছিল সেরে সুস্থির ফিরে যাবে।

বাঘারুকে নিয়ে তিলক প্রতিটি টাড়িতে যায় আর ডাক দিয়ে সবাইকে জানায় যেন তারা হাটে গিয়ে বাঘারুর পতাকার কাছে জড়ো হয়, তারপর হাট মিছিল করে। তিলককে তো কেউই চেনে না। হাটে বাঘারুর ঝাণ্ডার কাছেও কেউ আসে না। ফলে একা তিলককেই বাঘারুর সঙ্গে হাটে ঘুরতে হয়।

'বাঘারুর কাঁধে ঝাণ্ডা।' সে আগে যায়। পেছনে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে তিলক। তিলক স্লোগান দেয় ' তিস্তা ব্যারেজ চালু করা...' কিন্তু বাঘারু বাকি অংশটা বলে না। আসলে সে জানেই না কী বলতে হবে। মিছিল শেষ করে ওরা গোলাবাড়ির ঢাল বেয়ে ওপরের বরম তলে ওঠে। 'বাঘারুর শরীরটাকে আকাশে খোদাই করা মনে হয়।'

তিলক ও বাঘারুর দীর্ঘ সংলাপে জানা যায় যে বাঘারু গয়ানাথের কথাতেই ঝাণ্ডা ধরে, আসলে তার কোন পার্টিপুর্টি নেই। এমন কি সে যে জল্লেশে গেছে, ঝাণ্ডা ধরেছে সেও গয়ানাথেরই কথায়। আসলে তার কোন খণ্ড নেই, জয়েন নেই— অর্থাৎ সে উত্তরখণ্ডে জয়েন করেনি। তিস্তা ব্যারেজ প্রতিরোধের দিনও গয়ানাথ বললে সে যাবে তবে উত্তরখণ্ডি হিসেবে নয় এমনকি রাজবংশী হিসেবেও নয়। ' মুই রাজবংশী নও, মুই ভাটিয়া না হও, মোর কোন পার্টি নাই, মোর কোন মানষি নাই, মোর কোন ঝাণ্ডা নাই'। গত দশ বারো বছরে বাঘারু মাত্র তিনটি সংলাপে অংশ নিল। 'তাও সংক্ষিপ্ত'। তাও ক্রমেই নেতিবাচক'। বাঘারু কি তার জীবনে ক্রমেই নিজের কাছে নিজে অবান্তর হয়ে পড়ছে— ধারাবাহিক ভাবে।' ক্রান্তির হাটে নিমগাছের তলায় একখানা ঝাণ্ডা নিয়ে বাঘারু একা দাঁড়িয়ে থাকে গয়ানাথের অপেক্ষায়।

গয়ানাথ হন হন করে এসে মিছিল করার মানুষ কোথায় বলে জিজ্ঞাসা করে। বাঘারু জবাব দেয় কেউ আসেনি। গয়ানাথ তিলকের খোঁজও নেয়। তিলকের এগিয়ে আসা দেখে সে রেগে মেগে বলতে থাকে যে - তারা নেতা হতে চায় অথচ মানুষ যোগাড় করতে পারে না— মিছিল কে করবে। এরপর চিৎকার করতে থাকে। কানকাটুকে- হাটের সবাইকে ডাকতে বলে। গয়ানাথের চেচামেচিতে একটা ভিড় জমে যায়। ভিড়টার দিকে তাকিয়ে তিলক লাইন লাগাতে বলে। কিন্তু ভিড়টা সবটা যোগ দেয় না। কারণ তারা সবাই তো গয়ানাথের নয়, উত্তরখণ্ডের লোক নয়, তারা গয়ানাথের চিৎকার শুনে এসেছে। তারা অনেকেই বামফ্রন্ট।

গয়ানাথও বামফ্রন্টকে গালাগাল দেয়। একজন প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে যায়। কিছু লোক এগিয়ে এলেও বাজারের থলি হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। গয়ানাথ তাদের উদ্দেশ্যে বলে, ' শালা, বলদের ঘর, সব এইটে আসিবেন বাপের বিয়া দেখিবার তানে? লাগা কেনে? মিছিল লাগা, লাগা'। এবার গয়ানাথ তিলককে ডাকে লোক গুলোকে মিছিলে সামিল করার জন্য। তিলক ফের, ' খাড়ি যান, লাইন লাগান, বলে চিৎকার করতে থাকে। গয়ানাথ ভাদই কাতুরাদের দাঁড়িয়ে না থেকে লাইনে দাঁড়াবার জন্য বলতে থাকে। ওরা অন্যমনস্ক হয়ে লাইনে এসে দাঁড়ায়।

তিলক 'উত্তরখণ্ড' বলে চিৎকার দেয়। কিন্তু কারো তেমন গলা শোনাই যায় না। বরং কোন অভ্যস্ত গলায় হেঁকে ওঠে 'বামফ্রন্ট জিন্দাবাদ'। ভিড়টা থেকে কেউ আত্মাবিশ্বাসে আহ্বান দেয় ' হে-ই সগায় বামফ্রন্টের মিছিল সাজাও, মিছিল সাজাও। উত্তরখণ্ড পার্টির মিছিল চলিবে না, চলিবে না।

গয়ানাথ একটু দূরে থেকে মিছলের পেছনে হাঁটে। হাটের ভেতর ঢুকে মিছিলটার গলা শোনাই যায় না।

পরিকল্পিত স্লোগান — 'উত্তরখণ্ড পার্টি জিন্দাবাদ, তিস্তা ব্যারেজ বন্ধ করো, ব্যারেজ বিরোধী মিছিলে যোগ দিন' ইত্যাদি স্লোগান কেমন যেন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

হাটে রটে যায় এবার বামফ্রন্টও মিছিলও বের করবে। হাটের এক কোণে ঋষিকেশ বসেছিল। সে চিৎকার করে ওঠে। 'তিস্তা ব্যারেজ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' আর দেখতে দেখতে জায়গা থেকে অনেক লোক এসে হৃষিকেশের পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে। একটা লাল পতাকাও জুটে যায়। মিছিলে যোগ দেয় রাধাবল্লভ আলবিশ ভগৎও। এদিকে সুধন সাহাও একটা ছোট্ট মিছিল বের করেছে। রাধাবল্লভ হাত মুঠি করে আকাশে তুলে হাঁক দেয়, 'ক্রান্তি হাটে উত্তরখন্ড চলবে না, চলবে না, গয়ানাথ জোতদারের বামফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত খতম করো, খতম করো। এদিকে হাঁটের আর এক জায়গা থেকে চা বাগানের শ্রমিকরা ও ফুলবাড়ি বস্তির লোকেরা আর একটা মিছিল বের করে দিয়েছে। মনে হয় ক্রান্তিহাট জুড়ে কেবল বামফ্রন্টেরই মিছিল।

চারদিকে বামফ্রন্টের এত মিছিলের দাপটে গয়ানাথের উত্তরখণ্ডের মিছিল যেন মিইয়ে যায়। উত্তরখণ্ডের মিছিলের লোক গুলো এলোমোলো, ঝাণ্ডাটা লম্বা এখানে সেখানে লেগে ঝামেলা সৃষ্টি করে। লোকগুলো হাঁটতে পারে না, স্লোগান ঠিক মত দিতে পারে না। ফলে মিছিলটা কখন শুরু হল, কখন শেষ হল বোঝাই গেলনা। নানা দিক থেকে বামফ্রন্টের মিছিল এসে দেখে গয়ানাথ এক জায়গায়, তিলক এক জায়গায়, আর ঝাণ্ডা হাতে বাঘারু আর এক জায়গায় দাঁড়ানো। কারো সঙ্গে কোন সংযোগ নেই।

ক্রান্তির হাটের পাকা রাস্তা বামফ্রন্টের দখলে চলে যাওয়ায় তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন উত্তরখণ্ডিরা চ্যাংমারি ব্যারেজের রাস্তাটাই বেছে নেয়। গয়ানাথের লোকজন এই রাস্তারই দুপাশে। সুস্থির জনা পঞ্চাশেক লোকের একটা সাইকেল মিছিল চ্যাংমারি হাটের পাকা রাস্তার ধরে, চ্যাংমারি ফরেস্টের পাশ দিয়ে, গোলাবাড়ি আর পশ্চিম দোলাই গাঁওয়ের মাঝখান দিয়ে, নেওড়া বস্তির ওপর দিয়ে সোজা ব্যারেজের দিকে যায়। আর শ'খানেক লোকের একটা পায়ে হাঁটা মিছিল পশ্চিম দোলাই গাঁও থেকে বাঁয়ে ঘুরে নেওড়া বস্তিতে গিয়ে ওঠে। দুটো মিছিল আপলচাঁদ ফরেস্টের ভিতর দিয়ে একসঙ্গে গাঁজোলডোবা-তিস্তা ব্যারেজের দিকে চলে যায়।

একটা লম্বা বাঁশের মাথা তে-কোনা পতাকা হাতে বাঘারু মিছিলের সামনে। তার পেছনে ওই শ'খানেক পায়ে হাটা লোক, তার পেছনে সাইকেল মিছিলটা।

'আপলচাঁদ বাঘারুর, বাঘারু আপলচাঁদের।' এর ভেতরেই কোথাও তার জন্ম হয়েছিল। এর ভেতরেই

কোথাও বাঘ তার পিঠে থাবা বসিয়ে ছিল। আজ এত লোক তার পেছনে। কিন্তু বাঘারুকে একা লাগে।

বাঘারু মিছিল নিয়ে এগোতে থাকে সেই বিশাল প্রাচীরের দিকে, বিরাট মঞ্চের দিকে। যেখানে রাস্তা প্রায় শেষ হয়ে আসে সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় তিস্তা ব্যারেজ। আকাশের কাছাকাছি মঞ্চ, লাল-নীল কত রঙ। এটা পেছনের দিক। সামনে নিশ্চয় বহু মানুষের সমাবেশ। সুস্থির পেছন থেকে বেরিয়ে সবাইকে দাঁড়াতে বলে। ওদিকে অতবড় মিটিং চলছে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে স্লোগান গুলো ঝালিয়ে নিতে হবে। সে স্লোগান গুলি প্র্যাকটিস করায়।

'উত্তরখণ্ড পার্টি জিন্দাবাদ'

'তিস্তা ব্যারেজ বন্ধ করো-বন্ধো করো।'

'বামফ্রন্টের পৌষমাস-রাজবংশীদের সর্বনাশ।'

'তিস্তা ব্যারেজের জলে ভাসিবে কায় - রাজবংশী সমাজ হায় হায়।'

' তোমার আমার সর্বনাশ, 'তিস্তা ব্যারেজ নিপাত যাক্।'

এরা যখন স্লোগান গুলো রপ্ত করছিল - তখন একটি পুলিশের জিপ এসে একেবারে বাঘারুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে সুস্থিরকে বলে মিছিল ভেঙে দিতে, স্লোগান বন্ধ করতে। হঠাৎ লাঠি বন্দুক নিয়ে পুলিশের আগমনে সুস্থিররা কেমন হকচকিয়ে যায়। তবু সুস্থির মুঠিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ অফিসার দু'পা এগিয়ে এসে আঙুল দিয়ে ইশারা করে পুলিশদের লাঠি চার্জ করতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দল লাঠি দিয়ে সুস্থিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে দেয়। যে যার মত পালাতে থাকে। এমনকি সাইকেলওয়ালারা কেউ কেউ সাইকেল ফেলেই ছুটতে থাকে। সুস্থিরকে পেটানো হয় বেশি করে। একটা জিপে ক'টা আর পুলিশ ছিল — ' তারা মাত্র কয়েক মিনিটে উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি - আপলচাঁদের একটু টুকরো জমির ওপর মেরে, ভেঙে, থেঁতলে ফেলে দিয়ে চলে যায়।'

বাঘারু সেই যে ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। পুলিশ তার সামনে এসে থেমেছে, তাকে সামনে পেয়েছে, কিন্তু তাকে এড়িয়ে মিছিলটাকে প্রহার করেছে। হয়তো তার ঢ্যাঙা, উলঙ্গ শরীর প্রহারেরও অযোগ্য ঠেকেছে পুলিশের পক্ষে। পুলিশ বাঘারুকে মারেনি বা মারার প্রধান লক্ষ করেনি। বাঘারুও পালায় নি। পালাবেই বা কোথায় এই আপলচাঁদে।

মিছিল তছনছ করে পুলিশ ফিরে গেলে মার খাওয়া লোক গুলো যে যার বাড়ি চলে গেছে। সাইকেলওয়ালারা

সাইকেল করে ফিরে গেছে। কিন্তু বাঘারুকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। বাঘারু ফিরে যায় আপলচাঁদ, গাছগাছালি, জংলাভূমি, সামনের তিস্তায়। ' শুধু তিস্তার ভেতরে ওই বিরাট প্রাচীর, প্রাচীরের ওপর অত গেট আর মঞ্চ, গেটে আর মঞ্চে এত ঝাণ্ডা — এই সব ঐ তার স্বদেশের সঙ্গে ঠিক মেলেনা।'

বাঘারু পতাকা সমেত বাঁশ মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যায়— খালি দুই হাতে। বাঘারু ঐ রঙ চঙে স্টেজ আর প্যাণ্ডেলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে — 'দেখিবার নাগে ঐটে কি সত্যিই একখান নতুন নদী বানিবার ধরিছে, নাকি ময়নাগুড়ির ঐ বেটিছোয়াখানের নাখান নাচানাচি লাগাবার ধরিছে।'

অন্ত্যপর্ব : মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র

হাটের দিন মাদারিদের ঘুমিয়ে পড়তে একটু দেরিই হয়। সেই সন্ধ্যে থেকে হাট ফেরতা গরুর গাড়িগুলো কঁকাতে কঁকাতে চলতেই থাকে। তাদের যাওয়া আর ফুরোয় না। হাট থেকে এসে মাদারি তার মাকে বলে যে কাল জলুশ হবে হাটে, ট্রাক ঢুকবে।

'মাদারির মা'র ঘর ফরেস্টের সীমায়।' ন্যাশন্যাল হাইওয়ে ফরেস্টের মাঝখানে যে একটু ফাঁকা জায়গা যেখানে এক সময় রাস্তা পিচ করার জন্য ড্রাম জাল দেওয়া হত, যেখানে হাতির পাল তাড়াবার জন্য একটা গাছের গুড়িতে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। সেটা পেরিয়ে খানিকটা এগোলেই ফরেস্ট একেবারে রাস্তায় উঠে আসে। ফরেস্টের ভেতর থেকে একটা ঝোরা এসে এখানে রাস্তা পেরিয়েছে। রাস্তার অপর দিকে ঝোরার খাত। এখানে রাস্তাটা বেশ চওড়া। অনেক সময় ট্রাকের ড্রাইভাররা এখানে গাড়ি থামিয়ে ঝোরা থেকে জল নেয়। নিজেরাও নেমে চোখে মুখে জল দেয়।

শীতের চার পাঁচ মাস ঝোরায় জল থাকে না। মাদারির মা রাস্তার পাশে ঝোরার ভেতর থেকে ওঠা একটা শ্যাওড়া গাছের তলায় পাথর দিয়ে বেদি বানিয়েছে। সাধারণ ভাবে ওখানে গাছটা থাকার কথা নয়। কিন্তু থেকেছে। যারা রাস্তা তৈরি করেছে, তারা শেওড়া গাছ কাটতে নেই বলে কাটেনি। মাদারির মা তখন কোথায় ছিল তা মাদারির মা'রও জানা নেই। কিন্তু মাদারির মা যখন ডালপালা দিয়ে ঘর বানিয়ে এখানে এসে বসবাস শুরু করে তখন জায়গাটার নাম শ্যাওড়াঝোরা হলে মন্দ কী?

বিচ্ছিন্ন একাকী গাছটা হয়ে উঠেছে বৃক্ষদেবতা। মাদারির মা গাছটাকে চিনতে পেরেছে। ফলে দুহাতে তোলা যায় এমন পাথর এনে গাছের গোড়াটায় পরপর সাজিয়েছে। মাদারির মা ভেবেছিল যে এই দেবতার

মত দেখতে গাছটাকে যদি পাথর দিয়ে ঘিরে সত্যি দেবতা বানানো যায় তাহলে এ পথে যাতায়াতকারী বাস-ট্রাকের ড্রাইভার ও লোকজনের ছোঁড়া দু-দশ পয়সার একটা আয় হবে।

এই শ্যাওড়া গাছের জন্য না ঝোরার জন্য না মাদারির মা'র জন্য জায়গাটার নাম শ্যাওড়া ঝোরা হলো? শেওড়া, ঝোরা দুই-ই আছে ছিলও, কিন্তু মাদারির মার ঐ ডালপালা, পাতায় ছাওয়া ঘরটুকু যদি না থাকত তাহলে কি-ট্রাক-বাসের ড্রাইভাররা এখানে বসে গাড়ি থামিয়ে একটু গাড়ি ধোয়া, নিজেরা চোখ মুখ ধোয়ার কাজ করত? তাদেরই হয়ত দরকার হয়েছিল এই জায়গার একটা নাম করণের। কিন্তু বেদি সহ শেওড়া গাছটাকে দেবতা বানানো গেল না। ফলে কেউ পয়সাও ছোঁড়ে না। অগত্যা মাদারিকে গাড়ি থামলেই ছুটে যেতে হয় গাড়ির কাছে। হাতপাতা হয় দু-চার পয়সার জন্য। 'হাত মুখ ধোয়ার পর ট্রাককে জল খাওয়ানোর পর ড্রাইভার তার বিরাট বুক পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা মাদারির হাতে দেয়।' ড্রাইভাররা গাড়ি স্ট্রার্ট দেওয়ার পর তাকিয়ে দেখে মাদারি কেমন করে 'ধীরে ধীরে চড়াই ভেঙ্গে, মাঠের ডাঙ্গা ভেঙে উঠে যাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে।'

কিন্তু এই দাঁড়ানো তে নিশ্চিত নয়। তবে হাটের দিন, মিষ্টির দোকান থেকে নেকরা নিয়ে মাদারি চাবাগানের ট্রাকগুলোর বা বাইরেরও কোনো ট্রাকের কাঁচ, বনেট, ড্রাইভারের দরজা মোছে - তাতে এক একটা হাটে চার পাঁচ টাকা পর্যন্ত হয়ে যায়। প্রথমদিকে ট্রাকে ক্লিনাররা তাকে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু আস্তে আস্তে মাদারি কাজটা প্রায় আদায় করে নিয়েছে। 'শেওড়া ঝোড়ায় নিয়মিত ট্রাক দাঁড়ালে মাদারি ত সেগুলোও মুছতে পারত।'

হাটে টিন পিটিয়ে লাল শুকরা ঢোলাই দিচ্ছিল আর বলছিল 'কাল তিস্তা ব্যারেজ যাবার লাগেক, জলুশ হবেক।' কথাগুলো শোনার জন্য মাদারি তার পেছন পেছন খানিকটা ঘোরে। লালশুকরা মাদারিকে বলে ঢোলাই দিতে আর বলতে—কালি তিস্তা ব্যরাজমে জলুশ হবেক, মিনিস্টার আবেক, ট্রাক আবেক—মাদারি টিন-কাঠি দিয়ে সারা হাটে জুলুশ, জুলুশ, চিৎকার করে ঢোলাই দিতে থাকে। মিষ্টির দোকানের ঘোষ মশাইর চোখে পড়ায় রাগে চোখ পাকিয়ে হেঁকে মাদারিকে এসব বন্ধ করে যার টিন তাকে দিয়ে কাপ ধুতে বলে।

মাদারি দৌড়ে গিয়ে লালশুকরার কাছে গিয়ে তার পাশে টিনটা রেখে ঘোষমশাই'র দোকানে চলে আসে।

মাদারি দু' হাটবারে ঘোষ মশাই'র দোকানে চায়ের কাপ ধুইয়ে দেয়। সেজন্য সে দু-চার পয়সা পায়ও। চা বানায় বাহাদুর। সে বলেছে বড় হলে তাকে চা বানানো শেখাবে। অবশ্য এখনও চা বানানোর টেবিলটা

মাদারির থুতনি পর্যন্ত। চা বানানো শিখতে হলে তাকে আরও লম্বা হতে হবে। হাট শেষ হওয়ার আগে তিনটে জলুশ দেখা গেল। 'সবাই বলে কাল তিস্তা ব্যারেজে জলুশ।'

মোটামুটি বলা যায় ১৯৬৮ সালের বড় বন্যার পর, ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে তিস্তা ব্যারেজ কথাটা খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা যায়। তিস্তা-মহানন্দা মাষ্টার প্লান কথাটিও তখনকারই। অল্প কিছুদিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট চলেও যায়। কথাটাও চাপা পড়ে। কয়েক বছর পর তিস্তাব্যারেজ প্রকল্পে হাত দেওয়া হবে, এজন্য তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন তৈরি হয়ে গেল। নিউজলপাইগুড়িতে একটি অফিস ও মালদার আর এক অফিস খোলা হল। মালদার একমন্ত্রী এর দায়িত্বে রইলেন। নিউজলপাইগুড়ি বা মালদায় তিস্তা নেই অথচ মূল অফিস সেখানে, ফলে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকে প্রতিবাদ উঠল। এই অফিস খোলার পেছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করছে মনে করা হল। অফিস নিয়ে নানা বিতর্ক শেষ হওয়ার আগেই 'জরুরি অবস্থা', ৭৭-র ভোট ও ইন্দিরা গান্ধির হার হয়ে গেল। কংগ্রেসই যদি কেন্দ্রে হেরে যায় তবে ব্যারেজের কাজ এগোবে কি করে। ১৯৭৭ সালের ভোটে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলো। মাঝখানে দুটো একটা ভোট। কিন্তু বামফ্রন্ট নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সরকারে বহাল থাকার ফলে তিস্তা-মহানন্দা প্রকল্প গতি পেল। স্পেশাল সেটলমেন্টের জরিপের কাজ ৭৭ সালেই শুরু হল।

'গাজলডোবা গ্রাম হয়ে উঠল প্রধান কর্মক্ষেত্র।' এপারে গাজল ডোবা আর ওপারে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের মাঝখানে চওড়া চউড়ি, তিস্তার মাঝখান দিয়ে তিস্তা ব্যারেজের কাজ শুরু হয়। সে কাজ এখনও চলছে। কিন্তু তার উদ্বোধন কাজ শুরুর আগেই। 'সেই উদ্বোধনেই এত জলুশ যাচ্ছে।' তিস্তা ব্যারেজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই এর উদ্বোধনের প্রয়োজন হল কেন—হাজার প্রশ্নের মধ্যে এই একটি প্রশ্নই এখন সবার মুখে।

ব্যারেজের একটি প্রধান কাজ হল তিস্তার জলকে তার মূল খাতে শাসনে রাখা। এ ব্যবস্থা না থাকায় তিস্তা আপন খেয়ালে খাত পরিবর্তন করে চলে। ফলে যে খাত বিরাট হয়ে গেছে, তার মাঝখানে-মাঝখানে অনেক চর তৈরি হয়েছে। সেইসব চরে বসতি হয়েছে, চাষবাস চলছে। তিস্তা ব্যারেজ হলে এইসব চর আর থাকবে না, জলের ধাক্কায় চরগুলো ভেসে যাবে।

এই সব চরে বিশেষত পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র চাষীরা বসবাস করে। তিস্তা ব্যারেজের কথা শুনে তারা তাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থান নির্মানের কথা নিজেরা ভাবছে সরকারকেও ভাবাচ্ছে। যেহেতু ব্যারেজের জন্য প্রত্যক্ষ ক্ষতি

তাদেরই বেশী তাই সঙ্গত কারণে তারা অর্থাৎ যাদের উচ্ছেদ হতে হবে, ব্যারেজের কাজে তাদের নিতে হবে বলে দাবি তুলেছে। বিশেষ করে মাটি কাটার প্রাথমিক কাজে। কিন্তু তাদের দাবিপূরণে অনেক বাধা দেখা দিয়েছে। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষরও এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই। কাজটা হাতে নিয়েছে সর্বভারতীয় কোম্পানী। তারা সাব কন্ট্রাক্টর দিয়ে কাজ করায়। তারা এসব কাজে লেবার আনে তাদের সুবিধা মত জায়গা থেকে। এজন্য তারা অনেকে চলেও গেছে। লোক আসাও শুরু হয়েছে। ট্রাক আসার একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে। ছোটখাট একটা বাজারও বসা শুরু করেছে। এ অবস্থায় এইসব লোককে বসিয়ে কোম্পানী কি স্থানীয় চরের লোকদের কাজ দেবে।

কোম্পানি গোপনে একটা হিসেব কষেছিল যে একাজে দূরের চরের লোকেরা আসবে না। আসলে লোকাল কিছু লোক আসবে। তাদের সংখ্যা হবে কম। ফলে কোম্পানির নানা লোকের সঙ্গে তারা এঁটে উঠবে না। তাছাড়া সাবেক কন্ট্রাক্টরের আবার কিছু সাব কন্ট্রাক্টর দরকার। তারা আসবে লোকাল থেকে। তারা প্রকল্পের প্রাথমিক কাজের মালপত্র যেমন বাঁশ, দড়ি, শাল-বরগা, পাথর ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে জোগান দেবে। এরা স্থানীয় রাজনীতিটাকেও দেখবে। এছাড়া কোম্পানি সবচেয়ে দক্ষতা দেখায় স্থানীয় গ্রামাঞ্চলে রাজবংশীদের একটা সংগঠন গড়ে, যারা চরুয়াদের বিরোধী। চরুয়ারা এ সংবাদ শুনে সরাসরি দাবি করে রাজবংশীদের কাজে নেওয়া চলবে না। এই দ্বন্দ্বগুলি কাজে লাগায় কোম্পানি। কাকে কাজ দেবে—রাজবংশীদের দিলে চরুয়া দাঙ্গা বাঁধাবে। 'সুতরাং কোম্পানি সরকারের অনুমতি অনুসারে নিজের লোকদের দিয়ে কাজ শুরু করে দেয়।'

ব্যারেজের কাজ শুরু, উদ্বোধন ইত্যাদি ছাড়াও একটা ইতিহাস আছে 'সে ইতিহাস ত প্রতিদিন, প্রতি বছরের নানা ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।' সাধারণত দেখা যায় ইতিহাসের বড় ব্যাপার কলকাতা-দিল্লী-বোম্বের মত বড় শহর থেকে ছড়ায়। কিন্তু কোনও কোনও সময় দেখা যায় উত্তরবঙ্গের মতো একটা অঞ্চলের একটা অনির্দিষ্ট জায়গা থেকেও ইতিহাস একটা আকার পায়। অনেক সময় দেখা যায় এরকম আঞ্চলিক খন্ডের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত বড় ইতিহাসের অসম কিন্তু প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান গঠন ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাত্র সাত বছর আগের আন্দোলনের সূত্র ধরে। ভারতীয় মূলধারার বিরুদ্ধে মুসলমানের একটা বিচ্ছিন্ন ধারা আশ্চর্যজনক ভাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেল। ১৯৪০ সালে লাহোর সম্মিলনে পাকিস্তানের দাবি প্রথম তোলা হয়। মাত্র সাত বছরেই তা স্বাধীনতার প্রায় একশ বছরের স্বপ্ন কল্পনার প্রতিদ্বন্দ্বী

হয়ে উঠল!

'তিস্তা ব্যারেজ সেরকম একটা আঞ্চলিক খন্ড ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই মালদহ-দিনাজপুরের পোলিয়া রাজবংশী ও কোচবিহার জলপাইগুড়ির রাজবংশীরা তাদের আদিবাসী সত্তার প্রাধান্য চেয়ে বসে। উত্তরখন্ড পার্টি বা আন্দোলনের মধ্যেও সেই প্রাধান্য চাওয়ার ব্যাপারটা আছে। এর সঙ্গে আরও কিছু দাবি মিশিয়ে রাজবংশীদের স্বার্থরক্ষার কথা বলা হচ্ছে। তবে এর মধ্যে বহু ক্ষুদ্রস্বার্থ এমন ভাবে স্থান পেয়েছে যে এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অতটা উজ্জ্বল নয়। এতদসত্ত্বেও যখন তারা জল্পেশের শিবলিঙ্গ আর বোম্বের শ্রীদেবীকে একাকার করে দিতে পারল-তখন এদের যে লোক বল নেই সেটাই বা বলা যায় কেমন করে।

'প্রাচীন ইতিহাস, জনবৈশিষ্ট্য এইসব নিয়ে একটি অঞ্চলের বিশিষ্টতা যখন তার বিচ্ছিন্নতার উপাদান হয়ে ওঠে, তখন ইতিহাসের কোন উপাদানই অব্যবহৃত থাকে না।'

প্রায় মাঝখান দিয়ে যদি পূর্বপশ্চিমে একটা রেখা টেনে জলপাইগুড়ি জেলাকে দুভাগ করা যায় তাহলে উত্তরের তিন ভাগের দুভাগই রাজবংশী এলাকার বাইরে। একেবারে উত্তরে দার্জিলিং জেলার লাগোয়া অংশের অধিবাসীরা নেপালী, তার দক্ষিণে চাবাগান সূত্রে কোল মুন্ডা-সাঁওতালরা আর একটু দক্ষিণে সমতল অংশে রাজবংশীরা বাস করে। সেজন্য জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর অংশ-দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। 'ফলে পার্বত্য এলাকার সঙ্গে জলপাইগুড়ির একটা সম্পর্ক প্রায় স্থায়ী হয়ে গেছে।'

শিলিগুড়ি থেকে হিলকার্ট রোড দিয়ে দার্জিলিং এর সঙ্গে একটা দীর্ঘ সম্পর্ক সমতলের। সেরকম জলপাইগুড়ি জেলার ওদলা বাড়ি থেকে গরু বাথানের রাস্তা সোজা উঠে গেছে লাভা আলগারা হয়ে কালিঙপং। পাথরঝোরা, শুড়িবাড়ি, ছোট ফাগু, বড় ফাগু ইত্যাদি চা বাগান ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠে গেছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে জলপাইগুড়ি কোথায় শেষ হয়ে দার্জিলিং শুরু হলো।

সেই নিরবিচ্ছিন্ন মুখ আর ভাষার সূত্র ধরেই সাম্প্রতিক কালে পাহাড়ি মানুষের এক স্বাতন্ত্র্যের দাবি পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসেছে। সেই দাবি-ই গোর্খাল্যান্ডের দাবি। তবে ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যায় সেই স্বাতন্ত্র্যের দাবির মধ্যে নিহিত আছে পশ্চিমবঙ্গের এই পাহাড়ি এলাকা প্রতি বহু বহু অবজ্ঞা, উপেক্ষা নিজেদের মাতৃভাষার অস্বীকৃতি ও আহত আত্মসম্মান বোধ। তারা যেমন হিসেব করে কত চা, কতটা কাঠ

সমতলে যাচ্ছে আর পাহাড় সেই অনুপাতে কিছুই পাচ্ছে না-তেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তো কেন্দ্রের কাছে হিসেব দেখায় তাদের বঞ্চনার। তাহলে একই রকম হিসেবের পদ্ধতি, একই রকমের ভাষা ও বচন। অবশ্য তিস্তা ব্যারেজের জন্য দাবিটা ওদের বড়ই উদ্ভট। 'তিস্তা ব্যারেজের আসল মতলব নাকি পাহাড়ের নদীর জল সমতলের জন্য টেনে নেয়া।' একথা ঠিক হতে পারে না। বরং বলা যায় তিস্তা প্রকল্পে তো পাহাড়ের মানুষেরও উপকার হবে।

রাজনীতি করে কেউ যদি বলে যে তিস্তা তো কালিঙপং এর নদী। পাহাড়ে এরজন্য কারও মাথাব্যাথা নেই। যেই সমতলে নেমেছে অমনি বড় ব্যারেজ তৈরি করেছে, নদীটাকেও লুঠ করে নিচ্ছে। তাই তিস্তা ব্যারেজ ভাঙতে হবে। এ ধরণের উস্কানীমূলক বক্তব্যে বঞ্চিত মানুষ খুব তাড়াতাড়ি হিংসুক হয়ে উঠতে পারে।

উত্তরখন্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যান্ড ও নমশূদ্রদের আন্দোলনের ঐক্যহীনতা ও স্বচ্ছতার অভাবের সুযোগ নিয়ে সরকার তিস্তা ব্যারেজের কাজের গতি বাড়িয়ে দিল। তাছাড়া রাজনৈতিক দিক থেকে বামফ্রন্টের নিজেদের ঐক্য, এমনকি এ ব্যাপারে কংগ্রেসকেও হাতে পেয়ে এক প্রবল রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ শক্তি তৈরি হয়েছে। তাদের কাছে ওরা পরাভূত হতে বাধ্য। এছাড়া গত এক বছর ধরে চাবাগানগুলিতে ইউনিয়নের মাধ্যমে সমতলে রাজবংশীদের মাঝখানে বিচ্ছিন্নতা বিরোধী প্রচার চালানো হয়েছে।

তাই ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন উত্তরখন্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যান্ডরা আন্দোলন করছে বটে কিন্তু তা তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। কেন্দ্রিয় সরকারের জলবিষয়কমন্ত্রী রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রী, সেচমন্ত্রী উদ্বোধন করতে আসছেন। আর সেজন্যই চারদিকে এমন পুলিশ, সি.আর.পি, বি.এস.এফের ছড়াছড়ি।

তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন একটি সরকারী কর্মসূচির সঙ্গে একটি রাজনৈতিক ঘটনাও। একে কেন্দ্র করে প্রমাণ করা উত্তরখন্ড, কামতাপুর বা গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলনের চেয়ে বামফ্রন্টের শক্তি কত বড়। ইচ্ছে করলে সরকার পুলিশ দিয়ে পিটিয়েই ঐ আন্দোলনগুলিকে শেষ করে দিতে পারত। কিন্তু তাতে ওরা বেশি উৎসাহিত হতেও পারত। পুলিশ বাড়াবাড়ি করলে ব্যাপক আন্দোলনও হতে পারত। তার চেয়ে রাজনৈতিক ভাবে শক্তি প্রদর্শন করাই যুক্তি যুক্ত।

উদ্বোধনের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে প্রথমে উদ্বোধনের কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। শুধু নিরাপত্তার কারণ বলা হবে কেন রাজ্য সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আমলারা রাজ্য সরকারকে

নির্বাচনের আগে কৃতিত্বটা কংগ্রেসকে দিতে চাননি—রাজ্য সরকার-ই নিক এটা চেয়েছে। সুতরাং তিস্তা ব্যারেজের এই তড়িঘড়ি উদ্বোধন একমাত্র নির্বাচনটা আসছে বলে। ব্যারেজের উদ্বোধন দিয়ে নির্বাচনী অভিযান শুরু। যদি বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি উত্তরবঙ্গের নির্বাচনে তাদের ভোট ভাগাভাগি করে নেয় তাহলে বামফ্রন্টের পক্ষে জেতা আরও সহজ হবে। যদি বামফ্রন্ট আগের শক্তিই রক্ষা করতে পারে বা দু চারটা সিট বেশি পেয়ে যায় তাহলে ঐসব শক্তি আপনা আপনি মুখ থুবড়ে পড়বে।

লরি বা ট্রাকে করে কত দূর দূর জায়গা থেকে লোকজন আনা হচ্ছে। সেই কোথায় ভূটান সীমান্ত সাঁওতালপুর, কালচিনি, রাঙালিবাজনা, রাজাভাতখাওয়া, কোথায় বিন্নাগুড়ি, লাটাগুড়ি, মাদারিহাট, বীরপাড়া-হাসিমারা, জয়গাঁ, মাল, মেটেলি, ময়নাগুড়ি মাইল মাইল দূরের থেকে লোক আসছে দলে দলে।

জলুশের খবর এসেছে বলেই মাদারির মা জোলুসে যাবে এমন নয়। কারণ এত এত টারিবাড়ির মধ্যে যার এতটুকু ঠাঁই হয়নি বসবাসের, যাকে নিজে একটা শ্যাওড়াঝোরা বানাতে হয়েছে তাকে কে বলবে জলুশে যেতে। তাছাড়া জলুশে গেলে সে দিনটা তো তাকে উপোস করে কাটাতে হবে।

এই ফরেস্ট বন্য পশু পাখি যেমন করে আহার সংগ্রহে বেরয়, তেমনি করে তাকেও বেরতে হয়। সারা দিন মাটিতে চোখ রেখে তাকে ফরেস্টে ঘুরতে হয়। বনে ঘুরে ঘুরে সে মুরগির ডিম, ছোট মুরগির ছানা বা মেটে ইঁদুরের বাচ্চা পেয়ে যায়। এটাই তার সারা দিনের কাজ। হাতে একটা শক্তকাঠি নিয়ে সেটাকেই অস্ত্র বানিয়ে সে জঙ্গলে ঘোরে। কোন কিছু আওতায় এলে কখনো বর্শার মতো ছোঁড়ে, কখনো কুড়ালির মতো কোপ মারার ভঙ্গিতে শিকার ধরে। শুধু শরীরের জোরেই সে বেঁচে আছে। 'শুধু জোরেই 'আটটা না দশটা সন্তানের জন্ম দিয়েছে।'

ঘোষ মশাই'র দোকানের কাপ-ডিশ ধুয়ে বা ট্রাক মুছে মাদারি এখন ভাঁজ করা টাকাও আনে। তা দিয়ে চালও কিনতে পারে। চাল কেনা যত সহজ আগুন কেনা তত সহজ নয়। এজন্য মাদারির মাকে নানা কৌশল করতে হয়। কোনদিন ঘোষ মশাইর দোকান থেকে বেশ কিছুটা আগুন নিয়ে যায় কলা পাতায় বা কচু পাতায় করে। তখন 'সেই আগুনের শিখার পাশে ছেলের সঙ্গে মায়ের আর এক সংলাপ শুরু হতে পারে।'

মাদারি তার মাকে বলে যে ঘোষমশাই তাকে লাড্ডু আর নিমকি দিয়েছে খেতে কিন্তু এই আগুনের জন্য সব ভুলে গেছে। পরের হাট করে সে লাড্ডু এনে মাকে খাওয়াবে। মাদারির মা জিভের মধ্যে লাড্ডুর মিষ্টির

স্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করে। মাদারি আরও জানায় যে বাহাদুর তাকে চা বানানো শেখাবে, যখন সে টেবিলটা নাগাল পাবে। মাদারির মার আট-দশ সন্তান এভাবে টেবিলের সমান উচ্চতায় এসে কোথায় চলে গেছে। মাদারিও যদি চলে যায়। 'তা হলে মাদারির মা জলুশে যাবে কেন?'

বড়জোর আট দশ বছর ধরে মাদারির মা, মাদারির মা হয়েছে। কিন্তু তার আগেও সে কতবার মা হয়েছে তার হিসেব জানা নেই। যারা তার মুখ চেনা তারাও বলতে পারবে না তার মা হওয়ার কথা। মাদারই যে তার আগের ছেলে নয় তা জানা কি সম্ভব তাদের পক্ষে? কিন্তু মাদারির মাকে তো তারই উপর নির্ভরশীল ওপর একটা ছেলে দরকার। তা হলে তার ছেলে তার সঙ্গে বা থাকবেই কেন?

মাদারির মা-র একটা ম্যাপ তৈরি হয়ে গেছে কখন তার ছেলে আর তার কাছে থাকবে না। ঐ মোটামুটি যখন টেবিলের সাইজ লম্বা হয় নিজে নিজেই ট্রাকের চাকার ওপর ভর দিয়ে পেছনে উঠতে পারে বা যা পয়সা পায় তা আর সবটা মাকে দেয় না—তখনই জানা হয়ে যায় সে মাকে ছেড়ে চলে যাবে। তারা ঠিক কোথায় যায় জানা না গেলেও আন্দাজ করা হয় মাদারি হাট, বীরপাড়া, হাসিমারা ইত্যাদি জায়গায় যায়। মাদারির মা-র একটা ছেলে ছাড়াতো চলে না। তাই একটা ছেলে সেই অবস্থায় যাওয়ার আগেই আর একটা ছেলে জোগাড় করতে হয়। 'এত হিশেব নিকেশ করে ছেলে পেটে ধরতে গেলে ছেলের একটা বাপও মাদারির মার হাতের কাছে সব সময় বহাল থাকা দরকার।' তার প্রথম ছেলের বাপ একটা আধবুড়ো নেপালী। বেশ ক' বছর ঐ লোকের সঙ্গে থাকার পর একদিন লোকটি দোকানটোকান বেচে বাচ্চাটাকে গালটিপে আদর করে কোথায় চলে গেল।

দোকানের নতুন মালিকের লোক এসে সেই রাত্রিতেই দোকানে তালা লাগিয়ে বলে গেল সকালে বাচ্চা নিয়ে চলে যেতে। পরদিন কাক্ না ডাকতে দোকানের নতুন মালিকের এক লোক সহরায় ওরাওঁ এসে মাদারির মাকে তার কাছে নিয়ে গেল। লোকটার ঘর ছিল শাল-বাকলা দিয়ে তৈরি। সেই তার আর একটি ছেলে হল। এরপর একে একে এলো এক রাজবংশী জোতদার, তারপর এক চা-বাগানের বাঙালীবাবু ও এক মিলিটারি। আর তার বাচ্চারা নিয়মিত হয়ে যাচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। 'ততদিনে সে ঘর কবে যে ভেঙ্গে গেছে।'

সাতসকালে বনমুরগী আর ময়ূরের ডাকে মাদারি আর মাদারির মা'র ঘুম ভাঙ্গে। শীতকালে ওদের বড় কষ্ট হয়। ঘরের আগুন নিভে গেলে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু রোদ কি আর ওদের ঘরে ঢোকে। বিশাল

ফরেস্টের ফাঁক ফোকর দিয়ে দু-এক চিলতে রোদ এলে ওরা বিছানা ছেড়ে ওঠে।

বর্ষা শেষ, শীতও আসেনি। হিমে সকালের গাছপালা বৃষ্টির মত ভেজা। মাদারি তার মাকে জলুশে যাওয়ার জন্য ডাকে। মাদারির মা একবার ভাবে বলে দেয় 'তুই যা'। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় মাদারি একা গেলে যদি আর না ফেরে। তাই মার সঙ্গে যাওয়ার অভ্যাসটা থাকুক। আর এবারই বোধ হয় তার হিসেব গোলমাল হল—মাদারি চলে যাবার মত লম্বা হলেও তার মার পেটে বাচ্চা এল না। এমনও হতে পারে তার আর বাচ্চার দরকার নেই। মাদারি আর একটু বড় হলে বাহাদুর তাকে চা বানানো শিখিয়ে দেবে, তখন সে ঘোষ মশাইয়ের দোকানে চাকরি পাবে চা বানানোর। আবার ট্রাক মোছামুছি তো আছেই। এই ভাবনাগুলো তার মনের চার পাশে জমা হয়েই থাকে। তাই মাদারির ডাকে সাড়া দিয়ে সে বলে 'যাবু নাকি তুই, সত্যি?'

বাইরে কুয়াশা। মাদারির মা মাদারিকে অপেক্ষা করতে বলে, রোদ ওঠা পর্যন্ত। কিন্তু মাদারির তর সয় না। মাইল মাইল হেঁটে যখন মাদারি আর মাদারির মা হাট খোলায় পৌঁছায় দেখে সব খালি, জনমানুষ নেই। শুধু একখানা ট্রাক কুয়াশায় ভিজে দাঁড়িয়ে আছে। মাদারি বলে জলুশ বোধ হয় চলে গেছে। ওর মা বলে জলুশ কেমন যে চলে যায়। এরকম কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা দেখে ঘোষ মশাইয়ের দোকানের ঝাপটা আধখোলা। আরও এগিয়ে দেখে বাহাদুর কলের পারে দাঁত মাজছে। মাদারি বাহাদুরের সঙ্গে দোকানে আসে। আবার বাহাদুরকে কখন জলুশ বেরবে জিজ্ঞাসা করায় বাহাদুর বলে লোকজন সকালের কাজ কম্ম সেরে তবে তো জলুশে যাবার জন্য আসবে—তার মত ঘুম থেকে উঠেই তো দৌড়বে না।

বাহাদুর মাদারিকে বলে জল ফুটে গেছে, তিন কাপ চা যেন সে করে ফেলে। আর সে একটা রঙ চঙে ছবি আঁকা গেঞ্জি পরে নেয়। টেবিলের ওপর রাখা একটা মগে আধাআধি জল ঢালতে বলে বাহাদুর যায় প্যান্ট পরতে। এদিকে মাদারি বাহাদুরের কথানুযায়ী কাজটা সেরে এবার কী করবে জিজ্ঞাসা করে। বাহাদুর একটা চওড়া বেল্ট পরতে পরতে বলে 'খাড়া আইচছু'। কাছে আসতেই মাদারি বলে ওঠে 'হে বাহাদুর দাদা, তোমাক ত মিলিটারির নাখাল দেখাছে।'

বাহাদুর তিন চার চামচ চিনি, খানিকটা দুধ মগে ঢেলে দিয়ে একখানা ময়লা ধরনের নেকরায় কিছু ডাস্ট চা দিয়ে পোটলা করে মাদারির হাতে দিয়ে ঐ জলে নাড়তে বলে যতক্ষণ চায়ের রং না আসে। মাদারি একটা চামচ জোগাড় করে। এটাই তার বেশি দরকার। কারণ বাহাদুর তো চামচ দিয়ে শব্দ করে করেই চা বানায়।

মাদারিও তাই করতে থাকে। জলুশের জন্য মাদারি আজ প্রথম চা বানানোর সুযোগ পায়।

বাহাদুর এসে তিনটে কাচের গ্লাস সাজিয়ে মগ থেকে চা ঢেলে ভর্তি করে দেয়। তারপর বয়ম থেকে কুকিস বিস্কুট বের করে একখানা মাদারির হাতে দিয়ে বলে 'এই চা বিস্কুট তোর মাকে দিয়ে আয়' মাদারি চা বিস্কুট হাতে নিয়ে দু পা এগিয়ে সন্দেহের গলায় বলে যে চা বিস্কুট দুখানাই মাকে দেবে কিনা। বাহাদুর সম্মতি জানায়।

ততক্ষণে একটু রোদ পড়েছে সর্বত্র। মাদারি দোকান থেকে বেরিয়ে তার মাকে খোঁজে। এগিয়ে গিয়ে চা-বিস্কুট দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বলে 'মুই বানাইছু, বাহাদুরদা মোক শিখাইছে।' চা নিয়ে মাদারির মা জিজ্ঞাসা করে টেবিলে বানিয়েছে কিনা। এটা জানা তার জরুরী। আজ জলুশের সকালে মাদারি কি হঠাৎ টেবিলের সমান উঁচু হয়ে গেল। সে মাকে তার বানানো চা খেতে পীড়াপীড়ি করে। মায়ের চা খাওয়া দেখাটাই যেন তার প্রধান কাজ।

মাদারির মা চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে মুখে পোরে। তরল বিস্কুট সারা মুখ ভরে যায়। সে তার দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা দিয়ে বিস্কুটের আস্বাদ নিতে থাকে। বাহাদুর মাদারিকে ডাকে। একজন এসে বাহাদুরের কাছে চা চাইলে সে বলে 'আজ জলুশ, আজ দোকান বন্ধ।'

সকাল আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ হাটখোলা লোকে ভরে যেতে থাকে। চা বাগান থেকে মরদদের সঙ্গে মেয়েরাও এসেছে। এসেই নাচ শুরু করেছে হাটখোলার খোলা উঠোনে। তাদের মাথায় গোঁজা ফুল, পাতা যে যেরকম পেরেছে পরেছে। মরদরা সঙ্গে মাদল বাজাচ্ছে। একটা লোক বাঁশিও এনেছে। কিন্তু বাজাতে পারছে না অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্য।

পাশাপাশি গ্রাম থেকে রাজবংশী মেয়ে পুরুষরাও এসেছে সেজে গুজে। তারাও স্নান সেরে বা মাথায় তেল মেখে এসেছে। তারা গোল হয়ে ওদের নাচ দেখছে। এরই মধ্যে হান্টুপাড়া টি এস্টেটের তিন ট্রাক লোক এসে নাচতে শুরু করে। সবাই ওদিকে তাকায়। তারপর ওরা-চলে যায়। বাহাদুর চিৎকার করে বলে হান্টুপাড়া চলে গেল এবার লঙ্কাপাড়া আসছে।

বাহাদুরকে সবাই জিজ্ঞাসা করে তাদের ট্রাক কখন আসবে। লোকজনের এত ভিড় দেখে মনে হয় উত্তরখন্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যান্ড, নমঃশূদ্র সমিতি ও সবের যেন কোন অস্তিত্বই নেই। সরকার এবং পার্টি মিলে দূর

দূরান্ত থেকে লোক এনে বোঝাতে চাইছে সারা জেলার মানুষ তিস্তা ব্যারেজ চায়। অন্য কোন দলের এমনকি কংগ্রেসেরও কোনও অস্তিত্ব নেই এই জেলায়। এই ভিড়ের ভেতর হয়ত কামতাপুর, উত্তরখন্ডের, গোর্খাল্যান্ডের, নমঃশূদ্র সমিতির লোকজনও থাকতে পারে। সরকারী ব্যবস্থায় তারা যাচ্ছে। তবে এ নিয়ে কোন সন্দেহ বা উত্তেজনা নেই কারও। 'আটটা বেজে যাওয়ার পর ধূপগুড়ির ভটচাজদের দুটো হাট বাস আর সিংজির একটা বিরাট বড় ট্রাক এসে দাঁড়ায়।'

তাড়াহুড়ো পড়ে যায় বাসে ওঠার জন্য। কে কোন বাসে ট্রাকে উঠল সে নিয়ে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি খোঁজ খবর চলে—তারপর ঠিক হয় 'যায় যেইঠে আছেন, নড়িবেন না, স্যালায় ব্যারাজত গিয়া বাছি নিবেন।'

তিনটি বাস-ট্রাকের বাইরেও কিছু লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পক্ষে ছাদে ওঠা সম্ভব হয়নি। রাস্তার ওপর দুজন শহরের ছেলে এসেছে। একটি ছেলে ট্রাকের ওপর উঠে একে ওকে সরিয়ে জায়গা করে দেয়। অন্য ছেলেটি বাসের জানলা দিয়ে বেরিয়ে বলে 'বাচ্চাদের কোলে বসান দেখবেন জায়গা হয়ে যাবে।'

ট্রাকের পেছনে কিছুটা জায়গা খালি হয়েছে। তাতে 'সেই দেউনিয়া চেহারার কয়েকজন এবং মেয়েরা ট্রাকে উঠে যেতে পারে।'

'জলুশ মানেই তো দল বেঁধে যাওয়া।' কিন্তু মাদারি আর তার মার তো কোন দল নেই। কার সঙ্গে তারা যাবে। মাদারির মা ধূপগুড়ির ভটচাজদের বাসে গিয়ে উঠেছিল কিন্তু সেখানে এক মোটা মহিলা তাকে জোর করে নামিয়ে দেয়। এবার ওরা মা-ছেলেতে মিলে আর একটা বাসের কাছে গিয়ে ওঠার জন্য কাকুতি মিনতি করে। কিন্তু সেখানেও ভিড়ের জন্য উঠতে পারে না। ওরা দেখিয়ে দেয় ট্রাক। এবার মাদারি মাকে নিয়ে ট্রাকের দিকে ছোটে। সে দেখতে পায় বাহাদুর ব্যাটন হাতে একখানা বাসের ওপরে লোক তুলছে। মাদারিকে দেখে সে চিৎকার করে বলে যে তারা এখনও ওঠেনি কেন? তখন ওরা দৌড়তে দৌড়তে ট্রাকের পেছনে যায়। ট্রাকে ডালা তখন উঠে গেছে। ট্রাকও স্টার্ট দিয়েছে। বাহাদুর চিৎকার করছে—ড্রাইভারকে গিয়ে থামাতে বলছে। ড্রাইভার আঙ্গুল দিয়ে ওপরে দেখিয়ে দিতেই ওপর থেকে একটি ছেলে প্রায় ধমক দিয়ে বলে ওঠে 'এখন সময় হলো?' ছেলেটিকে পেছন দিক থেকেই তুলে নেয়। আর তার মাকে ড্রাইভারের দরজার পাশ দিয়ে উঠতে বলে।

ট্রাকটা রওনা হতেই ছেলেটি স্লোগান শুরু করে। প্রথমে চেনা স্লোগানগুলো—বামফ্রন্ট সরকার জিন্দাবাদ।

গরিবের সরকার বামফ্রন্ট সরকার, পঞ্চায়েত আইন করল কে-বামফ্রন্ট আবার কে? উত্তরখন্ড-গোর্খাল্যান্ড চলবে না চলবে না, 'উত্তরবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদ রুখবই রুখব।'

ছেলেটি এবার শ্লোগানগুলিকে আরও নির্দিষ্টতায় আনতে চায়। 'তিস্তা ব্যারেজ করল কে-বামফ্রন্ট সরকার আবার কে?' তিস্তা ব্যারেজ কা পানিলেক-নয়াদিন, আগে লাক' গোর্খা-রাজবংশী ভাই ভাই, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, গোর্খা-দেশিয়া-মদেশিয়া একাই, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, 'চা-বাগিচা কা মজদুর বস্তি লোক কা দোস্ত ভুলো মত, ভুলো মত।'

প্রথম প্রথম ট্রাকটা বাস দুটোর পেছনেই যাচ্ছিল। কিন্তু দেখে এভাবে গেলে মিটিং শেষ হয়ে যাবে। তখন বাসকে পেছনে রেখে ট্রাক সামনের দিকে ছুটলো। 'দলগাঁও পেরিয়ে গেল।'

গয়েরকাটা থেকে যে রাস্তাটা বিন্নাগুড়ি-বানার হাট হয়ে চামুর্চি গেছে সেই রাস্তা দিয়ে একটুখানি গিয়ে ল্যাটার‍্যাল রোড যা দুই হাইওয়েকে যুক্ত করেছে সেই পথ ধরে ট্রাকটা এগোতে লাগল।

রাস্তার পাশ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে গয়েরকাটা নদী। নদীটার উল্টোদিকে ট্রাকটা চলেছে জমির একটু পাথুরে ঢাল বেয়ে আয়তনের চাইতে একটু বেশি খরবেগে।

বিন্নাগুড়ির কাছে এসে বড় ঝকঝকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তার মুখে মুখে বড় বড় কাঠের বাক্স উপুড় করা। তাতে রঙিন খুঁটি পোতা। পরিস্কার মাঠ। বিন্নাগুড়ি মোড় থেকে আর একটা রাস্তা পূবে মাদারি হাটের উত্তরে চলে গেছে। এই রাস্তা অনেক পুরোনো। এই রাস্তা গেছে 'দেও বুড়াপাড়া, শোভা রাম দিয়ে, তিনি নদী, বানগুড়ি নদী পেরিয়ে টোপা ভাসা। এখানে নেমে হাঁটা শুরু করলে হেঁটে হেঁটে মাদারি হাট পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যাবে। এই রাস্তা বড় করে পিচ ঢালা করলে বিন্নাগুড়ির সঙ্গে হাসিমারার একটা সুন্দর, গোপন যোগাযোগ স্থাপন হতে পারে। পশ্চিমে শিলিগুড়ির কাছে ব্যাঙডুবি আর পুবে জলপাইগুড়ির হাসিমারা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এই অঞ্চলটা একেবারে স্বাবলম্বী হতে পারে।

ট্রাকটা গয়েরকাটা থেকে ডান দিকে ঘুরে এই রাস্তাটা ধরতেই ট্রেনের নির্জনতার মত ট্রাকের ওপরেও একটা নীরবতা নেমে আসে। এ রাস্তায় দু একটা মিলিটারি ও চা বাগানের ট্রাক ছাড়া কোনো গাড়ির আনাগোনা নেই। কেবল এই ট্রাকখানাই মাইলের পর মাইল জঙ্গল পথে ছুটে চলেছে। ট্রাকের ওপরে কিছুক্ষণ আগেও যারা নাচছিল তারা এর ওর গায়ে মাথা দিয়ে ঝুঁকছে। কেউ শুধু তাকিয়েই আছে দূরে। কেউ বা গুন গুন করে

গানকে সঙ্গী করেছে। এর মধ্যেই দেবপাড়া চাবাগানের মেয়েরা মাথা নুইয়েই গান ধরে—

মাসি, তুই আর ভাল কম্বল খুঁজিস না,

.....

এমন উকুন আর আমি কোথায় পাব?

ইনিয়ে বিনিয়ে দীর্ঘক্ষণ চলে গানটি। হঠাৎ একটা মেয়ে সোজা হয়ে বসে বলে—'চা বাগানের গ্যামাক্সিন এখন আমার উকুনও খেয়েইছে, থাকার জন্য পোকারা এখন গাছের পাতাও পায় না, হায়রে এরপর পোকাগুলো থাকবে কোথায়?' এটা ঐ গানের সম্প্রসারণ না বর্জন না বুঝেই মেয়েগুলো একসঙ্গে হেসে ওঠে। এক সময় হাসি থামে আবার নীরবতা।

রাজবংশী মেয়েরা ট্রাকের পেছনে এসেছে। এবার ওরা গান ধরে-

'আকাশ ত পরিষ্কার হয়ে গেল,

কাল মুরগিটা সাদা হয়ে গেল,

.....

আর সাদা রাতের পর তোর সময় হলরে বিদেশিয়া বন্ধু,

পান-সুপুরি নিয়ে আমার গোসা ভাঙানোর?'

ট্রাকটার দুলুনির সঙ্গে চাপাকান্নার সুরে গানটা চলতে থাকে। এর মধ্যে ট্রাকটা এসে পড়ে বানার হাট বাজারে। সেখানে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে ট্রাকের অপেক্ষায়। ট্রাকটাকে দেখে তারা হাত তোলে, শ্লোগান দেয়, বামফ্রন্ট জিন্দাবাদ, চলো চলো ব্যারেজ মে চলো। বানার হাট পেরনোর পর আবার চা বাগান শুরু। সামনে একটা ঝলমলে ট্রাক-ছুটছে। এই ট্রাকটা গতি বাড়ায় ওটার সঙ্গ নেবে বলে।

মাদারি মা'র কাছে এতলোক, এত মিছিল, এত শ্লোগান সব কিছুই অবান্তর। তার সঙ্গে তো সম্পর্ক একমাত্র, ঝোরা, বন, গাছপালা ইত্যাদির। তাকে তো কেউ ডাকতই না। তারও আসার দরকার ছিল না। শুধু মাদারি জেদ ধরল বলে তার আসা কারণ সে মাদারিকে হাত ছাড়া করতে চায় না। বছর দুই পরে মাদারি তো চলেই যাবে কোথাও অন্য ছেলেদের মত। এবার সে জন্যেও সে এসেছে মাদারিকে আগলে রাখতে। আর অত লোকের মধ্যে কি তার আগের ছেলেরা কেউ নেই। ট্রাকে পাড়ার দলটাকে পেয়ে যাওয়ার পর থেকে মাদারির

মা'র বড় ভালো লাগছিল। সে যে প্রতিদিন ফরেস্ট, লতাপাতার সঙ্গেই মিশেও থাকে। তা থেকে তার আজ অন্য রকম স্বাদ পাচ্ছে। এই মুক্তির সঙ্গে সে শ্যাওড়া ঝোরার তুলনা করে না ঠিকই 'কিন্তু তার বড় ভালো লাগে এত মানুষের সঙ্গ, এত মানুষের চামড়ার গন্ধ।'

মাদারির মা তো কোনো মানুষের সঙ্গই পায় না। তার তো কোনো মানুষের কাছে তার দৈনন্দিনের আহার জোটে না। সেজন্য তাকে বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে আহার সংগ্রহ করতে হয়। অথচ আজ সেই মানুষই তাকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে। এখানে এক বাহাদুর ছাড়া তাকে কেউ চেনে না। জলুশ যেখানে নামবে সেখানেও তো তাকে কেউ চিনবে না। সবার সঙ্গ পেয়েও সে থাকবে একা।

মানুষের গন্ধর মত মানুষের আওয়াজও মাদারির মা'র ভালো লাগে। বনে তো কত রকমের আওয়াজ। সে আওয়াজের কারণ থাকে। ফরেস্টের পশুপাখি তাদের শরীর দিয়ে সে সব আওয়াজ করে, বোঝে, আওয়াজ অনুযায়ী নিজেকে বদলায়। মাদারির মা তো পশুপাখি নয়। তার আওয়াজ গ্রহণ বর্জনের একটা সীমা আছে। মিছিলের এই মানবিক কলরোল তার ভালো লাগে। বর্ষা নদী, বা আকাশে মেঘের চেয়েও ভালো লাগে।

ট্রাকটা খানিকটা ওপরে উঠে বা দিকে ঘুরতেই সামনে চকচকে কাল রাস্তা আর ছোঁয়া যায় এমন দূরত্বে পাহাড়। মাদারি মাথা তুলে পাহাড় দেখে, রাস্তা দেখে। রাস্তা তো সে অনেক দেখেছে কিন্তু এ রাস্তা অন্যরকম- বাঁয়ে খাদ, খাদটা দিয়ে বহু দূরের ফরেস্ট দেখা যায়। ডান দিকে পাহাড়। মাদারি দুজনের ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে।

মাদারি হাট থেকে বেরনোর পর থেকে তাদের মনে হয় তিস্তা নদীর ব্যারেজের কাছাকাছি বোধ হয় এসে গেল। যেদিন থেকে মিটিং মিছিলে ওরা তিস্তা ব্যারেজের কথা শুনেছে সেদিন থেকে একটা কল্পনা মনে মনে করে রেখেছে। ওরা তো তোর্সার পার থেকে এসেছে। তিস্তার বন্যা, ভয়ঙ্করতার কথা ওরা শুনেছে। তাই এখন মনে হচ্ছে এই বোধ হয় সামনে সেই ভয়ঙ্কর তিস্তায়, ভয়ঙ্কর ব্যারেজ দাঁড়িয়ে আছে। এরকম মনে হবার আরও কারণ এরা পরপর পাহাড়, নদী, খাদ, ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছে। ট্রাকে সাঁই সাঁই করে পার হয়ে গেল- লংতি, চুয়া, পাথাং, ডায়না, জলঢাকা, মূর্তি, জুর্তি নদীর ব্রিজ।

চালসার মোড়ে এসে ট্রাক থামাল পুলিশ। পারমিট দেখল। লিডারের খোঁজ করায় সুখেন্দু রায় এগিয়ে এলো। কোথা থেকে আসছে বস্তির লোক না বাগানের লোক জানতে চাইল। পুলিশ একটা স্লিপ দিল—

'পুলিশের বাড়ানো হাত থেকে একজন কাগজটা নেয়।' চালসায় দাঁড়ানো, পুলিশের স্লিপ নেওয়ার জন্য স্বাভাবিক ভাবে ট্রাকগুলোর একটা লাইন পড়ে যায়। চালসা থেকে মাল বাজার পর্যন্ত লাইন। মনে হয় ট্রাক দিয়েই বোধ হয় মিছিল। এবার সবাই ট্রাকে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে। কোনো কোনো ট্রাকে শুধুই মেয়েরা। এন.সি.সি'র পোষাক পরা ট্রাক ভর্তি ছেলে মেয়ে। আবার স্কুলের পোষাকেও ছেলে মেয়েরা আছে দু'তিনটি ট্রাকে।

আবার গাড়ি থামে পুলিশ ক্যাম্পের কাছে। পারমিট চায়। ছেলেটা আগের স্লিপ দেখায়। ক'জন আছে জিজ্ঞাসা করায় ছেলেটি গুনে বলে সাতাশি। পুলিশ একটা বড় কাগজ-বাড়িয়ে দেয় ট্রাকের সামনের কাচে লাগিয়ে নিতে নইলে ট্রাক ঢুকতে দেবে না। পুলিশের পাশে দাঁড়ানো ছেলেটি ব্যাজের বান্ডিল এগিয়ে দিয়ে সবার বুকে লাগাতে বলে। সেই ছেলেটি ঝুড়ি করে সাতাশিটা টিফিনও ট্রাকে দিয়ে দেয়। ট্রাক চলতে শুরু করে। ওরা কখন আপলচাঁদের ভেতর ঢোকে। মাদারি ও মাদারির মার মনে হয় তারা যেন শ্যাওড়া ঝোরায় ফিরে এসেছে।

'সেই সময় মাদারির মা ব্যাজ পায়, সঙ্গের সেফটিপিন দিয়ে সেটা ফোতার ওপর বুকের কাছে এঁটে নেয়। টিফিনের ঠোঙা পায়। কয়েক শতাব্দী পর যেন মাদারির মা তার জিভে মানুষের তৈরি গম ও সেই গম থেকে তৈরি আটার স্বাদ পায়। কয়েক সহস্রাব্দী পর মাদারির মা জিভ দিয়ে জানে পৃথিবীতে স্বাদের বৈচিত্র্য কতটা। মাদারির মা'র মুখের ভেতরে আলু আর রুটির টুকরো মুখবিবরের সহস্র গ্রন্থি মুখ থেকে নিঃসৃত লালায় যখন ভিজছে, ভিজছে আর মুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক তখন সে দেখে আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত এক নদীকে আড়াআড়ি ভাগ করে এক দেয়াল যেন আকাশের দিকেই ছুটে যায়। তিস্তা ব্যারেজ।'

ব্যারেজের সবগুলো স্লুইজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। মাত্র চারটি হয়েছে। তাতেই উদ্বোধন করাতে হচ্ছে। সেজন্য তিস্তা ব্যারেজকে সাজাতেও হয়েছে কৌশল করে। মানুষকে বোঝানো দরকার কী ভাবে স্লুইস খুলে তিস্তাকে মূল খাতে বইয়ে দেওয়া হবে। সেটা দেখানোর জন্য ব্যারেজের উত্তর দিকে কৃত্রিম বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে জল ছড়িয়ে দেওয়া হবে। বাঁধ মানে তো জল ঠেকানোর বাঁধ নয়—জল সরানোর বাঁধ।

পাড়ের কাছে ব্যারেজের ওপরে বিরাট স্টেজ বানানো হয়েছে। নানা রঙের কাপড় স্টেজে ঝলমল করছে। স্টেজের দুদিকে জাতীয় পতাকা, মাঝখানে সরকারি দলের পতাকা উড়ছে। স্টেজের বাঁ দিকে একটু উঁচু মঞ্চ

থেকে বক্তৃতা হবে। ডানদিক থেকে বোতাম টিপে উদ্বোধন করা হবে।

নির্দিষ্ট সময়েই ভি.আই.পি দের কনভয় জাতীয় সড়ক ধরে বেশ জোরেই ছোটে। সামনে ছয় মোটর সাইকেলের এসকর্ট। নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা আগে চালসার মোড়ে মিছিলের ট্রাকগুলি চলতে শুরু করে শ্লোগান দিতে দিতে।

মানাবাড়ি মোড়ে আবার গাড়ি থামিয়ে দেওয়া হয়। এ চল্লিশটি গাড়িকে আস্তে আস্তে যেতে দিতে হয়। দাঁড়িয়ে থাকা মিছিলে কোনো শ্লোগান ওঠে না। একটা সন্দেহ ও সর্তকতা চারিদিকে এই চল্লিশটি গাড়িকে রক্ষা করবার জন্য। কে জানে ঐ শ'শ' ট্রাকের মধ্যে কোথায় কোন আততায়ী লুকিয়ে আছে। উত্তরখন্ড বা গোর্খাল্যান্ডের লোকদের হাত থেকে তো বাঁচতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কবর দিতে, তো এতবড় আয়োজন— এত নেতা, এত মিছিল। কিন্তু কার্যত নেতাদের জন্যেই মিছিল আটকে রাখা হয়, তাদের নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ এই মিছিলের দিকেই সন্দেহের তীর, কমান্ডো-পুলিশের নজর। মানাবড়ি থেকে আপলচাঁদ পর্যন্ত ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অপেক্ষাকৃত সরল নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে একটু অলসভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশ দেখতে দেখতে ভি.আই.পি-রা ধীর গতিতে যেতে থাকেন। কিছুক্ষণের জন্য পুরো কনভয়টাতেই নেমে আসে আকাশের শিথিলতা।

আপলচাঁদের কাছে রাস্তা দুভাগ হয়ে একটা সোজা আর একটা ডানে ব্যারেজের দিকে গিয়েছে। ভি.আই.পি কনভয় ডানদিকের রাস্তায় ঢোকার পর মানাবাড়ি থেকে ট্রাকগুলো ছাড়া হয়। এগুলো পুরোনো সোজা রাস্তা দিয়ে ব্যারেজের দিকে পৌঁছয়। গাড়ি থেকে নেমে ভি.আই.পি-রা সোজা মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান সদ্য নুড়ি পাথর বিছানো রাস্তা দিয়ে। ইঞ্জিনিয়াররা এসে ব্যাজ পরিয়ে দেন সবার বুকে। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাজটা সবচেয়ে বড় ও রঙিন। হাঁটতে হাঁটতে কেন্দ্রের জলপথ মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তা হতে থাকে।

সরকারের প্রচার বিভাগের ক্যামেরা, অল ইন্ডিয়া রেডিওর রিপোর্টাররা সবাই ঝুঁকে পড়ে যে যার ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ করেন। যাঁরা ছবি তুলছেন তাদেরও আবার ছবি তোলা হয়।

'উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়।' বক্তা দার্জিলিং থেকে মালদহ পর্যন্ত এম.এল.এ-রা, উত্তরবঙ্গের এম.পি-রা। তারপর বলবেন যাঁর যাঁর দপ্তর এই কাজের সঙ্গে জড়িত— রাজ্যের সেচমন্ত্রী, পি.ডব্লউ.ডি মন্ত্রী, বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয়মন্ত্রী। সবশেষে বলবেন মুখ্যমন্ত্রী এবং আর এক মঞ্চ থেকে বোতাম টিপে স্লুইজ গেট উদ্বোধন

করা হবে। বেলা দুটোর মধ্যে সমস্ত প্রোগ্রাম শেষ করা হবে।

মঞ্চে একজন ইঞ্জিনিয়ার মেড ইন হংকং একটা বাইনোকুলার দিয়ে দেখছেন আর সবার হাতে হাতে সেটি ঘুরছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দেখে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে দিলেন। এতো লোকের সমাবেশ কেন্দ্রীয়মন্ত্রী এর আগে কোথাও দেখেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেন-'আপনার জনপ্রিয়তা যে এতটাই ধারণা ছিল না।'

এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে নানা কথা চলে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পশ্চিমবাংলাকে তো তারা পাঞ্জাব বানাতে দিতে পারেন না। আর এখানে কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর পার্টির লোকেরাই তো গোর্খাল্যান্ড, উত্তরখন্ড ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী দলে যোগ দিচ্ছে। মঞ্চের ওপর থেকে মাইকে শ্লোগান শুরু হয়েছে। জমাটবাঁধা হাজার হাজার জনতা সেই শ্লোগানেই গলা মেলাচ্ছে। তখন মনে হয়—'এত মানুষ যেখানে এমন সরবে-এতটা সমর্থন জানাতে চায়, তখন রাজনীতির তত্ত্ব যেন দুই হাতে ধরা যায়, ছোঁয়া যায় এমন এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা পায়।'

একজন বক্তা আসছেন, বক্তৃতা করছেন চলে যাচ্ছেন, মনে হয় একটা বক্তাই যেন চলছে বহুক্ষণ ধরে। পশ্চিমমুখী চোঙগুলি দিয়ে আওয়াজ অনুকূল বাতাসে ভেসে যাচ্ছে সমাবেশের ওপর দিয়ে 'তিস্তার জলে কুটো পড়লে যেমন ভেসে যায়।' মাদারির মা ঘুরে ঘুরে দেখছে মিটিংএ কত মানুষ এসেছে, ফরেস্টের গাছের মত কাঁধে কাধ লাগিয়ে বসে আছে। মানুষের আওয়াজ, মানুষের চামড়ার গন্ধ মাদারির মা ভালোবেসেছিল, ভালবেসেছিল মানুষকে তাই এই মিটিংটায় সে ভালোলাগাটা উশুল করে নিতে চায়। এত মানুষের ভিড়ে মাদারির মা তার আটটা কি দশটা সন্তানকে খোঁজে। এতবড় জন সমাবেশ সে কোনদিন দেখেনি, হয়তো জীবনে আর দেখতে পারে না। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ, এই মানুষের মাঝখানে কি তার সন্তানরা কেউ-ই নেই! এখানে মঞ্চের দিকে ঘাড় উঁচু করা হাজার হাজার মুখ খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ তার মিলেছে, তাই দেখছে তার ছেলেদের মুখ কোথাও দেখা যায় কিনা। সে হাঁটছে যেমন করে প্রতিদিন ফরেস্টে হাটে খাদ্যান্বেষণে সেই রকমই হাঁটা। আজ তার হাতে লম্বা লাঠির অস্ত্র নেই, আছে শুধু চোখের দৃষ্টি । একের পর এক সে মুখ দেখে যায়—রাজবংশীমুখ। তার সন্তানের বয়সের আন্দাজে মুখ। নেপালি জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা আর তার পরের মদেশিয়া পুত্রের মুখ তার পরপর মনে আছে। তারপর মনে করতে পারে না—মিলিটারি আগে না রাজবংশী দেউনিয়া আগে। মাদারির মা একের পর এক গোর্খামুখ দেখে যায়। এইসব ছোট ছোট মুখ, প্রবল চিবুক আর তীব্র হনু যুক্ত প্রায় একই চেহারার মানুষগুলোকে সে নিবিড় ভাবে দেখে। কতদূরে তার ছেলেরা গেছে যে এই দুনিয়ার মানুষের মিটিংয়েও তারা আসে না। এসেছে তা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে শুধু তাকে খুঁজে যেতে হবে।

এরই ভেতর প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে স্লুইজ গেটের অবকাশ দিয়ে তীব্রগতিতে জল নিজের খাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাদারির মা সেই মুক্ত সফেন জলরাশির দিকে তাকায় না। 'তার কাছে এই ব্যারেজ, এই স্লুইজ গেট, এই নদী নিয়ন্ত্রন, এই মঞ্চ এই জয়ধ্বনি অবান্তর।' তার কাছে বড় বেশি প্রাসঙ্গিক জয়ধ্বনি মুখর মুখগুলো।

'মাদারির মা একের পর এক মদেশিয়া মুখ দেখে যায়—তার ছেলেদের সমবয়সী মুখ—বড় বেশি চেনা এই মুখের লম্বা ধাঁচ, চওড়া কপাল, চোয়ালের চওড়া হাড়।'

রাত মাঝামাঝির পর একটা ট্রাক মাদারি হাটে এসে দাঁড়ায়। ট্রাক থামানোর ঝাকুনিতে ট্রাকভর্তি নারী পুরুষ ঝিমুনি থেকে জেগে ওঠে। ক্লিনার নিদ্রিত গলায় কে নামবে মাদারির হাটে জানায়। মাদারির মা ট্রাকের ডালা ধরে ঝুলে হাত ছেড়ে দেয় আর রাস্তার ওপর ধুপ করে বসে পড়ে।

মাদারির মা নিজের গাড়ি হারিয়ে ফেলায় এক ভদ্রলোক ফালাকাটার গাড়িতে তুলে দেয়। সেই গাড়ি তাকে মাদারি হাটে নামিয়ে দিয়ে ফালাকাটায় চলে যায়। মাদারির মা সারা রাত নিজেকে হাট খোলার খোলা জায়গায় নিজেকে দৃশ্যমান করে রাখে যাতে মাদারি তাকে দেখতে পায়। মাদারির মা মাদারিকে খোঁজে, ঘোষ মশাইয়ের চা দোকানের ছাদে গিয়ে ডাক দেয়। দোকানের ভেতর থেকে বাহাদুর ঘুমের গলায় বলে যে মাদারি গাড়িতে আসেনি। মাদারির মা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'মাদারি কোটত গেইল?' তারপর মাইল মাইল দূরে শ্যাওড়া ঝোরার দিকে হাঁটতে থাকে। একটা কুকুর মাদারির মার সঙ্গ নিয়েছে। কিসের গন্ধে তার সঙ্গ চলেছে। সে মাটি শুকছে বারবার।

মাদারি বাস ট্রাক গোলমাল করেছে বলে হয়ত ফেরেনি। বা সে চলেই গেল আর ফিরবে না কোন দিন। এসব ভাবতে ভাবতে মাদারির মা তার ফরেস্টের কাছে এসে পড়ে। পাতায় পাতায় ছাওয়া ফরেস্টে ঢোকার রাস্তার সীমায় এসে কুকুরটা থেকে গেল। সবুজের, এমোনিয়ার তীব্র গন্ধ এসে লাগে মাদারির মায়ের নাকে। কুকুরটাও বোধ হয় সেজন্য ঢুকতে চায় না।

'মাদারির মায়ের গায়ে সেই কোন আরণ্যক জন্মজন্মান্তরের গন্ধ পেয়েই কি কুকুরটা সঙ্গ নিয়েছিল?'

সেই অন্ধকার গুহার মত রাস্তা দিয়ে মাদারির মা ঐ গন্ধের ভেতরে ঢুকে যায়। এই জাতীয় সড়ক দিয়ে রোজ গোটা ভারতবর্ষ যাতায়াত করে। মাদারির মা দেখে এলো নদী, বন্যা, ব্যারেজ। কিন্তু তার কাছে সব অবান্তর। সে তার নিজের তৈরি শ্যাওড়া ঝারে, নিজের ঘরে ঢুকল। কিন্তু 'তার নিজের তৈরি শেষ মানুষটিও

ছিল, আজ থেকে তার থাকল না বোধ হয়।' বহু দূর থেকে কুকুরটার প্রবল কান্না একটানা ছুটে আসে। 'বাকি রাতটুকুর জন্য মাদারির মা তার পাতার ঘরে প্রবেশ করে।'

এ বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হওয়ার উপযুক্ত জায়গা। শেষ না করলে তো চলতেই থাকবে 'পরদিন, তারপর দিন, তারপর দিন।'

'মাদারির মা ভারতবর্ষের প্রায় আশি কোটি মানুষের মধ্যে সেই ছ'সাত কোটির একজন, যারা বনের পশুর নিয়মে বাঁচে। 'দারিদ্র্যসীমা, 'পশ্চাদপদ অংশ' ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ তাকে ছোঁয় না। ফলে, মাদারির মায়ের প্রতিদিনের বাঁচাই এক স্বাধীন, সর্বেভৌম, স্বরাট, স্বাবলম্বী বাঁচা। .....

সেই বাঁচার নিয়মেই সে তিস্তা ব্যারেজ, কাবেরী ব্যারেজ, হীরা কুঁদ ড্যাম, ভাক্‌রা-নাঙ্গাল এইসবের বিরুদ্ধে তার নিজের এক শ্যাওড়া ঝোরা বানাতে পারে। সেই বাঁচার নিয়মেই নিশিদিন ভারতবর্ষ যাতায়াত করে এমন একটা সড়কের পাশে নিজের এক রাষ্ট্র কায়েম করতে পারে।'

মাদারির মায়ের এই দারিদ্র্যের মধ্যে গৌরবের কিছু নেই, আছে অপমান। 'সেই অপমানের বিচ্ছিন্নতাকে বিদ্রোহের বিচ্ছিন্নতা বলে ভাবার মধ্যে, তার সাত-কাহন বৃত্তান্ত রচনার মধ্যে মিথ্যা কিছু থেকেই যায়।'... তাই অক্ষর জ্ঞানহীন এই বৃত্তান্ত যত লেখা হবে, ততই মিথ্যা হবে—'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।' এ বৃত্তান্ত তাই এখানেই, এমনই একটাযোগ্য জায়গায়, শেষ হোক।

মাদারির মা তার পাতার ঘরে রাত্রির বাকি কয়েক ঘন্টা শেষপুত্রহীন কাটাক।'

পরিশিষ্ট : এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত শেষ হয়ে গেছে।'

উপন্যাস যে গাজল ডোবা দিয়ে শুরু সেই গাজল ডোবা দিয়েই শেষ। 'এতে সত্যি সত্যি যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। একটি বৃত্তান্তের সমাপ্তি ঘটল।'

বাস্তবে কিন্তু তেমন হয়নি। এ বৃত্তান্ত খেলার সময়েও তিস্তা ব্যারেজের কাজ চলছে। এখনও শেষ হয়নি। যে গাজোল ডোবায় প্রথম সার্ভের কথা লেখা হয়েছে তখনও জানাই ছিল না এই গাজোল ডোবাতেই তিস্তা ব্যারেজের প্রধান ঘাটি হবে। যখন এ বৃত্তান্তে তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের কথা লেখা হয়-তখন উদ্বোধন হবে তেমন কোনো কথাই ওঠে নি। কিন্তু কিছুদিন পর এই বৃত্তান্তের বর্ণনানুযায়ী একটি উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছিল।

'এ বৃত্তান্তে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনাকে বা ইতিহাসকে নথিভুক্ত করা হয়নি।'

'ব্যারেজ উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এ বৃত্তান্তের তিস্তা ইতিহাস হয়ে গেল। এখন আর তিস্তা সেই পুরোনো তিস্তা থাকল না। এখন প্রকৃতির সেই নদীর পুনর্জন্ম ঘটবে মানুষের হাতে।...

তিস্তা ব্যারেজের পর তিস্তার প্রাকৃতিক জীবন শেষ, এখন সে এক মানবিক নদী। তিস্তা তার মানবিক ইতিহাসের পর্বে ঢুকবে। তিস্তাবুড়ি, কুমারী হয়ে উঠবে।'

'এই তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' সেই প্রাকৃতিক তিস্তার সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতিনীতির বৃত্তান্ত। তিস্তা তার নদী স্বভাবে প্রাকৃতিক, সে জলছাড়া কিছু নয়। বাঘারু তার মানব স্বভাবে প্রাকৃতিক - সে কেবল মানুষ; একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়।'

বৃত্তান্ত লেখা শেষ হলেও তিস্তা ব্যারেজ আরো কয়েক বছর পর শেষ হবে। তখন তিস্তাপারে, তিস্তায় আসবে নানা পরিবর্তন—

ব্যারেজের জল আটকে কত নতুন জমি চাষের আওতায় আসবে। ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় কত নতুন জমিতে চাষ হবে। নিতাইদের চরটা হয়ত থাকবে না। কিন্তু তিস্তাকে সরিয়ে এনে জমি বের করে নিতাইদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সীমান্তটা হয়তো স্থল ভাগ দিয়েই চিহ্নিত করা হবে।

তিস্তা ব্যারেজের ফলে গয়ানাথ এক জমিতে পাবে তিন ফসল। তার জমি, গরু কমতে পারে। কিন্তু ফসল বাড়বে। সে নতুন ট্রাকটার কিনে ভাড়া খাটাবে। ফসল বাড়বে, বিক্রি বাড়বে, লাভ বাড়বে।

গয়ানাথের সঙ্গে রাধা বল্লভদের আর সংঘর্ষ থাকবে না। কারণ সম্পত্তির জোতদারী শেষ হয়ে ফসলের জোতদারী শুরু হবে। রাধাবল্লভরাও তাদের ভেস্ট জমিতে তিনচার ফলন করে গয়ানাথের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। গয়ানাথের পাওয়ার টিলার ছাড়া রাধা বল্লভদের চলবে না। কৃষি পণ্যের দাম আদায়ের জন্য রাধাবল্লভ, গয়ানাথরা একসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের চাষীদের মত রাস্তারোকো, জেল ভরো আন্দোলন করবে।

'ব্যারেজের ফরেস্ট তিস্তাপারের ফরেস্ট বদলে যাবে, আপলচাঁদ বদলে যাবে।' ব্যারেজ জল দেবে, বন্যা ঠেকাবে। ফরেস্টে নতুন নরম গাছ লাগানো হবে, যা থেকে শিল্পও হবে।

'বন বদলালে জীবজন্তুও বদলে যাবে।' হরিণ, গন্ডার, হাতি যদি তাদের খাবার, বসবাসের, চরে বেড়াবার উপযুক্ত জায়গা নতুন বনে না পায় তাহলে এরা এখানে থাকবে কেন। বানরাও তাদের পুরোনো আশ্রয় না

পেয়ে কোথায় চলে যাবে। ঘনবন থাকায় পাখি, পাইথন স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে। এরা স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হবে।

'কিন্তু তিস্তাপারের বৃত্তান্ত যে এমন আমূল বদলে যাবে—তাতে বাঘারু মাদারির মা ও মাদারির কী হবে?'

তারা কি গয়ানাথ-রাধাবল্লভ-নিতাইদের মত নতুন তিস্তার সঙ্গে, ফরেস্টের সঙ্গে মিলে মিশে যাবে নাকি গন্ডার, হরিণাদি পশু, পাখি, সাপদের মতো এ অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে, অন্য কোন নদী তীর খুঁজবে।

মাদারির মা, বাঘারুরা তো পুরোনো উৎপাদন ব্যবস্থার কেউ ছিল না। তাই নতুন ব্যবস্থায় বদলাবারও প্রশ্ন ওঠে না। 'মাদারির মা যেখানে আছে। সেখানেই থাকতে থাকতে ঘাসপাতার সঙ্গে মিশে যাবে।' কিন্তু বাঘারু আর মাদারি এরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত এই বৃত্তান্তে অসীমাংসিত থেকে যাচ্ছে।

সেদিন বাঘারু একটা দায় অনুভব করেছে তার স্বাধীন তিস্তায় পাহাড়ের মত যা গজিয়ে উঠল তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী জানবার। গয়ানাথের ঝান্ডা মাটিতে ফেলে সে স্বাধীন পায়ে নদীর ব্যারেজ ও প্যান্ডেলের দিকে এগোয়। সোজা হাঁটতে হাঁটতে বাঘারু বাঁশের বেড়ায় এসে ঠেকে। বেড়াটা টপকাতে চায়। পুলিশ এসে বাঁধা দেয়। পুলিশ আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করায় সে জনতার দিকে চলে গিয়ে প্রথম সারিতে ঢুকতে চায়। কিন্তু ভেতরে মিছিলের যারা বসে আছে, যাদের বুকে ব্যাজ লাগানো তারা কেউই তাকে ঢুকতে দেয় না। সবাই শুধু পেছনে যেতে বলে। ফলে বাঘারুকে কেবলই পেছনে যেতে হয়, ক্রমেই সরে যেতে হয় দূরে।

এভাবে বাঘারু একেবারে মিটিং এর শেষে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে সে দাঁড়াবার, বসবার জায়গা পেয়ে যায়। তার অবস্থানটা এতদূরে যে সে ব্যারেজ তিস্তা কিছুই দেখতে পায় না। একটা গাছের গোড়ায় সে বসে এবং ঘুমিয়ে পড়ে। যখন সে জাগে তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মিছিল, মিটিং ভেঙ্গে সবাই যে যার জায়গায় চলে গেছে। সে দাঁড়িয়ে দেখে বহু দূরে কিছু আলোর সারি। বাঘারু বুঝতে পারে ওটাই ব্যারেজ, প্যান্ডেল। সে ঐ দিকে হাঁটতে থাকে।

এবার বাঘারু বেড়া টপকাতেই পুলিশ তাকে থামিয়ে দেয়। ফ্লাড লাইট তার ওপর এসে পড়েছে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় যাবে। সে উত্তর দেয় 'ঐঠে যাম্, প্যান্ডলত' আর একটা পুলিশ ওখানে যেতে মানা করে। সে মিছিলে হারিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। বাঘারু বলে 'না, মোর কুনো মিছিল নাই।' সে পেছন

ফিরে অন্য পথ ধরে প্যান্ডেলে যাওয়ার পথ খোঁজে। এবার দুজন পুলিশ তাকে ডাকে। বলে যে একটি ছেলে হারিয়েছে, তাকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিতে। আর কী দেখবে একপাক ঘুরে দেখে আসতে। সেও কী হারিয়ে গেছে, তার মিছিল কোথায়, জিজ্ঞাসা করে। বাঘারু আবার উত্তর দেয় — 'মোর কুনো মিছিল নাই'। সে দেখে মঞ্চের তলা বা কোনো জায়গা থেকে একটা ছেলে বেরিয়ে আসছে। পুলিশ ছেলেটিকে বলে যে এই লোকটা মিটিংয়ের, এর সঙ্গে চলে যায় যেন। সে তাকে পৌঁছে দেবে।

বাঘারু ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলে 'মুই মিটিঙের মানষি না হই।' পুলিশ ধমক দিয়ে ছেলেটিকে বাঘারুর দিকে ঠেলে দিয়ে বলে-'যাও, ছেলেডারে নিয়্যা ব্যারেজ ম্যারেজ কী দেইব্যা দেইখ্যা রওনা দ্যাও।' যেন ব্যারেজ দেখার লোভেই মাদারি এসে বাঘারুর লম্বা আঙ্গুল ধরে, বাঘারুর সঙ্গে যেতে রাজি হয়। 'মুহূর্তের মধ্যে মাদারি-পুলিশের দিক থেকে বাঘারুর হাত ধরে বাঘারুর দিকে চলে আসে।' মাদারি বাঘারুকে টেনে ব্যারেজের দিকে নিয়ে যায়।

বাঘারু স্বগতোক্তি করে—'এইঠে গেট বানাইছে, জল আটকি রাখে।' বহু নিচে বাঁধ বেঁধে বেঁধে জলকে গেটের মুখে আনা হয়েছে। বাঘারু বাঁধগুলো দেখতে পায় না। মাদারির হাত ধরেই সে এবার বাঁ দিকে সরে আসে। ওখানে জল বেঁধে রেখেছে কিনা মাদারি জিজ্ঞাসা করে। বাঘারু উত্তর দেয় 'রেখেছে' কিন্তু কেমন করে তা সে জানে না।

এবার বাঘারু ব্যারেজের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সামনে তাকায়, আগে তিস্তার দিকে তাকায় কিন্তু সব কিছুই যেন তার অচেনা মনে হয়। সে ব্যারেজের অনেক ভেতরে গেছে, কিন্তু জানে না শেষ কোথায়? বাতাস বইছে জোরে। বাঘারু মাদারিকে আগলে ধরে। মাদারিও বাঘারুকে চিনে নিয়েছে, সেও তাকে জড়িয়ে ধরে।

মাদারি জিজ্ঞাসা করে-ব্যারেজ এখানেই শেষ কিনা, তিস্তা নদী কোথায়? সবক্ষেত্রেই বাঘারুর উত্তর 'না জানো'। আবার মাদারির জিজ্ঞাসা-তিস্তা নদী তুলে দিয়েছে কিনা, নতুন নদী বানিয়েছে কিনা, বাঘারু এখানকার মানুষ কিনা, তার মত সেও হারিয়ে গেছে কিনা? হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনে বাঘারু হেসে ফেলে। পেছনে পুলিশ ফিরে আসার জন্য ডাকে। তারা ফিরে আসতে থাকে।

মঞ্চের তলার পর্দা সরিয়ে মাদারি ও বাঘারু সেই তীব্র আলোকিত বনভূমিতে ঢোকে। দুজন দুজনের হাত আলগা করে দেয়। সামনে মাদারি, পেছনে বাঘারুকে ডাকে। সাদা বালির ওপর ওদের ছায়া দুটো ক্রমে লম্বা

হতে থাকে। সামনে বেড়া আছে। তা টপকে তারা আপল চাঁদের ভেতর ঢুকবে। 'আমরা বাঘারু-মাদারিকে আর অনুসরণ করব না।'

'বাঘারু তিস্তাপার আপলচাঁদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মাদারিও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে-সেই কারণেই বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে কারণে তিস্তাপার ও আপল চাঁদের হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক, সাপ খোপ চলে যাবে-সেই কারণেই বাঘারু চলে যায়। তারও শুধু একটা শরীর আছে। সেই শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফরেস্টে বাঁচবে না। এই নদী বন্ধন এই ব্যারেজ, দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়াবে। বাঘারুর কোনো অর্থনীতি নেই। বাঘারুর কোনো উৎপাদনও নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে এই অর্থনীতিও এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল। বাঘারু কিছুকিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।'

বাঘারু তার জন্ম ভিটে এই ফরেস্ট ছেড়ে মাদারিকে নিয়ে সারা রাত ধরে হাঁটবে। পথে দু একটা গঞ্জ পার হবে। মাদারির ঘুম পাবে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। আবার হাঁটবে। 'এরকম হাঁটতে হাঁটতে যখন বাঘারু মনে হবে নতুন ফরেস্ট, নতুন একটা নদী খুঁজে পেল, তখন বাঘারু থামবে। সেই নতুন নদী, নতুন ফরেস্টটা বাঘারু শরীর দিয়েই চিনবে।' সে মাদারিকে জানে না, সে কে, কোথায় থাকে। কিন্তু যেতে যেতে তাদের কত কথা হবে। তাতে দুজন দুজনের কত অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

'এ বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হোক্।

এই প্রত্যাখ্যানের হাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক হাঁটুক, হাঁটুক।'

তিস্তাপুরাণ

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০০০, ১ মাঘ, ১৪০৬

'উপন্যাসটির খুবই ছোট কিছু টুকরো — শারদীয় পরিচয় ১৯৯৭, শারদীয় আজকাল — ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ ও শারদীয় তিস্তা-তোরসা ১৯৯৯ এ নানা শিরোনামে বেরিয়ে ছিল।'

উপন্যাসখানির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯৬। মলাট অন্যান্য পরিচয় জ্ঞাপক পৃষ্ঠা, ছবি সূচিপত্র ও বুড়িমার গোতা-পরিচয় ১৮ পৃষ্ঠা। ৬৯৬ থেকে ১৮ পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে গ্রন্থখানির মূল কাহিনি ৬৭৮ পৃষ্ঠার।

সমগ্র উপন্যাসটি সাতটি পর্বে বিভক্ত। প্রতিটি পর্ব কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম যুক্ত। মোট অধ্যায় সংখ্যা ১১০। কোন্ পর্বে কত অধ্যায়, কত পৃষ্ঠা তা নিচে দেওয়া হলো—

পর্ব শিরোনাম	অধ্যায় সংখ্যা	পৃষ্ঠা
■ শেষ	১১	১৯—৭৩
■ আর এক শেষ	১৫	৮১—১৫৫
■ আরম্ভ	১৮	১৭৩—২৭৬
■ আরম্ভের পর	৩১	২৮৫—৪৫৭
■ আরও এক আরম্ভ	১৭	৪৬৫—৫৫৩
■ শেষান্তর	১৭	৫৬৩—৬৬৫
■ কথান্তর	১	৬৭৫

পর্বগুলি পৃষ্ঠা গণনার ধরন ভিন্ন রকমের। দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশে আছে পূর্ব পর্বের শেষ অধ্যায়ের পৃষ্ঠাগুলি, কোথাও সাদা পৃষ্ঠা ও পর্ব নামাঙ্কিত পৃষ্ঠা।

অধ্যায় পরিচিতি

সূচিপত্র

শেষ

১ বুড়িমা, ২ বাঁচা, ৩ এগিনা, ৪ হারানো প্রাপ্তি, ৫ দেখা, ৬ গোলাঘর রক্ষা, ৭ পাটাঘররক্ষা, ৮ গোহালিয়া ঘররক্ষা, ৯ শোয়াঘর রক্ষা, ১০ জননী-কাউঠানী, ১১ পুরাণ কন্যা।

আর এক শেষ

১২ সময়, ১৩ সোলংগাদর্শন, ১৪ সোলংগাভাসান, ১৫ নাইয়া, ১৬ সোলংগাপ্রাপ্তি, ১৭ নদীপথে, ১৮ সংলাপ ও অনালাপ, ১৯ আহ্বান, ২০ দিকজ্ঞান ও ভূজ্ঞান, ২১ ফরেস্ট প্রবেশ, ২২ ফরেস্ট নিষ্ক্রমণ, ২৩ তিস্তাদর্শন, ২৪ তিস্তা প্রবেশ, ২৫ পুরাণ পুরুষ, ২৬ পরজন্ম থেকে —।

আরম্ভ

২৭ বাঁচার নিরিখ, ২৮ সব কিছুর পেছনে, ২৯ খরার পাক, ৩০ লেভির আওয়াজ, ৩১ খোঁজখবর, ৩২ ব্লক অফিস যাত্রা, ৩৩ ব্লক অফিস, ৩৪ শলা পরামর্শ, ৩৫ হাটের নেশা, ৩৬ ধূপগুড়িহাটে যাওয়ার প্রস্তুতি, ৩৭ গুহাপথ, ৩৮ ধূপগুড়ি হাট, ৩৯ ক্ষেতোয়াল, ৪০ জোতদার, ৪১ মিটিঙোয়াল, ৪২ মালিক বিডিও, ৪৩ পাট্টিপুট্টি, ৪৪ লেভি।

আরম্ভের পর

৪৫ মিরাকল, ৪৬ অমরতা, ৪৭ সরকার, ৪৮ জমিদখল, ৪৯ উচ্ছেদ অভিযান, ৫০ লালঝান্ডা, ৫১ বিষাদ, ৫২ বাপবেটা আধিয়ার, ৫৩ ঘোড়া জোতদার, ৫৪ পাছাডাঙ্গা, ৫৫ খাওয়ানো ও খাওয়া, ৫৬ দলগাঁও, ৫৭ বাগানদখল দর্শন, ৫৮ জ্ঞানতত্ত্ব, ৫৯ সবসেবড়া ইনকিলাব, ৬০ ষ্ট্র্যাটেজি-ট্যাকটিকস, ৬১ 'উঠোজাগো ভুখাবন্দী', ৬২ জিজ্ঞাসা, ৬৩ ভিতর-বাহির, ৬৪ শাম্মীকাপুর, ৬৫ কার্তিক সংক্রান্তি, ৬৬ গরুচুমানি, ৬৭ বাখরখোয়ানো, ৬৮ শিকার, ৬৯ ভাঙ্গন, ৭০ গোবরনেথা, ৭১ জমিয়াল, ৭২ কথোয়াল, ৭৩ জন্মের কাজ, ৭৪ দখল, ৭৫ নির্বাসন।

আর এক আরম্ভ

৭৬ ছোঁয়া, ৭৭ ঋতুবিপর্যয়, ৭৮ ভূমিবিপর্যয়, ৭৯ নাম বিপর্যয়, ৮০ ভাটিয়া চাষ, ৮১ অপারেশন-বর্গা, ৮২ নতুন চাষ, ৮৩ উপদেষ্টা খোঁজা, ৮৪ মাটি পরীক্ষা, ৮৫ বিশেষজ্ঞ, ৮৬ নতুন চাষ, ৮৭ হাইইল্ড, ৮৮ ধানজ্বর, ৮৯ ম্যালেরিয়া, ৯০ তাংকুক্ষেত, ৯১ ঢেমনার মৃত্যু, ৯২ সৎকার।

শেষান্তর

৯৩ গোত্রনারী, ৯৪ হাওয়া বদল, ৯৫ আওয়াজ বদল, ৯৬ রাস্তা ও ভ্যান, ৯৭ স্কুল ও সাইনবোর্ড, ৯৮ শাড়ি, ৯৯ যাত্রা, ১০০ টিকিটোয়াল, ১০১ কানজি হাতি, ১০২ আমলাতন্ত্র, ১০৩ হস্তিবিদ্যা, ১০৪ প্রাচীন ও নবীন বিবাহ, ১০৫ ছোটদাদার প্রত্যাবর্তন, ১০৬ হস্তিকন্যা, ১০৭ শেষ মস্তি, ১০৮ শেষ শ্বাস, ১০৯ গোত ছেঁড়া।

কথান্তর

১১০ বুড়িমা।

শেষ

'বুড়িমা যে বাড়িতে আছে, এটা কারও সব সময় আলাদা করে খেয়াল থাকে না।' যেমন বেখেয়ালে চলে যায় স্বাভাবিক নিয়মে অনেক কিছু—আবার সন তারিখের হিসেবে খেয়ালে না থাকলেও কতো কথাই তো মনেও থাকে— থাকে গত সালের ধানের হিসেব, মাটির হিসেব, বৃষ্টি বাদলের কথা-এমনকি— পুরাণ কন্যা সীতার-হালে উঠে আসার কথাও।

ফরেস্টের কথাও মনে থাকতে পারে। ফরেস্টের জন্ম, কতো মানব জন্ম আগের ফরেস্ট, শাল গাছ, জঙ্গলে আগুন দেওয়া বা না দেওয়া। মনে থাকতে পারে নদীর কথা, নদী পারাপারের কথা, জল ঢাকা নদীর ওপর ব্রিজের কথা। "ঐ উত্তরে নদীগুলির মাথায় ভুটান পাহাড়। যেখান থেকে নদী আর হাতি জঙ্গলে নামে।' নদীর জল কোন ঢালে নেমে কোথায় যাবে, কোন বছর বন্যা হবে খরা হবে — সে কথাও মানুষ বংশ পরম্পরায় জেনে অনুমান সিদ্ধ হয়ে যায়। একবার জলের স্রোতে মা হাতি ও হাতির বাচ্চা নেমেছিল। সেটা দেখার ভিড় জমেছিল। তবে দেখা নয়। বাচ্চাটাকে আবার সস্থানে ফিরিয়ে দিতে। কারণ এসব স্বাভাবিক নিয়ম। এরা হাতি চেনে, হাতির গতি চেনে, নদী চেনে, পাহাড় চেনে—পাহাড়ের ক্ষয়বৃদ্ধি, ধ্বংস সব চেনে— চেনে আপনা আপনি—স্বাভাবিক নিয়মেই। আর সেজন্যই গাছের কত উঁচুতে করুয়া পাখি এবার বাসা বেঁধেছে—কিংবা কাউঠানী নদী থেকে উঠে ডাঙ্গায় কত উঁচুতে ডিম পেরেছে তার ওপরেই নির্ভর করবে এবারের বানের জল কত হবে। মানুষের জন্মের বা জোত বেড়ে ওঠার ঘটনাও প্রকৃতির মতই স্বাভাবিক। শ'খানেক শাল গাছ লাগিয়ে গেলে কয়েক জন্ম ধরে—তার বৃদ্ধি হতে থাকে। এর মধ্যে সেই ব্যক্তির ছেলে, নাতি, নাতির নাতি বা নাত্নি বা নাতনির স্বামী সেই শাল গাছ ভোগ করতে পারে। 'এমন চকিত ও ক্ষণ প্রভ সে বিদ্যুৎ। মরণও তেমনি।' — আর তেমনি মানুষের জন্ম ও জীবন। কার পেটে কী বাচ্চা হবে—হতেই থাকবে বলার উপায় নেই। কেউ বলতে পারে না জীবন কোন খাতে কেমন করে বইবে - তবে বইবে, বইছেও। 'এই এতসব মনে রাখার মতই তো বুড়িমাও আছে।' বুড়িমা তার সব কিছু জোত-জঙ্গল, নাতি, পুতি, নাত বৌ-চরবাড়ি মেঘবাড়ি সব কিছুর মধ্যে মিশে আছে, বেঁচে আছে।

"একেক সময় মনে হয়, বুড়িমা সারাটা জীবন এক সঙ্গেই বাঁচছে আর সেই বাঁচা থেকে টুকরো টুকরো হয়ে অন্যদের 'বাঁচার একটা দিন তৈরি হচ্ছে।' দিনরাত, সকাল সন্ধ্যে, আলো আঁধার — নিয়ে বোঝা না বোঝা নিয়ে বেঁচে আছে।

বাড়ি ঘরের রোজকার কাজ কর্মে বুড়িমাকে লাগে না। তাই একটা বাচ্চা ও তার কাছে কেউ রাখার সাহস পায় না। বরং বাড়ির কুকুর ভেউলা' তার চেয়ে বিশ্বস্ত। 'বুড়িমা যেন সিন্‌জাকাঠির ঠাকুর—তার চোখ মুখনাক সবই আছে, দেখে দেখে বুজতে হয়। তার কোনও আওয়াজ নেই, তার কোনও চলন নেই।' তবে তার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। বুড়িমার জন্য 'এগিনায় ঢুকতেই ঠাকুরানীর ঘর' চিরকাল থাকলেও তার বসা, শোয়া, রাত কাটানোর কোনও নিয়ম নেই— সে সর্বত্র। তার এমন সর্বত্রগামিতা দেখে অন্যদের মনে হয় 'তাহলে রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনই জেগে ওঠে আর তার পা দুটো পাখা হয়ে যায়' কিন্তু একটা সময় ছিল যখন বুড়িমা 'বেটিছোয়ার চেয়ে' একটা কিছু বেশি ছিল। তার সময় ছিল, সন্তান উৎপাদন করার ক্ষমতাছিল— সংসারের সব কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বয়স ছিল। স্বামী, পুত্র ছিল।

'বুড়িমার জীবনটা ত উত্তরের পাহাড়ের মত— গোটাটাই একটা জীবন।' পাহাড়ের যেমন চূড়া আছে, নিচে ছড়িয়ে পড়া আছে, গাছ, পাথর, ঝোরা, নদী, ঝর্ণা পোকা-মাকড় আছে তেমনি আছে বুড়িরও সমগ্রতা। তার পাহাড়ের মত মস্ত জীবন তো কেউ জানে নি, হয়ত সম্ভবও নয়। তাই এটা হিসেব কষে বের করা সম্ভব নয় কেমন করে বেটিছোয়ার শরীর ছেড়ে বুড়িমা কবে বুড়িমা হয়ে উঠেছিল। 'বা বুড়িমার জীবনকে গোটা একটা নদীও বলা যায়।..... 'পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে তার গোপন ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সমুদ্র হয়ে যাওয়াই গোটা জীবন, নদীর। বুড়িমার।'..... 'সব জীবন তো সমুদ্র হয়ে ওঠে না। যে জীবন হয়ে যায় সমুদ্র সেই জীবন বুড়িমার। 'এমন তো আর নয়—সব গাঁয়েরই বুড়িমা থাকে। তবে এও ঠিক- 'বুড়িমার গাঁও এ বুড়িমা আছে আর যে গাঁওয়ে বুড়িমা নেই সেটা বুড়িমার গাও নয় — 'কথাটা এতই সোজা।'

কোন এক শ্রাবণ মাসে বুড়িমার জোতের সবাই যখন রোয়া লাগানোর কাজে ব্যস্ত তখন হঠাৎ মুখটাটু কান কাটুর বউ তার ডান হাতের চারটি আঙ্গুল গালে তুলে বলে ওঠে 'হায় হায়। বুড়িমাক তো সকালঠে একবারো দেখো নাই। উঠিছে কি উঠে নাই বুড়ি? দেখিছেন, তোমরালা কায়? দেখিছেন?' শুরু হয় ছোটাছুটি সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে বুড়িকে খোঁজার জন্য। সবাই মিলে ছুটে যায় ভিতর বাড়ির আরও ভিতরে 'পাছত বাড়ির দিকে'।

শ্রাবণের এই কুড়িটা দিন বড়ই ব্যস্ততার দিন। হালুয়ার ঘর সেই শেষ রাত থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত থাকে। শুক্লপক্ষ হলে জ্যোৎস্নাতেও মাঠে কাজ করে। এই কুড়িদিন বাদ দিলে সারা বছরই বাড়ির ব্যাটা ছেলেরা সকাল হওয়ার আগে মাঠে যায় আর বেলা শেষে ঘরে ফিরে আসে। ক্ষেতের আলে বসে চিড়ে

মুড়ি বা জলভাত খাওয়ার রীতি নেই। তাছাড়া ক্ষেত বাড়ি তো দূরে নয় বাড়ির সামনেই ছড়ানো।

বড়বাঁক নদী বুড়িমার গাঁওটাকে দুভাগ করে দিয়েছে। সেই নদীর জল বর্ষার সময় সব সময় উঠে আসে না কখনও উঠে আসে নরম পলি নিয়ে। জমির চার দিকের অনেকটা জুড়েই গোল হয়ে ফরেস্ট।

সারাটা বছর চাষের সময় খাবার পাঠাতে না হলেও শ্রাবণের এই কুড়িটা দিনে কিন্তু পাঠাতে হয়। এই ব্যস্ততার মধ্যে বেলা অর্ধেক পুইয়ে গেলে মনে পড়ে বুড়িমার কথা— কেউ কি তাকে দেখেছে!

বুড়ির বাড়ি, বড় জোতদারের বাড়ির আদলে তৈরি। বাড়িতে লোক বেড়ে যাওয়ায় অনেক ঘর, অনেক এগিনা। এছাড়া আছে কলো বাড়ি। আমবাড়ি, খেড়িবাড়ি। ভিতর এগিনার পেছনে পাছত এগিনায় উত্তর ভিটেয় দুটো শোয়ার ঘর আর পশ্চিম ভিটেয় দুটো শোয়ার ঘর। এছাড়া আছে খড়িঘর, রান্নাঘর আর বাইরের উনুন। এতেও কুলোয় না বলে পাছত-এগিনার পেছনে নতুন এগিনা। সেখানেও উত্তর ও পশ্চিম ভিটেয় চারটি শোয়ার ঘর, মাঝখানে একপাশে কাঁচা কুয়ো। এরপর বড়-এগিনা ডানদিকে কেতরে গেছে। বড় এগিনার পেছনে যে খন্দক এগিনা, সেটাও ডান দিকে কেতরে গেছে। আর এগিনার মাঝখান দিয়ে ফরেস্টের পুরনো নালী চলে গেছে। নালীটার জন্য এই এগিনাকে খন্দক বলা হয়েছে। এই নালীর ভেতরে শীত ও গরমে 'কলমিশাক, দুধ কচু, মানিমুনি, নাফাশাক ভরে থাকে।' বর্ষায় এখানে কেউ কেউ হোঁচট খেয়ে পড়েও। এভাবে পিছলে পড়ে বলে ওর নাম পাছল এগিনাও হয়েছে। এক একটা এগিনা এক দেড় বিঘে পরিমাণ।

এগিনা শুধু ধান-পাট শুকোনোর জন্য নয়। 'এগিনায় ধান শুকবে, পান শুকবে, গরু-বলদ-একটু-আধটু ঘুরবে, কুকুরটা ছুটোছুটি করবে, তবে তো সেটা এগিনা।' এগিনা বানিয়ে ঘর না বানালে এগিনা তো মাঠ হয়ে যাবে। তাই এগিনার সঙ্গে ঘরও থাকে। এই পাঁচ এগিনায় ছড়ানো কোনও একটা ঘরে বুড়িমাকে কেউ ঢুকিয়ে দেয়। যার ঘর সে হয়ত জানেই না সে কথা। সারা রাত জানে না।

'মুখটাটু-কানকাটুর বৌ যে শ্রাবণের দুপুরের শুরুতে গালে হাত দিয়ে সবাইকে মনে পড়িয়ে দেয় সেদিন সকাল থেকে কেউ বুড়িমাকে দেখেনি তাতেই বাস্তুঘর থেকে ভিতর এগিনা জুড়ে বেটিছোয়াদের'.... খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। সেই দলটায় আছে পুতি পনুয়ার বড় আয়ী, সোমারীর মা, আরও আছে পাথারনী, ভোটুর বৌ, জোনাকু বাঙ্কুরামের মা। মেয়েদের মধ্যে আছে শনিয়া-বিসাদী-ভুঁইচালী। আছে রবিরামের বড়মার শ্বাশুড়ী সোন্দনী। বানভাসি-আশিনার বৌ মুটকি আছে। আছে পাটেশ্বরী, কুমালী, দেবারী, টুলটুলি, কলেশ্বরী, ঝারী,

নেকী, কলকলী ও গুলগুলী এরা সমবেত ভাবে হাসে, কথা বলে, রসালাপ করে আর বুড়িমাকে খোঁজে। এদের ' নোলক দোলে, মাকড়ি দোলে, সাদা চুল ওড়ে, খোলা চুল ওড়ে, আর চাপা একটা শ্বাস সমবেত বেরিয়ে আসে—'মাই-গে-এ'। কী সর্বনাশ।'

কেউ জঙ্গল বাড়ির দিকে ছুটে যায়, বুড়িমা যদি ভুল করে সেদিকে গিয়ে থাকে। এমনও তো হতে পারে জঙ্গলই বুড়িমাকে টেনে নিয়ে গেছে। কারও মনে হয় বাঘ হয়ত টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় তাহলে ভেউলা ডেকে উঠত।

কেউ ছুটে যায় ভিতর এগিনার দক্ষিণ কোণে কেউ সোজা পাছত এগিনায়। পাছত এগিনার ঘরগুলো হামা দিয়ে দেখে। এই দলটা থেকে খসে গিয়ে কেউ বা নতুন এগিনার ঘরগুলো দেখতে থাকে। কেউ বারান্দাটা দেখে, সেখানেও তো পড়ে থাকতে পারে বুড়িমা। বাকি দল পাখির ঝাঁক যেমন করে বাঁক নেয় সেভাবে বড় এগিনার দিকে বাঁক নেয়। বটগাছের পাতা মারিয়ে পাছল-এগিনার নালাটা পার হয়ে বড় এগিনার বারান্দার গুহায় হামা দিয়ে ঢোকে। পাছল এগিনায় ঠেকে গিয়ে দলটার কেউ কেউ বাহির এগিনার দিকে ছোটে। পাছল এগিনার পশ্চিম ভিটেয় শোয়ার ঘরের পেছন দিয়ে এবার উত্তর দিকের বাঁশবাড়িতে ঢুকে যায়। তাদের মাথায়, হাতে বাঁশের পাতা লেগে নতুন প্রবাহমান শব্দ তৈরি হয়।

রবিরামের বড় মার শাশুড়ি, সোন্দনী কানে শুনতে পায় না—তাই সব সময় আওয়াজ দেখতে চায়। আর সেজন্য সে মেয়েদের পেছনে পেছনে ছোটে। বুড়িমাকে বোধ হয় আর কোনও দিনই ফিরে পাওয়া যাবে না—এরকম মনে হওয়ায় আরও খোঁজা বেড়ে যায়। বুড়িমার এখনকার সংসার তো আগের সংসার থেকেই এসেছে। এই ত্রিকাল জোড়া সংসারে বুড়িমার কি একটা ঘর না থেকে পারে? সেই ঘরের সঙ্গে এত বড় সংসারের এগিনা ঘর সব মিলে গেছে। সেজন্য বুড়িমা বাড়ির যেকোন জায়গায় জটলা পাকিয়ে থাকতে পারে।

শ্রাবণের রোদে এত খোঁজাখুঁজির পর বড়চিলার বড় ছেলে বড় মুতুরার বৌ কাণ্টী, সানঝুর বড় ছেলের ঘরের ঝাঁপের আড়াল থেকে বের করে আনে। চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দেয় 'এইঠে, এইঠে'। তার গলার স্বর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বুড়িমাকে পেয়ে যাওয়ার খবর চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে কালটী ঘরে ঢুকে বুড়িমার গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ

অনুভব করে বেঁচে আছে তো! 'মাই, মাই গে, হেই মা' বলে বুড়িমাকে ডাকে। ডাক শুনে আশপাশের সবাই চলে আসে। বুড়িমা উঠে আসে। তাকে ধরে বাইরে আনা হয়। সানঝুর বড় ছেলের বৌ দেবারী লজ্জায় রাঙা হয় একথা ভেবে যে কাল রাত বুড়িমা তার ঘরেই ছিল। ঝারী রসিকতা করে বলে যে লজ্জার কিছু নেই—বুড়িমা কিছু দেখতে পায় না, তাছাড়া ঘরও অন্ধকারই ছিল।

বুড়িমাকে পেয়ে যাওয়ার পর সবাই যে যার কাজে চলে যায়। শ্রাবণের এই কুড়িটা দিনের ব্যস্ততা তো সারা বছরের চেয়ে আলাদা। তাছাড়া বাড়িতে কত আত্মীয় স্বজনের আসা যাওয়ার ব্যস্ততা তো লেগেই আছে। এমন একজন ঘড়িওয়ালা লোক বুড়িমার বাড়িতে হাজির হলে তার ঘড়ি সবার আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। ঘড়ির ভেতর ইংরেজি লেখা, অন্ধকারে জ্বলে ওঠা 'ফুটকিগিলা' সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সময়ে এগিনা ঝাট দেওয়াও আগের মত নয়। শ্রাবণে ঘাস জঙ্গলে এগিনা অনেক ছোট হয়ে যায়।

বুড়িমাকে যদি খুঁজে পাওয়া না যেত তাহলেও যে রোয়াগাড়া ক্ষেত থেকে বাড়ির ব্যাটাছেলেদের ডাকা হত তা নয়, কারণ শ্রাবণের এই কুড়ি দিন বেটাছোয়াদের ডাকতে নেই। তাছাড়া বেটাছোয়ারা বেশি খুঁজতে পারে বেটিছেয়ারা কম—এমন ধারণা তাদের নেই। যদি এমন ইশারা পাওয়া যেত যে জঙ্গল বাড়িতে বুড়িমা হারিয়ে গেছে তাহলে লাঠিসোটা বল্লম নিয়ে বেটিছোয়াদের আরও সবাইকে ডেকে জঙ্গলবাড়ি যাওয়া হত।

এবার শ্রাবণের পুনিয়া বা শাদোপাক চলছে। তাই সূর্যওঠার আগে আর সূর্য ওঠার পরে একই আবছা আলো দিনগুলোকে বেঁধে দেয়। শ্রাবণের বৃষ্টিরও একটা ধোকর আছে। রাতে বৃষ্টি দিনে থেমে যায়। অনেক সময় জমি থেকে নালী কেটে জমা জল বের করে দিতে হয়।

'এই যে শাওন থেকে সেই শীত, আর সেই শীত থেকে আবার শাওন, এসবের মধ্যে কি বুড়িমা কিছু দেখে, দেখতে পায়। এমনতো হয়, অনেকে সূর্যাস্তের পর কিছু দেখতে পায় না।' বুড়িমা এরকম কিছু নয়।

বুড়িমার জোতের প্রবীণরা মনে করে যে তারা বুড়িমার চোখ দেখেছে—কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখেনি। বুড়িমা যে হাঁটতেই পারে না, প্রায় গড়িয়ে চলে তবু বুড়িমা কাউকে ডাকে না, ধরতে বলে না, পাছল এগিনার নালীতে ধাক্কাও খায় না। কখনও কারও মনে হতে পারে দেখার জন্য বুড়িমার চোখ দরকার হয় না।

'এক ভাদ্রের প্রথম দুবার দিনের দুপুর নাগাদ তখনও শ্রাবণের অমাবস্যা চলছে বুড়িমা নতুন এগিনা থেকে গড়িয়ে এসে ঠেকে পাছত এগিনায় দুখারুর ঘরের পেছনে। তখন দুখারুর পুত বৌ ঢলানী নতুন এগিনা পার

হচ্ছিল। বুড়িমার দিকে মুখ ফেরাতেই সে দেখে বুড়িমা দু আঙ্গুল তুলে তাকে ডাকছে। সে বুড়িমাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটু গেড়ে বসলে বুড়িমা ফিস্ ফিসিয়ে বলে—'পাহাড়ের ধসে বান আটকি আছে, পাহাড়ত, উঁচা পাহাড়ত, বড় বান, বড় বান—'

ঢলানী যে দু পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে বসে বুড়িমার কথা শুনছিল, এক ঝটকায় সে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে এখন কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। কোন দিকে কী বলে ছুটবে ভেবে পায় না। সে এ বাড়ির ছেলের পুত বৌ। বুড়িমা সম্বন্ধে বিয়ের আগে থেকে শুনে আসছে। বুড়িমা চোখের সামনের লোক চেনে না অথচ পাকা রাস্তায় বাস থেকে কে নামল, পাহাড়ে হাতির দল কোন রাস্তায় নামছে, তিস্তাপারের সেই দুই নম্বর কাশিয়া বাড়িতে বড় পুতনীর ছেলে হল না মেয়ে হল—এসব দেখতে পায়। 'বুড়িমা নাকি শ'শ' মাইল দূরের কমে, বা আট দশটা রোয়া গাড়ার কমে, কিছু দেখতে পায় না।' আর বুড়িমা যা বলে তা মানতে হয়। এসব জিনিস জানার মত পুরনো বৌ ঢলানী। তাই ঘরের পেছনে নেতিয়ে পড়ে থাকা বুড়িমার দুটি আঙ্গুল তোলা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে বুড়িমা কিছু বলতে চায়। তবে সেই কথা শোনার পর আর কোনও দ্বিধা না করে 'তীক্ষ্ম আওয়াজ আকাশ থেকে মাটি কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠে 'বড় বানা নামি আসিছে, পাহাড়ঠে আটকি আছে, বুড়িমা কহি দিছে।'

তার এই আওয়াজ শুনে ততক্ষণে বাড়ির বেটি ছোয়ারা বেরিয়ে এসেছে। ভিড়ার বৌ পাটেশ্বরী ঢলানীর আওয়াজ নিজের গলায় তুলে নেয়। মেয়ে সোমারীও একই কথা বলে চিৎকার করতে থাকে। বাহির এগিয়ায় ছুটে গিয়ে ঠাকুরানির ঘরের পেছন দিয়ে ডোবার পাড় ধরে একেবারে মাঠের দিকে ক্ষেত বাড়ির লোকজনকে ডাকতে থাকে— 'বুড়িমা, বুড়িমা কহি দিছে-এ-এ-এ, বড় বানা নামি আসিছে পাহাড়ঠে আটকি আছে-এ-এ-এ।

এটাই পদ্ধতি, রীতি বা লোকাচার, প্রতিদিন ঘটে না অথচ যেকোন দিন ঘটতে পারে সে ঘটনার কথা এমন ভাবে এ গলা ও গলা করে সমগ্র গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া। মেয়ে, পুরুষ, মোটা গলা, সরু গলা, মিলে একটা বৃহৎ স্বর তৈরি হতে থাকে। এই স্বর কানে গেলে সবার বোঝা হয়ে যায় কী বলছে, কী করতে হবে।

ক্ষেত বাড়ির ভেতর আওয়াজ পৌঁছতেই বেটিছোয়ার ঘর ছুটতে থাকে বাড়ির বড় এগিনার দক্ষিণ মুখো বড় ঘরের দিকে। ওটাতেই বড় একটা মাচান আছে। যাতে বন্যা এলে সব জিনিসপত্র এমনকি বাচ্চাদেরও

তুলে দেওয়া হয়। খড়িঘর থেকে মই কাঁধে দুখারুর ছোট বেটার বৌ কলকলী বড় ঘরের দিকে ছোটে। ক্ষেত বাড়িতে এখন সদ্য রোয়া ধান গাছ, দাঁড়ানো ভাদই আর পাট। সে সবের ভেতর থেকে কাল রংয়ের সব গাছ যেন ছুটে আসছে বাড়ির লোকজন। মুখে আ-আ-আ আওয়াজ।

ছোটচিলা গোলা ঘরের ঝাপ খুলে ভিতরে ঢোকে। ধানই তো আগে বাঁচাতে হবে। সে ভেতরে ঢুকে কোনো বুদ্ধি পায় না— কেমন ভাবে ধানের বস্তাগুলোকে সরাবে। এত ধানের বস্তা লোক দাঁড়াবার জায়গায় নেই। ছোটচিলা বাইরে থেকে ছোট বাপার কথা শুনতে পায়— 'পাটার গোলা খুলিবা না হয়' গাঁঠি বান্ধা আছে, ধানের গোলা দেখ, ধান—। এবার দারিঘর ও গোলা ঘরের দাওয়ার উচ্চতা মাপা হয়। মাপে দেখা গেল গোলা ঘরই বরং কয়েক আঙ্গুল নিচু। ছোট চিলা গোলাঘরে মাচান ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করতেই ছোট বাপা চিৎকার করে নির্দেশ দেয়—'মাচানের তলাত খুঁটা বান্ধ কেনে, খুঁটার মাথাত গোটা বাশ বসা, বাঁশ কাট গাছ কাট।' অমনি বাঁশ কাটা গাছ কাটার তৎপরতা শুরু হয়ে যায়, সেজন্য এগিনার দক্ষিণ ভিটের খোলা চালার নিচে দা, কুড়ুল, খন্তা, কোদাল আনার জন্য যে যার মত ছুটে যায়। কতক্ষণ পরে, কত উঁচু বানা কোন নদী দিয়ে আসবে কিছু জানে না কেউ কিন্তু জিনিসপত্র সিলিংএ তোলা, মাচান সারাই করা এমনকি নিজেকে বাঁচানোর কাজ জোর কদমে চলতে থাকে।

সমবেত সিদ্ধান্ত হয় যে দারিঘরের দুদিকে দুটি মাচান তৈরি করে ধানের বস্তাগুলো সেই মাচানে স্থানান্তরিত করতে হবে। ছোটবস্তাগুলিকে নামিয়ে বড় বস্তাগুলোকে আগে সরাতে হবে। কাজ করতে করতে বন্যা এসে গেলেও কাজ করে যেতে হবে। এবার পাটা ঘরের দিকে সবার নজর পড়ে। ছোট বাপাকে নিয়ে সেই রোগা গলা মানুষটি গেট ছাড়ার আগেই পাটাঘর খুলে তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে—'মাঝখানে অনেকখানি গর্ত করি এখান খুঁটি গাড়ো। আর পাটার গাঁঠি গুলাক খুঁটির নখত বান্ধি দাও সব পাখে।'

পাটা ঘরে ছোট বাপা দাঁড়ায় তার পিসির বেটা ভাইয়ের পাশে। ছোট দাদা তাকে বড়দাদা বলে। বড়দাদার জন্ম জলপাইগুড়ির দক্ষিণে ধাপগঞ্জে। ছোটবাপার পিসি সেখান থেকে এ বাড়িতে চলে আসার বছর খানেকের মধ্যেই এক ঢেমনা ধরে ছিল। পিসির দুই ছেলে এক ধাপ গঞ্জের পিসের, বড়দাদা, আর ঢেমনার, ছোট দাদা। বড়দাদা ও ছোটদাদার চেহারা অবিকল ঢেমনার মতো। ঢেমনাকেও এ বাড়িতে সবাই ঢেমনা বলেই ডাকে। ঢেমনা এ বাড়িতে মারাও গিয়েছিল এবং তার নিজের ছেলে ছোটদাদা তখন নির্বাসনে থাকায় বড়দাদাই তার

মুখাগ্নি করে। কারণ ঢেমনা তো বড়দাদার সহোদর ভাইয়ের বাপ।

সেই বড়দাদাই পাট ঘরে দাঁড়িয়ে যে বন্যা এখনও আসেনি তার স্রোতের কথা ভাবল। যদিও পাটগুলো গাঁঠিবাঁধা আছে, তবু জলস্রোতে যাতে ভেসে না যায় সেজন্য মেঝেতে একটা বড় গর্ত করে একটা শক্ত খুঁটি পুঁতে দিতে বলা হল। এবং মোটা দড়ি দিয়ে গাঁঠিগুলো জড়িয়ে বেঁধে দিতে বলা হল। তাতে চারিদিক থেকে জলস্রোত ধেয়ে এলে টেনে নিতে পারবে না। বেশ কিছুদিন জলের তলায় থাকলেও একটু পচন ধরতে পারে তবে ধানের মতো একেবারে পচে যাবে না। ছোট দাদা একখানা গুয়াগাছ কেটে আনতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত মতো ছোটদাদা ও বড়দাদা বাইরে ছুটে আসে আর দুজনেই ছুটতে থাকে। তাদের শরীর থেকে দড়দড় করে ঘাম ঝড়তে থাকে— পেশিগুলি বড় স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। অন্যান্যরা ছুটছিল বাইরে থেকে ভেতরে, নানা জিনিসপত্র নিয়ে।

ছোট বাপা আর বড়দাদা বাহির এগিনায় এসে দেখে বাড়ি থেকে জঙ্গল বাড়ির দিকে ছোট বাপার নিজের মায়ের পেটের বড়দাদা, খুড়া বাপার মাইঝন বেটা, বনের ভেতরে চড়ে বেড়ানো গরুগুলো সামলাতে ছুটছে। রোয়াগাড়ার পর গরুগুলিকে বনেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

বুড়িমা যখন বানা ঝুলে আছে দেখেছে তখন তো গরুগুলিকে গুছিয়ে দু-তিনজনের সঙ্গে পুবে জটেশ্বরের হাট আর দলগাঁওয়ের মাঝখানে কোনও উঁচু ডাঙ্গায় পাঠাতেই হয়। যদি এমন হয় যে বুড়ির ঝুলে থাকা বন্যা এসে বুড়িমার সারাটা গ্রাম ভাসিয়ে দেয়, ডুবিয়ে রাখে সব কিছু নষ্ট হয়ে যায় তবে সেই গরু নিয়ে যাওয়া বেটাছোয়া ও বেটিছোয়ারা ঐ পুবদিকে কোথাও চা বাগান, রেললাইন, আসাম রোড পার হয়ে এমনকি হলং ফরেস্টে গিয়ে কোথাও একটা গাঁও বসাতে পারবে। শুধু দেখতে হবে তারা যেন সোজা পুবে না যায় কারণ সেখানে তোর্সা নদী আছে।

পাহাড়ে ঝুলে থাকা বন্যা যা অনিশ্চিত, সেজন্য গোরু গোছানো। যারা গোরু চড়াছিল তারা তো এসব জানেও না। তারা পাহাড় দেখতেও পায় না। ভাদ্রের রোদের প্রখরতা থেকে বনে গাছের ছায়ায় এমনকি ডালে বসে তারা দিব্যি আছে। কী করে তারা বন্যার কথা শোনা মাত্র গোরু গোছাবে।

'ছোট বাপার নিজের বড়দাদা, ছোট বাপার-খুড়া বাপার-মাইঝান বেটা ছোট বাপা, ছোট বাপার সেই পিসির বড় বেটা বড়দাদা জঙ্গল বাড়িতে ঢোকে। তার আগে অন্যান্য ছেলেরা ঢুকে গেছে। হঠাৎ মস্ত এক

কুকুরের ডাক শোনা যায় সে আরও ভেতরে ঢুকেছে। 'ভেউলার ডাকের ভিতর রাত্রি ছিল, অন্ধকার ছিল, অনিশ্চিত ভয় ছিল, আক্রমণের হুমকি ছিল, পালিয়ে যাওয়ার ইসারাও ছিল।' ভেউলার কান্না থামলে হাম্বা রবে গরুগুলিকে ডাকা হল। ফরেস্টের ভেতর থেকে ঝিঁঝির ডাক, জলপড়ার শব্দ, এরকম নানা শব্দ পাওয়া গেল। ছোট বাপাদেরও গলা থেকে সেই ডাক উঠে আসে। মাইঝেনবেটা 'ধোলী', 'ধোলী' করে ডেকে ওঠে। আবার ডাকে 'নওসরী-ই', লা-আ-লী। যেন আর দেরি করা যায় না।

এবার বনের ভেতর থেকে লম্বা হা-ম্বা-আ, ডাক ভেসে আসে। সেই ডাকশুনে ভেউলা শব্দ অনুসরণ করে ছুটে যায় যেন গরুরা দিন শেষে ঘরে ফিরছে, ভেউলা যাচ্ছে এগিয়ে আনতে। ডাকশুনে ও ভেউলার চিৎকারে গরুগুলি বাড়ি ফেরার পথের আন্দাজ পায়। এগুতে থাকে। একে একে ফিরতে থাকে।

সবগরু একত্রিত হলে নিজো দাদা নাম্বুকে ডেকে বলে একটু অপেক্ষা কর। বাড়ি থেকে একটা বেটিছোয়া পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গরু মানষির দলটা অন্য কোথাও গাঁও বানাতে গেলে তো একটা বেটিছোয়া দরকার।

বাড়িতে ঢুকেই নিজোদাদা ভোরাইকে ডেকে জঙ্গল বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হতে বলে। এখনও তিনটি গরু বাকি আছে বেরোনো, বেরুলেই নাম্বুদের সঙ্গে সেও যেন গরু বাঁচাতে পুবের দিকে যায়। ডাউকীর নাত বৌ ভোরাই এক ছুটে জঙ্গল বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়।

বাড়ির ভিতরে উঁচা ঘরের আধখানা সিলিঙে মই লাগিয়ে পাটেশ্বরীরা বানার ভয়ে জিনিসপত্র রাখছিল। সেখানে ভোরাইও কাজ করছিল সবার সঙ্গে। ডাকশুনে সে চলে গেছে তিন রাখোয়াল আন্ধারু-ঝাকো, নাম্বুর সঙ্গে গরু বাঁচাতে স্থানান্তরে। ভোরাই এ বাড়ির বউ। সে এসেছে তিস্তার এ পারেরই গাঁও থেকে তবে অনেক দূর মেখলিগঞ্জের কাছাকাছি—অন্তত আধবেলা হাঁটা পথ এমন জায়গা থেকে। আসন্ন বানায় বুড়িমার গ্রাম ধ্বংস হলেও তিন জোয়ান ও এক নারী, গরু বাছুর বেঁচে থাকবে এই কারণেই বড়রা এ ব্যবস্থা করেছে। এমনও হতে পারে ভোরাইদের গ্রাম তখন ভোরাইগুড়ি বা ভোরাই গাঁও নাম নেবে বা ওরা ফিরে এসে এখানে যেমন ছিল তেমননি থাকতে পারবে।

পাটেশ্বরী 'সামা উরোনখান আনতে বলে ধোলীকে কারণ বানা চলে গেলে ধান থেকে চাল চিড়ে তৈরি করে সংসারের মানুষগুলোকে বাঁচাতে হবে তো! বউয়েরা নানা কৌশলে সামা উরোনটাকে এনে 'উচাঘরের দাওয়ার নিচে এনে ফেলে। ভাদ্রমাসের এই চামড়াফাটা রোদে চার যুবতীকে বড় ক্লান্ত দেখায়। 'সামাউরনটা

আকারে ছোট। চারজন ধরার জায়গা নেই। কিন্তু ধোলী, নেকী, কলকলী, শনিয়া ওটাকে একসঙ্গে নিয়ে আসতে যায়। কারণ একজনে আনা সম্ভব-নয় বলে। যদিও বা চারজনে ওটা তুলল, তবে হাঁটবে কী করে। দেড় হাত উঁচু, পৌনে একহাত চওড়া খোদলের ঘের পৌনে এক হাতের কমই হবে গর্ত, আর এক বিঘতের একটু বড় পায়ার উচ্চতা। সেটাকে চারজনের আট হাতে ধরবে কোথায় বা আট পায়ে চলবে কেমন করে। চলতে গেলে তো চারটি মাথায় ঠোকাঠুকি লেগে যায়। নতুন এগিনা পার হয়ে ওরা পাছত এগিনায় গিয়ে এই, এই, এই করতে করতে উরোনটাকে ফেলে দেয়। তখন ওরা হাফ ছেড়ে শরীর দুলিয়ে হাসতে থাকে। এর ওর সঙ্গে নানা কথা বলতে থাকে। এই দলে শনিয়া আর বিশাদীর বিয়ে হয়নি। কলকলী শনিয়াকে একটা ঠেলা দিয়ে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করে। তার মুখ থেকে একটা প্রবাদ বেরিয়ে আসে 'অতি বিয়াস্তির না হয় বিয়া, অতি-ছোয়াস্তীর না-হয় ছোয়া।'

ধোলীর মাথাতেই বুদ্ধিটা প্রথম আসে উরোনটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাবার। চারজনের মিলিত ধাক্কায় ওটা গড়ায় বটে কিন্তু একটু এগিয়েই থেমে যায়। কলকলী-উরোনটার খোদলের খাঁজে দু-হাত ঢুকিয়ে বলে 'নে, ধর্ কেনে। এ হচ্ছে এক আমড়া গাছের দামড়া।' এরপর ওরা নানা কৌশলে উরোনটাকে পেটের কাছে ধরে উঁচা ঘরের দাওয়ায় নামিয়ে দেয়। এই ভাদ্র মাসের চড়া রোদে ওরা চার নারী উরোনটা নিয়ে কসরৎ করতে থাকে। অন্যদিকে বেটাছেলেরা কেউ জঙ্গলবাড়ি, কেউ, পাটবাড়ি, গুয়াবাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছিল। কেউ তাকাচ্ছিল না পর্যন্ত ওদের দিকে। এমন কাজ ভাগাভাগি এখানকার রীতি। সহজ কঠিন কাজ বলে নয়। মেয়েরা যখন ধান ভুখায় তবে উরোনটা তাদেরই সরাতে হবে-এমন একটা সহজ হিসেব কাজ করেছে।

'শুন দুপুরে এই ছয় এগিনা জঙ্গলবাড়ী যখন 'আসিবা-বানার' ভয়ে সব গুছিয়ে নিচ্ছিল তখন আকাশের একখন্ড কালো মেঘ অনুচ্চস্বরে জানান দিতেও পারে বানা আসার কথা। ঐ সময়ে তিস্তার খরফেনা এড়িয়ে 'জলের গভীরে গভীরে উজান ঠেলে ওপরে উঠছেন যে জননী কাউঠানী যে উপরে উঠে তার গলাটা আকাশে বাড়িয়ে ডাক দেয় ' হে-এ খঞ্জন, হে ফড়িঙ্গা, বাউ গে-এ...।' জননী কাউঠানী সম্পর্কে প্রশ্ন—তাকে কেউ কোন দিন দেখেছে কিনা? তার উঠে আসা, সাঁতার কাটা, ডিমপারা দেখতে নেই, দেখলেও দেখতে নেই। তবু সে আসে সব নদী-জল-তল ভেদ করে অবশেষে তিস্তায়। আবার তার সমুদ্র যাত্রা। কোথা থেকে আসা আবার কোথায় চলে যাওয়া। এটা বিশ্বাস। প্রমাণ নেই। 'তার কোনও সাক্ষী আছে? প্রমাণ আছে?.... সব জিনিসের

কি সাক্ষী হয়? প্রমাণ হয়? না হয় না হয়। না হলেও হয়। যেমন বানা ঝোলা, যেমন গোলা, গোয়াল ঘর রক্ষা, তিন পুরুষের সঙ্গে একটি মেয়েকে বিদেশে গরুসহ পাঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা। বুড়ির বানাঝোলা থেকে গল্প শুরু হয়ে সম্ভাব্য বন্যার হাত থেকে নিজ নিজ সম্পত্তি গরুবাছুর রক্ষা করার ঘটনার একটা পরম্পরা লক্ষ করা যায়। কিন্তু জননী কাউঠানী নানা নদীর জল বেয়ে এমনকি জলঢাকা থেকে তিস্তায় আসা যায় কোন জলপথ নেই—তৎসত্বেও এ অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লেখক তত্ত্বের নিরিখে তাও সম্ভব করে দিয়েছেন। 'এই পৃথিবীর কুনো নদী কি কুনো নদীঠে আলগ্ থাকিবা পারে?' এই প্রশ্নই তো উত্তর। পারে না। পারে না—কারণ জলের উৎস তো একটাই। মাটিও একটাই। আপাত বিচ্ছিন্ন হলেও ভেতরে ভেতরে একই মাটি, একই জল - এক আকাশ, এক সূর্য, এক বাতাসের মতো।

জননী কাউঠানী তো তিস্তা বুড়িমার মতো দেবতা। তাকে তার আসা যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করবে কে? সৃজনের জন্যই তার আসা। ডিম পেটে এলেই সুমেরু কুমেরুর সমুদ্রের জল ঠেলে দুদুয়া, তিস্তায় আসা।

'তিস্তা তো নদী নয়, তিস্তা দেবতা। তিস্তা বুড়ির পূজা হয়, মেচেনী খেলা হয়। তিস্তা আর গঙ্গা তো এক নয়। দুজনেই দেবতা।' লোক বিশ্বাসে দুজনেরই আলাদা রীতিনীতি। সব নদীর উৎস এক হয়েও লোক বিশ্বাসে আলাদা—দেবতা বলে। গণেশ কার্ত্তিক দুর্গার দুই ছেলে তো মেচেনী দুর্গার। ধূপগুড়ির ফুলবাড়ীর কাছে তিস্তায় শিবঠাকুর মেচেনী পাড়ায় এসে মেচেনীদের সঙ্গে মেলামেশা করে। দুর্গা তা জানতে পেরে তিনিও এসে মেচেনী বেশ ধারণ করে শিবের সঙ্গে সহবাস করে। তাতেই দুই সন্তান গণেশ ও কার্ত্তিক। 'মেচেনী খেলাই তো তিস্তা বুড়ির পূজা, তিস্তা বুড়ি নেমে আসেন আকাশ থেকে উঠে আসেন তিস্তা নদীর বুক থেকে।'

'নামি আসিছেন তিস্তা বুড়ি।/উঠি আসিছেন তিস্তা বুড়ি।/ হীরামন বাঁশিখান বাজিবার ধরে/ মোর মনখানত-নাগিনার ধরে।/ আর উড়িয়া গেইল মোর গায়ের পছোরা।'—

তিস্তা, গঙ্গা যেমন তাদের ইচ্ছামত বাঁক ফেরান, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন, তেমনি জননী কাউঠানীও কেন, কোথায়, কেমন করে আসেন তা জানার কোনও দরকার নেই—জানতেও নেই। 'তা জানার বিষয় নয়।' বুড়িমা 'ঝোলা বানা' দেখে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। সবাই যখন ঘরদোর সামলাতে ব্যস্ত তখন সত্যি সত্যি বানা কোথাও ঝুলে আছে কিনা, বুড়িমার কথা সত্যি কিনা তা জানার জন্যে জননী কাউঠানী গল্পের অবতারণা। কাউঠানী কোন কোন নদী পথে ডিম পাড়ার জন্য জলের উজানে নিজেকে ঠেলে উঠে এসে

বালি পাথর সরিয়ে দুদুয়ার পারে ডিম পেরে বুক দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে ফের তিস্তায় নেমে যায়। এদৃশ্য কেউ দেখেনি কিন্তু না দেখলেও ঘটনা ঘটেছে এবং একটা ডাক ওঠে দাদা গে, বাউ গে, খঞ্জন, দাদা গে বাউগে ফড়িঙ্গা—আ'। 'কে ডাকে কেন ডাকে কেউ জানতে চায় না।' জানতেও নেই—এই ডাকেই 'জেঠোদাদাকে জিজ্ঞেস করে কেন তাদের ডাক পড়েছে। জেঠোদাদা-তাদের বলে—'খোঞ্জন, ফোড়িঙ্গা, তোমালাক-বানা দেখিবা যাবা নাগে।' এরপর আদেশ মত দুজনে দুটো লাঠি নিয়ে 'গারামক সালাম করে'—খঞ্জনকে বড়বাকের পাড় ধরে উত্তর দিকে এক নদী মানষির কাছে, ফড়িঙ্গাকে বড় বাঁকের পুবপার ধরে দক্ষিণ দিকে আর এক নদী মানষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলে। যেতে পথে বহু নদী, বহু পথ, নদী জানা মানষি, নদী-মানষির সাহায্যে ওরা তিনজন দুই ছেলে ও জেঠোদাদা-বানা চিনতে তিনদিকে চলে যায়। জননী কাউঠানী কে? এও মাতা হিসেবে বংশ রক্ষার জন্য ডিম পারার সময় উঠে আসে। অথবা দেবী তিস্তাবুড়ির মতো—ত্রাতা।

বুড়ির গোতে বন্যার জন্য সবার প্রতীক্ষা। এতক্ষণ যে ব্যস্ততা ছিল গোহালিয়া ঘর, পাটা ঘর, শোয়ার ঘর রক্ষা, বুড়িকে নিরাপদ স্থানে, উঁচু ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে রাখা তা সব চুকে বুকে গেছে। এবার সবাই যে যার মতো অপেক্ষা করছে কখন বন্যা আসবে। দিন জাগা রাত জাগা। রাতের খাবার শেষ করে কুমালীও বসেছিল। তার মনে পড়ে বাল্যস্মৃতি—তখন বিয়ে হয়নি—কুমালী নদীতে কিশোরীর স্নান, রসাল জাম্বুরার মতো রসবতী তার দুটি স্তন নদীর জলে ভিজে একটা আত্মরতি বোধ করা। সে আপন মনে গান ধরে—

উতরা কুমলাইয়ের জল.....স্যালায় গন্ধায় মোক পাগল করিবার ধরে।' বানা আসছে না। এগিনার ভিতর দিকের এক কোণে কিশোরীরা খেলছিল—'নোকটুরে নটুয়া....'। আন্ধার পক্ষের তারা উঠেছে। ওরা বসে গেছে বানা চলে গেলে কী ফসল হবে জমিতে সে গল্প নিয়ে। বানা চেনার থেকে বাঁচার জন্য ওদিকে তিন যুবক সঙ্গে এক যুবতী চলে গেছে—আর এদিকে দুই যুবক দুটি লাঠি নিয়ে নদী চিনতে বেরিয়ে পড়েছে। বিসারু ভাবে বানা এসে পাট বাড়িতে ঢুকেই পড়েছে। ঢুকেছে দাঁড়িয়ে থাকা হাই ইল্ড ধান ক্ষেতে। সেই ভাদ্রের টনটনা রোদে আর কেউ মনেই করতে পারছে না বানা এলে ওদের চারজন কী পাঁচজন কী করবে। ওরা পাট ক্ষেতে নামে, ধানক্ষেতে নামে, আল ধরে হাটে। ধান পাট ক্ষেতে বন্যার জলের পরিবর্তে বাতাস বয়ে যায়। পাকা ধান গোলা মুখো। ওরা পাকা ধানের ক্ষেতে আলে বসে, ধান ক্ষেতে নামতে নেই। আলে বসেই জমির ঘাস তোলে উবু হয়ে। সে মাটির জল এখনও শুকোয়নি। 'সে মাটিতে গোহি হল রেখা, এখনো মিশে যায়নি। সে হল রেখা থেকে এই বানাজাগা প্রহরে সেই পুরাণ কন্যা উঠে আসতে পারে।

আর এক শেষ

বানা এসেছিল কিনা কেউ বলতে পারে না। এলেও যে বুড়িমার গাঁও দিয়ে নামবে তাও নয়। আবার নামলেও তিস্তা, জলঢাকা, দুদুয়া ইত্যাদি নদীতে ভাগাভাগি হয়ে বানা দুর্বল হয়ে যেতে পারে, আবার পাহাড় থেকে নামতে নামতে বানা উদাস হয়ে যেতে পারে, তখন ঠা ঠা রোদে দাঁড়িয়ে কেউ বলতে পারে 'হারে বানাখান উদাস হয়্যা গেইল।

বুড়িমা যখন বানাকে ঝোলা অবস্থায় দেখেছে তখন ভেবে নেওয়া যেতেই পারে বানা নেমেছে তার আবার সাক্ষী সাবুদ কী? এই বানাটা নাম পেয়ে যায় 'বানাঝোলা'—আর এ সময়ে যারা জন্মে তাদের কতো নাম হয় এই বানা দিয়ে—বানভাসা, বানুয়া, বানভাসি, ভাসানী ইত্যাদি। এই বানার বছরে কতজনেই পেটেলী হয়—তাদের জামাইবাবু আসে শালীর পেট খালাস দেখতে। এভাবেই সময় চলতে থাকে। মানুষ সময়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। 'অফিস খোলার টাইম থাকে, অফিস বন্ধের টাইম থাকে, ইসকুল বসার টাইম থাকে, ইসকুল ওঠার টাইম থাকে। এমন টাইমের হিসেব দিয়ে কি আর সময় মাপা যায়। এমন সময়, যা চলছে তো চলছেই, যার ভিতর কখনো মানুষ ঢুকছে, কখনো মানুষ সে সময় থেকে খসে যাচ্ছে।' বানাঝোলার ব্যাপারটাও সে রকমই কবে কখন বুড়িমা বানা ঝোলা দেখেছিল তার হিসেব কে রাখে—চলমান সময়ে কতবার বানা ঝুলবে, আসবে, কবে আসবে। এতো একটা কথা মাত্র। অনেক কিছুই দিনক্ষণ তারিখ দিয়ে হিসেব চলে না, ঘটনা দিয়ে হিসেব হয়। যেমন বানার সময়, ধান কাটার সময়।

লেখক নিজেই প্রশ্ন করেছেন বুড়ির দেখা বানা কী এসেছিল? সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? হয়ত এসেছিল, হয়ত সব নদীতে ব্যপ্ত হয়ে গিয়েছিল, হয়ত উদাস হয়ে গিয়েছিল। তবে 'বুড়িমা যখন দেখেছে, পাহাড়ে বানা ঝুলে আছে তখনই তো জানা হয়ে গেছে বানা নেমেছে বানা ভেসেছে।' এসব জিনিস সময় দিয়ে মাপা যায় না। সময়ে সব বদলায় পুরোনো ধান চাষ নতুন ভাবে নতুন নামে চাষ হয়, রাজনীতির পরিবর্তন হয়। কারণ মানুষের জীবন তো জন্মের চাইতে অনেক বড়। তার তো শেষ নেই।

ঘাটোয়ালের কাহিনি বুড়িমার বানা ঝোলার মত আর এক কাহিনি। 'এখানে এক ঘাটোয়াল ছিল।' বুড়িমার ঝুলে থাকা বানা যেমন সত্যি কি মিথ্যা জানা যায় না। কিংবা এর বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও একে উপলক্ষ করে কতো কান্ডই না ঘটল বা ঘটে যেতে পারে। অনুরূপ সময়ের বিশালত্ব বা সময়ের পরিবর্তনশীলতার

সঙ্গে এক ঘাটোয়ালের গল্পও এসে পড়েছে। যে ঘাটোয়ালের বাবা তার বাড়ির উঠোনে কয়েক পুরুষের একটা শিমূল গাছে তার শিল্পী দৃষ্টি দিয়ে একটা নৌকা দেখেছিল, যেমন শিল্পী পাথরের ভেতর নানা কিছু দেখে। তারপর একদিন সে গাছ কেটে তার ভেতর থেকে আস্ত একখানা নৌকা বের করল। কিন্তু পরিবর্তমান সময় তাকে নৌকায় চড়তে দেয়নি। তার ছেলে ঘাটোয়াল বা ঘাটিয়াল সেই নৌকা বা সোলংগাটিকে নদীতে ভাসাবে বলে বেরিয়ে পড়ল।

কাহিনি গড়ে তোলার জন্য লেখক ঘাটোয়ালকে নানা ভাবে তৈরি করেছেন। তার ঘরে রাখা সোলংগা মাঝেমাঝে চিকচিক করে উঠত যেন ঘরে বানা ঢুকেছে। একদিন তার স্বপ্নে এরকমই মনে হল। সে একখানা দাও কোমরে গুঁজে নিয়ে সোলংগা কাঁধে বেরিয়ে পড়ল নদীর খোঁজে, জলের খোঁজে সোলংগা ভাসাতে হবে তো! ঠিক যেন ভগীরথ গঙ্গা আনয়নে বেড়িয়ে পড়েছে। এখানেও পুরাণের আবহ। নদী—কোন নদী—কুলজুয়া, দুদুয়া, রেতি, জমজমা অথবা এদের মিলনস্থল। যেকোন জায়গা, যেকোন জল,কারণ একটু জলই শুধু দরকার। 'সে তার নদীতে গিয়ে শোলংগার ভেতর ওঠে। সোলংগা তাকে নিয়ে ভেসে চলে যেদিকে, তার মুখতার বিপরীতেই থাকে। তার দৃষ্টি পারে, অতীতে গাঁওএ, সেও যেন নদীর সঙ্গে নদীর মতো করে ভেসে চলেছে। এমন কাজ ক'জনেই বা পারে।

সোলংগা নিয়ে ঘাটোয়াল জলে ভাসে। স্বল্প পরিসর নদী পথে তার যাত্রা তার বাপের সাত কেলেনে শিমূল গাছ থেকে খুঁদে পাওয়া সোলংগায় সে আজ সওয়ার। বাইরে থেকে কেউ কেউ তাকে দেখে সে বয়ে যাচ্ছে। এভাবে কত দিন যে চলে যায়— 'কতগুলো শীত যায় বর্ষা যায়, পাকড়ি গাছে কতবার পাতা ঝড়ে, পাতা গজায় আকাশ কতবার ছোট হয়ে আসে, আবার বড় হয়ে যায়, কত জ্যোৎস্না ঢেকে যায়, জ্যোৎস্নার কত ঢাকনা খসে যায়, একই নদীর জল কত রং বদলায়, মাটির ফলন কত বদলে যায়। একটা মানুষের জন্মেই কি একটা দেখা শেষ হতে পারে?'—ঘাটোয়াল এক উদ্দেশ্যে নদী পথে বের হয়েছে। বর্ষা, ঋতু পার হয়ে সে বয়ে যাচ্ছে। সে সব ঋতু বদল দেখছে আর বয়েও চলেছে। শুধু নদী পথে তো নয়, নদীর পারের জনজীবন, ঘাট, মাঠ, গাছপালা, হাট সব কিছু। এমনি এক হাটের ধারে মুরগী যখন ডেকে ওঠে —শোলংগায় বসে সে শোনে। অর্থাৎ ছেড়ে আসা সাধারণ জীবনের সঙ্গে ষোল আনা সংযোগ রেখে সে চলতে থাকে, উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

কয়েক দিনের মধ্যে কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক নাইয়া তার সোলংগা নিয়ে এখানকার সব নদীতে

সব সময় ভেসে বেড়াচ্ছে। তার বিরামহীন সোলংগা যাত্রা। কখনও কারও সঙ্গে কথাও বলে। অনেক ক্ষেত্রে তা গান মনে হয়। নদীরও রকম ফের—তিস্তাও নদী তোরসাও নদী। কিন্তু জল আলাদা। এপার ওপার জোড়া জলের নদীর মানুষজন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে ভাব বিনিময় করে। 'নদীর সঙ্গে কথা না বললে সেখানে মানুষ বোবা হয়ে যাবে। নদী থেকে যে কথা উঠে আসে না সে তা না শুনলে কালা হয়ে যাবে।'—নদীর এসব প্রভাব নদীওয়ালা দেশে। যেমন গঙ্গায়, পদ্মায়। সেখানে নদীর প্রভাব মানুষের ওপর, মানুষ নদীকে আশ্রয় করে তার জীবনবৃত্ত রচনা করে। কিন্তু 'এই দশনদী বিশনদীর পৃথিবী তা থেকে আলাদা। মানুষের জীবন এখানে নদীর ওপর ছড়িয়ে পড়েনি। অথচ চোখের নিমেষে নদী নদী ছেড়ে উঠে এসে টাড়ি বাড়ি গ্রাম ঠোঁটে করে সেই একই গতিতে বেরিয়ে যেতে পারে...' এখানে 'মানুষ সে রকম জীবনটুকুকেই মেনে নেয়, নদী বা ফরেস্ট তাকে যেটুকু জীবন দেয়।'

এই দশনদী বিশনদীর দেশে নদী এমন ছোট নিরালা যেন সবার পায়ে পায়ে চলে। 'এখানে সোলংগা ভাসানোর দরকার হয়না।' অর্থাৎ বিশেষ সময়ে ছাড়া পারাপারের দরকারেও না। তবে মেয়েদের দৈনন্দিনের কাজ চলে এতে। মেয়েরাও হাটে গিয়ে নানা খোঁজ খবর নিতে পারে। এই সুযোগে মেয়েদের হাটে যাওয়া এবং তার বর্ণনার কথাও আসে। সোলংগা ভাসে সারা এলাকার সব নদীতে আর বাড়ির মেয়েরা দল বেধে একএকজন এক এক ভঙ্গিতে সোলংগা দেখে। 'সোলংগা আর নাইয়াকে কে দেখেছে তা কেউ জানে না।'

'....দেখা যায় অথচ দেখা যায় না।' নারী পুরুষ, দেউনিয়া-হালুয়া-পাইকার প্রত্যেকের মনেই অনিশ্চয়তা যে সত্যি সোলংগা-নাইয়া বাস্তব না মিথ্যা?—'এসব গান দশ নদী, বিশ নদী ছয় হাটের পৃথিবীর গান।' কারণ এইগুলি পরে এক নদীতে মিলিত হয়েছে। তখন 'এসব সেই পৃথিবীর গান যেখানে নদীর ওপর মানুষের সংসার জীবন। ... এই দশ নদী বিশ নদীর পৃথিবীতে কোনো ঘরে কি কোন এক জন্মে এই ভাটির দেশ থেকে কোনো মেয়ে বউ হয়ে আসেনি? আর সে কি কোনো কালে যে নদী থেকে সে এসেছে সে নদীর গান গায়নি?'—এসেছে পাখির ঠোঁটে করে যেমন বীজ আসে আর সেই বীজ থেকে গাছ তারপর আবার বীজ—আবার গাছ। এখানে উত্তরবঙ্গের নদী সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নদী সংস্কৃতির একটা মিলের কথা বলা হয়েছে। কারণ 'এই দশ নদী-বিশ নদী হয়ত মাটিতে সেই এক নদী হয়েছে-রংপুরে, দিনাজপুরে কিছুটা জলপাইগুড়ির পশ্চিমে সেই বোঁদাপচাগড়ে—আর সেই ভাটি থেকে গান উজিয়ে এসেছে।'

সোলাংগা ও নাইয়ার গল্পও নদীগুলির মিলনের কথা। ইঙ্গিত। দশনদী বিশনদী মিলে মিশে এক নদী—এক সংস্কৃতি বোধের পরিচায়ক। এভাবে হৃদয়ে তার গান হয়ে ওঠে—

ও পরান সাধুরে-

বড় নদীর তালাস করিবেন না।

মোর নদীখান ছোট, সেইঠে কাশিয়ার হুলুস্থুল

ঐঠে তোমরালার সোলংগা বাধেন রে।

ও পরান সাধুরে।.... সোলংগা ভাসান।

এ গানের মর্মার্থ বহুবিধ। তবে এ গানের প্রসঙ্গেই কিছু শাশ্বত কথা এসেছে— 'যে নদী দেখিস নাই সে নদীর সোতা খুব বুজরুখ। যে নারী দেখিস নাই, সে বড় সুন্দরী, তোর কানকে তোর চোখ বানাস না নাইয়া বরং তোর চোখকে তোর কান বানা। সব নদীতে পাথর আমার নদীতে কোন পাথর নেই।'

জয়বীরপাড়া চা বাগানের নিচে যেখানে রেতি নদী দুভাগ হয়ে দুদুয়ায় মিশেছে সেখানে এক আশ্বিন মাসে নাইয়াসহ সোলংগাটিকে পেয়ে গেল মৈজুদ্দিন কী মইনুদ্দিন পাইকার। এতদিন ঘাটোয়াল ছিল একা, এবার আরোহী পেল। মৈজুদ্দিন, মইনুদ্দিন, মৈজু, মৈনু বহু নামের আড়ালে আসলে একই মানুষ। মামলাবাজ মৈনুদ্দিন। মামলা খুঁজতে সে দশ নদী বিশ নদীর সব হাটে তো যায়ই এর বাইরেও যায় আর এই হাটাহাটির মধ্যে সে রাস্তাঘাট গাছপালাকে আলাদা করে চেনে। আর চেনে কার কোন জমি, জমির দাগ নম্বর। খাস জমি এমনকি থানার সীমানা সবই। 'এই পৃথিবীর পশ্চিম-দক্ষিণে ধূপগুড়ি থানা আর পূর্ব-দক্ষিণে ফালাকাটা থানা গায়ে লাগানো। এই পৃথিবীর উত্তর পূবে মাদারি হাট-থানা রেল লাইন থেকে শুরু।'—ফালাকাটা ও মাদারিহাট থানায় যায় না—কারণ তাহলে আলিপুরদুয়ার কোর্টে যেতে হবে। তার কোর্ট জলপাইগুড়ি। বড় উকিলবাবুর গলা নকল করে সে থানার দারোগাকে সবিনয়ে বিদায় জানাতে যায়। কিন্তু প্রত্যাশা পর জন্মে যেন ইংরেজি বলতে পারে। দুই বিবি, তাদের ছোয়া ছোটো, জোয়াই, নাতি নাতনির বেশ বড় সংসার। যে যার মত সংসারের দায়িত্ব পালন করে। তবে পাইকারকে না পুছে নয়। আর মামলাবাজ পাইকার সেই সুযোগটাই নেয় মনে প্রাণে। সে এবার নতুন মামলা ফাঁদতে চায়—চা বাগানের পাশে, নদীর পাশে জমি কিনবে। সেই নদীর জল চা বাগান বা কুলিকামিনদের ধোয়াপোছার কাজে ব্যয় হবে—ফলে সে জল পাবে না—তাই মামলা। টিপ সই

দেয়া এই পাইকার-ই জয়বীরপাড়া ফরেস্টের জলে ঘাটোয়ালকে প্রথম ডাকল ঘাটোয়াল বলে, সে নদী পথে মামলা করতে যাবে।

নদীতে মইনুদ্দিন সোলংগায় চলেছে। ঘাটোয়ালের সঙ্গে প্রশংসা করে কথা হয়-বাঃ বাঃ। কারণ চাঁদের ওঠা-ডোবা বা ক্ষয়বৃদ্ধি, সূর্যের উত্তাপের কমা বাড়া সব কিছু বোঝার সঙ্গে নদীর জলে তখন ডানে বাঁয়ে লগি মারতে হয়-সে দক্ষতা নাইয়া অর্জন করেছে। মুইনুদ্দিন যে সারা জীবন সারাক্ষণ জমি বাড়ি, হাট-ঘাট-মাঠ ঘুরে মামলা মোকদ্দমার উকিল-হাকিমকে চেনে সে সেই নাইয়ার কেরামতি আয়ত্বে দেখে তাকেও চিনে বলে ওঠে— 'এই বাউখান জল চিনে, এই বাউখানের চিনিবার ঢক আছে। 'এই আশ্বিন মাসে নদীর জলও শুকায়নি', বর্ষার জল লেগেছে, এখনও নামতে পারে 'পাইকার বলে ওঠে 'হবা পারে এখনো বৃষ্টি ও ঝড় বইতে পারে।' নাইয়া পাইকারের দিকে পেছন ফিরে লগি মারতে থাকে। দেখা যায় তার পাছার উত্থান পতন, বিচিত্র অবস্থা 'যেন নলবনে বাতাস এদিক ওদিক ঘুরছে আর নলবনগুলো নড়ছে ডাইনে বাঁয়ে।'

'বাউ হে, কোটত পাইলেন অ্যানং সোলংগাখান, পাইলেন বাউহে? বলে তার বাবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কারণ এই দশ নদী বিশ নদীর দেশে কেউ-ই তার অজানা নয়। তবে একে কেন সে চিনতে পারছে না। নাইয়া ভাবে, সময় নেয়, কেন প্রশ্ন জাগেনি কারোর। তারপর জিজ্ঞাসা করে তার বাবার কথা 'বাউ গে, কায় রে তোর বাপ?' নাইয়া জানায় সে তার বাবাকে দেখেনি। এরপর আসে মার প্রসঙ্গ, সে ক্ষেত্রেও সে মার কথাও জানে না জানায়। কত মামলা লড়েছে পাইকার কিন্তু এখানকার মামলার খেই পায় না। 'আর তোর মা ওক' বলতেই ঘাটোয়াল বা নাইয়া বলে 'কত তো মাই', বোঝা মুশকিল। একি উদার মনোভাব-না তার বাপের বহু নারী সঙ্গ? মইনুদ্দিনের মাথায় ধন্ধজাগে, অবিশ্বাস উকি মারে যেখানে ৩১নং জাতীয় সড়ক ধরে সারাক্ষণ কত ট্রাক আসাম কলকাতা করছে তাতে জলপাইগুড়ি যাওয়া যায় নিশ্চিত ভাবেই, তাতে না চেপে কেন এই সোলংগায় উঠল? একি মিথ্যা? ছলনা? তাহলে নিজের মনে বড় উকিলের মতো ইংরেজি বলে মনে করে নাইয়াও তার মনের কথা বুঝে ফেলেছে মানে সেও ইংরেজি বোঝে? তাই যদি হয় তবে তো সবই শেষ। তাহলে কি তাকে 'ভুলামাসানে ধরেছে?' অথচ রাস্তাঘাট সব ঠিকঠাক যেদিকে যা থাকার কথা তাই আছে? পকড়িবাড়ি, ক্ষেতখামার সবই ঠিক তাহলে? পাইকারের মনে সাত রকম প্রশ্ন জমতেই থাকে কেন সে সহজ সরল পাকা রাস্তা ট্রাক, বাস, বাদ দিয়ে এই অচেনা অজানা সোলংগায় উঠে বসল? একি তার ভ্রান্তি? তাহলে— 'এই ঘাটোয়ালটা মাদারিহাট ফালাকাটা থানার লোক নয় তো? কারণ এই দুই থানাকেই তার জবর ভয়।

পাইকার সারা জীবন মামলা লড়েছে। কখনও মনে হয়েছে যদি এমনটা না করত তাহলে বোধ হয় সারাটা পৃথিবী তারই হতো। প্রতিবেশীরাও তেমনই ভাবে। আবার সে ভাবে মামলা মোকদ্দমায় আছে বলেই তার এতো জোত জমি-দুই বিবি-কত কিছু। সে টাকু পাইকারের ছেলে। সব চেনে। বাড়ির সামনে দাঁড়ালে 'সে আট দশ হাল জমির ওপারের হালুকাকে চিনতে পারে। 'সে কিনা তার বাহির এগিনার মত নদী রেতি দিয়ে নামতে নামতে ভাবতে শুরু করেছে যে এই ঘাটোয়ালটা মানুষ নয়, অপদেও, ভুলা মাসান? তবে সেকি তাকে মাদারি হাট বা ফালাকাটা থানায় নিয়ে চলেছে? 'এ কখনো হতে পারে?' কঞ্চির মতো একটা ছেলে সোলংগা বাইছে—যেন তার মনে হচ্ছে নিজের নৌকায় বসে আছে। এই আত্মকথনের মধ্য দিয়ে পাইকার নিজের ও তার পারিপার্শ্বিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

'এতক্ষণ সময় গেল পাইকার কোনো আন্দাজই করতে পারছে না'- যে ঘাটোয়াল কে? কার ছেলে? কোথায় থাকে? কারণ এই জয়বীর পাড়া—সারা এলাকায় সে কাকে চেনে না, জানে না। ডুবরি বন্দরের শুকনো খাতে একটা ন্যাকচা বলদ দেখে সে বলে দিতে পারে এটা কার? সাত খোয়াপাড়ার বেঙ্গুকে তার ন্যাকচা বলদের হদিশ দেয়। আর সে কিনা নাইয়াকে চেনে না— সে আবার জিজ্ঞাসা করে 'কায় তোর বাপ'....'সাকিন কোটত?'—ঘাটোয়ালের জবাব 'না জানো না জানো' ঘাটোয়াল নানা রকম জবাব দিতে পারে—'হয় হয় মুই অ্যানং মানষি যায় বাপোক না জানো.....'সে আরো বলতে পারে তোমরালা যার বাপ হামরালার বাপ স্যায় (তায়) ' সে আরও বলতে পারে 'তোমরার মাওক পুছো।'—সত্যিকারের বাপ চেনার এক জটিল আবর্ত এখানে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের সনাতনি বাপচেনার পদ্ধতির ওপর সংশয় সৃষ্টি করে সমাজের গতানুগতিকতার প্রতি একটি প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে। মৈনু না মৈজু পাইকারের মতো লোক সঠিক উত্তর বার করে নিতে পারল না ঘাটোয়ালের কাছ থেকে—'সারা জীবন মামলা করেও যা জবাব চাও তা পুছতে পার না।'—তখন তার মনে হয় 'এই ঘাটোয়াল খান দ্যাও হবা পারে, অপদ্যাও হবা পারে না।' কারণ 'ক্যানং চুপ করি থাকি মোক চুপ দিল।'

পাইকারের ভেতর কথা জমা হতে থাকে, সে সবাইকে জানে চেনে, জমিতে হাটে, কাছারিতে উকিল মোক্তার, মুহুরী এমনকি বোধ হয় হাকিমকেও কিন্তু ঘাটোয়াল যেহেতু এ প্রজন্মের তার নাতির সমান তাই সে তার বাবা মাকে জানতে চায়। যার কাছে দশনদী বিশ নদীর দেশে কোনো কিছুই অজানা নয় - সে কেন

ঘাটোয়াল, তার মা বাপের কথা জানবে না, চিনবে না। নদী শোভায় অন্যমনস্ক নাইয়াকে-পাইকার সজাগ করে দেয় বড়বাঁকে সোলংগা ঢোকানোর জন্য। নাইয়া সোলংগা ঢোকায়। পাইকার জিজ্ঞাসা করে সে বড় বাঁকেই বা সোলংগা ঢুকালো কেন, কোথায় যাবে। উত্তরে নাইয়া জবাব দেয় যে সে জলে যেতে চাইছে—এখানেও জল ওখানেও জল। পাইকার আরও জিজ্ঞাসা করে সে নদীর নাম জানে কিনা-যেখানে যেতে চায়। নাইয়া জবাব দেয় 'হয়। নাম জানো নাই। দেখিলে চিনিবার পাম।' 'তোমরালা কি নদী হারিয়া ফেলি নদী খুঁজিবার ধরিছেন?' উত্তর আসে—'খুঁজি। খুঁজিবার তো লাগে।... কোটত্ আছে স্যানং নদী? পাইকার তিস্তার কথা বলে। তার বিশালত্বের কথা শোনায়। তিস্তার চড়ে বালুর ঘূর্ণি, আবার ঘাটোয়ালের বাবার নদীতে নৌকা চালানোর প্রসঙ্গ আসে। পাইকারের মনে প্রশ্ন জাগে এই নাইয়া যখন এইঠেও জল ঐঠেও জল বলছে তখন সে নিশ্চয়ই নদী চেনে না—নদী খুঁজে বেড়াছে। বাপে সাতকেলেনে শিমুল গাছে একটা আস্ত নৌকা দেখে তা খুঁজে বের করেছে। তার ছেলে নদীর খোঁজে সেই সোলংগা ভাসিয়ে দিয়েছে। নদী চেনার এক ক্রমিক ধারার পরিচয় পাওয়া গেল। পাইকার সেই নৌকায় সওয়ারী। দেখা যাক্ শেষ পর্যন্ত কোথায় যায়।

'আইসেন কেনে। মোরা সোলোংগাখান করি নদীখান-নদীখান দিয়া তিস্তা যাই।' আইসেন কেনে। তিস্তা যাই।' ঘাটোয়াল পাইকারকে এই আহ্বান জানায়। কিন্তু এর মধ্যে পাইকার এক বালির চরে নেমে গেছে ঘাটোয়ালকে মাসান দ্যাও ভেবে। যে নিজের পরিচয়, বাপ-মার পরিচয় জানে না-সে দ্যাও ছাড়া কি। তাছাড়া নদী পথে আসার সময় বাঁদরদের গাব ছুঁড়ে তাদের নাজেহালও করেছে অনেক। পাইকার সিদ্ধান্ত নেয় এখানে নেমে সে বড় রাস্তা ধরে লরি কিংবা বাস ধরে সদর জলপাইগুড়ি যাবে। কিন্তু জলঢাকা ও তিস্তার ব্রিজ থাকা সত্ত্বেও ব্রিজ নেই মনে করে সোলংগা করেই তাকে সদরে যাওয়ার আহ্বান জানায়। 'ব্রিজ থাকিলে কায়ও নদী পার হয়?' তাই পাইকার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে যে সে আর ঘাটোয়ালের আহ্বানে সাড়া দেবে না। পায়ের চটি হাতে নিয়ে বগলে ছাতা নিয়ে বীর পদক্ষেপে বালুবারি ধরে সে এগোতে থাকে জঙ্গলের দিকে। একটু উঁচুতে জঙ্গলে ঢুকে সে নিচের দিকে তাকায়। দুই হাতি সোলংগায় ঘাটোয়াল দাঁড়িয়ে নীল জলের উপর ভাসমান। পাইকার তা প্রত্যাখ্যান করে। 'পাইকার যেন তাদের ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিসর্জন দিচ্ছে।' নদীপথে সদরে যাওয়ার কথা ভেবেও অনিশ্চিত পাইকার বাস্তবের ব্রিজ, ট্রাক, বাসের আশ্রয়কেই স্বীকার করে। অজানা পথিক অজানা পথ ছেড়ে দেয়।

পাইকার-ঘাটোয়ালের আহ্বান বিসর্জন দিয়ে ফরেস্টে ঢুকে পড়ে বটে। কিন্তু তখন তার মনে পড়তে থাকে

নানা কথা, বিশষত অতীতে যখন জলঢাকা, তিস্তার-ব্রিজছিল না, পাকা রাস্তা ছিল না তখন তো নদীপথেই যাতায়াত হতো। তাহলে সে পালাচ্ছে কেন? সে আবার এসে উঠল সোলংগায়। কিন্তু জলপাইগুড়ি সদরে সে যাবে কী করে-সে তো দুদুয়ায়। দুদুয়া, জলঢাকা, তোরসা-পুব বাহিনী এরা একসময় এক সাথে মিলে পুব দিকে চলে যাবে। কিন্তু সে তো যাবে পশ্চিমে জলপাইগুড়ি সদর। তাহলে উপায়। যদি রেতি নদী দিয়ে দুদুয়ায় না আসত আরো পশ্চিমে ডায়না ধরে-জর্দা নদী ধরত তাহলে জর্দা তো তিস্তায় গিয়ে পড়েছে—তা সম্ভব হতো। তবে 'জানি রাখো ঐ জর্দা নদীখান একোখান নদী, যেইলা এই পুবিয়াল নদীগিলার নখত পছিমাল নদী গিলার মিল বানাছে—ময়নাগুড়ির তলত।' তাই সিদ্ধান্ত ' তারপাছে ডায়না ধরি, জর্দা ধরি তিস্তা যাই।'—কিন্তু এতো আর হয় না। অনেক ভাটিতে আসা গেছে—' সোলংগার পথখান কোটিত?' পথ আছে—আরো ভাটিতে গিয়ে একখানা জঙ্গল পার হয়ে-কালীগঞ্জ ও জাজং পাওয়া যাবে। সেখানেই জলঢাকার পূবে ধূপগুড়ি, পশ্চিমে ময়নাগুড়ি। আর ময়নাগুড়ির পশ্চিমে তিস্তা। 'তো চলো কেনে। পথ পাকিবার ধরো, সোলংগা ভাসাও নদী ধরি।' 'ঘাটোয়াল সোলংগার মাথায় দাঁড়িয়ে লগিটা তুলে নেয়।'

আবার ঘাটোয়াল আর পাইকার তিস্তার উদ্দেশ্যে সোলংগা ভাসায়।

দুদুয়া ধরে সোলংগা ভাসতে থাকে। 'পাড়ত লাগাও, পাড়ত লাগাও' বলে পাইকার বারবার চিৎকার করতে থাকে। ঘাটোয়াল পুব না পশ্চিম জিজ্ঞাসা করে—আবার নিজেই বলে 'পশ্চিমত'। এক সময় পাইকার একটু লাফ দিয়েই সোলংগা থেকে নেমে পড়ে। কিছুটা ফরেস্টের ভেতর দিয়ে গিয়ে আবার নদীতে পড়তে হবে। তাই ঘাটোয়ালও 'সোলংগা কাঁধে তুলে, বাঁ হাতে সেটাকে ধরে রেখে ডান হাতে লগি ঝুলিয়ে পাইকারের পেছনে পেছনে ঘাটোয়াল বালি পেরিয়ে জঙ্গল বাড়িতে ঢোকে।' পাইকার জঙ্গলের ধার ধরে যায়, পেছনে পেছনে যায় সোলংগা কাধে ঘাটোয়াল। শুধু একবার 'জলখাইকোনা' বলে পাইকার জানান দেয় জায়গাটাকে।

জঙ্গলের কিনারে চলতে চলতে কখন ওরা জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে, জঙ্গলই তো পথ করে দেয়। বাঁ কাঁধে সোলংগা মাঝে মাঝে পাইকারকে যাতে না হারায় সেজন্য ডাক ছাড়ে 'দেউনিয়া'। পাইকারের কথায়-ঘাটোয়াল টামগাছের জঙ্গলে সোলংগা নামায় টামের ডাল দিয়ে দুটো বৈঠা বানাতে। কারণ তিস্তায় লগি কাজে লাগবে না। ঘাটোয়াল পেছনে গুজে রাখা হাত দাও দিয়ে বৈঠা বানায়। নদী থেকে ফরেস্টে যেন বৈঠা বানাবার জন্যই ঢোকা। অবশ্য এছাড়া রাস্তাও নেই। তারপরে ফরেস্ট থেকে নিস্ক্রমণ।

ঘাটোয়াল চিৎকার করে সোলংগা নিয়ে হাটতে থাকে কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরোনও সহজ নয়। নইদেউনিয়া হওয়ার গল্প আর দেউনিয়া গিরি দূর করতে জঙ্গলে ছেড়ে আসার কাহিনি বলা হয়। পাইকার ক্ষেত বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে বলে 'এইঠে কালীগঞ্জ জাজং। এইঠে জলঢাকা নদী। পার হওয়া লাগিবে।' নদীর পারে এসে পাইকার জল ঢাকার নতুন কনট্রাকটরের ব্রিজ দেখায় আগে যা ছিল লাল টঙ টঙা ব্রিজ। সোলংগা ভাসাতে বলে। যদিও জলঢাকা পুবিয়াল নদী। তবে এখানে পছিমাল' 'পূবের ঢাল শেষ, অ্যালায় হামরালা পছিমের ঢালত ভাসিম। তিস্তার জলত।' জলঢাকার সুন্দর বর্ণনা—'জলঢাকা দেখতে খুব সুন্দর.....আকাশটাও মিশে গেছে।' এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘাটোয়াল সোলংগায় উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে। সোলংগা পাকখায়। উঠে পড়ে। 'সোলংগা স্রোত ঠেলে,.... স্রোতের উল্টো দিকে চলে।' 'ঐ পাড়ত যাবা লাগিবে তো?'—এসে পড়ে থানা ময়নাগুড়ি। ঘাটোয়াল আবার সোলংগা কাঁধে নেয়। ওরা দক্ষিণপূবে এসেছে। প্রণাম করে মা কামাক্ষ্যাকে। একটু পরে 'মা তিস্তা বুড়িকে' প্রণাম করে 'পাইকার দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে কোমর ভেঙে সেলাম করে, তিস্তাবুড়িকে প্রণামের এটাই রীতি, হিন্দু-মুসমান নিরপেক্ষ রীতি। পাইকার বলে 'হাড়িয়া দিক'।

'কাংড়া থেকে হাড়িয়া দক্ষিণ পূব থেকে উত্তর-পশ্চিমে মা কামাক্ষ্যা থেকে বাবা শিবের এই পৃথিবী-চোখের সামনে।' ওরা মাঠ বরাবর হাটে। বৃষ্টি নামে। ভেজে। সোলংগা উঁচু করে দুজনেই মাথায় দেয় টুপির মত করে।

পাইকার বলে ' যেইখান গাঁও ছাড়ি আসিছু-এটা ভাঙ্গামালি। যেইখান গাঁও দেখা যাচ্ছে-ঐঠা গোরার হাঁড়ি।' এরপর 'সিসুখালি' তারপর রেল লাইন, তারপর বাঁধ, তার পরেই তিস্তা। পাইকার মনে মনে বলে 'ঐ গোরার হাড়িত আছে ভাদই জোতদার।' তার কাছ থেকে দুইখানা পাকা বাঁশের লগি চাইবে—না থাকলে বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে নেবে।

সেই জয়বীর পাড়ার বেড়ার ধারে সোঁতার ভাসমান সোলংগায় উঠেছিল মইনুদ্দিন পাইকার। রেতি-বড়বাঁক দুদুয়া নদী বেয়ে তারপর পশ্চিম দিকে যাওয়ার জন্য সোনাখুলি মধ্যখুটি মারিতে থেমে পায়ে হেটে ফরেস্টে। ফরেস্ট পার হয়ে আবার জল ঢাকা 'পশ্চিমবাহিনী'—জলঢাকা পার হয়ে ক্ষেতের আলভেঙ্গে—তিস্তায় এসে পড়ল।

তাদের উদ্দেশ্য তিস্তা দর্শন না হলেও এটাও তো তাদের একটা বড়ো অভিযান। সেই জয়বীর পাড়া থেকে

গোড়ার হাড়ির ভাদই জোতদারের বাড়ী। মাঝে রেতি-বড়বাঁক-দুদুয়া-জলঢাকা তার আগে ফরেস্ট। ফরেস্ট পার হয়ে হাঁটা পথে তারপর তিস্তার পারের বাঁধে ওঠা। উঠতে গিয়ে বার কয়েক পা হরকে যাওয়া তারপর তিস্তা দর্শন। কিন্তু কী দেখল ঘাটোয়াল। একোন্ তিস্তা? একে দেখার জন্যই সে কি বেরিয়েছিল তিস্তা তাকে কী হতাশ করল? নানা কথা মনে আসতে পারে। তবে এই গাছ, লতা, গুল্ম নিয়েই তো সে জন্মেছে। তারও তো কোনো সঠিক পরিচয় নেই। 'সে নিজেই তো এই নিসর্গ।'

ওরা বাঁধ-বেয়ে বাঁধের ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে তিস্তা দেখছিল। লম্বা ঘাসে পা ডুবে, বা কাঁধে সোলংগা, জলে বাতাসে মাথায় চুল উড়ছে ঘাটোয়াল শুধু তাকিয়ে উত্তরে দক্ষিণে, কী দেখছে সেই জানে। এক সময় পাইকার তাকে জিজ্ঞাসা করে—'দেখিছো? তিস্তা'? সে যেন তার মতো সোলংগা কাঁধে আরও অনেককে দেখে। সেই ধুসর শূন্যতার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে জল খান কোটত? কোটত নামিবার নাগিবে। এইভাবে হতাশা, নিরাশা বা আশান্বিত হয়ে ঘাটোয়াল তিস্তা দর্শন সেরে তিস্তার ভেতর নামার জন্য পা বাড়ায়।

সম্ভবত এই প্রথম ঘাটোয়ালের পেছনে পাইকার। তিস্তার পরিচয় দিতেগিয়ে লেখক বলেন—"তিস্তা তো পৃথিবী!.....একখান আস্ত গোটা নদী উঠি আসি তোক ভাসি নিগিলা।' পরিচয় দিতে গিয়ে তিস্তার স্বরূপ জানা গেল। এরকম সোলংগা কাঁধে-পায়ে হেঁটে ওপারে জলপাইগুড়ি সদরেও গিয়ে ওঠা যায় অথবা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই এক নদী জল নিয়ে তিস্তা হাজির হতে পারে।

ঘাটোয়াল ও পাইকার বাঁধের পার বেয়ে নিচে নেমে উত্তর দিকে হাটতে থাকে, পথ খোঁজে পলি পাথর মেশানো মাটি ধরে কোথায় গিয়ে নদীতে নামবে। দেখতে পায় মরা জল, শ্যাওলা দিয়ে ঢাকা পরেই থলথলে কাদা, নামলে অনেকটা ডুবেও যেতে পারে এভাবে তারা নির্ণয় করতে পারে না কোথায় জল। 'পাইকার একটা জায়গা দেখিয়ে বলে—'এইঠে এইঠে এইঠে, ঘাটোয়াল সোলংগাখান ভাসাও কেনে।' সেই মরা সোঁতার জলটা সেখানে বাঁধের ঢালের তলা পর্যন্ত এসেছে। কাজেই এখানেই সোলংগা ভাসানো যায়। আর মূলজল কোথায় তাও ঠাওর করা যাচ্ছে না। থকথকে জলে সোলংগা ভাসিয়ে দেখা গেল সোলংগা নড়ে না, দাঁড়িয়েই আছে। পাড়ে দাঁড়িয়ে 'ঘাটোয়াল বলে, 'এইখান কি একখান ভাসিবার জল?' এতো পথ আসা তবে কেন? 'অ্যানং জলের তানে? কোটত তোমার জল আর কোটত তোমার সোঁতা?' এরপর আবার ঘাটোয়াল সোলংগা

ঘাড়ে তুলতে চায়। তবু একবার চেষ্টা। লগি দিয়ে ঠেলা। একটু নড়াচড়া মাত্র। পাইকারের বক্তব্য তিস্তা যাকে ভেতরে নিতে চাবে, সেই যাবে। না চাইলে নয়। চাইলে কোথা থেকে জল এসে ভাসিয়ে নেবে। পাইকার বলে 'তোঁহক পরীক্ষা নিঁছে, পরীক্ষা নিছে'। অপেক্ষা করে কোনো অলৌকিক ঘটনার। এমন ঘটনা তার জীবনে বহু ঘটবে। এতো পথ পার হয়েও 'পাইকার জানে না—এই ঘাটোয়াল মানুষ, নাকী মানুষ সেজে আছে।' তবে ' সে ঘাটোয়াল, মানষিই হোক, দেওই হোক, আর অপদেওই হোক—পাইকার তাকে পাক দেবে।

সোলংগা আবার সেই পথেই পিছু হঠতে থাকে- তবে কিছুটা পাতলা, হালকা জল মেলে, তাতে ওদের মনে হয় তাহলে এখানে হয়ত নতুন সোঁতা হয়তো শুরু হয়েছে। তারা যাওয়ার সময় এই সোঁতা কেন দেখেনি ভেবে পাচ্ছিল না। সুতরাং যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা ভাবে। পাইকার সামনে আরও একটি সোঁতা অনুমান করে। দ্বিধা ছেড়ে ওরা সোঁতায় পড়ে। এবং ক্রমশ জল বেশি হতে থাকে। 'ইতো এখান নদীই হবা ধরিছে', পাইকার সোজা হয়ে বসে।

ঘাটোয়ালও নদীর গন্ধ পায়। খান দশেক লগি মারতেই দেখে—'সামনে মেঘে কাল আকাশের সবটুকু জুড়ে ঘোলা এক স্রোত এত বেগে বইছে যেন স্থির।' ঘাটোয়াল বলে 'তিস্তা'। সেটা প্রশ্ন না আবিষ্কার বোঝা যায় না।

'সোলংগাটা তিস্তায় পড়ে। অনন্ত জলরাশি, তীব্র বেগ, ঘাটোয়াল এর আগে কখনও দেখেনি। সে লগি ছেড়ে বৈঠা হাতে নেয় সম্ভবত এই প্রথম। 'হে দেউনিয়া কোন পাখত তোমার জালপাইগুড়ি?' উত্তর আসে 'সিধা সিধা এইটে তুই আবার উতরোত যাবার চাছিস? তুই যেইলা পাড়ি দিবু, সেইলা জলপাইগুড়ি সদর বসিবে।' জলের বেগ, নদীর গভীরতা, সব সামলিয়ে এখন ঘাটোয়ালের গর্বিত চেহারা। তার বাবার তৈরি করা সোলংগাকে সে জল দিয়েছে। আরও দু'জন লোক বসালেও ২/৩ আঙুল উঁচুই থাকবে জল থেকে সোলংগা। ' বাপের ব্যাটা তো বাপের ব্যাটা।'

তিস্তার উপরের আকাশ সে এখন অন্য আকাশ, অনেক বড় আকাশ। অথৈ জলে ডুবতে ডুবতে ঘাটোয়াল ভাসার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সে বৈঠা হঠাৎ সোলংগায় ফেলে দিয়ে অন্ধকারকে বিদ্ধ করে, সোলংগা থমকে দাঁড়ায়। এমন তীব্র স্রোতে মাঝ নদীতে এমন ভাবে জাদুমন্ত্রের মত সোলংগা থামিয়ে দেওয়াকে পাইকার এক অসম্ভব অলৌকিক কাজ বলে মনে করে। এর আগেও বার কয়েক এই নাইয়া বা ঘাটোয়ালকে সে 'দ্যাও,

হবা পারে' বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এখন যেন সেটাই সত্যি প্রমাণিত হল। মাঝ নদীতে তাকে মারার কৌশল কিনা। ' এ কুখনো মানষি হবা না পারে।' ভয়ে সে ' ঘাটোয়াল মোক ছাড়ি দে' বলে বার বার মিনতি করে।

আসলে সোলংগা থামার কারণ সামনে একটা কাশিয়ার চর। চরের প্রস্তুতি জলের তলায় আগে থেকেই। সেই কাশিয়া বাড়ির শুকনো ডাঙ্গা চরে দু'পাশে নদী দু'ভাগ হয়ে গেছে। পাইকার এতো জানে, তবু এ ভ্রম তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে— এ কেমন হলো— এও ছল কিনা। ' এক তিস্তার দুই তিস্তা হয়ে যাওয়া, সেই কাশিয়াবাড়ি, সমস্তটা সে দেখে। তাতে তার আতঙ্ক বেড়ে যায়। তিস্তায় সবকিছু ঘটতে পারে।' এমন মনে হয়। তারপর দু'জনে কথোপকথনে পাইকারের সন্দেহ আরও বারে, ' তোক চিনিবার পাছি না। মোক এই কাশিয়া বাড়িত ছাড়িদে।' বলে অনুরোধ জানায়।

লগির খোঁচায় সোলংগা চরে গিয়ে থামে। পাইকার তড়িঘড়ি নেমে যায়। উল্টো খোঁচায় সোলংগা নদীর স্রোতে পড়ে। ঘাটোয়াল বৈঠা হাতে নেয় ' তিস্তার অন্ধকার স্রোতকে প্রতিহত করতে করতে সে শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলে ' মোক তো নদী খান খুঁজিবার নাগিবে। পুরান পুরুষ ভগীরথ যেমন এককালে নদী খুঁজতে বেড়িয়ে ছিল সেরকম।

এই ঘাটোয়ালের গল্প এ জন্মের, না পরজন্ম থেকে নেওয়া বলা বেশ জটিল। কারণ গল্প সবসময় সময় মেনে চলে এমন তো নয়। কারণ গল্পের উৎস জীবন, আর জীবন নানা সময়ে নানা অবস্থার মধ্যে বহমান। সেই বহমানতায় কখনও অতীত হয় বর্তমান, কখনও বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পুরনো গল্পও—গল্পটা বলা হয় যতবার আর যতবার শোনা হয় ততবার এই রকম একটা করে বাচ্চা বেরয়। সময় হলেই ভেতরে জমে থাকা গল্প বেরিয়ে আসে, সে যত অতীতের হোক বা ভবিষ্যতের হোক। বর্তমানে সে বক্তা ও শ্রোতার কাছে নিজের মত করে রূপ নেয়।

এখানে নতুন সোলংগার গাছ খোঁজার গল্প বলতে গিয়ে পুরনো সোলংগার নদী খোঁজার গল্প শুরু হয়ে যায়। তবে শেষ হল না। ' সময় হয় তোমার দরকার মত একটা হিসেব।' ..... " সময় মানে কোন মাপ নয়, অন্ততঃ বুড়িমার এই গাঁওটায়, সাত গোতের এই ভিটায়, দশ নদী বিশ নদীর এই দেশে ছয় হাট দুই ঝারের এই পৃথিবীতে। সময় মানে তুমি মাটির তলায় কী গেড়ে রেখেছ তার জন্য অপেক্ষা।" ' যে গল্পে এ জন্ম পরজন্ম সব একাকার হয়ে যায় সে সব গল্পে সময়ের কোন পরম্পরা থাকে না, যেন একের পরে দুই সব সময়

আসে না, যেন সব বছর জেঠাইয়ের পর আষোঢ় আসে না যেন, গরমের পর বৃষ্টি হবেই এমন কথা নেই। আবার কোন কোন গল্প একের পীঠে দুই করে ক্রম অনুসরণে আসে যেমন 'একটা থ্যাম থ্যামা মানষির একখানা হটকোটিয়া বউ ছিল।'..... 'এমন গল্পে তো সবই টাইমের হিশেব দিয়ে।' 'ঘাটোয়ালের গল্পে তো আর তা নয়। সে গল্পে ঘাটোয়ালের ঘাটোয়াল হতেই একজন্ম চলে গেল। একদিন ঘাটোয়াল তার সোলংগা ফেসে নদীতে ডুবে গেল আর সে সাঁতার দিয়ে পারে উঠে গেল। সোলংগা ফেসে যাওয়ার পর ঘাটোয়ালের আর এক জন্ম তো শেষ হলো, গাছের দিকে কী করে তাকাতে হয় সেটা নিজে নিজে শিখে নিতে।' এ শেখা সে প্রকৃতির মধ্য থেকে পশু পাখির জীবনাচরণ থেকে শিখে নিয়েছে। এতো রকমের গাছপালা পাতা দেখে সে— এক সময় পাতার স্তুপের মধ্যেই শুয়ে পড়ে। তারপর হাটে। দেখতে পায় এক পাতার ঘর। তার ভেতর তার চেয়েও দুই বুড়াবুড়ি। সেই ঘরে পাতার ওপর সেও ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না — খিদের জন্য। বুড়িকে জিজ্ঞাসা করে — খাওয়ার কিছু আছে কিনা। বুড়োবুড়ি জেগে ওঠে। এখন আর তারা তেমন বুড়োবুড়ি নয়। ওরা ওকসি পাতার স্তুপ সরিয়ে দুটো মাথোয়াল বের করে —মাথায় দেয়। তারপর একে একে দু'জনেই চাল ফুঁড়ে উড়ে যায়। ঘাটোয়াল মাথোয়ালটা নিয়ে নাড়া চারা শুরু করে। ওর গঠন কোন দিকে চাপা, কোন দিকে লম্বা দেখতে থাকে। কিন্তু মাথায় দেয় না। এক সময় কি খেয়ালে মাথায় দিতেই সেও উড়ে যায় রাজবাড়ি। থরে থরে খাবার সাজানো—পানীয় সাজানো। ঘাটোয়াল সেই খাবার তছনছ করে, পানীয় পান করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকে। তারপর একটা আওয়াজ শুনতে পায়। আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসে। তাকে ঘিরে ধরে কিছু লোক - লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। হঠাৎ শোনে 'উমাক গাছে বান্ধি পুড়ি মার।' অমনি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ' গাছত বান্ধিবার জন্য'। যারা নিয়ে যাচ্ছিল তাদের এক দেউনিয়া বলে বসে -' অ্যানং গাছত বান্ধি আগুন দিবার নাগিবে— যেইলা গাছঠে ছাই উড়ি রাজা মশাইয়ের চখুত তো না ঢুকে,..... কানত না যায়।' সে রকম গাছ একটা পাওয়া গেল, একটা শুকনো শিমুল গাছ। ঘাটোয়ালের বড় আপশোস হয় কেন আগে একে সে দেখেনি। এর ভেতর সে স্পষ্ট একখানা সোলংগা দেখতে পায়। বাতাসের গতি দেখে ওরা চিৎকার করে ওঠে— ' এইঠে এইঠে শিমুল গাছত বান্ধো।' বাধা হয় তাকে। জিজ্ঞাসা করা হয় তার অন্তিম ইচ্ছা কী? সে বলে ' মুই মাথোয়াল খান দিয়া মরিম' তাই দেওয়া হয়। যেমনি আগুন দিতে যাবে অমনি গাছ শুদ্ধু সে শূণ্যে উড়ে যায়। এবং তার নিজের বাড়িতে বউয়ের সামনে এসে নামে। বউ জিজ্ঞাসা করে ' কোটত আসিলেন? শিমুল গাছ নিয়া?'

পরজন্ম 'থিকা'। বাঁধন খোল।' 'এই পুরো গল্পটাই পূর্বজন্ম, ইহজন্ম, পরজন্ম যাতায়াতের গল্প হতে থাকবে'। পুরাণ পুরুষ ঘাটোয়ালের গল্প শেষ হয়ে যায়।

আরম্ভ

বুড়িমার গোতে তার ছেলে পুলে গোনা সম্ভব নয়। এখন বুড়িমার গোতের হিসেব দেওয়ার লোকও নেই। বুড়িমা নিজেও সে হিসেব দিতে পারে না। 'এখন তো বুড়িমার কত জন্ম বাঁচা চলছে তারই কোন হিশেব নেই — সে হিশেব কেউ খোঁজে না। সে হিশেব খুঁজতে পারে এমন লোকজনও নেই।' ' বুড়িমা তেমন করে বাঁচে, একটা গোটা ফরেস্টের মত, তার একার বাঁচার মধ্যে কত জন্ম মৃত্যু মিলে গেছে।'

এখানে বুড়িমাকে যত বয়সী গোত্রমাতা হিসাবে দেখানো হচ্ছে - বাস্তবে সন তারিখের হিসেবে কিন্তু তা মনে হয় না। ' জলপাইগুড়ির সেই বড় বানার পরের ভোটের পরে একবার আর তারও বছর দশ পরে একবার কতমন্ত্রী, হাকিম, নেতা, গিরি পঞ্চায়েত এসে এই একটা কথাই দুই দুইবার জিজ্ঞেস করেছিল। বুড়িমাকে, বুড়িমার বয়স তো এখন অন্ততঃ আরও বিশ তিরিশ বছর কম হওয়ার কথা, তখনই এই জিজ্ঞাসার কোন তল পায়নি — তোমার ছেলে মেয়ে কটি। তাদের নাম কী কী' ?

মোটামুটি শতবর্ষের বয়সের হিসেবে বুড়িমার সাত গোত। তাতেই বুড়ি বাস্তব বর্হিভূত কাহিনি—বানা ঝুলে থাকার কথা বলতে পারে, না দেখেই তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়ার খবর দিতে পারে। এই অলৌকিকত্ব আরোপ করার কারণ কী?

বুড়িমার বয়স আসলে হিসেব কষে যে বলা যাবে না তা নয় — কিন্তু লেখক সে ভাবে এ হিসেব কষতে চান না। নারী তার মা হওয়ার ক্ষমতা দিয়ে যে গোত সৃষ্টি করেন - সেই ক্ষমতার মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি সাধারণ গণনার মধ্যে একে আনতে চান না। নারীর একক শক্তি যা পুরুষের নেই, যিনি একটা শরীরের ভেতর আর একটা শরীর ধারণ করতে পারেন — তিনি কেন পারবেন না - বানা ঝোলার কথা বলতে, কেন পারবেন না তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়ার কথা বলতে। বরং আরও কতো অজানা কথা তার জানার কথা। সে জন্য বুড়িমা গোত্রমাতা - এদিকে বাস্তবের হিসাব দিয়েও তার বয়স নির্ণয় করা যায়। তার গোত্রের নরনারীর হিসেব করা যায়। আবার অন্য দিকে - তার মাতৃত্ব অলৌকিকতার মধ্যেও ' যাক কহিছেন পরের বেটা/ উমায় মোর জাতের খোঁটা।'— এই সর্বজনীনতায় আসা যায়।

বা 'এই বেটাখান মোর, ঐ বেটাখার তোর / সব বেটারই একোখান পেটের ভিতর ঘর'। বা 'সন্তান গুনেন

সাধু, সন্তান না গুনেন / গুনিবার চাহেন যদি আমাসুর তারা গুনেন'। বা 'মোর কপালের গুনে মুই হছি বেটি ছোয়া / না হইলে কোটত পাইতাম অ্যানং ছোয়াপোয়া'। এই কথা গুলির মধ্যে 'লৌকিক , বাস্তব ও সম্ভাব্য সেই জগতে নারীর শারীরিক স্বাতন্ত্র্যের গৌরবের কথা আছে।' '.....পুরুষের দ্বারা অধিকৃত হয়ে নারী সন্তান ধারণ করে না। নারী সন্তান ধারণের ক্ষমতাকে ব্যবহারের জন্যই পুরুষকে অধিকার করে।' বুড়িমা সেই মহত্বের অধিকারী। তাই তার গোতের হিসাব করতে পারলেও করা ঠিক নয়। 'যে সব প্রশ্নের জবাব না থাকাটা অস্বাভাবিক সেই সব প্রশ্নেরই কোন জবাব না দেয়া, জন্মভর না দেয়া, তারপর জবাব না দিয়েই জন্মান্তরে চলে গিয়ে বাঁচা - এ এক অসম্ভব প্রতিবাদের কাজ। এই প্রতিবাদ থেকেই বুড়িমার গোতের, সাতগোত, সাতগাঁও তৈরি হয়েছে।'

'তেমনি বুড়িমার ছোয়াছোট গোনা যাবে কী করে?'

কারণ - ১) তাদের পরস্পর চেনাই নেই। ২) থাকলেও চিনতে পারত না - কারণ ততদিনে ঢক বদলে গেছে।

এক চেনা যায় নাম দিয়ে —

ক) মাসের নাম দিয়ে — আষাঢু, বৈশাখু

খ) ঋতুর নাম দিয়ে — শীতেশ্বর

গ) ঋতু বৈশিষ্ট্যের নাম দিয়ে — বাতাসু, বানুয়া, ঝড়ু

ঘ) স্বভাব দিয়ে — কান্দুরা

ঙ) কাজ দিয়ে — বাঘারু

চ) বারের নাম দিয়ে — বুধারু

ছ) প্রাকৃতিক অবস্থা — আন্ধারু, জোনাকু

জ) পশুপাখির নামে — চিলা, কাউয়া

এসব কতবার আর প্রয়োগ করা যায়। বড় সোমারু বা ছোট কান্দুরা, এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে রাজবংশী সমাজের নামকরণের পদ্ধতি গুলি বলা হল। বলা হল জীবন যাপনের নানা কৃৎ কৌশলের কথাও। বুড়িমার বাঁচা যেন ফরেস্টের মতো করে বাঁচা বলতে গিয়ে গাছের জন্ম, বাড়া, মৃত্যু, ফুলফল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে —

বুড়িমার আর পাঁচজনের মত এই গোতে বৌ হয়ে আসার পর এই সংসারের খাশজমি, আধিয়ারীর রেকর্ড

লেভি — " ধান রোয়া, ধান বাছা ..... এই সব রোজকার হাজারটা কাজের পরিচয় পাওয়া গেল। এরই মধ্যে বুড়িমা কতবার জন্ম দিয়েছে — তার হিসেবটা কি রাখার মতো জিনিস।

১৯৬৮ সালের বড়বানার জল শুকোতে শুকোতে, যে পলি পড়ে ছিল সে পলি শুকোনোর আগেই — অর্থাৎ বন্যার চিহ্ন মুছে যাওয়ার আগেই ১৯৬৯ সালে একটা ভোট হয়েছিল। ভোটের আগে পরে খাশজমির দখল নিয়ে একটা আওয়াজ উঠেছিল। সে আওয়াজ দশনদী, বিশনদী আর ছয় হাট ভেদ করে বুড়িমার গোতে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাতেই বোঝা যায় — আওয়াজ কত শক্তিশালী।

যে বুড়িমার এই সাতগোতের ভেতরে আছে সে নানা ভাবে বাইরে আসতে পারে, কিন্তু যে বাইরে আছে, তার পদে পদে ভুল হতে পারে। সে অন্যপথ ধরতে পারে। যখন দেখল আর পৌঁছানো গেল না, তখন তাকে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে।

' এই 'বুড়িমার গোত' 'সাতগোত' এর কোন সম্মুখ নেই, শুধু পেছন আছে।' জলঢাকা নদীর পুবপার থেকে পুবের বীরপাড়ার আগের রেল লাইন পর্যন্ত ঘনবিস্তৃত ফরেস্ট। তাহলে কি বলা যায় বুড়িমার সাতগোত এই ফরেস্টের ভেতর একটা গ্রাম? একটা গাঁও মানে তো টাড়ি বাড়ি, এগিনা, হাঁস, গাই, চুয়াবাড়ি, নিজেদের গাছ, মাপ মত রোদ। এই ফরেস্টের ভেতর এমন সুবিধে কোথায়। এখানে একটা দুটো 'বেটাছোয়া', 'বেটিছোয়া' থাকতে পারে। ঘর না বানিয়েও থাকতে পারে। তাহলে বুড়িমার গোতের প্রকৃত ঠিকানা 'দক্ষিণে শিসতলির হাট, উত্তরে ডুবরিবন্দর হাটের কোনাকুনি যাওয়ার পথে ফরেস্টের ভিতর বুড়িমার গোত।' ..... ফরেস্টের ভিতরে না ফরেস্টের পিছনে।'

সামনের ক্ষেতটার ওপর চোখ বোলালে আন্দাজ করা যায় — ক্ষেতবাড়িটা আছে বলেই এখানে বুড়িমার গোত আছে। তবে ' সে ক্ষেতবাড়ি এতই ছড়িয়ে থাকে যেন এই ফরেস্টের পেছনে, সেই ফরেস্টেরও পেছনে। আবার এই নদীরও পেছনে, ঐ নদীরও পেছনে, সেই নদীরও পেছনে।'

এতো পেছনে কোন আওয়াজ পৌঁছতে গেলে টাড়ি-বাড়ি, বন কত কিছু ভেদ করে তবে পৌঁছতে হয়। তবে সরকারের যদি কোন আইন হয়, তাহলে লোকমুখে, এ হাট ও হাট করে জানাজানি হয়ে যায়। কিছু লোক তো এমন ভকভকিয়ে থাকে যে এসব কথা শোনার জন্য ও বলার জন্যও হাটে যায়।

৬৮-র বড় বানার পরের আওয়াজটা হাট থেকে কেউ শুনে আসেনি। বুড়িমার গোতে আসবে বলেই রওনা দিয়ে ছিল ৬৮-র আগেই। লেভি নিয়ে।

ঐ পাহাড়টা পুরনো, ঐ নদীটা পুরনো এসব কথা যারা বলে তারা কখনও নদী-পাহাড় দেখেনি। এসব কথা বাবুদের। দেশি মানুষেরা এ স্বরে কথা বলে না। কারণ যে নদীটাকে নতুন দেখা যাচ্ছে সেই নদীটাই মাইল মাইল উজানে বা ভাটিতে বয়ে গেছে। ফরেষ্টও তাই। পাহাড়, ফরেষ্ট নদী এসব পুরনো হয় না। এসব নতুনও হয় না।

একসঙ্গে সাত আট মানবজন্ম বয়সী হাতির পাল ভূটান থেকে নেমে আসে প্রতিবছর। এই হাতিরাও কি এসে বলতে পারে এই পাহাড়, এই ফরেষ্ট নতুন? এমন কথা বলা যায় না। বড় জোর বলা হয় আমি গাছটাকে আজ নতুন দেখলাম। কিংবা নদীতে আজ আমি নতুন ভিজলাম। তাও কী বলা যায়। আর বলা বলিরই বা কী অত।

বুড়িমা আছে, বুড়িমার গোত আছে, ক্ষেতবাড়ি আছে, বাইরের আওয়াজ চলে আসার জন্যই বুড়িমার ক্ষেতবাড়িতে কত রকমের ক্ষেতবাড়ি আছে। গোতের জংলু, ঢেপা, বড় মুতুরারা, কিছুই জানে না। কিন্তু ক্ষেত বাড়ি সারা বছরই নানা ফসলে ভরা থাকে।

তিনবর্ষা বৃষ্টি নেই। বুড়িমার গোত খরার পাকে পড়ে থাকে। গোতের লোকেরা অভ্যাস মত বৃষ্টিতে রোয়া লাগানো, নিড়ানির সময় ক্ষেত নিড়ানো করতে পারছে না। ধানের শিসে দুধ আসে না। ধানহীন ধানগাছ গুলো ক্ষেতভরা আগুনের শিখার মত কাঁপতে থাকে।

তাও বুড়িমার গোত গোলা থেকে জমানো ধান পেড়ে — আধিয়ারদের সেই ধান দিয়ে আসে খাবার জন্য। নিজেরাও খাও। বেচতে পারে না, এই ভেবে যদি পরের বছর আবার খরা হয়।

পরের ফাল্গুনে আবার চাষ শুরু করে। না করে উপায় কী। আকাশের জল আর মাটির নিচের জলের আশায় যাদের চাষবাস, তাদের সে আশা না করে উপায় কী? সেবার বড় বানার আগের বছর ফাল্গুনের মাঝামাঝি দিন দুই ঝির ঝিরে বৃষ্টি হল। তা দেখে কোন কোন বৌ আপন মনে ছড়া কেটে বলে — 'সেই আসাই আসিলু মেঘ, অ্যালায় ব্যাঙ পাম কোটত?' বৃষ্টিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ভাদইয়ের বিছন ছিটানো গেল না। জল আটকানোর জন্য আল বাঁধা হয়েছিল, তা সে ভাবেই পড়ে রইল। ততদিনে হালুয়ারা বুঝে গেছে যে তারা খরার পাকে পড়েছে। সেই খরার দ্বিতীয় বছরে বুড়িমার বাড়িতে তিন পুরুষ পরে যে সোমারীর জন্ম হলে যে তার আবো হবে, সেই পাথারনীর একখান মেয়ে হয়েছিল। কী লজ্জা, কী লজ্জা। দু-দুটো বছর এই বাড়িতে কোন বাচ্চা জন্মায়নি। ক্ষেত বাড়ির দিকে তাকালে মনে হয়.এ মাটিতে ঘাসও গজায় না। শুধু বড়বাঁকের দুই

পারের কিছু জমিতে ধান হয়েছিল যা দেখতে লোকেরা ভিড় জমিয়েছিল। সেই বছরেই সরকার আওয়াজ দিল ' সকলকে লেভির ধান সরকারকে দিতে হবে।'

'লেভির আওয়াজ প্রথম নিয়ে এসেছিল মাগুর মারির ঝারের এক বুধবারের ময়নাতলির হাট থেকে বড়চিলা। ..... পরে যে কান্টীর শ্বশুর হল বড়চিলা, অগুনের বেটা।' - 'হাটে শুনে এসেছে এবার থেকে লেভির ধান দিতে হবে।' তার বাপকে জিজ্ঞাসা করল ' কায় কহিল'। উত্তরে বড়চিলা হাটে ছোটু মিঞার কথা বলে। এবং তাকে দেউনিয়া বলে সম্বোধন করে এও বলে যে তারা লেভি দেবে কিনা।

হুঁকোর টানে আলোচনা চলতে চলতেই — সন্ধ্যায় ভাতের আয়োজন হয়। এটাই এদের আসল খাওয়া— 'সকালের খোয়া খোকসা ভাত / দুপুরের খোয়া মুড়ি / বিকেলের খোয়া চা আর চুড়া- / সনঝার খোয়া ভারী।'

শুরুতে এই লেভির আওয়াজটা এমন উঠল যেন সকাল বেলা উঠে দেখা গেল ভূটান পাহাড় আর নেই।' কয়েকটা খরার পর ধানশূন্য চাষীদের লেভি দিতে হবে — এই সরকারি আদেশ যেন হঠাৎ ভুটান পাহাড় উধাও হয়ে যাবার মত অবাস্তব, অসম্ভব এবং অভাবনীয় ব্যাপার। আর ভুটান পাহাড়হীন এই অঞ্চলের মানুষের থাকে কি? থাকে না দিক— পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। থাকে না নদী,নালা, জল, বৃষ্টি। থাকে না ক্ষেতখামার— সব শূন্য হয়ে যায়।

গরম ভাত-প্যালকা শাক সহযোগে খেতে খেতে, থালার দিকে তাকিয়ে অগুন বলে ' কায় কুছু শুনিছেন লেভির বাদে' ? কেউ উত্তর দেয় না। কারণ এখনও উত্তর দেওয়ার মত কথার ফাঁক তৈরি হয়নি। কথাটা ঝুলেই থাকে। একটু পরে দোলান বলে যে ময়নাতলির হাটে বড়চিলাকে এ সম্পর্কে ছোটু মিঞা কিছু বলেছে কিনা। গলার স্বরেই বোঝা গেল দোলান অগুনের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেনি। সবার শোনার জন্যও বলেনি। আধবসা কানকাটু এদের মধ্যে বড়। তার এখন বসে যাওয়ার বয়স। তাই তার উপস্থিতিতে একটি সম্মতি তৈরি করার জন্য দোলানের এই উক্তি।

অগুন এতক্ষণ তার ঝোলা কথার খেই ধরে বলে যে ময়নাতলির হাটে যে বড়চিলা গিয়েছিল, সেখানে ছোটুমিঞা তাকে লেভির ব্যাপারে কি করণীয় জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। কথাটা পরিস্কার হতে থাকে, লেভির ব্যাপারে এর চেয়ে আর কেউ বেশি কিছু জানে না।

ধানরাম জিজ্ঞাসা করে লেভির জন্য কি করতে হবে। উত্তরে অগুন বলে — 'ধান দিবার লাগিবে।' ' কাক

দিবার লাগিবে'? অগুন ভাত ভরা মুখে বলে ' সরকারক'।

এভাবে লেভির কথা আলোচনা করে ওদের খাওয়া শেষ হয়। দুখারু হুঁকো সাজায়। হুঁকো খেতে খেতে লেভির ব্যাপারে আরও তথ্য জানার জন্য কাকে খোঁজ করতে পাঠানো হবে সে কথাও ওঠে। এরই মধ্যে আরও একপ্রস্থ ছিলিম খাওয়া চলে। দোলান বলে কাল তো বৃহস্পতিবার শিসতলির বড়হাটে গেলে হয় না। বিসারু বলে শিসতলিতে টাকু পাইকারকে ধরতে গেলে একটু সকাল সকাল যেতে হবে। ধানরাম নিজে যাবে বলে সিদ্ধান্ত করে। টাকু পাইকার তিরিশ বছর পর জয়বীর পাড়ায় যে মৈজুদ্দিন বা মৈনুদ্দিন সোলংগার চেপে ছিল তার বাবা। একই সঙ্গে হাট আর টাকু পাইকারের সঙ্গে কথা বলা দুটোই সেরে আসবে বলে ধানরাম হাটে যায়। না হলে দিনটা শুধু শুধু হাটে যাওয়ার জন্য নষ্ট করবে কেন?

অগুনের ধাপগঞ্জে বিয়ে হওয়া দিদি যে চলে এসে বুড়িমার বাড়িতে এক ঢেমনা ধরেছিল তার ছেলে ছোটদাদা। সে বলে ' শনিবার তো ধূপগুড়ির হাট'— তবে দেরি কেন, যদি বলে তবে ছোটদাদা কালই ধূপগুড়ি ব্লক অফিসে যেতে রাজি।

যাওয়ার সময় যে কথাটা উঠেছিল এতোক্ষণ ধরে সেটাই চলল। তবে যাতে খবর জানতে ব্লক অফিসে যেতে না হয়— সেই চেষ্টাই ছিল সবার মধ্যে। কিন্তু ছোটদাদা নিজেই এ প্রসঙ্গ তোলায় সবাই রাজিই হয়ে গেল। কারণ ব্লক অফিস থেকেই তো প্রকৃত খবরটা পাওয়া যাবে। আর তাদের দায়ও থাকবে না। ছোটদাদাকে এবাড়ির লোক বলে আর কে না চেনে। তাই বিসারু বলে - ' যা কেনে কাল শুনি আয়।'

ধানরাম যাবে জয়বীর পাড়া চা বাগানের পাশে টাকু পাইকারের কাছে, বাঙ্কুরাম যাবে শিসতলির হাটে আর ছোটদাদা যাবে ধূপগুড়ি ব্লক অফিসে। বড় চিলার বড় ছেলে বড় মুতুরা এখন যার নাম খেতুয়া আবার মাঘুর ছেলের নামও খেতুয়া। ক্ষেতে কাজ করতে করতে এদের মায়েদের প্রসব বেদনা উঠেছিল বলে এই নাম।

অগুনের বউ নদিনী আর মাঘুর বউ ঝাটকি দু'জনেরই প্রসব বেদনা উঠেছিল ক্ষেতবাড়িতে। পাশাপাশি কেউ ছিল না নদিনীর। প্রসব ব্যথাটা আসা যাওয়া করছিল। কিন্তু পরে এমন মোচড় দিয়ে ওঠে যে - ক্ষেতবাড়িতেই বাচ্চা হয়ে যায়। গরুর গাড়ি করে নদিনীকে বাড়ি আনা হয়। বাচ্চা যদি গাড়ির ঝাকুনিতে পড়ে যায় সে জন্য মার সঙ্গে দেওয়া হয় না। সেই বাচ্চার নাম খেতুয়া না হয়ে পারে।

মাঘুর বউ ঝাটকির প্রসব বেদনা উঠেছিল এক মাঘ মাসের শেষে, ধান কাটার সময়। ঝাটকি কাটা ধান গাছ গুছি করছিল। ব্যাথা অনুভব করতেই ঝাটকি কতোরানীকে সঙ্গে করে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। পথে আলে

বসে পড়ে। কতোরানীর চেচামেচিতে ঝাটকিকে গরুর গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। সোন্দনি প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়িতে আসে। ঝাটকির বাচ্চার নামও রাখা হয় খেতুয়া। তবে দুই খেতুয়াকে বোঝবার জন্য একজনের নাম হয় হালুয়া খেতুয়া বা মাঘুর খেতুয়া, কাদারু খেতুয়া বা অগুনের খেতুয়া। এই খেতুয়ারাও এক সময় মাতব্বর হবে।

ছোটদাদা যেহেতু বুড়িমার গোতের সরাসরি কেউ নয়, তাই একটু আড়ালে থেকে লেভির খবরটা জানতে সুবিধা হবে বলে তাকে ব্লক অফিসে যেতে বলা হলো। ছোটদাদা গামছাটা পরে উপরে একটা শার্ট পরে নেয়। তারপর এগোয় ন্যাশনাল হাইওয়ে এক কুড়ি এগারোর দিকে।

ব্লক অফিসের কাছাকাছি আসতেই ছোটদাদার গতি কমে যায়। ব্লক অফিসের চারদিকে যে প্রাচীর তার একদিকের দেয়ালে রংচংয়ে ছবি আঁকা দেখতে পায়। ছবিটি একটা বেটাছোয়া, একটা বেটিছোয়া আর একটা একটা করে দুটো ছেলে মেয়ে। এ ছবির অর্থ বোঝে ছোট দাদা। বেশি বাচ্চা কাচ্চা না করার ছবি।

বুড়িমার গাঁও থেকে এতো গুলো নদী, খুঁটিমারি, জঙ্গল, বড়পাকা রাস্তা, যে নিশ্চয়তা নিয়ে হেঁটে এসেছিল ব্লক অফিসের সামনে এসে যেন দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। ' এটা জীবনযাপনের প্রধান ধাক্কা যেখানে ছড়িয়ে পড়ে সেই কোর্ট কাছারি, হাকিম, টাকিমের সামনে সেই কৃষকের দ্বিধার জন্য হতে পারে। হয়তো সারা জীবন অনিশ্চয়তার জীবন কাটে বলে সরাসরি কারো মুখোমুখি হওয়ার অনভ্যাস হেতু হতে পারে ' ছোটদাদা বাঁ হাতের মুঠোতে তার নাকের ডগা থেকে থুতনি পর্যন্ত ঢেকে , ডান হাতটা একটু বেশি দুলিয়ে মাথাটা নিচু করে।, গেট দিয়ে ব্লক অফিসে ঢোকে। তার ভঙ্গির মধ্যে সামান্য ছলনা ছিল— যেন সে সব চেনে।'

সে চারদিক ভালো করে দেখে নেয়। ব্লক অফিসের বড় মাঠটার দেয়াল ঘেঁষে দুটো ছাউনি। সে দ্বিতীয়টাতে গিয়ে বসে। তার পাশে বসা একটি লোক জিজ্ঞাসা করে কী, লেভির খোঁজে? ছোটদাদা উত্তর দেয় না। ফের জিজ্ঞাসা করে বাড়ির ঠিকানা। ছোটদাদা ' হু পাকে' বলেই ছেড়ে দেয়। ছোটদাদা ঠিক করে নিয়েছে বুড়িমার গোতের কারও নাম বলবে না। লোকটাও বুঝে যায় লোকটার মতিগতি। এবার সে গিরির নাম জিজ্ঞাসা করে। ছোটদাদা উত্তর দেয় টাউনের গিরি, উকিলবাবু। অমনি লোকটা নিজের নোটবই খুলে পাতার পর পাতা উল্টে জিজ্ঞাসা করে ভট্টাচার্য? নিজের মনেই বলে 'ভট্টাচার্য তো উকিল না'। এবার লোকটি ছোটদাদাকে তার হাটের নাম জিজ্ঞাসা করে। ছোটদাদাও বোঝে লোকটা তাকে গেঁথে ফেলছে। উদাস সুরে বলে ' কতলা হাট', ডুবরিবন্দর হাট, জটেশ্বর হাট, খুঁটিমারি হাট, — লোকটির কথায় আরও উঠে আসে জটেশ্বর মাদারি হাটের

কথা। লোকটা বুঝতে পেরেছে লোকটা কোন হদিশ দেবে না।

ছোটদাদা এবার সরাসরি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে ' লেভির তানে কী আইন হছে। কী নুটিশ হছে। লোকটি ছোটদাদাকে বলে যে তার গিরি টাউনের উকিল, সে জানে না লেভির খবর? ছোটদাদা বেকায়দায় পড়ে। ছোটদাদা বুঝে যায় - সে ধরা পড়ে গেছে। লোকটিও বুঝে যায় - ছোটদাদার নিজেকে আড়াল করার চেষ্টার কথা। লোকটি ছোটদাদাকে 'চা'খাইয়ে বিদেয় নেয়।

' ঐ বৃহস্পতিবার রাত্রি খাওয়ার সময়' ..... তিন জনের কাছ থেকে কী খবর এলো জানার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সে জন্য একটা প্রস্তুতিও চাই। সবার আগে ফিরেছে ধানরাম, তারপর ছোটদাদা, তারপর বাঙ্কুরাম। বাঙ্কুরাম ফেরার আগেই সন্ধ্যাবেলা চ্যাংড়া প্যাংড়রা চটকাগান শুরু করেছে। — 'মুই না শোনং না শোনং, তোর বৈদেশিয়ার কথা রে.....।' বাঙ্কুরাম বাইরে থেকে নেশা করে এসে মোড়গের ডাক দিচ্ছে। ' তোর তো আবার ভাত খোয়ার বাদে আঙুল খোয়া নাগিবে।' দোলান ধনরামকে এরকম একটা কথা বলায় সেই সূত্রেই সে এতোক্ষণে বলার সুযোগ পায় যে ' সগাকই আঙুল খোবার লাগিবে।' ..... গোলাঘরত ধান যা আছে সরকার আসি নিযাবে। টাকু পাইকার কহিল।'

বাঙ্কুরাম বিড়িতে টান দিতে দিতে বলল 'এইঠে লেভির তানে পাট্টি ফাট্টির বেপার আছে।'—'কংগ্রেস-কমুনিস'—অর্থাৎ লেভির ধান যাতে দিতে না হয় সেজন্য পার্টির লোকেরা প্রচার শুরু করেছে। বলা যায় এটা 'লেভির পার্টি'। বাঙ্কুরামকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে কোনো পার্টি ধরেছে কিনা। বাঙ্কুরাম আশ্বস্ত করে 'মুই ধরো নাই।' বাঙ্কুরামের পার্টির কথা, ধানরামের টাকু পাইকার ও বান গড়ানি হাটের কথা ও ছোট দাদার ধূপগুড়ি ব্লকের সেই মুহুরির কথা একত্রে কেমন যেন জটিল হয়ে যায়। আলোচনায় বেরিয়ে আসে কোনো পার্টি রিটার্ন দেবে, লেভি দেবে না, কোনো পার্টি রিটার্নও নয়, লেভিও নয়। আবার প্রশ্নও ওঠে তাহলে কি সব পার্টি এক হয়ে এ আন্দোলন করছে। না তা নয়, জোতদার মানষিগিলা কংগ্রেস ছেড়ে বাংলা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। কানকাটু বলে 'যতো ভাটিত যাবু তত কেচাল'।

এর মধ্যে এ নিয়ে ধূপগুড়ি হাটত মিটিং। ছোটদাদা বলে 'মুই, বড় চিলা, কলিন গি শুনি আসি'। সবাই বোধ হয় এ রকমই একটা ভাবছিল। আসলে বানা খরার দুর্যোগে পড়ে, পরিচিত বা অভ্যস্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার এদের সাহস আছে। কিন্তু লেভির মতো একটি অপরিচিত আইনী ব্যবস্থা কীভাবে সামলাবে তার কোন হদিশ এরা খুঁজে পায় না। তাই সবাই চুপচাপ ভাবে।

হঠাৎ বিসারু বলে— কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। সরকারের নোটিশ এলে ব্লকে গিয়ে কথা বলা যাবে। তবে শলাপরামর্শ করে ঠিক হয় - মিটিং এ যাওয়াই ভালো। কারণ ওখানে দশ দিকের দশজন আসবে একটা উপায় বের হবে লেভি নিয়ে।

হাটে যাওয়ার একটা নেশা তৈরি হয় গাঁয়ের মানুষের মধ্যে। কারণ হাটই এমন স্থান যেখানে লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়, আলাপ হয়, ছেলে মেয়ের বর বা কনের সন্ধান করা হয়, ভিন্‌গায়ের আত্মীয়স্বজনের খোঁজ খবর করা যায়।

এই হাটে কে না যায়, বড়োরা, বেটিছোয়ারা, ছোট ছেলে মেয়েরা, চ্যাংড়াপ্যাংড়ারা, এক একজনের এক এক ধরনের প্রয়োজন, নেশা। দূরের হাট, কাছের হাট, সব হাটেই যাওয়ার জন্য মন উস্‌খুস্‌ করতে তাকে। যে হাটে যাওয়াই হলো না সে হাটেই যা ঘটার তা ঘটে গেল। কী ঘটল তা কেউ জানে না।

'যে হাটে না যাই, সে হাটের শেষ নাই।'

'হাটই হচ্ছে চ্যাংড়াদের বড় হওয়ার, শেয়ানা হওয়ার, জোয়ান হওয়ার প্রতিষ্ঠান।'

'কয় হাটের ছোয়াই, বাপক ডাকে বিয়াই।'

'হাটের নেশা তাই তাদেরই লাগে যারা বাড়ি ঘর করে, সংসার বানায়, ক্ষেতবাড়ির কাজ যাদের সর্বক্ষণের— সে বেটাছোয়াই হোক্‌ আর বেটিছোয়াই হোক।

'জাই গেল ক্ষেত বাড়ি, মধ্যে হইল পথ
জাই গেলেন গিরির বৌ, নিত্য যাছে হাটত।'

ক্ষেতের মাঝখানে রাস্তা হলে ক্ষেত বাড়ি নষ্ট হয়, গিরির বৌ নষ্ট হয় নিত্য হাটে যাতায়াত করলে। অবশ্য এ হিসেবটা সবার সমান নয়। 'কেউ তো হাট তার ঘর থেকে মুক্তির জায়গা ভাবতে পারে।'

'চ্যাংড়াবান্দার হাটতে ঘুনি ফোতা বেরাইছে।
কোটত গেইলেন ভাবের দেওরা, শাক চাখিয়া যান।'

'ঘর থেকে হাটে যাওয়া যেন হাট থেকে তার মনের মত একটা ঘরে যাওয়ার জন্যই।'

'হাট বসেছে তার জন্যে, যার হাটে আসার ঘর আছে, হাট থেকে ফেরার ঘর আছে, হাটে বেচার জিনিস যে বানায়, হাটের জিনিস যে কেনে, হাটের মানষিতে মানষিতে যে কত নদী নালা ঝোরা ডিঙ্গায়, হাটের গানে গানে যে যেসব দেশ এখন দেশের বাইরে সেই সব দেশের কথা এখনো গায়, হাটের কথায় কথায় যে এমন

কথা বলতে চায় যা কথায় কথায় বলা যায় না।'

'হাটের মধ্যে বাউরিয়ার হাট, ভোটের মধ্যে পাসি

সেই মতন দেখু দাদা, চেংড়ি মাইয়ার হাসি।

চেংড়ি মাইয়ার হাসি রে মোর ঠিয়া পাখির রাও

অ্যানং জুড়াছে দাদা, ঘোর ট্যানাটার গাও।'

বাউরিয়ার হাট, পাহাড়ের ওপরের গ্রাম ও টিয়াপাখির রা-এর-মতো তরুণীবধূর হাসি।

'যে সব কন্যার কথা ফুটেছে, গোছ হয়েছে....তারা আপন মনে গাইতে থাকে—

বাপো গেইসে হাট, মাও গেইসে হাট / মাও আনিবে মোলার নাড়ু, বাপ আনিবে খাট—

ঐ খাটত চড়ি যাম বৃন্দাবনের হাট।'

ধূপগুড়ি হাটে গিয়ে মিটিং শুনে দশদিকের দশজনের কথা শুনে বুড়িমার গোত কী সিদ্ধান্ত নেবে সে জন্য ওরা ধূপগুড়ি হাটে যাওয়াই স্থির করে। 'বুড়িমার গাওয়ের মানুষের ধূপগুড়ি হাটে যাতায়াতের অভ্যাস নেই।' কারণ তাদের নানা রকম ফসল বিক্রির জন্য তাদের গাঁয়েই পাইকার আসে। তবে বেশি কিছু হলে 'বছরে মাত্র কয়েকবার ধূপগুড়ি হাটে যেতে হয় ধান বিক্রির জন্য পাট বিক্রির জন্য।' আবার বেশি পরিমাণে নিয়ে গেলে পাইকাররা এক হয়ে তাদের সঙ্গে বদমায়েসী করে। তবু তারা যায় যেহেতু বুড়িমার গাও ধূপগুড়ি থানার মধ্যে এবং 'মানষি সব সময় পশ্চিমে ও দক্ষিণে যেতে চায়' স্বভাব বশত।

বাড়ির বৌরা চ্যাংড়িরা ছেকোপাড়া দিয়েছে। এক গাদা কাপড় নিয়ে বড়বাঁকের পাড়ে যায় ধুতে। কোন সাগাই বাড়ি যাওয়ার আমেজে প্রস্তুতি চলছে। আষাঢ় মাসের এমন সময়ে ক্ষেতবাড়ি ছেড়ে সাধারণত হাটে যাওয়া হয় না। কারণ আষাঢ় মাসের নতুন জলে মাটির যে খেলা, মাটি তৈরি করার যে আনন্দ — তা আর কোথায়।

আষাঢ়ের নতুন জলে মাটিতে লাঙল চষার মজাই আলাদা। লাঙল চালিয়ে মাটিকে কাদা করা হয়। হাল দিতে দিতে হাল তুলে হাত দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙে কাদা করতে হয়। এই মাটি জলে মাখামাখি চলতে চলতে 'নিজের নগ্ন শরীর দিয়ে বৃষ্টির ঝরন বোঝা কতটা পাতলি, কতটা ফিনফিনি, কতটা নাউধুয়া, কতটা ফাতরা বা নাখেরা, দুবলা কতটা কুটুনি— কানে কানে কথা বলে, ফিসফিসিয়ে, কতটা চমক দেওয়া — চিলকি এমনকি পারলে জিভে চেটেও বোঝা — জলে জলে মাটি কতটা ভরে উঠছে মাটিরই ভিতর থেকে।'

এই আস্বাদন ছেড়ে ধূপগুড়ি হাটে যাওয়া। আসলে বুড়িমার গোত কোন গোলমালের মধ্যে যেতে চায় না। ' তারা নিজেরা জোতদারও বটে আধিয়ারও বটে।' তারা নিজেদের জমি চষে, তাদের জমিও আধিতে দেওয়া আছে। আবার অন্য জোতদারেরও জমি চষে। বুড়িমার গোতের একটা সুনাম আছে। তার কারণ প্রধানত দুটি— এক, বুড়িমার গোত এই দশ নদী বিশ নদী ছয় হাটের পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো চাষী। দুই, বুড়িমার গোত যার যা পাওনা তা সবার আগে মিটিয়ে দেয়।' — সে পাওনাদার সরকারই হোক, আর ফরেস্টই হোক আর চুকানিদারই হোক আর জোতদারই হোক।

কিন্তু ভয় পাচ্ছে এই লেভি নিয়ে। কত কী পরিমাণ কিছুই তারা এখনও জানে না। অবশেষে কী তাদের এসব মেটাতে অভাবে পড়তে হবে। শুক্রবার সারা দিন বুড়িমার গোতের বাতাস ভারী ছিল। শনিবার আস্তে আস্তে কেটে যায়। ঝুটু, বুনুয়া, কলিন সকলেই হাটে রওনা দিয়েছে। প্রথমবারের ভাত শেষ হয়ে দ্বিতীয় বার বসানো হয়েছে। গরম ভাত খাওয়া-দাওয়া চলছে। হাটে যাওয়ার জন্য বড় চিলা প্যান্ট পড়েছে। গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে চাদর। ছোট দাদা গামছা পড়া—গায়ে একটা শার্ট। এরকম অনভ্যস্ত পোষাকে দেখে বাড়ির মেয়েরা হাসাহাসি করছে। অষ্টপ্রহর যাদের খালি গায়ে পায়ে, একটা নেংটিতে দেখা তাদের গায়ে এই সঙ্গতিহীন পোশাক হাসির উদ্রেক করে বৈকি।

দোলানের খাওয়া হয়ে গেছে। সে ঘটি উপুর করে জল খাচ্ছে। শাদুরী তার স্বামী ধানরামকে বলে 'হে দেউনিয়া, আজি আর আঙ্গুল খাবেন না। ধূপগুড়ি অনেকদূর, সারাখান রাস্তা আঙুল খাবার পাবেন।'

'বেলা দেড় প্রহর নাগাদ ওরা বুড়িমার বাড়ির এগিনা থেকে ডান দিকের সরু রাস্তা ধরে লাইন বেঁধে ফরেস্টের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়'— উদ্দেশ্য ধুপগুড়ির হাটে যাওয়া। অনেক রাস্তা আছে যাওয়ার তবে প্রতিক্ষেত্রেই দু'একবার নদী পার হতেই হবে। 'বাঙ্কুরাম আগে আগে যাচ্ছে, তার পেছনে ছোট দাদা, তার পেছনে নদিনী, তার পেছনে অগুন, তারপর শাদুরী, শাদুরীর পেছনে দোলান। দোলানের পেছনে বড় চিলা তারপর ধানরাম। সবাই যার যার মত পোষাকে হাটের পথে চলেছে। ওদের অনেকের নানা পথে ধূপগুড়ি যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। যে পথে বাঙ্কুরাম চলেছে সে পথে একবারই নদী পড়বে। ' ঐ একবারই নদী'। দুদুয়া পার হয়ে গেলে আর নদী পড়বে না। 'দুদুয়া ওখানে চওড়া।' 'বনজঙ্গল-মাটির সেই পথটা পড়ে দুদুয়া নদীতে।'

নদী পার হওয়ার সময় সবাই নিজ নিজ কাপড়ে জলে নামতে নামতে ক্রমে মাথায় বেঁধে নেয়। এমনকি নদিনী ও শাদুরীও কোমর সমান জলে এসে ফোতা খুলে মাথায় বাঁধে। ' এতক্ষণ বনের গুহাপথে যে আটজন

একটা লাইন তৈরি করে আসছিল তারা এখন লাইন ভেঙে দুদুয়ার জলের স্রোতের রেখায় রেখায় নিজেদের শরীর মিলিয়ে দেয়। ..... পেশিময় পুরুষ শরীর গুলি আর অসমতল নারী শরীর গুলি জলের সঙ্গে খেলাতেও মাতে। কেউ একটু ভেসে যায়। কেউ স্রোতের একটু উল্টো দিকে যায়, কেউবা স্রোতকে উছলে যেতে দেয় নিজেদের শরীরে।' 'ফোতা আর নেংটি এই মানুষ জনেরই এক অনিবার্য পোষাক তেমন ছাড়া এই বন পথ, জনপথ, গিরিপথে শরীর মেলানো যায় না।'

হাট বসো বসো এমন সময় ওরা হাটে গিয়ে পৌঁছায়। বাঁশের বোঝাই গরুর গাড়ি, দোকান খামার, ডাক্তারবাবুদের ওষুধের দোকান, হাটবাস ইত্যাদিতে হাট ভরে উঠেছে। বন নদী প্রান্তর পার হয়ে আসতে যাদের আড়ষ্টতা ছিল না বুড়িমার গোতের ওরা হাটের পথে পাকা রাস্তায় বড় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। লেখকের মতে ' এ বোধ হয় গ্রামের মানুষের শহরে এসে বিহ্বলতা নয়। এ বোধ হয় গ্রাম নগরের কোন দ্বন্দ্বও নয়। এ বোধ হয় উৎপাদন আর পণ্য, বা বিনিময় আর বাণিজ্য, বা কৃষি শিল্পের কোন বিরোধও নয়। এ হয়তো সভ্যতারই মৌলিক বিহ্বলতা'। যা 'দশবিশ নদীর দূরের পৃথিবীর মানুষজনের মধ্যে এখনও চারিয়ে আছে। সেখান থেকেও উৎপাটিত হয়ে যাবে, এই গল্পের শেষে। তখনও অন্যত্র চারানো থাকবে।"

ভিতর হাটে পা দিতেই ডাঁই করা হাড়িকুড়ির দোকান। নদিনী ও শাদুরী হাঁড়ি কেনার জন্য এগিয়ে যায়। এরাও হাঁড়ি কিনবে। কারণ 'ঘরের শোভা হাঁড়িকুড়ি ছোয়া ছোট নাওদারী।' টোকা দিলেই টন টন করে ওঠা, হাঁড়ি বউ ও ছাওয়াছোটোই তো বাড়ির শোভা। এ প্রসঙ্গে হাড়ির নানা প্রকার ও উপযোগিতার কথা তুলে ধরা হয় — যেমন চুকাই, ঢেক, ঘারা, পোইলা, ঢেকসা ইত্যাদি। নানা কাজে ব্যবহারের জন্য লোহা লক্করের দোকান, চালহাটি, পাশে রেখে ওরা গদিয়ালবাবুর গদিতে গিয়ে বসে। ক্রমে লেভি প্রসঙ্গ আসে। বাজারে তেমন চাল উঠেনি। দরও ৩০০ টাকা কুইন্টাল। ঐ খরার জন্য। এরা সবাই মজা করে চা নিমকি খায়।

চা নিমকি খেয়ে বুড়িমার গোতের লোকেরা ওঠার উপক্রম করতেই গদিয়াল তাদের বসতে বলে, কারণ এখনই মিটিং শুরু হবে। বড় জোতদার কাছুয়া মহম্মদ এসেছে, টাকু পাইকার, মোটাশিলা জোতদার ছোটু মিঞা— এমনকি গয়েরকাটার শশঙ্গিবাবু (শশাঙ্কবাবু) এসেছে। এদের মধ্যে শশঙ্গিবাবু শিক্ষিত। সবাইকে লেভি ব্যাপারে কী করনীয় বোঝাবার জন্য শশঙ্গিবাবুকেই দরকার বেশি। তাই ছোটু মিঞা বলে— ' তোমরালা না আসিলে বুঝাবেন কায়? তোমরালা শিক্ষিত মানষি।'

কাছুয়া মহম্মদের বাবা বুঝুয়া মহম্মদ, তার বাবা হাজুয়া মহম্মদ। এই হাজুয়া মহম্মদের মৃত্যুকালে তার

শ্বাস উঠে আর নামে। তখন বুঝুয়া মহম্মদ বুড়িমার কাছে এসেছিল জানতে হাজুয়া কতদিনে মুক্তি পাবে। কারণ ' বুড়িমা তখন সবে বুড়িমা হতে শুরু করেছে— যা দেখা যায় না তেমন কিছু হঠাৎ হঠাৎ দেখে ফেলছে, যা বলা যায় না তেমন কথাও হঠাৎ হঠাৎ বলে দিচ্ছে।'

শশঙ্গি জোতদার - জোতদারির কাজে লেখা পড়া দরকার আছে বলে মনে করে না। তবু ছোটু মিঞা যার কাছে সবাই এসে সব বিষয়ে বুদ্ধি নেয়, এমনকি জেঠো জোতদার পর্যন্ত সেই মিঞাকে মান্য করে, বুদ্ধি নেয়। শশাঙ্গি জোতদারকে জানায় যে যে কাজই করুক লেখাপড়া জানলে তা ভালই হয়। ছোটু মিঞা রাজবংশী মুসলমান। বড় ঘর। তাই বহু দূর দূর থেকে ছেলে বউ আনে। এদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের গড়নই আলাদা। এদিকে শশঙ্গি জোতদার জমি কেনাবেচার খবর জানতে চায় ছটুমিঞার কাছে। এরকম কথোপকথনের সময় গদিয়ালবাবু ঘরে ঢোকে। তার পেছনে আলটা গ্রামের ভোলানাথ জোতদার আসে, আসে মোটা শিলা জোতদার, আসে নাউধিয়া জোতদার এরপর টাকু পাইকার, অগুন কাছুয়া মোহম্মদ তো আগেই এসেছে। গদিয়ালবাবুর ঘরে জোতদারদের এক বিরাট সভা বসে।

কাছুয়া এসেও আবার কোথায় গেছে। সবাই তারই অপেক্ষায়। ক্রমে দ্বিধা দ্বন্দ্ব বাড়ে। কেন একজন বড় জোতদারের জন্য বসা। আগের সে দিন তো এখন নেই। ' জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে কৃষিতে সরকারি ব্যবস্থায় এসেছে বড় জোর সোয়া'শ বছর। তাই এখানকার জোতদারও নিজেকে 'হালুয়া' বলে বা এখানকার হালুয়াকেও তার বৌ-ভালবাসার ঠাট্টায় ' রে দেউনিয়া' বলে ডাকে। এই প্রায় নির্বাক রাজবংশী কৃষকের মজ্জায় এক স্বাধীনতার পরাক্রান্ত বোধ মিশে আছে। সে বোধ কারও কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে যেতে দেয় না।'

জয়রাম জোতদার, হরিবল জোতদার, দিনুমাষ্টার, দোলান, অগুন যখন উঠি উঠি করছে, গদিয়ালের সঙ্গে কথা বলছে — তখনই কাছুয়া মহম্মদ এসে হাজির হয়। সে সবার উদ্দেশ্যে নমস্কার করে, টাকু পাইকারকে দেখে কুশল জিজ্ঞাসা করে। কাছুয়াকে সবাই নেতা সাব্যস্ত করে। কিন্তু কাছুয়া একটু অস্বীকারের ভঙ্গি করে। পেছন থেকে এগিয়ে আসার জন্য' একটু ঠেলাঠেলি শুরু হয়। ওর মধ্যে একটা মাথা ন্যাড়া, প্যান্ট পড়া, ঢোলা গেঞ্জি পড়া লোক। সে এসে 'গদিবাবু কোটত' জিজ্ঞাসা করে। লোকটির নাম 'কার্তিক'। একসময় খুঁটিমারিতে সে চাষ করত। তার ছেলে মেয়ে বৌ ওখানেই থাকে হতে পারে। কার্তিক পাগল হয়ে এখন ধূপগুড়িহাটেই থাকে।

মালিক মানে গদিয়াল, সাদা পাঞ্জাবী পড়া ভদ্রলোক দেখা যায় বিডিও সাহেবকে ডেকে আনেন। সবাই

লেভির কথা জানার জন্য উদগ্রীব হয়। । নানা কথার পর জানা যায় সরকার এখনও উত্তরবঙ্গে লেভির নোটিশ করেনি — সম্ভবত গতবারের খরার জন্য। তবে জোতদাররা ইচ্ছে করলে গতবারের আবাদের হিসাব জানিয়ে ফরম পূরণ করে কিছু লেভি সহ দিয়ে দিলে আর কোন ল্যাঠা থাকে না। আসলে জোতদারদের মিটিংএ ডাকা এবং বিডিও সাহেবকে আনা গদিয়ালেরই কৌশল। সেই তো এখানকার লেভির এজেন্ট।

হাটের আওয়াজ বলে আওয়াজটা আসলে পার্টির আওয়াজ। লেভি না দেওয়ার জন্য কংগ্রেস ভেঙে বাংলা কংগ্রেস সৃষ্টি হয়েছে। ওদের নেতা অজয় মুখার্জী। হাটে মিছিল করে বক্তৃতা করে লেভি না দিতে বলেছে। অন্যদিকে কমিউনিষ্ট পার্টিও লেভি না দেওয়ার পক্ষে বক্তৃতা করছে। বাঙ্কুরাম মদ খেয়ে বলছে যে লেভিতে পাট্টিপুট্টি ঢুকে গেছে।

প্রথমে নিজেরা আলাপ আলোচনা করে লেভি নিয়ে — কী দেওয়া যায়, কত দেওয়া যায় এসব। প্রথমে ওরা দু'কুইন্টাল দিতে চায়। গদিয়াল মালিক বলে এতে বুড়িমার সম্মান থাকে না। অবশেষে ঠিক হয় সতের কুইন্টাল দেবে। অগুনরা বুঝে নেয়। এই মিটিং লেভি ছাড়ের নয়—বরং বুড়িমার গোত বা তার সমতুল গোতের থেকে একটা বড় পরিমাণ লেভি নেয়ার। এবং এও আশঙ্কা হয় যে সতের কুইন্টাল রাজি না হলে গোতের মূল ধরে টান দেবে— সব হিসেব নিকেশ করে আরও বেশি নোটিশ ধরাবে। গোতের পরিচয়ে বলা হয়েছে মরাঘাট পরগনার প্রথম সেটলমেন্টে (১৮৭২) বুড়িমার গোত তৈরি হয়ে আসছে। 'বুড়িমার গোতের জোত তো পাকুড় গাছের মত, তা থেকে কত ঝুড়ি নেমেছে, কত শিকড় গজিয়েছে, কত শিকড়ের শিকড় কত দিকে ছড়িয়েছে।'

এই গোতকে সতের কুইন্টাল লেভি এই খরার পাকের মধ্যে দিতে হবে—তাই সরকারের এই সাহসকে প্রতিবাদ জানিয়ে আপন মনে ওরা বলে —'এই সরকারক পালটিবার লাগে। কার এ সরকার।' লেভির অজুহাতে জমির হিসাব খুলতে যাওয়ার আশঙ্কায় ' ৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেভির হুকুমে সারা রাজ্যের সব রকমের চাষী যে এক সঙ্গে সরকারকে পরের ভোটে প্রত্যাখ্যান করল তার কারণ এই লেভির সুবাদে সরকার জমির মালিকের জমির হিসেব খুলতে চেয়েছে বলে চাষীর মনে হয়। .... যে চাষী লেভি চায়নি, সে চাষী খাশ জমি উদ্ধার হোক এটাও চায়নি। অথচ হলো তাই।'

লেভির ধানের পরিবর্তে ওরা টাকা দিতে চায়। ১৭ কুইন্টালের দাম আজকের ২৫৫ টাকা বাজার দরে ৪৩৩৫ টাকা গদিয়াল মালিক তথা এজেন্টকে দিতে হবে। আর ওরা সরকারের কাছে দাম পাবে ২৪০ টাকা

কুইন্টাল দরে ১৭ কুইন্টালের দাম ৪ হাজার ৮০ টাকা। রসিদ এই হিসাবে পাবে। ধনরাম একবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বলে — 'শুধু রসিদ লিখি সাড়ে বার কুড়ি টাকা লাভ।'

ধূপগুড়ির হাটে লেভির ব্যবস্থা সেরে ওরা যে পথে গিয়েছিল সেই পথেই বাড়ি ফেরে। 'রেতির জলে ওরা হাড়ি ভাসিয়ে মজা করে।' হাটে শোনা আওয়াজ তুলে হাসাহাসি করে — 'পাট্টিপুট্টি ছাড়ি দাও/ এই সরকার বদলি দাও।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে বাড়ির লোকজন দেখে ওরা জিজ্ঞাসা করে — ' বুড়িমা? বুড়িমা ক্যানং আছে?' এরা এদের দৈনন্দিন পুরাণ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই পৌরাণিক দৈনন্দিনে আবার প্রবেশ করে। ' আছে, আছে, আছে,' - মানে, উত্তর আসে বুড়িমা ভালই আছে।

আরম্ভের পর

বুড়িমার বাড়ি থেকে বের হওয়া ও ঢোকার রাস্তা একটাই। সেই পথেই কেউ কখনও ডাক শুনে বেরিয়ে যায়, আর ফেরে না। এরকম ডাক বেরনোদের মধ্যে দু'একজনকে দেখা গেছে সকালে এই বাড়িরই দারিঘরে, বা উনুনের পাড়ে বা কুয়ো পাড়ে শুয়ে আছে।

ঢেমনা — সে রকম ডাক বেরনো মানুষ। সেও ডাক শুনে বেরিয়ে ছিল— বুড়িমার গোতে এসে আর ফিরে যায়নি। এ ডাক কেমন? 'এ ডাক যে শোনে সে নিজেই নিজেকে ডাকে।' যারা বের হয় তাদের গমনের অভ্রান্ততা কী করে তৈরি হয় — এমন অন্ধকারেও। ' সে পথে এসে কখনও একটা পা ভুল ফেলে না কেন?'

' অথচ বুড়িমার বেঁচে থাকা নিয়ে এই নিশ্চয়তা কোন সময়ই তাদের ভিতড় শিকড় গাড়ে নি।' শিকড় গাড়ে না।' অন্যান্য মানুষদের মত বুড়িমা বাড়ির - আশা হতাশা - আশঙ্কা - সম্ভাবনায় বাঁধা পড়েনি। বুড়িমা কখনও কারো দু'চারটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছে হয়তো, বুড়িমার গোত কোন নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে বুড়িমার ইঙ্গিত ইশারায় তাও পরিষ্কার নয়। তবু যেন এমনই এক বিশ্বাস বা ধারণা হয়ে আসছে যে বুড়িমার গোতের মানুষজন নিজেরাই যে রক্ষা করেছিল নিজেদের, সে আত্মরক্ষা সম্ভবই হত না যদি বুড়িমা সেই বিশেষ উপলক্ষে বুড়িমা হয়ে না উঠত। বুড়িমা তাদের আত্মরক্ষা।'

এই আত্মরক্ষা না হলে হয়তো ভূটান পাহাড় বুড়িমার গোতের ওপর এসে পড়ত, 'পৃথিবী একবার কেঁপে উঠে নদীর উজান ভাটা বদলে দিত, কেড়ে নিত মানুষের মুখের ভাষা, সম্ভাষণ, বুড়িমা কি ভূটান পাহাড়ের পাখা কেটে দিয়েছিল যেমন পুরাণে ঘটেছিল কখনও ..... এরকম আরও কত মিরাকল? ' বুড়িমাকে নিয়ে

তেমন কোন স্মৃতি তৈরী হয়নি।' ..... বুড়িমা আর বুড়িমার কথা যেন আলাদা। বুড়িমার কথা যত বড়, যত ছড়ানো, যত দিগব্যাপী, বুড়িমা নিজে ততই ছোট, তত কোঁকড়ানো, ততই ধুলোর সঙ্গে, ততই খুটোর সঙ্গে মিশে থাকা। মানুষ কি পারে নিজেকে নিয়ে তৈরি কথার এতটা বিপরীতে যেতে?' অবশ্য বুড়িমার গোতের কেউ কখনও দেখেনি বুড়িমাকে সেরকম।

'তাহলে বুড়িমা কি তাদের তেমন সুবিধা করে দিতে পারা কোন পূর্বজ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতাবান রাডার? অথবা টেলিল্যান্স? বুড়িমা তো তাদের প্রতিদিনের বাঁচার ভেতরই লেপটে আছে।' এখানেই কোন অদৃশ্যতা বুড়িমাকে বুড়িমা তৈরি করেছে।

'প্রতিদিনের বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিদিনের বেঁচে থাকার মধ্যেই হয়তো মানুষের এক অদৃশ্যের বড় দরকার। সে অদৃশ্য কখনও কখনও অশ্রুতও বটে। স্পর্শাতীতও বটে। তবে মানুষ সেই অশ্রোতব্যতা ও অস্পর্শনীয়তা অতিক্রম করতে চায়। আর আশ্চর্য, দৃশ্যতাও অতিক্রম করতে চায়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ দেখছে এমন কিছু মানুষ অদৃশ্য কিছুতে বদলে নেয়। অথচ সেই পরিবর্তন থেকে সে আবার কিছু শুনতে চায়, সে আবার কিছুর স্পর্শ চায়।' ' মিরাকল' ছাড়া মানুষ বাঁচে না।' কিন্তু সব মানুষ বা গোষ্ঠী তা পায় না। অবশ্য এক সময় সে ভুলে যায় ' মিরাকল' ছাড়া তার বাঁচার কথাই নয়। নারীর পেটের ভেতর আর এক মানুষের অবস্থান কি কম 'মিরাকল' । স্বাভাবিকতার মধ্যেই 'মিরাকল' বাস করে। ' বুড়িমা, বুড়িমার গাঁওর সেই 'মিরাকল'।

আধবসা কানকাটু যার হাল একদিন সবচেয়ে তলার মাটি উপরে আনত, আজ সে কঞ্চি হাতে শুকোতে দেওয়া ধানে পাখি তাড়ায়। আর যে ছেলেটা দাঁড়াতে গিয়ে টলমল করত তার গলার আওয়াজ এখন হালের বলদের চেয়েও উঁচুতে। এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বুড়িমার বড় গোতে এমন ওঠা বসা লেগেই আছে।

এক বুড়িমার বেলাতে সব উল্টে যায়। সবাই ভাবে বুড়িমা যখন তখন মরে যাবে। কিন্তু যত দিন যায়, বর্ষা যায়, চাষ যায়, শীত যায় বুড়িমা ততই অমর হয়। আর বুড়িমা যতই অমর হয়, আর ততই সবার ভয় ধরে যদি অমরতা থেমে যায়। সংসারে কত জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে বুড়িমার অমরতা যেন দরকারি। এটা এখন সবার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। 'যে অমরতা প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু লাঞ্ছিত, সে অমরতা টুকুই তো সবাই বাঁচিয়ে রাখতে চায়।'

এমনও ধারণা গোতে পুরুষ পুরুষ ধরে জন্মেছে যে বুড়িমা হয়ে ওঠার আগে তো বুড়িমা অন্য বাড়ির মেয়ে ছিল। এখানে বউ হয়ে এসেছে। সুতরাং এ গোত সে একদিন ভেঙে দিতেও পারে। এটা একটা ভয় হয়ে গোতে ছড়িয়েছে। কিন্তু বুড়িমার শরীরের পক্ষে এখন কি আর সম্ভব! বুড়িমা তার নিজের বাড়িতে বেঁচে থেকে এই

গোত মুছবে কেমন করে।

সদ্যজাত শিশুর শ্বাস নেওয়া, মায়ের বুকের বোটা টেনে দুধ খাওয়া, হাত- পা গুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়া সবটাই যেমন অলৌকিক বলে মনে হয়। বাঁচার সাড়া না পেলেই ছুটে গিয়ে দেখে আসা — কিছু হয়নি তো! তেমনি বুড়িমার ক্ষেত্রেও। যে মানুষটা মরণের দিকে হেলে গেছে তার মরণটাকেই শুধু পাহারা দেওয়া। বুড়িমা রাতে একা ঘুমোয় না। কেউ না কেউ থাকে। তবে সেও তো ঘুমে ডুবে থাকতে পারে। ভরসা একমাত্র কুকুর ভেউলা। সে দিনরাত মাঝে মাঝেই আকাশে নাক তুলে ঘ্রাণ নেয়। তেমনি কিছু হলে কান্নায় সবাইকে জানিয়ে দেবে। এতবড় বাড়িটার এতবড় ঘর, এত এগিনা, এত মানুষের সারা রাতের ঘুমে, আধা ঘুমে শুধু একটাই কথা ' আছে, না আছে?' 'জাগে না জাগে?' — ' আছে', 'জাগে'। বুড়িমার গোত তো ছড়িয়ে আছে দশ নদী, বিশ নদীর বাইরে— এ বাড়ির মেয়েদের বিয়ে হওয়ার সূত্রে—তারাও বুড়িমার অমরতার খোঁজ খবর নেয়। এমন কি বুড়িমার স্বামীর খুড়ার বেটা ভাই যে বুড়িমার বিয়ের আগেই নীলফামারী চলে গিয়েছিল শ্বশুরের জোত রক্ষা করতে, সেটাও তো বুড়িমার নিজের গোত— তাদেরও তো একটা 'মিরাকল' দরকার। বুড়িমা সেই মিরাকল, সেই অমরতা।

১৯৬৫-র খরার বছর লেভীর জন্ম। ওই একই সময়ে লেভী, ভোটু ও সোমারীর জন্ম। লেভী সোমারীর পিসি। 'যে সময়ে অন্য বাচ্চারা জন্মায়নি তখন, সেই চার-পাঁচ বছরে মাত্র তারা তিনজনই একা একা জন্মেছে বলে, তাদের তিনজনকে নিয়ে সেই সময়টা বুড়িমার সংসারে টিকে আছে।'

'সোমারীর জন্ম নিয়মমাফিক, ঠিক ঠাক সময়ে, স্বাভাবিক সময়ে হয়েছে। লেভীর জন্মটা গোলমেলে। জোনাকুর বৌয়ের বদলে তার মা পাথারনী পেটেলী হয়ে লেভীর জন্ম দেয়। লেভীর জন্ম খরার সময়, তাই নামও লেভী, সময়ের দ্যোতক। আওয়াজ উঠল ' দে সরকার পাল্টি দে।' 'সেই সরকার পাল্টাবার সময়কার ছেলেই তো ভোটু'। নীলফামারীর নাতির ছেলে ভোটু।

এই সরকার পাল্টানোর ফল জমির মালিকানা ওলট-পালট, উথাল-পাতাল। ভোটের পরই বড় বানা। বড়বানা জমির সীমানা, তিস্তা জলঢাকার, রেল-সড়ক-ব্রিজ সব ভেঙে চুরমার করে দিল। জমির পাট্টা, দাগ নম্বর, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। 'সেই বড় বানার বছরের শীতেই পড়ল দুই নম্বর ভোট।'

প্রথম ভোটের সরকার ফেলে দেওয়ায় দু'নম্বর ভোট। দুই নম্বর ভোটে এক নম্বর ভোটের সরকারই ফিরে এল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট ৬৭, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ৬৯, বামফ্রন্ট ৭৭। তখন দ্বিতীয় ভোটের সময় সোমারীর খুড়ি ,

বাঙ্কুরামের বৌ ধোলীর এক ছেলে হলো। তার নামও ভোটু। দুই নম্বর ভোটু। তবে পরে এক নম্বর দুই নম্বর মিলে মিশে গেছে। তবু বলা যায় —

'এই সোমারী, লেভী আর দুই ভোটু — চারজন মিলে এই খরা বানা, দুই ভোটের সময়টা বুড়িমার গোতে ধরে আছে।' সরকারের অদল বদল এদের জন্মের সময় গুলিতে।

বুড়িমার বাড়ির এগিনার উত্তর দিকে ছোট্ট ঠাকুরানীর ঘর। তার ডান হাতে ডোবা। ডোবার উত্তর-পূর্ব কোণটাই এবাড়ির সবচেয়ে উঁছু জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে ঝটু নজর করে দূরে ক্ষেতে লাল রঙের কিছু একটা। সেটা কী জানার জন্য বাড়ির সবার মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। প্রথমে ওরা ভাবে হয়তো বিধবা জোতদারনীর জমি দখল হচ্ছে। পরে কেউ কেউ বুড়িমার গোতের কথা বলে। ব্যাস ব্যস্তত শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কে যাবে, কখন যাবে তা ঠিক হয়না। পাথারনী চিৎকার করে জমি দখল রোখার আহ্বান জানায়। তক্ষুনি সবাই তৈরি হয়। ' চালে লাঠি বাঁধা। হাতে পাওয়া যায় না। কতোরানী উবু হয়ে বসে , তার ঘারে দুই পা দিয়ে খাঁড়া দাঁড়ায় নদিনী। তার হাতে হাত দাও ধরিয়ে দেয় ধোলী। এক ঝটকায় পাটা দড়ির গিট কেটে ফেলে নদিনী। কাঁধ খোলা, গলা খোলা, ফোতায় বাহুমূল থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত নগ্ন এতগুলো মেয়ের উদ্যত হাতের ওপর লাঠি সোটা ঝরে পড়তে থাকে।' জমি দখলকারী লালঝাণ্ডা রুখতে এদের এই প্রস্তুতি।

' লাঠি সোটাগুলি সব যে মাটিতে পড়ে তা নয়। যে যা হাতের কাছে পায় তা নিয়েই বাহির— এগিনার দিকে ছুটে যায়।' ছোটে নারী পুরুষ উভয় দলেই।

বেটিছোয়ার দলে ছিল নদিনী, কলেশ্বরী, ধোলী, কতোরানী, সাদুরী ও মননী। আর বেটাছোয়ার দলে ঝটু, বনুয়া, কলিন প্রথমে, তার পিছনে ছোটদাদা, বড়চিলা আর ছোটবাপা। তাদের পেছনে দুখারু আর বিসারু। এ বিসারু কিন্তু দুখারুর বাবা নয়। কাকা, প্রায় সমবয়সী। কতোরানীর হাতে বর্ষা, ধোলীর হাতে মাছ মারার কাটা।

আধবসা কানকাটু বয়সের ভারে ধীর গতি। সে বেটাছোয়াদের দলের পিছনে পড়ে গিয়েছিল। তাকে বেটিছোয়ারাও টপকিয়ে চলে গেল। তাদের চলার মাঝে ঝম্পই পড়ায়, উঁচু নিচু হওয়ায়, পেছনের লোক সামনের দলকে কখনো দেখছে, কখনও হারাচ্ছে। সবাই চলছে এক লক্ষে, তাদের জমি অর্থাৎ বুড়িমার গোতের জমি যদি দখল হয় তবে তা উদ্ধার করতে। এদের মধ্যে মননী এ বাড়ির এ যাবৎ সকলের কনিষ্ঠা বৌ। তার বাপের বাড়ি শিলতোলসার পূবে ছোট শালবাড়ি— তাকে কেউ কেউ পুণ্ডিবাড়িও বলে। সে কখনও এরকম

দখল দেখেনি, করতেও যায়নি। সেও এসেছে আসতে হয় মনে করে। জায়গাটা যে ঠিক কোথায় ঠাহর করা যায় না, আদিগন্ত ধানের জন্য। তবে ওরা খানিকটা আন্দাজ করেই চলতে থাকে। কানকাটু ভাবে সেখানে আগে মেয়েরা পৌঁছালেই ভাল হয়। রক্তারক্তি হয়না। চলে শুধু সম্ভাব্য দখল উচ্ছেদ অভিযান।

বুড়িমার জমি দখলের আশঙ্কায় ছুটে আসা নারী পুরুষেরা দেখতে পায় একটি 'লালঝাণ্ডা' ধরনী জোতদারনীর জমিতে আলের ধারে পোতা এবং বাতাসে ঝাণ্ডাটা বুড়িমার জমি ছুঁয়েছে— কঞ্চিতে লটকানো ঝাণ্ডা বলে। ওরা দুখারু ও বিসারু দেখতে পাচ্ছে — জোতদারনী কী বলে যেন চিৎকার করছে। জোতদারনী এদের দলটাকেই তার জমি দখলকারী দল ভেবেছে। জোতদারনীর চিৎকার কাইজুরি বেটিছোয়ার গলার আওয়াজের মতন — যে আওয়াজ শুনে নাকী বাঘও পালায়, নাম শুনে শিকার ছেড়ে দেয়। জোতদারনী চিৎকার করে - এক মাছকে ডেকে বলা সেই পুরনো ছড়াটা বলতে থাকে।

'তোক ঝাকোত ধরিম, খোলাত ধুইম্

.....

.....

কাউয়ার চিলায় ঠোঁটত করি খাইবে সেই গু।'

মজা করে গোতের ছেলেরা শেষের লাইনটি কোরাস ধরে। জোতদারনী রেগে আগুন হয়ে বাড়ি থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসে মশালের মত — যদি জমি দখলই হয় তবে সে ফসল জ্বালিয়ে দেবে। অমনি দুখারু হাত তুলে রোখে। জোতদারনী অবাক হয় দুখারুকে দেখে। জ্বলন্ত কাঠ ফেলে বাড়ির ভিতর চলে যায়।

এদিকে গোতের মেয়েরা হা হা করে লাঠি উঁচিয়ে ছুটে আসে আগুন লক্ষ করে। কিন্তু বিসারু ওদের রোখে এবং কলেশ্বরী ধোলীকে জোতদারনীর বাড়িতে পাঠায়। ওরা গিয়ে কিছুক্ষণ পরে দুই ঘটি জল নিয়ে ফিরে আসে। ওদের কাছে জানা যায় — জোতদারনীর নতুন আধিয়ারের বাড়িতে শিলিগুড়ির কাছের কোন গ্রাম থেকে তার এক শালা এসে শলা দিয়েছে যে ' সব জায়গায় আধিয়াররা খাশ জমির দখল নিচ্ছে। বিসারু নতুন আধিয়ারও তার শালাকে ডাকতে বলে। ওরা বলে বিসারু নতুন আধিয়ারকে ঝাণ্ডা নিতে বলে। সে যেন এমন এক আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল। তুলে নেয়। তখন বিসারু শালাকে বলে — ' তোমরালা সাগাই আসিছেন, সাগাই খান। মোর এইটে ঝামেলা পাকিবেন না।'

জোতদারনীর নতুন আধিয়ার আর শিলিগুড়ি থেকে আসা শালার পরামর্শে তার জমিতে খাশ জমি

দখলের জন্যে লাল ঝাণ্ডা পুতে দেয়। এই লাল ঝাণ্ডাই গোতের লোকেরা দেখেছিল এবং তা দখল মুক্ত করার জন্য অভিযান করেছিল।

'গোলমালটা যে রকম পাকিয়ে উঠেছিল ঠিক তেমন কিছু হলো না, ভিজে খরের মত নেতিয়ে গেল।' ফলে এবার গোতের সবার ফেরার পালা। সার বেঁধে ধানক্ষেতের আল ধরে উঁচু নিচু জমি পার হয়ে ওরা বাড়ি ফিরতে লাগল— বিষাদ ঘন চোখে মুখে। পথে ছোট দাদাকে ধানক্ষেত টানে। ছোটদাদা ঝম্পইর পারে বসে — তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। ছোটদাদা ভাবে সেই নতুন আধিয়ারের কথা যে ঝাণ্ডা পুতে ছিল এবং ঝাণ্ডা তুলে নিল। এতসব ভেবেই তার কী মনে আসে ? ' মুই তো আধিয়ার না হই, জোতদার না হই, হালুয়া মানষি না হই। মুই এক ঢেমনার বেটা। মোর জোতও নাই, গোতও নাই।'

'ধরনী জোতদারনীর জোতের জমি দখলের মত ছোট খাটো সব মজার ঘটনা হাটে হাটে খুব বলাবলি হচ্ছে।' এরকমই একটা গল্প বাপবেটা আধিয়ারের গল্প। গল্পটা এক হাটে যেমন ভাবে বলা হয়, শোনা হয় - অন্য এক হাটে গিয়ে তার রূপ কাহিনি বদলে যায়। পশ্চিম খুঁটিমারীর গন্ধারু জোতদারের এক ছোট আধিয়ার জোতদারের বলদ, হাল নিয়ে তারই জমি দখল করতে চায়। জোতদার বলে—তা জমি দখলের পর যে চাষ করে ফসল হবে তা সে রাখবে কোথায় ? উত্তরে আধিয়ার বলে 'কেন তোমার গোলা ঘরত ?' তখন জোতদার বলে 'তা বেশ, আমার হাল, আমার বলদ, আমার বিছন যখন বলদ জোরা রাখ, আগত গোলাবানাই স্যালা জমি দখল করিবার যাবু'। আধিয়ার বলদ রাখে আর জমি দখল হয় না। ময়না তলির হাটে এ গল্প শুরু হয়েছিল। এই হয় হয় হালুয়ার গল্প। বানগড়ানি হাটে, ডুবড়ি বন্দর হাটে, গয়েরকাটা হাটে, শিসতলি হাটে — এসে গল্পের নাম - ধাম পাল্টে গেছে। পরে বাপবেটা হালুয়ার গল্পও এসে পড়ে। গোঁসানিমারীর দিনু মাষ্টারের বাপের আমলের আধিয়ার এসে দিনুকে জানায় যে সে তার বাপের আমলে ছিল, এখনও আছে, তার বেটাও থাকবে। দিনু বলে—'থাকবে। তো চলো'। বলে জলঢাকা নদীর পারে নিয়ে যায়। নদীর ওপারের জমি গুলি দেখিয়ে বলে ওই গুলি তো আমার জমি— যাও গিয়ে দখল করো। হালুয়ারা নদীতে নামে। আর ফিরে আসেনি কোনদিন। এই গল্প গুলি থেকে জানা যায় কী করে জোতদাররা আধিয়ারদের জমি দখলের ইচ্ছে বা চেষ্টা সমূলে ধ্বংস করে দিত অতি চাতুর্যের সঙ্গে।

ঘোড়া জোতদারের গল্প এক আজগুবি গল্প। ঘোড়া জোতদারের বাবা আসলে ঘোড়া জোতদার। তার ঘোড়া ছিল। ঘোড়ার পিঠে চেপে সারা জোত ঘুরত, দেখত, কিনত, বেচত। একদিন ঘোড়ার পিঠে চড়েই

তার মৃত্যু হয়। তাকে নামালে তার ঘোড়ারও মৃত্যু হয়। তার ছেলে হয় জোতের মালিক। কিন্তু ঘোড়া নেই তার। তার ঘোড়া হল কল্পনায়। কল্পনার ঘোড়া, রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে সাব রেজিষ্ট্রার হয়ে আছে। ঘোড়া জোতদার তার জমি বেনামিতে রাখে। পরে অফিসারকে ঘোড়া ভেবে জিভ টাকরিয়ে ছোলা দেখিয়ে বাড়িতে নিতে চায়। অফিসার কায়দা করে ১০০ টাকার একটা নোট দিয়ে আপদ বিদেয় করে। সে সেই টাকা দিয়ে ধূপগুড়ির গো-হাটা থেকে একটা ঘোড়া কেনে। মনে হয় সেটা পুরানো ঘোড়া— যা অর্ধেক সাহেব। সে তা না কিনে — পুরো একটা ঘোড়া কিনে বাড়ি যায়। সেই থেকে তার নাম ঘোড়া জোতদার।

গল্পের শেষটা বদলে যায়। ঘোড়া জোতদার যে ঘোড়া কিনল — তা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখে — রান্নাঘরে তার বৌ ' ধনের মাও' এর সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। ধরনী জোতদারনীর নতুন আধিয়ারের ঝাণ্ডা গাড়া ঝাণ্ডা খোলার ব্যাপারটা যতদিন আটকে থাকে ততদিনই এসব ঘোড়া কেনাকিনির গল্প চলতে থাকে। বন্ধ হয় দলগাঁও চা বাগানের জমি দখল শুরু হওয়ার পর থেকে।

ছোটদাদা যার না আছে জোত, না আছে গোত। সে বুড়িমার গোতের এক ঢেমনার ছেলে— সেও এই গল্প গুলি শোনে, জানে, আন্দাজ পায়। 'যেমন আন্দাজ পায় তার লাঙ্গলে ওপড়ানো মাটি দেখে— মাটিতে কতটা রস আছে।'

বৈশাখের প্রথম দিকে বেশ বড় বৃষ্টি হওয়ায় ছোটদাদা কাছের জমি জমা ছেড়ে বেশ দূরের একটা ডাঙ্গা জমির দিকে হাল-বলদ নিয়ে হাঁটা দেয়। সাধারণত এসব উঁচু জায়গায় জ্যৈষ্ঠ মাসে হাল দেয়া হয়। এই পাছাডাঙ্গার মাটিতে ছোটদাদা বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত একচাষ, দো-চাষ করে।

'ছোটদাদার চাষে এক স্বয়ং সম্পূর্ণ অনন্য নির্ভর শ্রম ছিল কিন্তু তা সে জানে না। জানলে তার মনে প্রশ্ন জাগত—ক্ষেত বাড়ি খান তো মুই পাকাছি। মুই আছো তো ক্ষেতবাড়ি আছোঁ, হাল আছোঁ, ফলন আছোঁ। মুই নাই তো ক্ষেতবাড়ি নাই, হাল নাই, ফলন নাই। পাখি য্যানং বাসাত ফিরে, মুই স্যানং ক্ষেতত আছি। মোর এই হালখান আর আকাশের এই মেঘখানের মধ্যিখানত কোটত আছে জোতদার? জোতদার কায় হয়? কায় জোতদার?' যার আত্মপরিচয় জোত নাই, গোত নাই দিয়ে তার কঠোর শ্রম প্রদানের পর প্রশ্ন জমতে থাকে জোতদারের বিরুদ্ধে। ধরনী জোতদারনীর নতুন আধিয়ার, ছোটদাদারা একই শ্রেণির। এদের শ্রেণি সংগ্রামের একটা প্রস্তুতি চলছে।

বৃষ্টি ও ঘামে ভিজে ছোটদাদা পাছাডাঙ্গা চাষ করে। একটু বৃষ্টি ধরতেই দ্বি-প্রহরে ভীষণ খিদে নিয়ে হাল

বলদ নিয়ে বাড়ি ফেরে। সে কষ্ট পায় এতক্ষণ জল না খেয়ে বলদ জোরা কেমন করে খেটেছে এই ভেবে। ছোটদাদা নিজে বালতির জল খেয়ে টিনে করে বলদের জন্য জল আনে।

বলদকে জল খাইয়ে সে খাওয়ার ঘরে গিয়ে বলে ' গেলেন কোটত সগায়?' ডাকে ' খোয়া দিবেন কায়?' ' সে ডাকে যেন কিছুটা সংকোচ জড়িয়ে থাকে।' অন্যরা এভাবে এলে ' মাও', 'ভাজী', 'বড়কিলামা' বলে ডাকে। কিন্তু সে তো ঢেমনার ছেলে সে কাকে কী বলে সম্বোধন করবে। আর এরকম স্বগতস্বর রাজবংশী সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য — ছোটদাদা তার ব্যতিক্রম নয়। বাঙ্কুরামের বৌ ধোলী এসে বৃষ্টিতে ভিজেই রান্না ঘরে ঢুকে — হাড়ি থেকে ভাত তুলে ছোটদাদাকে জিজ্ঞাসা করে সে দলগাঁওয়ে গিয়েছে কিনা। ছোটদাদা জিজ্ঞাসা করে কোন দলগাঁও। কারণ এখানে তিন তিনটি দলগাঁও। এক—বীরপাড়া রেল ষ্টেশন দলগাঁও, দুই—বুড়িমার উত্তরে চা বাগান দলগাঁও, আর বুড়িমার গোত হয়ে ওঠার আগে এটার নামও ছিল দলগাঁও-সরুগাঁও। এ ঘটনা ৬৮ সালের বড় বানার আগে — তখনও বুড়িমার গোত পুরোপুরি বুড়িমার গোত হয়ে ওঠেনি।

'ধোলী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে যায় , মদেশিয়া মানষিলা বস্তির মানষিলা মিলি তামান বাগানখান দখল নিবার ধরিছে। ঝাণ্ডা উড়িয়ে চোঙা ফুঁকিছে। হাল চলাছে। সগায় তো বাগান দখল দেখিবার গিছে।'

ছোটদাদা ভাত খেতে খেতে ভাবে — 'যাবা লাগে। বাগান দখল কাক কয়।'

শুকনো, ঠাণ্ডা, খড়খড়ে ভাত নুন দিয়ে মেখে খেতে ছোট দাদার একটু সময় লাগে। প্রায় আড়াই প্রহর হাল চালনার খিদে। ভাত খাওয়া শেষ করে কুয়ো পারে গিয়ে থালা ধোয়, তারপর বাগান দখল দেখতে বুড়িমার বাগান বাড়ি থেকে বেরবার সেই বনপথ ধরে সে যায়। পাকা রাস্তায় উঠে দেখে কোথাও কোন মানুষ নেই। অনেকক্ষণ পর নজরে পরে দূরে - লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, কোন দৌড়াদৌড়ি নেই। ' এইবার ছোটদাদা পায়ে পায়ে ওই ভিড়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে 'ভিতরে হাল দেয়া হচ্ছে।' পাঁচ সাতটা হালের হাল দেয়া। মাটি ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে, ঢাল মাটি, সবুজ মাটি। সবাই চষা মাটি, উপরানো মাটি দেখছে — ছোটদাদাও দেখছে।

দেখা হয় বিদুনীর সঙ্গে। বিদুনী বড় বাবা আষাঢুর ছেলে ছোয়াআষাঢুর বৌ। ' ডাকোছে' জিজ্ঞাসা করায় ছোটদাদা বলে 'কায়'। বিদুনী বুড়িমার বাড়ির লোকজনের কথা বলে। তারাও এসেছে বাগান দখল—একটা

অন্যরকম দখল দেখতে। শুধু চাষ চলছে দেখে এবার ওরা ফিরে যাচ্ছে। ছোটদাদা বোঝে কোন গোলমাল পাকেনি তাই লোকজনের শুধু ভিড় অন্য কিছু নয়। তবে ভাবে এত হাল এল কোত্থেকে।

চিরকাল বুড়িমার গাঁও আর চা বাগান পাশাপাশি। কিন্তু রাজবংশী মানুষদের সঙ্গে চা বাগানের মদেশিয়া, নেপালী শ্রমিকদের কোন মিল নেই। যাতায়াতও তেমন নেই। ওদের উভয়ের পুজো আচ্চা, আচার ব্যবহার আলাদা। কোন বিনিময় নেই। ' বিনিময় ঘটে মাত্র তিনটি অনিয়মিত উপলক্ষে।

১) নেশা করা ২) কালীপুজো আর ৩) হাতির পাল বা বাঘ তাড়ানো। এ তিনের মধ্যে কালীপুজোর তিন চারদিন নিয়মিত ভাবে ভাব বিনিময় হয় প্রতিবছর। কিন্তু তাতে জমি দখলের জন্য বুড়িমার গোতের মানুষ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়তে আসবে কেন? তারা বাগানের বাইরের পতিত জমি দখলে না খুশি, না দুঃখিত। ক্ষেতের জমি দখলে তারা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে — বাগানের জমিতে তা নয়। তাই তারা এ দৃশ্য থেকে সরে যাওয়াই যুক্তি যুক্ত মনে করেছে।

ভিড়টা ক্রমে পাতলা হয়ে যাচ্ছে — ছোটদাদা ঘুরে ফিরে দেখছিল। ছোট দাদা ক্রমে উৎসুক হয়ে ওঠে। সে ডান হাতি বাঁহাতি বাঁক ঘুরে সব জমিটা দেখে। দেখে একটা লাল প্লাস্টিকের চাদরের তলায় এক বাবু সব তদারকি করছে। জমির ওদিকে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও ছোটদাদা যেতে পারে না — কারণ কেউ যাতায়াত করছে না। ছোটদাদার জানার দরকার নেই — সে অভ্যাসও নেই। ' তবু মানুষ তো খবর জানতে চায়। কোন কারণ না থাকলেও চায়। এইসব কারণে ছোটদাদা খবর জানতে পারে বৈকি। সে জন্য এদিন ছোটদাদা খবর জানতে চাইছিলই। আর সে জন্যই এদিক ওদিক ডান-বাঁ পাকে ঘুরে এমনকি জমিতে নেমেও জানতে চাইছে কী হল, কী হবে। এক ছাতাওয়ালা লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তাকে সে জিজ্ঞাসা করে — ' মাটি তো কাঁদো হয়্যা যাচ্ছে। আর হাল দিছে কেন'? লোকটি জানায় ' হয় হয়। অ্যালায় তো তুলিবার লাগে।' কাল আবার জমি দখল হবে কিনা ছোটদাদা একথা জানতে চাইলে সে ঐ একই কথা বলে।

যার কিছু নেই - সেই ছোটদাদার কিছু জানার আগ্রহ দেখা দেয়।

ছাতাওয়ালা লোকটি ছোটদাদাকে তাদের লোক মনে করে। সে ওই লাল চাদরের তলায় লোকটির দিকে এগিয়ে যায়। সে জানায়, ' রাতিত অ্যানং বৃষ্টি হলে মাটি ধুইয়া যাবে'। কোন মাটি কেন ধুইয়ে যাবে? এই প্রশ্নটিই যেন হাজার প্রশ্নের একটি হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য ছোট দাদাকে ওই মদেশিয়া লোকটির কাছে মজদুর ইউনিয়নের নেতা কাপুর ও কালী কমরেডের কাছে জবাব দিহি করতে হয়। দেউনিয়া ও কিষাণ সমিতির

নেতা হরিমোহন তাকে বলে ' কোটত থাকো।' উত্তর—'হুততি'। সেও সহমত পোষণ করে যে বৃষ্টি হলে মাটি ধুয়ে যাবে। তাই —'হাল তুলো হাল তুলো' বলতে থাকে।

হাল তোলার আওয়াজ চারিদিকে ছড়াতে থাকে। 'কাপুর ছোট দাদার কাঁধে হাত দিয়ে, বাঁ হাতটা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বলে ' চলো কমরেড, ইসকো বলতা হ্যায় কিষাণ মজদুর একাই চলো।' শুরু হয় কিষাণ মজদুরের একই সঙ্গে চলার পালা। ওরা একই সঙ্গে বহুক্ষণ চলে — নানা কথা হয়। ওদিক থেকে ওরা হালবলদ নিয়ে ওদের দিকে আসে। পথে যেতে যেতে দু'জনে কথা হয়, ওরা যুগ যুগ ধরে এতো কাছাকাছি থাকে অথচ কেউ কাউকে চেনে না। ছোটদাদা বাগান চেনেনা, কাপুর হাল চেনে না। এই না চেনার পেছনে কাপুর পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র আছে বলে জানায় — ' ই দুনিয়াকো দুশমন হ্যায় মালিক , মালিক লোক, পুঁজিবাদ'। পুঁজিবাদ নাহি মাংতা, কিষাণ মজদূর কো জানে, মজদুর কিষাণ কো জানে। ই হামারা বাগান কো মালিক। ঔর তোমরা মনকো ক্ষেতি জমি কো মালিক, সব হ্যায় পুঁজিবাদ। কাপুরের বিশ্বাস —'কিষাণ, ঔর মজদুরকো একাই হোনেসে পুঁজিবাদ খতম হো যায়গা।' ওরা এজন্যই নানা ছলে জনমভর কিষাণকে মজদুরের সঙ্গে এক হতে দেয়নি। ওরা এভাবে কথা বলতে বলতে ওদের দখলি চষা জমির শেষ প্রান্তে আসে ও ছোটদাদা আরও কিছু পতিত জমি দেখতে পায়। জানতে চায় সেগুলি কাল দখল করা হবে কিনা। উত্তরে কাপুর জানায় না কাল নয়— পরে ইউনিয়নের মিটিং হলে তারপর। কিন্তু সে উত্তরে ছোটদাদা খুশি হয়না। সে আবার ঘুরে ফিরে ওই পতিত জমির কথা তোলে। কাপুর বলে, ' আভি নয়া সরকার কায়েম হুয়া'। সুতরাং সবই এখন সরকারের। এবং এ সরকার কৃষক মজদুরের সরকার, যুক্তফ্রন্ট সরকার। সুতরাং - 'কমরেড ই তো ষ্ট্র্যাটেজি ঔর ট্যাকটিজ কা মামলা হ্যায়।' এখানে কৃষক মজদুর ঐক্যের কথা, পুঁজিবাদের কথা, পুঁজিবাদের ধ্বংস করার কৌশলের কথা এবং নতুন সরকারের রণকৌশল আলোচিত হলো। ছোটদাদাকে শেখানো হয়েছে— সাম্য রাজনীতি।

ছোটদাদা বুঝতে পারে এখানে যারা হালবলদ নিয়ে এসেছিল তারা এদিকেরই মানষি। এখন তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। ' গোহালিয়া মুখা বলদ আর ঘর মুখা হালুয়া আর বৌ মুখা ঘরুয়ার দুই খান চোখ একখান করি কমি যায়।' ছোটদাদা এখানেই থিতু হয়ে বসে থাকে। সে জানে না জমি দখলের সঙ্গে ঐ চা বাগান, মজদূর ইউনিয়ন কৃষক সমিতির কী সম্পর্ক। কাপুর বারবার ছোটদাদাকে কেন কমরেড বলে ডাকে— কী এর মানে বুঝতে পারে না। সে আরও ভাবে তাকেও হয়তো ডিউটি দেবে রাত জাগার। কিন্তু কেনই বা দেবে। সে বলে 'মোর তো তোমরালার ইউনিয়ন নাই, উমরালার সমিতিও নাই। মোক ডিউটি দিবে কায়? সে কেন কমরেড

হবে...মুই ক্যানং করি ঐখান হব? মুই তো ইউনিয়নের মানষিই না হই।' ...' কায় কহিবার পারে মুই তো সমিতিরও মানষি না হই।' ..... কায় কহিবার পারে মুই তো সমিতিত যাবার না পারি।' কোন পরিচয় ছোটদাদার নেই, তবে সে কেমন করে কমরেড হবে। কাপুর উত্তর খোঁজে— হঠাৎ বলে ' ওহিদফে হামরামন তোমরামনকো কমরেড। কিঁউ? না, হিয়া হ্যায় ব্যারিকেড ....' 'ব্যারিকেড কো উসপার মে হ্যায় দুশমন, হামরামনকো শ্রেণির দুশমন। ব্যারিকেড কো ইসপার হ্যায় তোমরামন হামরামন, মজদুর কিষাণ, কমরেড'। কাপুর আচমকা গান ধরে 'হাম ভুখসে মরনেওয়ালে', কিয়া মৌতসে মরনেওয়ালে? এ গান ক্রমে চারিদিকে অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত কণ্ঠে বিভিন্ন স্তবক গীত হতে থাকে। তারা সকলকে ডাকছে ' আব কোমর বান্ধো, তৈয়ার হও লাখ কোটি ভাইয়ো।' কাপুর বুঝায় এ কিষাণ মজদুর সবার গানা। ছোটদাদা প্রশ্ন করে ' উমরা হালুয়া মানষিলা, মোর দেশি মানসিলা, কোটত পালেন এই গান খান? উত্তর— 'লড়াই সে'। এবার ছোটদাদা বলে 'লড়াই লড়াই করিবার ধরিছেন, মোর তো কুনো লড়াই নাই। কার নখত লড়াই করিম?' কাপুর ছোটদাদাকে ক্রমে যে জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে ছোটদাদা সেই জায়গাটাকে নিজের জায়গা ভাবতে পারছে না। ছোটদাদার জীবনের বেশির ভাগ জায়গাই তো নিজের নয় এমনকি বুড়িমার গোতও। সে ভুখাও নয়। বুড়িমার গোতে তার ভোখ নিবারণ হয়। বরং তাকে কেউ ভুখা বললে সে রেগেই যাবে। কাপুর তাকে তৈরি করার জন্য কালী কমরেডের কাছে নিয়ে যেতে চায়।

কাপুর টর্চ জ্বালিয়ে ছোটদাদাকে কালী কমরেডের কাছে নিয়ে যায়। কালী মজদুর ইউনিয়নের নেতা। কালী ছোটদাদাকে মিটিং মিছিলের কথা জিজ্ঞাসা করায় ছোটদাদা ধূপগুড়ি মিছিলের মিটিংয়ের কথা বলে। এও বলে তা ছিল লেভির মিটিং। কালী তাকে শ্রেণি সচেতন করার জন্য তার দুঃখ, দারিদ্র্য, জোতদারের শোষণ বঞ্চনার কথা বলে। কিন্তু ছোটদাদার বার বার মনে হচ্ছিল, 'মুই না খাওয়াইয়া না হই, মুই ধান করজা নেয়ার আধিয়ার না হই। মোর কুনু জোতদার নাই। মুইও জোতদার না হই, মুই কার নখত লড়াই করিম।' সে এখন তার লড়াই তার পাওনাটা বুঝে উঠতে পারেনি। কালী সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও ছোটদাদাদর প্রশ্ন ' বাবু, মুই কি চাছি সেটা কহি দেন।' বরং উল্টে সে কালীকে বলে ' বাবু, এইটে অ্যালায় জোতদারি হবে।' কালী তখন তাকে বোঝায় এ আধিয়ারি নয়, 'এখানে চাষিই তো পুরা।' জমিরও পুরা, ধানেরও পুরা।' ছোটদাদা এবার বাবুকে বলে ' কী আপনি যা কহসেন, একখান পুরা চাষ বাড়ি দেন, আপনার এইটে।' ছোটদাদা পরে অবশ্য সংশোধন করে ' মুই তো আকাশের জল চিনি বাবু, মাটির জল চিনি, মুই তো মাটি চিনি

বাবু।' ছোটদাদা থেমে যায় — কথা গুলি ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যায়। ' কথা ফুরিয়ে ফেলে।'

কাপুর এবার ছোটদাদাকে কিষাণ নেতা হরিমোহন কমরেডের কাছে নিয়ে যায় তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও— কারণ সংগ্রাম ও সংগঠন করতে হবে তো। আসে পাহারা প্রসঙ্গ, মশাল জ্বালা ও না জ্বালানোর। হরিমোহন বলে—'নিজের ইচ্ছা এখনও নিজে বুঝেন না? কী করেন? আধিয়ার? — 'না হই।' ক্ষেতমজুর হালুয়া? ' না হয়'। বাপের ছোট জমি আছে? ' না হয়' ' বাপো আছে কী নাই। — উত্তর দেবার সময় চলে যায়। জমি দখলের প্রশ্নে ছোটদাদা বলে — ' যে জমি মোর হালে আসিবে না সে জমি মুই দখল করিম কেনে?' হরিমোহনের উত্তর ' সেই জমির দখলদার যে তোমার জমিটা দখল দিবে।' দো-রুটি, দো-আলু, এক মিঠাই খাবার আসে। ' কাপুর তার মিঠাইটা ছোটদাদার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে ' ই মিঠাই কিষাণ মজুরকো একাইকো মিঠাই।' ছোটদাদা যতই তার অধিকার বঞ্চনার হদিশ থেকে দূরে যায়, ততই কাপুর, কালী, হরিমোহন তাকে সচেতন করতে চায়। সংগ্রাম ও সংগঠনের মধ্যে আনতে চায়।

রাত প্রায় শেষ। কাপুর আর ছোটদাদা পুবের অংশে চলে এসেছে। হো-ও-ও-ও-ও করে পাহারা চলছে। কাপুর ছোটদাদাকে আওয়াজ দিতে বলে, ' মুই না পারো' বললেও এক রকম জোর করেই ছোটদাদার মুখে রো-ও-ও-ও শব্দ করিয়ে নেয় কাপুর। রাত কেটে গেল, কাপুর প্রশ্ন করে তার সঙ্গে ছোটদাদার কেমন কাটল? — আবার জিজ্ঞাসা করে ' হামারা নাম কিয়া'। এরপর বলে তার নাম 'ভিকটর' ঘারোয়া উড়াও, বাবার নাম অর্জুন উরাও। মা-বাবা দু'জনেই খ্রীষ্টান। কিন্তু সে ওসব ধর্ম টর্ম মানে না। সে নাম নিয়েছে তার সিনেমার পছন্দের নায়ক শাম্মী কাপুরের নাম। এফিডেভিট করে এই কাপুর নাম সে চা বাগানের লিস্টে তুলেছে। বাগানের বাবুরা প্রথমে রাজি হয়নি। পরে বাধ্য হয়েছে। ছোটদাদা এসব কথা শুনে 'এখন রাত শেষে বাড়ি ফেরার আগে হাসতে হাসতে তার কেমন ঝরঝরে লাগে।'

এবার আন্ধার পাকে কার্তিক সংক্রান্তি পড়ায় ধান কাটার সুবিধা হয়েছে। অঘ্রান মাসের মাঝামাঝি সময়ে ধান কাটা যাবে। তখন ধানের ভিতরের দুধ শক্ত হয়ে আসবে। ধান গাছ গুলি শুইয়ে দিতে হবে— 'বাসাতে হবে'। গরুগুলিকে তখন ধানকাটার ঋতুর উপযুক্ত করে তুলতে হয়। তাই গরুচুমানির প্রস্তুতি চলছে। হলুদকোটা চলছে। হাঁট থেকে সিঁদুর কেনা হবে। মননী ও কলেশ্বরী হাটে যায়। টিপ আনে। বাড়ির অন্যান্য বউরা এই টিপ নিয়ে রস রসিকতা করে। গরু চুমানি শুরু হয়। ছেলেরা গরু গুলিকে পুকুরের জলে চুবাতে থাকে। সে দৃশ্য দেখবার মত।

' গরু গুলিকে প্রায় লাইন করে সাজানো হয়েছে। যতটা লাইন বাঁধানো সম্ভব।' কার্তিক সংক্রান্তি গরুচুমানি ব্রত।' গো-সম্পদ দেখে বাড়ির লোকজনদের মধ্যে আনন্দ, বাড়ির নানা সম্পর্কের বউরা এ উৎসবে অংশ নেয়। এ ব্রতে বাড়ির বৌ হিসাবে ' এখন যখন বুড়িমার কথা মনে পড়ে গিয়েছে, তখন বুড়িমাকে আনতেই হবে। বুড়ি ঝারীর ঘরে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে আছে। সে বুড়িকে পাঁজা কোলা করে নিয়ে আসে। ছোটদাদা ঝারীর পেছনে আসে।

আজকের এই গরু চুমানী ব্রতের 'প্রধান প্রতিমা নিয়ে তারা যেন মন্দিরে ঢুকেছে।' ছোটদাদা বুড়ি গাইয়ের পায়ের দিকটাতেই বসে, কলিন বুড়িমার শিয়রে দাঁড়ায়।' ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির বৌয়েরা-মেয়ে গরুর শিংয়ে, কপালে, ক্ষুরে কাঁচা হলুদ বাটা, তেলসিঁদুর, ধানদূর্বা লাগিয়ে দেবে। যে যার স্বামীকে রাখোয়াল ভেবে বৌয়েরা রাখোয়াল চুমানি করে। ব্রতের শুরুতে বাড়ির সবচেয়ে বুড়ি বৌ সবচেয়ে বুড়ি গাই বা বলদকে চুমানি দেয়। তারপর পর পর অন্যান্যরা দেয়। সেভাবে ছোট বৌ দেয় বাছুর বা গাইকে।

বুড়ি গাইয়ের মুখের দিকে ধোলী বুড়িমার হাটটা টানতে গেলে ছোটদাদার কপালে চুলে বুড়িমার হাতের সিঁদুর-হলুদ লেপটে যায়। এ ঘটনায় কেউ হাসে। কেউ ছোটদাদাকে 'বুড়ো বলদ' বলে রসিকতা করে। কিন্তু এ যেন অজান্তে বুড়ি নিজ হাতে ছোটদাদার কপালে তিলক এঁকে দিল। গল্পের শেষে এই ছোটদাদাই তো বুড়িকে বিসর্জনে নিয়ে যাবে - পিঠে করে। এ যেন উত্তরাধিকার বাছা হয়ে গেল। যে ছোটদাদার গোত নেই, বাড়ি নেই, ঘর নেই, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই — পিতৃপরিচয়ও নেই বললেই হয়, সেই 'নেই' হবে অন্যতম নায়ক চরিত্র। গরুচুমানির পর রাখোয়াল চুমানি। বউয়েরা গান ধরে—' ঐ রাখালিয়া মোর কপালে নাই / আইসেক সোয়ামি, তোঁহক চুমাই।' বুড়িমার বাড়িতে যে কোন কথা অর্থান্তরে চলে যায় সে জন্য এই গানের অর্থও পাল্টে হয়- রাখোয়াল রাখার সৌভাগ্য নেই, তাই সৌভাগ্য যে স্বামীকে এমন আপনার করে পাচ্ছে। গরুকে আলাদা করে খাওয়ানো হলে — শিকারে যাওয়া, খরগোশ ইত্যাদি এনে ধরে আনা হয়। লাউ কেটে বাছুরের খাবার তৈরি হয়।

কার্তিক সংক্রান্তির দিন গরু চুমানির পর গরুবাছুরকে বাখর খোয়ানো হয়। সে জন্য ছোট আষাঢু, কলকলী লাউ কেটে, পেঁয়াজ কেটে একসাথে জলে মেখে বাখর তৈরি করে। ছোটদাদা, আষাঢু বাখর খাওয়ায়। এ নিয়ে মেয়েরা গান গায় 'অগে মোর রাখালিয়া মোর কপালে নাই।' বাখর খাওয়ানো হয়ে গেলে ছোটদাদা আর ছোটআষাঢু শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। আগে ধানরাম গেছে। বাঙ্কুরামও আছে, ওরা বড়বাঁকদিয়ে

দুদুয়ায় যাবে— এরকম কথা হয়েছে।

ছোটদাদার অনুমানই ঠিক, ওরা ফরেস্ট ভেঙে বড়বাঁক পেরিয়ে, দুদুয়া পেরিয়ে গোঁসাইয়ের হাটে উঠেছিল। ওরা বরা শুয়োর শিকারের জন্য নদীর চরের বালিবাড়ি বাছতে চাইছে। কারণ তাতে শিকারকে খেলে খেলে শিকারের উত্তেজনা নিয়ে মারা যায়। জালে শিকার ধরার জন্য ছোটদাদা — জালের খোটা গাড়ে। একাজ এখন ছোটদাদা ভালো পারে। শিখতে হয়। জাল বিছিয়ে, শুয়োর তাড়িয়ে তাকে ধরার চেষ্টা হয়। 'কোন ধ্বনি নেই অথচ শিকার শুরু হয়ে গেছে। ছোটদাদার শরীরে শিকারের উত্তেজনা। বরা জালে আটকে যায়। ' জালে আটকে যাওয়া বরাটার ওপর তখন ঘিরে ধরা ঘর্মাক্ত মানুষের হাঁফ ধরা শ্বাস, লাঠি, বর্শা, কাঠের গদার সঙ্গে উঠছে, পড়ছে। উঠছে, পড়ছে। ছোটদাদা শুয়োর ধরার সময় জালে প্রায় আটকে গিয়েছিল। ' সে জালে আটকানো বরা পেটাতে যায় না।' শিকারের অনিশ্চতার মুহূর্তের উত্তেজনা, তৃপ্তি এখন ছোটদাদার শরীরে। 'ছোটদাদা সেই বরা পেটানো ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে দুদুয়ার ওপারের দিকে একটা হাঁক ছাড়ে— হৈ-হো-ও-ও।'

শিকার করে শুয়োরটা ক্ষেতবাড়ির একটা ডাঙ্গায় ফেলে রাখা হল। বরার বাসি মাংস নাকি নরম হয়, সেজন্য এরকম ফেলে রাখার রীতিও আছে। তবে এভাবে মাঠের মধ্যে ফেলে রাখায় তো ঝুঁকিও আছে। ভরসা ওই কুকুর ভেউলা। বুড়িমার গাঁওয়ে একটাই কুকুর ভেউলা। সে এ বাড়ির একজনের মতো প্রতিপালিত। অন্য কুকুররা তার কাছে ঘেঁষতেই পারে না। বছরে দু-চার দিন সে বাড়িতে বলে কয়ে'ই ডিউটি সারতে যায়। তারপর এসে আবার নিজের কাজে মন দেয়—

'বুড়িমার গাঁওয়ের একটাই বাড়ি— বুড়িমার বাড়ি। সে গাঁয়ে একটাই কুকুর ভেউলা।' বরার কাঁচা রক্ত ও মাংসের গন্ধ পেয়ে সে ছুটে আসে। তারপর থেকে এক পলকের জন্যও শুয়োরটাকে ছাড়েনি। সারা রাত ওই মাঠে ফেলে রাখা মৃত শুয়োরটাকে পাহারা দিয়েছে। মাঝে দু'একবার মরণপণ চিৎকার করেছে — একবার শিয়াল এসেছিল। আর একবার কী এসেছিল জানা যায় নি।

প্রায় একটা গোটা জিকে গাছ কেটে আনা হল। একদিক ছুঁচোলো করে বড় চিলা ঐ মরা শুয়োরের পাছায় লাঠিটা ঢুকিয়ে দেয়। এরপর শুয়োরটাকে আগুনের ওপর ধরে — সেঁকতে থাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নিচের জ্বলন্ত আগুনে শুয়োর পুড়তে থাকে। বাঙ্কুরাম কাউকে বাড়ি থেকে নুন হলুদ আনতে বলে।

ছোটদাদা সেই ডাঙ্গার উল্টো দিকে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। পাশে এসব উল্লাস চলছে। কাল গরুচুমানি গেছে।

আট-দশ দিন পর ধান কাটা শুরু হবে। তখন শ্বাস ফেলার সুযোগ হবে না। সেই ফসল কাটার সম্ভাব্য ব্যস্ততার মধ্যে সে নিজেকে দেখতে পায়। ছোটদাদা বুঝতে পারে না। কাল যে এত উৎসাহে শিকার করল আজ কেন তার এতো অনাসক্তি। ছোটদাদা এটাও ভাবতে পারে না আট-দশ দিন পর যে ধানকাটা শুরু হবে — তাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে এতো আড় লাগছে কেন? সে ঢেমনার ছেলে। বুড়িমার গোতে সারা জীবন কাটিয়ে তার নাম ঢেমনা সবার কাছে। ছোটদাদারও তাই। সেও সবার ছোটদাদা। আলাদা কোন নাম পরিচয় তৈরি হল না। কেন সে নিজেকে বেজন্মা বা জারুয়া ভাববে না?

আবার না ভাবাটাও স্বাভাবিক। কারণ তার বাবা ঢেমনা, তার মা এবাড়িতে নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তো দিন কাটায়। সে তো গোতেরই একজন। এ কথা সবার জানা। তাহলে তো ছোটদাদা তেমন বেজন্মা নয়ও।

কিন্তু ছোটদাদার এমন ভাবার কারণ হল সে বাপ-বেটা, মা-বেটা বড় দাদার সঙ্গে দাদা ভাই সম্পর্কে পরিচয় হতে পারেনি। সে রকম সম্বোধন তৈরি হয়নি। এমন কি বড়দাদা ও তার মাকে জানে কী না ডাকে কী না— সেটাও ছোটদাদা জানে না।

এখন সবাই মাঠে শুয়োর পোড়ার গন্ধে মাতোয়ারা। কেউ কেউ বরাকে নিয়ে সুরও ভাজতে থাকে ' ও মোর সাধের বরা রে', কেবল ছোটদাদার মনেই একটাই ভাবনা জ্বল জ্বল করছে — ' মোর কেনে ধান কাটা থাকিবে, মোর কেনে ক্ষেতবাড়ি থাকিবে, মুই কায় এই ক্ষেতবাড়ির, মুই কায় হম এই ধান কাটার।' 'ছোটদাদার অনন্য নির্ভর স্বয়ম্ভরতা চুর চুর ভেঙে পড়ছিল'

ধানকাটা শুরু হয় বর্ষার বৃষ্টির মত। চারদিকে, কখনো পাঁচদিকে, নদীর ঢাল, ফরেস্ট ধরলে কখনো নয় দিকে থৈ থৈ করছে পাকা ধান। তার মধ্যে হাওয়া খেলছে। যেন তিস্তার স্রোতের ভেতর দিয়ে কোন সোলংগা পাড়ি দিচ্ছে।

বুড়িমার বাড়িতে রাতের খাওয়ার পর ছিলিম টানতে টানতে দুখারু জানায় যে —সে ঢনঢনিয়ার ক্ষেতে ধান ডলা দিয়ে নুইয়ে দিয়েছে, এবার কাটা শুরু করতে হবে। পরের সকালেই ওই ক্ষেতে ধান কাটা শুরু হয়ে গেল। ডাঙ্গির মাঠের ধানেও ডলা দেওয়া হল। ধান কাটা হলে সেগুলো তোলার জন্য খোলান পরিষ্কার করা হল। কলেশ্বরী বাহির এগিনা ঝেটিয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে চারদিকে ধুলাময় করেদিল। এনিয়ে পাথারনি ধমক দিয়ে রসিকতা করে বলে — 'তোর মাইয়াক আজি বিয়া দিলে পেটেলী হইবে অ্যানং বুড়ি হওয়া

ধইচছিস। আর তুই জলনা ছিটাই ধুলোর ঝড় তুলিবার ধইচছিস। ' কলেশ্বরী বলে —' মুই ভাবিছু কুঁয়াৎ ভিজি আছে।' এরপর পাথারনি কলসী করে জল আনে। এগিনা ভেজায় আর কলেশ্বরী ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে এগিনা তৈরি করে।

এতবড় এগিনা তৈরি করতে বহু কসরৎ করতে হয়। নানা ভাবে ভিজিয়ে ঝেটিয়ে তৈরি করতে হয়। পাথারনির সঙ্গে যোগ দেয় নদিনী-ঝারি-টুলটুলি-ঝাটকি-শাদুড়ি-কলেশ্বরী। তাদের পেছনে আরও বৌরা।

এবার ভেজা ঝকঝকে এগিনা গোবর দিয়ে মোছা শুরু হয়। মাঠে পাকা ধানক্ষেত, তার মধ্যে বাতাসের দোলা। এগিনা জুড়ে এতগুলি নারী শরীর খোলা রোদহীন আকাশের নিচে স্নিগ্ধ অথচ খোলা ঘাড়, গলা, বুক, বাহু, হাত, পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগিনায় ঘুরছে, ঘুরছে, বসে বসে ঘুরছে। গোবর লেপা করতে করতে গোবরমাটির পলেস্তরা ফেলা হচ্ছে। এখানেই কাটা ধানের খোলান পড়তে থাকবে।

এই গোবর লেপা শুকনো বাহির এগিনায় প্রথম ধান এনে ফেলল দুখারু-বুনুয়া-ঝটু-সেই ঢনঢনিয়ার মাঠ থেকে। ধান এসে ফেলার সময়েই বাড়িতে এসে উপস্থিত হল কাছুয়া মহম্মদ। সে একা আসেনি। সঙ্গে এনেছে একটি লোককে যার মাথায় বুড়িমার জন্য আনা ভেট। ঠাকুরানীর ঘরে বসা আধবসা কানকাটুর কাছে এসে কাছুয়া তাকে আদাব জানায়। কুশল জিজ্ঞাসা করে। এর মধ্যে বিসারু ধানবাড়ি থেকে এসে কাছুয়া মহম্মদকে দেখে তাকে খাতির করে দারিঘরে একটা কাঠাল কাঠের চেয়ারে বসায়।

ডাঙ্গির মাঠ কাছুয়া মহম্মদের। তিন পুরুষ ধরে বুড়িমার গোত চাষ করে ভাগ দিচ্ছে। আসলে ৫৫ সালের আইন অনুযায়ী ও জমি খাশ। কিন্তু এতদিন তা সরকার দখল না করায় বা বিলি না করায় — কাছুয়া ভোগ করে আসছে। এখন নতুন সরকার এসে নোটিশ দিচ্ছে খাশ জমি উদ্ধারের জন্য। একথা জেনে কাছুয়া মহম্মদ এসেছে বুড়িমার গোতকে তা দিয়ে দিতে। আধিয়ার হিসাবে তো ও জমি বুড়িমারই প্রাপ্য। ভাল মানুষ সেজে কাছুয়ার — বুড়িমার গোতে এসে সে জমি দিতে চাওয়া সদিচ্ছা না নিরুপায় আত্মসমর্পন বোঝা মুশকিল। বুড়িমার আর্শিবাদ মাথায় নেয় কাছুয়া।

কাছুয়া মহম্মদ চলে গেলে সবাই যে যার কাজে ফিরে যায়। অগুনরা ডাঙ্গির মাঠে চলে যায়। ধান কাটায় যোগ দেয়। ডাঙ্গির মাঠ কাছুয়া মহম্মদের নয়, খাশ জমি, পনের বছর আগে খাশ জমি হয়েছিল। কাছুয়ার এই 'ঘোষণা' যা পনের বছর আগে ঘোষণা ছিল। আজ পনের বছর পর তা ঘোষিত হওয়ায় — এর অর্থ কত দিকে উচ্চারিত হতে লাগল। 'এই কথাখান তো কহা কামছিল, ধরো কেনে আজিঠে পাঁচ বছর কম এক কুড়ি

বছর আগে। যেই খান কথা যখন বলার তখন যদি বলা না হয় তো কথাখানের সোয়াদ বদলি যায়।' ..... কথা তো স্যালায় একখান গোটা বৃক্ষ।' গাড়িলেন কথা। হছে পাটের দড়ি। গাড়িলেন কথা হছে পাটের মাদুর। '..... কথা কহিবার নয়। কথা তো জলে ভাসি দিবার। গড়ি দিবার কথা তো সোঁত ধরি জলের পাথারে মিলায়।' ডাঙ্গির মাঠ সম্পর্কে পনের বছর আগের কাছুয়ার কথা ছিল মিছা, বুড়িমার আধিয়ারিস্বত্ব ছিল মিছা, কিন্তু খাটুনি ছিল সাচা। এবার ছোটদাদা মিছা হটিয়ে ডাঙ্গির মাঠ দখল নিয়ে মিছা কথাখান সাচা করতে চায়। তাই সে বলে —

'মোর কি কুনো গোত আছে? মোর গোতও নাই, জোতও নাই। মোর এক সাচা আছে। মুই নিজে সাচা হম। মুই ডাঙ্গির মাঠ টাক সাচা বানাম।'

ছোটদাদার মনে উঁকি দিচ্ছে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার বাসনা। বুড়িমার গোত চাইলে সে জমি পাবে, জমির পাট্টাও পাবে। কিন্তু তা তো দান বা অনুগ্রহ। সে তা চায় না। চায় নিজ অধিকার। নিজের আইডেনটিটি। মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি।

কাছুয়া মহম্মদের একটি কথা সময়ের হেরফেরে কীভাবে বহু কথার জন্ম দিচ্ছে। বহু ভাবনার, অধিকার বোধের জন্ম দিচ্ছে।

ছোটদাদা তাড়াতাড়ি ধান কাটছিল। 'ছোটদাদা কাচি দাওটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। 'ছোটদাদাকে কাল জন্মান্তরে ঢুকতে হবে। তাই আজ সে এ জন্মের কাজটাকে দেখে নিচ্ছে। জমি দখলের নেশায় রাতে উঠে ডাঙ্গির মাঠের ধান কাটে, পাঁজি দেয়। লোক জোগার করার জন্য বেড়িয়ে পড়ে— কারণ একার দখল দখল নয়। দলগাঁও চা বাগানের দিকে যাত্রা করে। পথে চা বাগানের দখলদারদের বাড়ি, টাড়ি। তাদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বলে — চা বাগানের শ্রমিক লাইনে যেতে। নিজেকে নিজে চোর ভেবে সরে পড়ে। ঝাণ্ডা চেয়ে, বিফল হয়। ফিরে আসে।

দলগাঁও থেকে ফেরার পথে জঙ্গলের ভেতর থেকে এক ছালা ওকসি পাতা নিয়ে আসে। ' ছোটদাদা দলগাঁওয়ে গিয়ে মানুষও পেল না, ঝাণ্ডাও পেল না। কিন্তু তাতে কি, তার সিদ্ধান্ত এখনও বদল হয়নি। সে জমির ধানের পাঁজি করে। নাড়া জমিতে ওকসি পাতার ঘর বানিয়ে তাতে রাত কাটায়। অগুনরা সকালে দেখে তা বুঝতে পারে, ভাবে ছোটদাদা তো দায়িত্বশীল পাকা হালুয়া। তাই বুঝি কাল রাতে ধান পাহারা দিয়েছে। পরে ছোটদাদার সদম্ভ ঘোষণা — ' পাহারা নয় দখল নিছু।' তখনও অগুনরা বোঝে না। অগুন প্রশ্ন করে সে

নিজে আধিয়ার কিনা? উত্তরে ছোটদাদা বলে - 'আধি চাহি না, জমি চাছি।' ..... ' তোমরা তো দিবারই পারেন। মোর আপন জমি তো মোকই বানিবার লাগিবে।' জমি দখলের খবরটা অগুন বড়শিলা হয়ে কলিন, বুনুয়া, ঝুটু সবার কাছে পৌঁছে যায়। ' দখল' শব্দটি স্পষ্ট অর্থ বহন করে।

অগুন, কলিন, বুনুয়ারা জমি উদ্ধারের জন্য, কাটা ধান বাড়িতে আনার জন্য গরুর গাড়ি সাজিয়ে ডাঙ্গির মাঠের দিকে যায়। তারা এই দখলের জন্য ছোটদাদাকে নির্বাসন দণ্ডও মনে মনে স্থির করেছে।

ছোটদাদার আধি থেকে মুক্তি নয়, রোজ মজুরি থেকে খালাস পাওয়া নয়, সে স্বাধীন হতে চেয়েছে। কিন্তু কোন অধীনতা থেকে স্বাধীন তা সে জানে না। ছোটদাদা জানে না স্বাধীন হওয়ার পর খিদে পেলে সে কি করবে। বড়শিলা-কলিনের দলটা এসে পাঁজির পেছনে জড়ো হয়েছে। শুয়োর তাড়ানোর মত করে ওরা ছোটদাদার দিকে ধাবিত হয়। ছোটদাদা প্রথমে খালি হাতে ঘুরে দাঁড়ায়, পরে কাচি দাও হাতে মাঝ মাঠে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়ে। ওরা ওর ওকসি পাতার ঘর ভেঙে দেয়। আর নিজেকে রক্ষা করতে না পেরে ছোটদাদা যেদিকে দল গাঁওয়ে গিয়েছিল সেই দিকে ছুটে পালায় নির্বাসনে। ' এমন নির্বাসন পুরাণ পুরুষদের নির্দিষ্ট থাকে।'

।। আর এক আরম্ভ।।

বুড়ি আছে বাড়ির সর্বত্র। সবাই তাকে ছুঁয়ে দেখে সে বেঁচে আছে কিনা। তারা তাদের শরীরের তাপ বুড়িমার শরীরে সঞ্চারিত করে। তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বুড়িমা তো সাইটোনের মত নয় যে বাঁজা থেকে গোত তৈরি করেছে। বুড়িমা বুড়িমাই। বুড়িমার বুড়িমা হয়ে ওঠার আগে যখন সে এবাড়ির বৌ ছিল তখন তো সে বাঁজা ছিল না। বুড়িমা থেকে বাঁজা হওয়া তো লজ্জা।

সেবার বুড়িমার গাঁওয়ের সেই দশনদী বিশ নদীর পৃথিবীতে এমন এক বৃষ্টি চলতে থাকল। যার ফলে আগের ফলনের হিসেব, বর্ষার হিসেব এবং পরবর্তী ফসলের হিসেব সব গোলমাল হয়ে গেল। সেই বৃষ্টি কখন, কবে ধরবে তার কোন লক্ষণই নেই। এরকম একবার নাকি শীতের বেলাতেও হয়েছিল। শীত যত দীর্ঘ হচ্ছিল, শীতের তীব্রতাও তত বাড়ছিল। শীতের মত অমনি এক বর্ষা শুরু হয়েছিল। সেই জমি দখল টখলের সয়ম। বাংলাদেশের যুদ্ধের পর কয়েকঘর ভাটিয়া চাষি এসে বাসা বেঁধেছিল। দলগাঁও-সরু গাঁয়ের দশ নদী বিশ নদীর দেশে। ঐ সময় অপারেশন বর্গা শুরু হল। সে সব চুকে গেলে সে চাষিরা জলচাষ শুরু করল। ' জলচাষ মানে হাইচাষ'। একজমিতে তিন চাষ। রোয়া লাগানোর আগে ব্লক অফিস থেকে বীজ এনে বিছন

ফেলতে হবে। জমিতে জল ধরে রাখতে হবে, আবার ছাড়তে হবে। এই জল দেয়া আর ছাড়ার চাষকে বলে জলচাষ। তিন মাসের মাথায় ধান পেকে গেল। বিঘা প্রতি ছয় আট মনের জায়গায় পনের বিশ মন ধান উঠল। এই বছর দুয়েকের বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই চাষিরা সে রকম জমি খোঁজা শুরু করেছে জলচাষ করবার জন্য, সে জন্য জলের কাছাকাছি জমি দেখাশুনা চলছে।

একদিন দীর্ঘ টানা বৃষ্টি থেমে গেল। ক্রমে থকথকে কাদা মাটি জেগে উঠতে লাগল। ছোট অচেনা মরা মাছ মেশানো মাটি চেনার জন্য দুদুয়ার পারের বাংলাদেশিদেরও কেউ কেউ ডাকল। বৃষ্টি থামলেও এখন কোন মাস, কোন ঋতু বোঝা যাচ্ছিল না। মাস আশ্বিনও হতে পারে, ফাল্গুনও হতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল। আর কাদা শুকিয়ে চারদিক ধুলোয় ভরে গেল, ধুলো ক্রমে থেমে ঠাণ্ডা হিম বাতাস বইতে লাগল। একটা দুটো আগুন জ্বালিয়েও শীত ঠেকানো দায় হয়ে পড়ল।

এক বর্ষা পেরিয়ে আবার এসে আর ফিরছে না — এই সময়ে বুড়িমার গাঁওয়ের বৌয়েরা পেটেলী হতে শুরু করেদিল। দুখারু টুলটুলির বড় বেটা, শানুর বড় বেটা, দেরুর বড় বেটা-বউ, ডাউকি পেটেলী হয়েছে। আর একদিন দেখা গেল, ভাসার বৌ চৌপীও, ভাদইয়ের বৌ, সানঝুর বৌ একে একে পেটেলী হয়েছে। এটা অস্বাভাবিক ঠেকছে এই কারণে যে সারা সময় তো এরা কাজে থাকে কিন্তু এই সময়টায় সবাই ঘরে। যেন ঘরে শুধু পেটেলী হওয়ার জন্যই থাকা। বর্ষায় বসে থাকার সময় সন্তান জন্মাবার যেন উপযুক্ত সময়। সানঝুর বৌয়ের ব্যথা হয় না বলে সোন্দনী ধাই তাকে ঘাস কাটায়। এদের ছোয়া ছোটর নাম — ডাউকীর ছোয়া ঝরণ, বর্ষণ উল্টোদিক ভেবে চোপীর ছেলে চেপা, ভাদইয়ের বৌ জঙ্গলে পায়খানা করতে গিয়ে আধ বেরোনো অবস্থায় দেখে বলে জংলু রাখা হয়েছিল। ' সেই ফলন ভোলানো বছর ভোলানো বর্ষার পর কেউ কেউ বাংলাদেশের মানুষদের সঙ্গে — কথা বলে জলে ডুবে থাকা মাটিতে কী চাষ হতে পারে তার হদিশ জানতে বলেছিল। এই বাংলাদেশীর নামও আধিয়ারী লিস্টি করার সময় নাম রাখা হয়েছিল 'দুদুয়ার ভাটিয়া'। ঋতু বিপর্যয়, মাটি বিপর্যয়, এরপরও কেমন ভাবে যেন আবার একটা কালানুক্রমিকতা ঢুকে যায় 'যেন তিন পাকের খরা গেল, লেভির পর বদলি সরকার হল, খাশ জমি দখল হল, ভোটের পর ভোট হল বাংলাদেশের মানষি এল, আধিয়ারের লিষ্টি হল, বছর ভোলা বর্ষা হল, পেট পেট ছোয়া হল, হাই-ইল চাষ হল —এরকম করে ছড়া কাটা যায়।'

দুদুয়ার পারের ভাটিয়ারা ক্রমে চেনা দেখা হতে হতে চেনা হয়ে যায়। যেমন চেনা হয় গনশা হাতি যে —

প্রতি বছর জয়বীর পাড়ার পেছনের পাহাড় থেকে এখানকার পাকা ধান খেয়ে যেত। পরে ধানরক্ষার জন্য গ্রামের লোক দল বেঁধে তাকে আটকাতে লেগে গেল। তিন চার বছর মশাল জ্বালিয়ে, গর্ত খুঁড়ে আটকিয়ে অবশেষে সে বুঝল যে — আর আর যাওয়ার উপায় নেই — অথচ ধান পাকলে সে সীমার বাইরে থেকে হাঁক ছাড়ত। তখন চাষিদেরও দায় হল। পরে ওরা ধান কাটা শুরু হলে সবাই কিছু করে ধান এক জায়গায় হাতির জন্য জমা করে ' গনশা ভোগ' দিত।

ঠিক তেমনি অচেনা ভাটিয়ারা ওদের কাজ শেষ হলে কাজের খোঁজে বের হতো — আর ক্রমে নানা অজানা চাষের কথা বলে বলে এখানকার মানুষই হয়ে গেল। আর তাদের চাষের নাম হল ভাটিয়া চাষ যা এখনকার প্রচলিত চাষ থেকে আলাদা।

ভাটিয়ারা শশঙ্গী জোতদারের, দিনু মাষ্টারের ও ম্যানেজার দেউনিয়ার ডাঙ্গা জমি চাষ করে সরিষা আলু টমেটো, কুমড়ো ফলিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। ক্রমে ৮/১০ বছর পর এদিকের জমির প্রধান ফসল হয়ে উঠল সেগুলিই। ভাটিয়া চাষিদের প্রভাব দশনদী বিশনদীর পৃথিবীতে পড়তে লাগল। দেশী জোতদার বা চাষিদের নীতি ও ভাটিয়াদের নীতি আলাদা হলেও একসময় তা সমতা পেল।

৬৭'র বদলি সরকার চাইল বর্গা লিস্ট তৈরি করতে। কিন্তু পুরনো অভ্যেস মতো বর্গাদার বা আধিয়াররা তা করতে ভয় পেল। জোতদারও ভয় দেখালো। তাহলে ভূতার ধান সরকার দেবে। এদিকে সরকার আর পার্টি পুর্টির লোকেরা অপারেশন বর্গা চালু করার জন্য বর্গা লিস্ট তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। নানা প্রশ্ন আধিয়ারের মনে — 'নামখান রেকর্ড করি মুই পামটা কি? মোর আধিখান বেচিবার পারিম? মুই কী চাষ করিম, কী চাষ করিম না, স্যালায় ঠিক করিবার পারিম? মোর আধখান মোর ছোয়াক দিবার পারিম?'

শশঙ্গী জোতদার, দিনু মাষ্টার আর ম্যানেজার দেউনিয়ারা তিন জনে মিলে দেশি আধিয়ারদের উচ্ছেদ করবার জন্য তাদের অস্বীকার করে ভাটিয়া চাষিদের আধিয়ার হিসেবে বসাতে চাইল। কিন্তু — অবস্থা জটিল হওয়ার আগেই ভাটিয়া চাষীরাই আধিয়ার হতে চাইল না।

ভাটিয়ারা আধিয়ারি না নিলেও ওরা ক্রমে এখানকার মানুষ হয়ে গেছে কাজের মধ্যে দিয়ে। দীর্ঘ বর্ষায় সব জলময় হয়ে যাবার পর চাষ খোঁজা, কোথায় কখন কী চাষ করা যায়। কেউ কেউ দুদুয়ার পারের ভাটিয়াদের চাষের কথা বলে। ওরা তো জল মানষি, জলচাষ জানে। ওদের চাষ এদের চাষ মিলে কিছু একটা করা যেতে পারে। মংলা চাষে নামতে বলে— চ্যাংড়াপ্যাংড়ারা না হলে চাষ ভুলে যাবে। আবার ধানরাম চাষে নামতে ডর

পায়। বলে — এতো বড় সংসার চলবে কেমন করে। ' এই খান কি একখান ক্ষেতবাড়ি? কোটত নামিবেন?' ধানরাম একথা বলে থেমে থেমে। ঠিক তার উল্টো স্বরে জবাব দেয় টুলটুলি— দুখারুর বৌ। ' ডর খাছেন কেনে? ডর নাই। ছোটদাদার মা ঢেমনার বউ বলে ..... হামলার তো ধান আর পাটচাষ করিবার লাগিবেই। খোয়ার চাষ, বেচার চাষ। ..... তার পাছে অন্য চাষ। বড়দাদা চাষ বদলের খবর দিয়ে জলচাষের কথা বলে এবং এ ব্যাপারে দুদুয়ার ভাটিয়াদের উল্লেখ করে। তাদের ধরে আনতে বলে। কে যাবে সে নিয়ে নানা কথা হয়। বিডিও অফিসেও চাষের খোঁজ আছে, সেখানে যাওয়ার কথাও ওঠে। ' বর্ষা ও শীতের শেষে এই ক্ষেতবাড়িকে আবার ক্ষেতবাড়ি তৈরি করা একটা অভিযানের মতো। কিন্তু তারা কেউই জানে না অভিযানটা কি ও কেমন। ' এখন কোন ঋতু, এই ঋতুতে কী চাষ হতে পারে, মাটির নিচে মাটি, আকাশের ভিতরে আকাশ আর দিকের ভিতরে দিকের মধ্যে কী ঘটে এই সবসময়।'

থৈ থৈ বর্ষার পর ভেজা মাটি, শীতের মাটিতে কি চাষ করা হবে — তারই উপদেষ্টা খোঁজার জন্য অগুন, বড়চিলা ওরা দুদুয়ার পারের ভাটিয়াদের নেমন্তন্ন জানিয়ে ব্লক অফিসে গেল। বড়বাবুর কাছে একজন চাষের অফিসার চেয়ে দশদিন অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে দু'দিন পরই ভাটিয়ারা এসে গেল বুড়িমার গাঁওয়ে। তাদের আপ্যায়ন করে একটা ঢোকরা পেতে দেওয়া হল। ওদের মধ্যে এক পাকা মাথা চুল দাড়িওয়ালা লোক ছিল। তাকে নিয়ে মস্করা হয়। এরপর 'দুদুয়ার পারের লোকজনকে নিয়ে অগুন, দুখারু শানু, মংলা, ঝটু, বড়চিলা, বড়দাদা ক্ষেতবাড়ির ভিতরে চলে গেল।' এরমধ্যে একজন দোলানের কাছে জামা ধুতি রেখে গেঞ্জি ও আণ্ডারওয়ার পরে তার সাথেই বুড়িমার গোত দেখে। এরপর 'লোকটি গেঞ্জিটাও খুলে দোলানের হাতে দিয়ে ক্ষেতবাড়িতে নেমে যায়।'

দুদুয়ার পারের ভাটিয়াদের দিয়ে বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা কী—দেখানো হয়। বর্ষার পর শীত শেষের মাঠ। উপরে শুকনো তলায় কাদা। কী চাষ হবে জানতে চায়। তারপর ঢনঢনিয়ার দিকে যায় — বড়বাঁকের পারের টাল জমি। সেখানে কোদালে কোঁপ মেরে মাটি খুঁড়ে ওরা মাটি দেখে ভেতরটা ভেজা। সন্দেহ প্রকাশ করে ধান চাষ হবে কিনা।

তিলক কাটা লোকটা জানায় এখন ব্লক অফিসে 'হাইল' ধানের চাষ করার ব্যবস্থা হয়েছে। সারও নানা রকম এসেছে। সেই খবর নিতে বলল, এরপর কচি কচি পাঠার মাংস টলটলে জলে রান্না করা খাবার খেতে লাগল ভাটিয়ারা। ' এদের খাওয়াচ্ছিল বুনুয়ার বউ নেকী। কলিনের বউ কলকলী আর বড়বেটা খেতুয়ার বউ

মননী। অগুনের বউ নদিনী আর দুখারুর বউ টুলটুলি দাঁড়িয়েছিল।' ..... ' অনং না ভোলার কাম নাই' নদিনী বলে, ' মিঠাকরি মনত রাখিবেন।'

ব্লক অফিসের বাবুরা এসেছে বুড়িমার বাড়িতে খবর পেয়ে। এসে জোনাকু, বড়চিলাদের সঙ্গে হাইইল্ড সম্পর্কে আলোচনা করে। বাবুদের একজন জমি গুলি ঘুরে দেখে। ওরা এতদিন হাইইল্ড করেনি। শুনেছে কিন্তু করেনি। বাবুরা বলে আমরা বিছন সারের ব্যবস্থা করব, শুধু জমিটা হবে জল ঢোকার ও বের করবার মত। তিরিশ দিন টানা জল রাখতে হবে। আবার তিরিশ দিন জল বের করে শুকিয়ে রাখতে হবে। জমি বিশেষজ্ঞ বাবু যিনি জমি দেখতে গিয়েছিলেন — তিনি ফিরে এসে এবছর যেমন চলছিল তেমনই চালাতে বললেন। শানু জল এনে দিলে তিনি পা ধুতে যান।

দুদুয়ার পারের চাষিরা আর ব্লক অফিসের বাবুদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ওরা নতুন চাষ ' হাইলে'র জন্য জমি খোঁজে। ফরেস্টের কাছে একটা জমি খুঁজে বের করে। তাতে হাইল চাষ করতে কতো হাল, মানুষ, সার, ওষুধ লাগবে এবং কীভাবে সে সব প্রয়োগ করবে তারই আলোচনা হয় সরস ভঙ্গিতে। এসব আলোচনার ভেতর থেকে এও বেরিয়ে আসে যে জোত গোত তাহলে কি থাকবে না? জমি ছোট হবে 'হাইল' চাষ প্রবর্তিত হয়ে বিঘেতে ১৫/২০ মন ধান ফলবে। বেশি জমির প্রয়োজন হবে না আর। এভাবে পরিবর্তন আসবে চাষে, জমির সীমানায়, মালিকানায়, পদ্ধতিতে, ফলনে। জমি যেন ব্যবসার মত হয়ে উঠবে।

এভাবেই এরা হাইইল্ডের চাষে নেমে পড়ে। ফরেস্টের লাগোয়া জমিতে জঙ্গলবাড়ির মত গায়ে গায়ে লাগানো ধান গাছ। একগাছে ৪/৫ টা পাশকাঠি দেখে বিসারুর শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। নতুন চাষ 'হাইল' পুরনো অভ্যেসের সঙ্গে সঙ্গতিহীন শ্বাসরুদ্ধকারী। তবু নতুন চাষ বুড়িমার গোতে শুরু হলো।

আষাঢ়ের শেষ পূর্ণিমার মাস খানেক পরে ধান পাকে। বড় দাদা, ঝটুরা অবাক হয় ধান দেখে। কিন্তু যে ধান গাছ তারা লাগাল — তাতে আর শিষ বের হল না। ওরা নানা ভাবে পর্যবেক্ষণ করে শেষ অবধি কোন উপায়ান্তর না দেখে ব্লক অফিসে যায়। বাবুরা বলে হয় সার বেশি হয়েছে , নয়তো কম হয়েছে। দুটোতেই ধান বের হয় না। ওদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। ওরা ফিরে আসে — বলে 'এতোখান মাঠ, এতো ক্ষতি আর বাবুরা কথা কহিল দুই ঢোক কি তিন ঢোক'।

বুড়িমার গোতে একটা জ্বর 'রোয়াগারার সময় শুরু হতো, ধানকাটার সময় পর্যন্ত চলত।' .....' তবে এ জ্বর তো টানা থাকে না। যখন আসে তখন হু হু করে আসে, যখন যায় তখন ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।' জ্বরের জন্য

কাজ আটকে থাকে না। সবার এক সঙ্গে জ্বর হয় না। খুব খুশি হলে নিমপাতার রস খাওয়ানো হত। কখনো মাথায় জল ঢালা হত। সেটা শিখেছে ময়নাগুড়ির হাসপাতালে এক ডাক্তারের ব্যবস্থা থেকে। নতুন রোগ, নতুন চিকিৎসা এসেছে। ধূপগুড়িতে একটা হাসপাতালও হয়েছে। তাতে বেটিছোয়াদের বাচ্চাও হয় আবার বাচ্চা বন্ধ করাও হয়।' 'সেই ধানজ্বর আবার শুরু হল সেই খাশ জমি দখলের পর।' আসলে তো ম্যালেরিয়া ফিরে এসেছে। মাইকে প্রচার হচ্ছে মশারি টানিয়ে শোয়ার জন্য। আধবসা কানকাটু মারা গেল ধানজ্বরে। এই গোতে মরারও একটা পদ্ধতি আছে। যাদের বয়স হয়, কাজ থেকে বসে যায় তারা ক্রমে মরণের দিকে ঢলে যেতে থাকে। পেছনে আবার কেউ পা বাড়ায়। এছাড়া আছে — পেট ফুলে মরা, শ্বাস বন্ধ হয়ে মরা, বান মেরে মরা। এখন অবশ্য বান মারা মরাকে চ্যাং দোলা করে মাচায় করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মরণের দিকে কেউ চলে গেলে তাকে চিকিৎসার ঠেকনো কেউ দিত না বা ঠেকনো যে আছে তাও জানতো না। এখন হাসপাতাল হয়েছে। কথা উঠল 'হাইল' চাষ নিয়ে। এবার ঠিকমত সার জলের অভাবে জমি জাই হয়ে গেছে। তবে 'নিষ্পত্তি হয়ে গেল বুড়িমার গোত হাইইল্ড চাষেই চলে যাবে'। বিসারু বলে 'একে একে ওই চাষখানই ধরিবার লাগিবে। ধরো কেনে, ধরো। চাষ যখন মাটিত আসি গেইছে, চাষ ধরো।'

কয়েকদিনের মধ্যে বুড়িমার গোতে ম্যালেরিয়া চেপে বসল। খেতুয়া ছোটবাপা, সোমারী, ধোলী একে একে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হলো। বাঙ্কুরাম হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে সবাইকে খাওয়াতে লাগল। এর প্রভাব পরে চাষে। ভাদ্রের কাল পাকের মাঝামাঝি রোয়াগারায় ঢিলেমি এলে ওরা ব্লক অফিসে যায়— কীভাবে হাইল ধান চাষ করা যাবে, কেমন করে স্প্রে করবে, সার দেবে সব জানতে। দরকারে ব্লক অফিসে রাত্রিবাস করে হলেও নতুন ধান আর পুরোনো জ্বরের সমস্যা মিটিয়ে আসবে।

এক মাঘে ডাঙ্গির মাঠে যে ক্ষেতবাড়ি ঢেমনার বেটা দখল করেছিল, সেখান থেকে পরে নির্বাসনে চলে গেছে কেন যেন সেই মাঠেই একদিন ঢেমনা তামাক চাষ করল। চাষের পর চাষ করে জমিকে প্রথমে ধুলো করা হয়। তারপর তামাকের বীজ এনে ফেলে চারা করে সেই চারা জমিতে পুতে, তা যত্ন করে। বড় হলে কাটা হয়। তিন-চারটি পাতা একসাথে বেঁধে শুকিয়ে তোলা হয়।

তামাক ক্ষেতে কাজ করতে করতে ঢেমনার জ্বর আসে। কোন রকমে পাশে রাখা সিনঝাকাটির পাঁজায় শুয়ে সে মারা যায়। মৃত্যু হলে হয়তো তার মনে পড়েছে ছোটদাদার কথা, ওর মার কথা কিংবা শৈশবের কোন স্মৃতি, অতীত তামাক চাষের স্মৃতি—যখন সে চ্যাংড়া ছিল, ছোটদাদার মা ছিল চেংড়ি, তামাক পাতার ওপর

দিয়ে মারিয়ে যাওয়া ঢেমনাকে সে স্তন দেখিয়ে, যোনি দেখিয়ে অভিসম্পাত করেছিল—সে সব কথা। শকুনের ঝাঁক দেখে বুড়িমার বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারল সাত দিন আগে ঢেমনা মরে গেছে। ঠিকানা পরিচয় হীন ঢেমনার মৃত্যুও বড় করুণ, অনাদরে, অবহেলায়, অগোচরে।

ঢেমনার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমার গোতে শোকের ছায়া নেমে আসে। ঢেমনা গোতের কেউ নয়, এমনকি ছোটদাদার মা পর্যন্ত তাকে ভুলে গেছে। সেই ঢেমনার জন্য কেন যে এত শোক।

মরা নিয়ে এসে বড় এগিনার কোণে রাখা হল। এবার সৎকার করবে কে — মুখাগ্নি করবে কে? বাড়ির বড় বিসারু বড়দাদাকে সে কাজ করতে বলল। বড়দাদা ঢেমনার বেটা না হওয়া সত্ত্বেও মুখাগ্নি করল। নতুন বস্ত্র পরিধান করল এবং যাবতীয় পারলৌকিক কাজ করল। ঢেমনার মুখে আগুন ছোঁয়ানোর আগে বুড়িমার গোতের তিন গোত্রধর ' ঢেমনার ক্ষেতে' পৌঁছায়। ' পুরাণে যেমন গোত্র ও দেশ এক একজন পুরাণ পুরুষকে ধরে আবর্তিত হয়।'

।। শেষান্তর ।।

জন্মান্তর যা ঘটে, তা জন্মের মধ্যেই। যেমন সেই ঘাটোয়াল — তার জন্মান্তর হয়ে সে ফিরেও এসেছে। অবশ্য ফিরে আসার জায়গা ছিল বলে। বুড়িমাও তাই—। তার দশনদী, বিশনদী, তার স্বামী, শ্বশুরবাড়ি, ছাওয়া ছোট সবাই তো আছে — তার মধ্যেই তার জন্মান্তর। দুই তিন জন্মের মানুষরা তাকে যতটা বোঝে পরের গুলো তেমন বোঝে না।

'বুড়িমা তার বেঁচে থাকাটাকে এমন এক জন্ম জন্মান্তরের বেঁচে থাকার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে যে বুড়িমা থেকেই একটা গোত তৈরি হয়ে গেছে।' সাধারণত এমন হয়না। 'গোত তো তৈরি হয় অনেক পরে। ওই গোতের মানুষেরা নিজেদের বাঁচার দরকারে, এক গোত বানায় যখন, তখনই তারা গোতের একটা মাথা বানিয়ে নেয়। বেশির ভাগ সময়েই সে বানানো মাথা।' বুড়িমার গোত, হয়তো বুড়িমাই জানে না। কিন্তু যাদের এ গোতে আসতে হয় গোত থেকে যেতে হয়, তাদের তো গোতের পরিচয়টি দরকার। যারা বুড়িমাকে দেখেনি, ভালো করে নামও শোনোনি, তাদের তো বেঁচে থাকার জন্য একটা নিশান চাই, একটা অক্ষ চাই, একটা দাগ চাই, 'বুড়িমা সেই বাঁচা', একটা অক্ষ—কল্পনা এমন জ্যান্ত থাকে। বুড়িমা বুড়িমার গাওয়ের বৌ, গরুচুমানির দিন এখনও তাকে দরকার হয়। 'বুড়িমার মৃত্যু নেই অথচ বুড়িমার প্রস্থান থাকতে পারে। সে এমন প্রস্থান যা পাহারা দেয়া যায় না।'

মরাঘাট পরগনার প্রথম সেটলমেন্টের (১৮৭৮) পর দশ বছর পেরোতে না পেরোতে যারা জন্মেছে বিসারু তাদের একজন। ১৮৮৫ সালে ময়নাতলির হাটবসল — তখনই এক বুধ বা রবিবারে বিসারুর জন্ম। তারপর থেকে বুড়িমার বড় মেজ, সেজ, পয়লা বড়। পয়লা মাইঝন শেষিলা এরকম করে সন্তান হতে থাকল। একসময় তার নিজের ও তার ছেলে, নাতি-নাতনিদের কে কার ছোয়া তা ভুলে যেতে লাগল।

'বুড়িমা নিজে ভুলে গিয়ে তার ছেলেকেও ভুলিয়েছে। তেমন বিস্মরণ ব্রত থেকেই তো গোত্র জেগে ওঠে, তিস্তার জল থেকে চরের মত।' বুড়িমা যে গোত্রনারী হবে সে কথা তো কেউ জানতো না। কিন্তু হয়ে গেছে, এখন সবার ভয় বুড়িমা যদি মরে যায়। অথচ মৃত্যুতো স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ চায় না বুড়িমা মরুক আবার বুড়িমা বিসর্জনে চলে যাক বা কোন ভাবে হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাক। বরং এ ভয়েই এখন গোত্রের সব চেয়ে বড় ভয়।

বুড়িমার বাড়িতে সাগাই আসার পর পুরনো নানা ঘটনা যেমন গত চার বর্ষা, কবে কাকে বাঘে খেয়েছে সে সব বলা হতেই থাকলো। নতুন চাষের পরিবর্তনে ঋতুর বদল হয়ে গেল। হাওয়া বদল হয়ে গেল। বনে ক্ষেতে যে সব পাখি আসতো তারা সময়, পথ বদল করল। যারা আগে মাঠে যেমন ভাবে চাষ করতে যেত, সহযোগিতা করত — তাদের অনেকেই বিশেষ করে মহিলারা এখন যায় না। 'টিয়ার ঝাঁক ডাকি গেইল, অ্যালায় একখানও মেঘ আসিল না। টিয়ার ঝাঁক ডাকি গেইল, অ্যালায়ও গাও শুকাছে না।' এখন টিয়ার ডাকার সঙ্গে মেঘ আসা আর গা শুকানোর কোনো সম্পর্ক নেই ঋতু বদলের ফলে।

'আওয়াজ গুলোই বদলে গেছে।' ক্ষেতবাড়ির, ফরেস্ট বাড়ির আওয়াজ কোনটা কার ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গেও তা বদলে যাচ্ছে। ক্ষেতবাড়িতে হাইইল্ড চাষ শুরু হওয়ায় পাম্প এসেছে। পাম্পের আওয়াজ অনেক আওয়াজকে বদলে দিয়েছে। গলার স্বর বদল করেছে। বনে, ক্ষেতে, বাড়িতে এই আওয়াজের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ইউরিয়াদি সারের ব্যবহারে গন্ধ বদলও হয়েছে। এসব বুড়িমার ভুবনকে অন্য ভুবনের থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

ঋতু বদলে গেল, আওয়াজ বদলে গেল, গন্ধ বদলে গেল, নিশানাও তো সব বদলে গেল। পাঁচ ছয় বছর ধরে পঞ্চায়েতের তদারকিতে রাস্তা পাকা হচ্ছে। জয়বীরপাড়া থেকে দুদুয়ার পার পর্যন্ত পাকা রাস্তা, দুদুয়ায় ব্রিজ হচ্ছে। ফরেস্টের ভিতর দিয়ে বুড়িমার গোতের লোকজন যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত সেটাও পাকা হয়েছে। 'বুড়িমার গোত ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, রাস্তা নিয়ে করবে টা কী?'

এই রাস্তা দিয়ে ভ্যান আসে, ভ্যানওয়ালা প্যান্ট পরা, নিয়ে এলো ভ্যানে করে এক দিদিমনিকে। 'লোকটি এদেশীয়, শুধু ভ্যান আর ফুলপ্যান্টের জোরে সে যেন কর্তৃত্ব জারি করে —সরকারের অফিসারদের মতো।' .....'গরুর গাড়ি তো ক্যানসেল।' দিদিমণি ভ্যানে করে কিছু ছোয়াছোট নিয়ে এসেছে — ওরা জামাপরা— ওদের নিয়ে বুড়িমার বাড়ির - এগিনার ধারের গাছ তলায় স্কুল শুরু করে। ক্রমে স্কুল, দিদিমণি ও ছোওয়াছোটরা পুরোনো হতে থাকে। একদিন বোর্ড আসে। বড় গাছে বোর্ড লাগানো হয়। লেখার বোর্ড। এরপর আসে সাইনবোর্ড — 'বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়'। বুড়িমা হয়ে যায় বুড়িমাতা।

দিদিমণির শাড়ি পড়া দেখে বুড়িমার গোতের মেয়েদেরও শাড়ি পরার ইচ্ছে হয়। একদিন শানুর বউ কলেশ্বরী — তাদের ছোয়াদের জন্য শাড়ি কিনে আনতে একশ টাকা দেয় দিদিমণিকে। প্রথমে একজনের জন্য আনে। সেই খানাই সকলে মিলে পরে। আগ্রহ বারে। আরও আনে। ক্রমে বাড়ির বৌরাও পরতে চায়। এনিয়ে রসিকতাও হয় প্রচুর। ফোতা ছেড়ে শাড়ি। পরিবর্তন আসে গোতে।

ভোটু বড় এগিনাকে নতুন বাহির এগিনা করতে চাইছে। রাস্তা তৈরি হওয়ার পর, রাস্তা বাড়িতে ঢোকার পর, দিদিমণি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে স্কুল শুরু করার পর বড় এগিনা তো নতুন বাহির এগিনা হয়েই গেছে— স্বাভাবিক ভাবে। চিরকালের কিছু নিয়ম একটু উল্টে পাল্টে গেল।

এক ভাদ্রের প্রথম দু-একদিনের দুপুর আড়াইটা নাগাদ দুখারুর পুতবৌ ঢলানী পার হচ্ছিল নতুন এগিনা। দৈনিকের অভ্যাস মতো বুড়িমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ যেন একটু পিছু টান বোধ করে, দেখে বুড়িমার দুটো আঙুল একটু তোলা। বুড়িমা ডাকছে? ছুটে যায়। ডাকে আয়ী? আয়ী?

' বুড়িমা ফিস ফিসিয়ে বলে ' তিস্তার পারত হাতি ডুবি যাবার ধরিছে। সেবা দে, সেবা দে।' বুড়িমা আবার স্থবির হয়ে যায়। '

' রওনা হতে হতে পরদিন সকাল।' বুড়িমা যখন বলেছে তখন নিশ্চয়ই হাতি ডুবছে। সুতরাং প্রস্তুতি চলল যাত্রা করার। বাঙ্কুরাম, বিসারু, ভোটু, দুখারু, দোলান, অগুন, পাথারনী, সোন্দনী, ধোলী, নদিনী এরা সবাই তৈরি হয়। নৈদারিঘরে সবাই সমবেত হয়। সেবার জন্য নতুন কুলো বানানো হয়। তাতে নতুন কলা পাতায় কলার ছড়া, কলাগাছ টুকরো করে ছোট বস্তা ভরে নেওয়া হয়। বোঝা যাচ্ছে না কারা এই যাত্রায় বেরুল। ' এই যাত্রা যদি যাত্রা শেষ করে ফিরে আসে তাহলে একমাত্র তখনই জানা যাবে — কারা এই যাত্রায় বেরিয়ে ছিল। প্রত্যাবর্তন ছাড়া যাত্রার শেষ নেই। সব যাত্রাই প্রত্যাবর্তনের দিকে যাত্রা। নিজের অক্ষদণ্ড ঘিরে প্রত্যাবর্তনের

দিকে যাত্রা'।

পুরানো রাস্তা যা ' এখন কোথাও পি ডব্লিউ ডি, কোথাও জিলা পরিষদ, কোথাও পঞ্চায়েত কোথাও বোধ হয় ব্লকই এই সব ফাঁকগুলো জোড়া লাগিয়ে দিয়ে রাস্তাটাকে গোটা করে দিয়েছে। আর এই রাস্তা থেকেই ছোট ছোট রাস্তা ফরেস্টের ভিতর দিকে চলে গেছে বুড়িমার বাড়ি দিয়ে যেমন'। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়িমার গোত ময়না তলি যাওয়ার একটা বাস পায় সকালে। তারা সেই বাসে উঠে পড়ে — সঙ্গে সেবা দেওয়ার সরঞ্জাম। কলাগাছের বস্তা দেখে, টিকিটোয়াল ছেলেটি সেগুলো বাসের ওপর দিতে বলে। ওরা আপত্তি করায় আসল কথাটা বেরিয়ে আসে টিকিটোয়ালের মুখ দিয়েই — ' হাতিডোবা যাবেন তো? যেইঠে তিস্তার চরত হাতিখান ডুবি যাছে।' গোত জানতো না ঠিক কোথায় সেই ঘটনাটা। এবার সঠিক স্থান জেনে গেল—'পুরানা বার্নেশ আছিল? উসকো নজদিগ। মেলা বসি গেইছে।' পারহেড বারোআনা দর স্থির হয়ে যাওয়ায় ওরা সেই মেলার জায়গাতেই নামতে পারল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার মোড় থেকে বাসে উঠে একেবারে হাতিডোবার স্থানে এসে নেমে পড়া— একথা ওরা ভাবতেই পারে না। টিকিটোয়াল দেশি চেংড়া অথচ লুকোতে চায় হিন্দী কথা বলে। বাঙ্কুরাম এটা বুঝে ফেলে।

বাঙ্কুরাম, ছোটবাপা ভাদুরা বাসের জানালা দিয়ে দেখে বাসটা ময়নাতলির হাট পার হয়ে জলঢাকা ব্রিজ পার হয়ে ময়নাগুড়ি হয়ে বার্নেশের রাস্তা ধরল। এ রাস্তা তাদের অচেনা। বাস এসে থামতেই ছাদের ওপর থেকে নদীরাম, ঢেপা, ধলেশ্বর, কুমালী, বস্তা, ঝুড়ি নিয়ে নেমে পড়ল। একত্রে গোটো হল। প্রথমে ওরা একপাল হাতি দেখে ফেলে তিস্তার চরে। ঠিক চর না পার বোঝা যায় না। এ নদী তো দেবতা নদী। ' দেবতা নদী কখনো নদী ছাড়ের ওপর তাঁর দখল ছাড়ে না। .... কোন একভাবে এই হাতির পাল আটকা পড়ে গেছে দেবতার কোন নিষেধে। এদেরই একটি দলছুট হয়ে তিস্তার ভিতর থেকে উঠে আসার সময় ' পুরনো বার্নেশের পুরনো তিস্তার পুরনো চরে একটা হাতি চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে। ' হাতিটা শুধু তারই চোখে আলাদা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, যে সেই দৃশ্যের ভিতর পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে যেতে পারে। একমাত্র সেই দেখতে পারে — মিরাকল যার 'দৈনন্দিন।' .....' এ হাতিকে কেউ কেউ বলে কিয়ানজিত হাতি। কানজি হাতি। ..... সেই কিয়ানজিত বা কানজি ডুবে যাচ্ছে'।

'দু-তিনদিনের মধ্যে জায়গাটির চেহারা এমন হয়ে উঠেছে যে বাঁয়ে উঁচুতে বুনো হাতির পাল আর ডাইনে নিচুতে পোষা হাতির ঘেরের মাঝখান দিয়ে নেমে ঢালের শেষে দাঁড়ালে সামনে সেই চোরাবালিতে ডুবন্ত

হাতিটি দেখা যায়।' ..... তিস্তা তো ঐখানত পাতালত ঢুকি গেইছে। পাতালটে গণশাক টানি নিছে।'

পঞ্চায়েত থেকে একটা প্লাস্টিকের চাদর টাঙিয়ে দেয়া হয়েছিল। তা ভরে গেছে। জায়গাটার সঠিকত্ব নিয়ে টানা পোড়েনে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফরেস্ট ডিপার্টপেন্ট আপত্তি তুলেছে আলো দিতে — হাতি ডুববে। সেচ বিভাগ পঞ্চায়েত ও জিলা প্রশাসন যে যার মন্তব্যে অটল বলে আমলাতান্ত্রিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে গেছে। তবু এমন একটা ঘটনা বলেই হাতি ডোবার জায়গায় পুলিশ পঞ্চায়েত ও জিলা পরিষদের মেম্বাররা ছিলেন।

মাত্র দু-তিন দিনের মধ্যেই কানজি তার পরিচয় হারিয়ে ফেলতে থাকে।' প্রশ্ন ওঠে এ কানজি কিনা—যা দুস্প্রাপ্য। কী ভাবেই বা এখানে এল পথ ভুলে? নাকি পূর্ব স্মৃতি মনে করে। এক দেড়শো বছর আগে এ পথেই হয়তো সে দল বেঁধে চলত। বন্যহাতি পোষ মানলে তার জেনেটিক কোড পালটে যায় — এর ক্ষেত্রেও তেমন হয়েছে কিনা। কিংবা যৌনটানে এর আগমন হতে পারে। হস্তিবিদ্যার নানা দিক আলোচিত হতে থাকে। আবার কানজি নিজেই পাতাল প্রবেশ করবে বলে নদী দেবতার কাছে এসেছে এমনও হতে পারে।

বুড়িমার গোত ভাদ্রের গোড়ায় এই চরে এসেছিল। এসে ওরা কানজিকে সেবাও দিয়েছে। বিসারু বলে, ' হামরালা নিজো দিম।' রসগোল্লা, গুড়, ধান, গমের পাহাড়ের মধ্যে ওদের সেবা প্রায় হারিয়ে যায়।

সকাল সন্ধ্যায় চলে ডোবা দেখা। আর সারাদিন রান্না গল্প গুজবে চলে যায়। নতুন কায়দায় রান্না করে এরা, নতুন রান্নাও শেখে। আলুসেদ্ধ মাখা— ডাল। কথা বলারও পরিবর্তন এসেছে নতুন পরিবেশে এসে।

'এখানেই এক দেউনিয়া এসে বুড়িমার গোতকে শোনাতে শুরু করে প্রাচীন সব বিয়ের কথা। বুড়িমার চার ছেলের যে তিন নম্বর সাইঝন, সেই সাইঝনের বড় মেয়ের নাকি বিয়ে হয়েছিল জোরপাকরির এক ছোট বেটার সঙ্গে।' বুড়িমার সন্তান সন্ততি সম্পর্কে কারও কোন ধারণাই নেই সুতরাং এ গল্প অবিশ্বাস করারও কিছু নেই।

'দুই দুই বার সরকারি হাকিম বার বার জিজ্ঞাসা করেও বুড়িমার কাছ থেকে কোন জবাব পায়নি। তার ছেলে মেয়ে ক'টি, আর কারা'? একবার খাশজমির পাট্টার সময় আর একবার অপারেশন বর্গার সময়।'

সম্বন্ধ হওয়ার পর ঠিক হয় ছেলে কে আর মেয়ে কে। বিয়ের দিন পর্যন্ত সেটা বদলানো যায় — বিয়ের প্রাচীন রীতি এমন।

এই হাতি ডোবাতেই জোরপাকড়ির জটেশ্বর বর্মনের নাতির জন্য বুড়িমার গোতের শনিয়ার বিয়ে হয় এই

শর্তে যে বিয়ের পরও সে শাড়ি পড়বে। তার স্বামীকে ফুলপ্যান্ট পরতে হবে।

কানজি হাতির হাটু যেদিন ডুবে গেল সেদিন কোটকা জটাইয়ের নাতির সঙ্গে শনিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। ভ্যানে পা ঝুলিয়ে নাতবৌকে নিয়ে যায় ' পরদিন সকালে বুড়িমার গোতকে তার বাড়িতে সাগাই খাওয়ার নেমন্তন্ন করে।'

হাতি তোলার জন্য বুলডোজার ও হাইড্রোলিক ক্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োগ করার কতগুলি অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এদিকে হাতি ডোবার মেলায় হঠাৎ ছোটদাদাকে দেখা গেল। সে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আসাম ঘুরে এখানে এসেছে। এই সময়েই এক ভিড়ের মধ্যে বড়দাদা ছোটদাদাকে পেয়ে যায়। নিয়ে আসে গোতের ছাউনিতে। সবাই তাকে দেখে স্নেহ করে, কেঁদে ফেলে। ছোটরা বুঝতে পারে না। নানা মজা, পুরনো গল্প হয়। নতুন দেশ, চাষ, ধান সে দেখেছে। 'ঢেমনা' মরার খবর পায়। তার শ্রাদ্ধ বড়দাদা করেছে। সুতরাং সেও এখন বুড়িমার গোতেরই একজন। সবাই চায় সে গোতে ফিরুক। ' ছোটদা বলে ওঠে ' মুই তো একখান ক্ষেতমজুর, ক্ষেতত যে যে কাম করাবে সেই কাম করিম। মোর জোতও নাই গোতও নাই।'

চাঁদের দহন আরও বাড়ল। পরিধির পোড়া দাগ আরও স্পষ্ট হলে, মধ্যস্থল আগুন লাগা কাঠের মত হলে কানজি ডুববে। একদিন কানজির ওপর থেকে তিস্তার দিগন্ত খুলে গেলে সেদিনই অন্ধকারে ' প্রথম তিস্তার শক্ত মাটিতে কোন একটা জায়গা থেকে কোন বেটিছোয়া গেয়ে ওঠে ' ও মোর দাঁতাল হাতির মাহুত রে—।' সে গান ছড়িয়ে পড়ে ও তৈরি হয় আপনা থেকেই। হস্তী। নারী, মাহুতের গান— সারা উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে প্রচলিত — নারীর বেদনার প্রতীক হিসাবে। বামন বামনির গল্পও এ প্রসঙ্গে আসে। বামনের নারী জয়মালা - কানজির প্রেমে পরে হস্তিকন্যা হয়। সেই কানজি। হাতির রাজা কানজি ডুবে যাচ্ছে। ' আজ তোঁহো ডুবি যাছ রে কানজি, মুই হস্তিকন্যা কিছু করিবার পারো না। পারো না।'

'ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদ উঠল রাত্রি আড়াই প্রহর পার হয়ে যাওয়ারও একটু পরে।' .... সে কী চাঁদ। ..... চামশিঙ্গা। কেউ দেখছিল, কেউ না, কানজিও না। কানজির সারা শরীরে মস্তির নেশা ঝম ঝম করছে। অথচ তার শরীর নড়ছে না। সে তার শুঁড় তোলে , আস্ফালন করে, বৃংহন করে।

বিভিন্ন বয়সীরা সেই ছাউনির মধ্যে আপন আপন যৌন আবেগ তাড়িত হয় সেই চাঁদানী রাতে। দলবদ্ধ হস্তি হস্তিনীর রমন দৃশ্য দেখা যায়। কানজি আপন মনে, আপন রভসে মাতে, শেষ মস্তি করে নিজের মধ্যেই, কারণ তার পাশে তো কোন শরীর নেই।

' দিনের প্রথম আভায় সকলে দেখল কুঁচকি পর্যন্ত মাটিতে ডুবে গেছে কানজি, পেট আটকে আছে। রটে গেল পুরো ডুবতে বা উঠে আসতে আরও দু'মাস লাগবে। সুতরাং বাড়ি ফেরা— চ্যাংড়াবান্দা, ধূপগুড়ি — আসামমোড়, চালসা ইত্যাদি শব্দে বাসের গায়ে চড়। ছাউনি ভাঙা শুরু হয়। হঠাৎ নজরে পরল কানজির পেছনের বাঁ দিকটা ডেবে যাচ্ছে। দশরাত দশদিন ধরে অমন শ্লথগতিতে ডেবে যাওয়ার পর একরাত্রি একবেলায় যেন ধস নামল। কানজির মাথা সোজা হয়ে গেল। মাথা, কান অবশেষে শুঁড়, ' কখন যে শুঁড়ের মাথা টুকু মাটির ভিতর ঢুকে গেল, তা কেউ দেখতেই পেল না। সব আলোড়ন ঢেকে মাটি বয়ে গেল।'

' বিকেল হতে না হতেই তিস্তার বুক বা চরে কানজির সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যখন বালি আর মাটি বইতে লাগল' , ...তখন সবাই নিজ নিজ গাঁয়ে ফিরতে চাইল। বুড়িমার গোতও ফেরার জন্য' তৈরি হচ্ছিল। এমন সময় সেই দেশি চ্যাংড়া 'টিকিটোয়াল'কে দেখে ফেলে এবং তার বাসেই ওঠে। বাস ছাড়ে না কারণ সেই বুনো হাতির পাল পার হচ্ছে। এমন সময় ভ্যানে করে শাড়িপড়া শনিয়া আর ফুলপ্যান্ট পরা তার স্বামী এদের খোঁজে এসে বাসের পাশে এসে দাঁড়ায়।

ছোটদাদাকে এরা সঙ্গে সঙ্গে যেতে বলে কারণ বুড়িমার গাঁও আর আগের অবস্থায় নেই। রাস্তাঘাট বদলে গেছে যদি সে চিনতে না পারে। ছোটদাদা ওদের বাসে বসিয়ে বাস থেকে নেমে যায়। নেমে শনিয়াকে দেখে। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারে না।

কথান্তর

পুরাণে যেমন অনেক যুদ্ধ জয় পরাজয়ের পর মানুষ জন পরস্পর অচেনা হয়ে যায় তেমনি এখানে শনিয়া আর ছোটদাদা পরস্পর অচেনা— নিজ নিজ পথে চলে যায় আবার হয়তো ওদের সূত্রেই গোত নির্মাণের জন্য।

ছোটদাদা পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই অপরিচিত নতুন রাস্তায় গোতে ফিরল। কিন্তু সে রাস্তায় এখন কেউ যাতায়াত করে না —আরও অচেনা হয়ে গেছে। তার তো এক জীবনের অর্ধেকটা কাটলো নির্বাসনে — পাঞ্জাব, ইউপি, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বর্ধমান, নদীয়া ও পুরুলিয়া জেলায়। সেখানে অচেনা নদী মাঠ ফসল মানুষ, জঙ্গল, কথা না বোঝা মানুষকে কথা বুঝিয়ে, কথা বুঝে— তার পায়ে পুরনো রাস্তা নতুন লাগবেই বা কেন? ধূপগুড়ি থেকে নেমে উল্টোপথে এগিয়ে জলঢাকার নতুন ব্রিজের তলায় ময়নাতলির হাটের কাছে নেমে সে বাস ধরে। বাসে ফিরতি পথের দু'পাশের পরিবর্তন সে দেখতে চায় না। কারণ এতো সে দেখেছেই

অন্যত্র। বুড়িমার গাঁও বদলেছে, নতুন ময়নাতলির হাট থেকে নতুন বাস ছাড়ে, নতুন কালভার্ট হয়েছে, বিঘায় পঁচিশ তিরিশ মন ধান হয়। এক এক জমিতে তিনটি ফসল হয়। মানুষের পোশাক বদলেছে, হাতে টাকা এসেছে। ' বদলেছে জেনেই ছোটদাদা নতুন রাস্তায় নতুন বাস ধরে। '

বদলেছে জেনেও ছোটদাদা তাহলে পুরনো রাস্তা খোঁজে কেন? ' নিজের জানা থেকে নিজের বাঁচাটাকে বাঁচানোর জন্যেই এমন ডানা উল্টোয়।' ছোটদাদা জন্ম চাষী। সে নির্বাসনে গিয়ে কন্ট্রাক্টরের কাজ করেছে ক্ষেতে খামারে। কিন্তু সে চাষ নিজস্ব নয়। ভেতরে বুড়িমার গোতের চাষই ক্রিয়াশীল ছিল। আসলে ছোটদাদা নিজেই নিজেকে মেপে যাচ্ছে। নিজেই নিজেকে যাতে দেখতে না পায় সে জন্য নিজের জল ঘেটে দিচ্ছে, ডানা বদলাচ্ছে। এখন বহুদিন পরে গোতে ফিরতে গিয়ে ছোটদাদার মনে নানা মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা দিয়েছে। বুড়িমার গোতে নই দারিঘরে ছোটদাদা আর আত্মরক্ষা করতে পারে না। গোতের ভিতরে, জলে ভিতরে যেন জল পেয়ে যায়। যেন আর কোন আক্রমণ নেই, কোন আত্মরক্ষা নেই, কোন আত্মগোপন নেই। ভোটুর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে ছোটদাদা — "যেইটে যাই সেইঠে দেখি বুড়িমার গাও। বুড়িমার ভিটা, ওই ক্ষেতবাড়ি, এই ফরেষ্ট বাড়ি। এই বড়বাঁক, এই দুদুয়া, এই জলঢাকা, এই গরাতি। ..... চোখ মেলি দেখি ভুটান পাহাড়খান চলিছেন তিনপাকে ঘিরিয়া নাচিনাচি। ..... ফরেস্ট খান অ্যানং ঘিরি ধরিল ভাবিছু ধূপগুড়ি কি গয়েরকাটা আসি গেইল রে নাবিবার নাগে। .....যেইঠে যাই সেইঠে দশনদী, বিশনদী। দুই হাত ভরি জলখাই তেষ্টা মেটে না। ভাবিছু স্বপন দেখিবার ধইচছু। য্যালায় ট্রাকত যাছি, বাসত যাছি স্বপন দেখিছু।.....। মোর তো একখান স্বপন, বুড়িমার গাঁও। মোর তো একখান গন্ধ বুড়িমার গাঁও। তো ঠিক করিলাম একবার ফিরি আসিছোঁ স্বপনক মিলিবার। শিলিগুড়ির বাদে বাসের ভিতর শুনিল হাতি ডোবা ধরিছে। স্যালায় এইঠে নামি গেলোঁ।"

সোন্দনী, বড়ধোলী, পাথারনী, নদিনী, শাদুরী এরা একজায়গায় জটলা করে কাঁদছিল। বড় বাপা আষাঢু, ছোট বাপা ভাদুরা, সানঝু শুনছিল বর্হিদেশের গল্প কী করে বুড়িমার দেশের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যেন ছোটদাদা পথ ভুলে গেছে। সে জন্য তারা সমস্বরে বলে ওঠে — ' আসি তো গেইছিস, ছোটদাদা এই তো বুড়িমার গাঁও। থাকি যা, থাকি যা, ছোটদাদা।' নদীরামের বৌ কুমালী রুদ্ধশ্বাসে সব শুনছিল। এধরণের গল্প এই প্রথম সে শুনল। এভাবেই ছোটবড়, চেনা অচেনা, সবার থেকে 'থাকি যা' সম্ভাষণ সে শুনছিল।

বড়দাদা, বাঙ্কুরাম, শালুরাম, জোনাকু, বড়চিলা, দুই নম্বর ভোট্টু বুনুয়া, কলিন, অগুন, দোলান, দুখারু,

পকড়ু, মংলা, ধানরাম, শানু, ঝটু, নাদু এদের নিয়ে ছোটদাদার সমাবর্তন। এরা সবাই মিলে তাকে ধরে মাথায় করে ক্ষেতবাড়ি নিয়ে নামায়। বুড়িমার বাড়ির বাইরে এখন পাকা রাস্তা দিয়ে দলগাঁওয়ের মোড় যাওয়া যায়। হাইইল্ড ধান, পাম্প। 'ছোটদাদাকে আর বিশেষ নজর না করলে আলাদা করা যায় না।'

অমাবস্যার রাত। খাওয়ার পর ছিলিম নিয়ে বসেছে সবাই। ছোটদাদা কথা বলে, রসিকতা করে — তার স্বরে, ধরনে পরিবর্তন ধরা পড়ে। নানা কথার পর বিসারু ডাঙ্গির মাঠের প্রসঙ্গ তোলে। এবং যে মাঠ একদিন ছোটদাদা দখল নিতে চেয়েছিল — তা তাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয়, নিজের গোতের একজন করে নেয়। ' হামরালা ডাঙ্গির মাঠের ঢেমনার ক্ষেতবাড়ি ছোটদাদার নামে লিখি দিই। মোর গোতের মানষি হইয়া ছোটদাদা এইটে জোত বানাউক।'

' গভীর ঘুমের ভেতর ছোটদাদা জন্ম জন্মান্তরের চেনা ডাক শোনে।' সে দেখে পাঞ্জাব, ইউ পি, বা মুর্শিদাবাদ নদীয়ার কোন ক্ষেতবাড়িতে অন্য ফসলের ভেতর শুয়ে আছে। ডানা বদল করে সে ঘুমে ডুবে যায় যেন কোন ডাক শোনেনি। সে নইদারিঘরে ঘুমোচ্ছিল। পাশে বড়দাদাও শুয়ে, যেন যমজ ভাই শাল আর সেগুন। ছোটদাদা, ছোটদাদা বলে ডাকা হয়। তিরিশ বছর জন্ম জন্মান্তরে এরকম তো ঘটেনি। আজ ঘটল। সে ধান গাছের ওপর বয়ে যাওয়া হাওয়ার শব্দ শুনতে চায়। আবার ডাকা, 'ছোটদাদা', 'ছোটদাদা'। সে ওঠে নিজের শূন্য বিছানার দিকে তাকায়। আজ সন্ধ্যায় যে খুটিটায় ঠেস দিয়ে বসেছিল সেখানে বসে। ' সে শুনতে পায়, ' ক্ষেতবাড়ি দেখিলুঁ ছোটদাদা? সে শোনে —

"ক্যানং বৈদেশিয়া হয়্যা গেইল সেই তোর বুড়িমার গোতের ক্ষেতবাড়ি। ..... ধান তো বেশি হওয়া ভাল। একমনের জায়গায় দশ মন ভাল। ..... ধান বেশি করে না হইলে মানষির খিদা ক্যানং করি যাবে? মানষির পেটের ক্ষিধা 'তোক না মুই দেখিছোঁ ছোটদাদা — তোর জন্মের আগত দেখিছোঁ। আটখান মানব জন্ম ধরি একখান মানব জন্ম খাড়া হয়। একখান শাল গাছের জন্মভর তোক দেখিছোঁ। তোর হাল নাই। বলদ নাই। বিছন নাই। জল নাই। বাপ নাই। মাও নাই। গোত নাই। স্যালায় দুই খান হাত আছে আর দুই খান পাও আছে। সেই হাত আর পাও নিয়া তুই কত কতখান পৃথিবী হাঁটি যাছিস ছোটদাদা।" কথাগুলো মনে মনে বলে ছোটদাদা দাওয়া থেকে নামে।'

'তোর দুইখান হাত আর দুইখান পাও। তুই পাছাড়াঙা ভাঙিস। সাত পুরুষের শিমুল গাছত নৌকা দেখিস। কানজি হাতি ডুবিবার দেখিস।'

ঃ তৃতীয় অধ্যায় ঃ

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ঃ
রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার

তিস্তাপুরাণ ঃ
রচনারীতি ও স্বরূপ বিচার

তৃতীয় অধ্যায়

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণের রচনারীতি

বাংলা সাহিত্য ধারায় উপন্যাস হল নবতর সংযোজন। প্রকৃতপক্ষে প্রায় দেড়শ' বছর ধরে এই সাহিত্য শাখাটি পুষ্টি লাভ করেছে। ইংরেজি নভেলকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে এর সূচনা ও বিকাশ। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিকদের হাতে বার কয়েক ইংরেজি মডেল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা হলেও সফল হয়নি। বাঙালীর নিজস্ব গল্প কথনের যে রীতি মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারতাদি নানা পুরাণ, রূপকথা, কথকতা, ব্রত-পাঁচালিতে আছে বাংলা উপন্যাসে সে রীতি ছিল অনুপস্থিত। সতীনাথ ভাদুড়ি তাঁর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' এ ইংরেজি মডেলমুক্ত নতুন ধারার সার্থকতা অনেকখানিই দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে দেবেশ রায় বলেছেন—

" 'রামচরিতমানস' এর কাহিনীর আদলে অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি পথের ছেলেকে নিয়ে যে উপন্যাসিক বিবরণ সতীনাথ তৈরি করলেন তাতে আমাদের বাংলা উপন্যাসের স্বীকৃত ফর্ম প্রত্যাখ্যাত হল আর প্রস্তাবিত হল কাহিনীর এক নতুন বিন্যাস।" ১

দেবেশ রায় তাঁর দুই যুগান্তকারী উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'এ ইউরোপিয় মডেল থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছেন। বাংলার নিজস্ব গল্প বলার রীতিকে আত্মস্থ করে জন্ম দিয়েছেন এক নবতম আধুনিকতার।

এই আধুনিকতা ও স্বাতন্ত্র্য উপন্যাস দুটির গঠনরীতিতে, ভাষা শৈলীতে উপমা, প্রবাদ, ছিলকা, ফাকালি ইত্যাদি প্রয়োগে এক 'লোকায়তিক পৌরুষ' এনে দিয়েছে, যা বাংলা উপন্যাসে অভিনব।

দেবেশ রায় দেশজ আখ্যানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট পরিণামে আখ্যান শেষ না করে কালপ্রবাহের মতো আখ্যানের নিজস্বগতি সৃষ্টি করেছেন। এই এগিয়ে চলার অর্থ সব ক্ষেত্রে যে সামনে চলা তা নয়। একটি কথাবৃত্তের সূত্র ধরে আর একটি কথাবৃত্তে এসে যাওয়া; সব সময় বাস্তবের যৌক্তিক পারম্পর্য মেনে চলা নয়। বাস্তবতা তার কাছে এক আবশ্যিক উপাদান হলেও এর কোনো সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় আকার প্রকার নেই। বাস্তবকেও তিনি গড়ে নিয়েছেন নিজের মতো করে।

প্লট পরিকল্পনায় তিনি আদি-মধ্য-অন্ত্যরীতিকে ভেঙ্গে ফেলেছেন। সমগ্র উপন্যাসটিকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে আকার দিয়েছেন। এই পর্বগুলি আবার কতকগুলি ছোট ছোট অধ্যায় বা এপিসোডে বিভক্ত। এপিসোডগুলি পৃথক পৃথক ভাবে সম্পূর্ণ। আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনো কোনো এপিসোড আপাত সম্পর্কহীন,

এলোমেলো। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সম্পর্কশূন্য নয়।

এদেশের পুরাণ কথায়, মহাকাব্যে যেমন আখ্যানের মধ্যে আখ্যান ঢুকে থাকে; একটি কথাবৃত্তের পাশাপাশি আর একটি কথাবৃত্ত চলতে থাকে; যে কোন বিন্দু থেকে বেরিয়ে আসতে পারে আর একটি কথাবৃত্ত; কথকতায় যেমন কথক মূল গান থামিয়ে দিয়ে অন্য গল্প, তত্ত্ব কথা, উপদেশ কিছু বিবরণ শুরু করেন—আবার ফিরে এসে খেই ধরেন, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে তা দেখা যায়।

উপন্যাস অনুসরণে রচনারীতি ও রচনা স্বরূপ আলোচনা করা হলো—

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত :

উপন্যাসটি ছ'টি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি যথাক্রমে আদি পর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব, বৃক্ষপর্ব, মিছিলপর্ব ও অন্ত্যপর্ব। পর্বগুলিকে বিষয় চিহ্নিত করার জন্য নামকরণও করা হয়েছে। যেমন আদিপর্ব—গয়ানাথের জোতজমি, বনপর্ব—বাঘারুর নির্বাসন, চরপর্ব—নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্ত বাহিনীর সীমান্ত ত্যাগ; বৃক্ষপর্ব—বাঘারুর প্রত্যাবর্তন, মিছিল পর্ব—উত্তরখন্ডের স্বতন্ত্র রাজ্যদাবি, অন্ত্যপর্ব—মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র। ছ'টি পর্বের পর একটি পরিশিষ্ট অংশ যুক্ত করা হয়েছে। তারও একটি শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ।'

পুবে ডায়না থেকে পশ্চিমে তিস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত তিস্তাপারের রাজবংশী মদেশিয়া, ভাটিয়া, ওরাওঁ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিশ্বাস, ভাষা সংস্কৃতি কীভাবে তিস্তা অন্বিত তাই আলোচিত হয়েছে তিস্তাপারের বৃত্তান্তে।

শিরোনামযুক্ত পর্বগুলি বেশ কয়েকটি শিরোনামযুক্ত এপিসোড বা অধ্যায়ে বিভক্ত। যেমন, আদিপর্ব—'গয়ানাথের জোতজমি' তে ১. হাটের পথে ২. ন্যাওড়া নদীর খেয়া ৩. সত্যমেব জয়তে ইত্যাদি মোট একচল্লিশটি এপিসোড বা অধ্যায় রয়েছে। এভাবে বনপর্ব 'বাঘারুর নির্বাসন' তে মোট চুয়াল্লিশটি, 'চরপর্বে' চৌত্রিশটি, 'বৃক্ষপর্বে' তেত্রিশটি, 'মিছিলপর্বে' আটত্রিশটি, 'অন্ত্যপর্বে' আঠাশটি এপিসোড। পরিশিষ্টকেও একটি এপিসোড ধরা যেতে পারে।

পর্ব ও এপিসোডগুলি প্রত্যেকটিই পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমনকি পর্বগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পূর্ণ বা আংশিক পৃথক ও স্বাধীন ভাবেও প্রকাশিত হয়েছিল। '১৯৮০ ও ৮১ শারদীয় 'বারোমাস' এ আদি ও বনপর্ব ৮৪ ও ৮৬-র শারদীয় 'কালান্তর'-এ চরপর্বের অংশ বিশেষ ও ৮৭-র শারদীয় 'প্রতিক্ষণ' এ অন্ত্যপর্ব

প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।' প্রতিক্ষেত্রেই পাঠক পর্বগুলির পৃথক পৃথক স্বাদ অনুভব করেছেন।

এভাবে আলাদা আলাদা পর্ব জুড়ে এক সময় তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ পাঠককে শুধু বিস্মিতই করে না, উপন্যাস রচনার এই নতুন কৌশল, লেখকের অপরিসীম দক্ষতা, মনন ও শিল্পরূপ নির্মাণ পাঠককে মুগ্ধ করে। অতীতে নম্বর দিয়ে অধ্যায়কেচিহ্নিত করার নানা রীতি দেখা গেছে। কিন্তু পর্বের নামকরণ বা এপিসোডের নাম করণ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'এর আগে দেখা যায় নি।

'হাটের পথে' আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়। এই এপিসোড শুরু হয়েছে 'একই হাটেএকসঙ্গে দুটো সাইন বোর্ড যাচ্ছে এবড় একটা দেখা যায় না।' এই পংক্তি দিয়ে। ক্রান্তির হাটে তিস্তাপারের জমি জরিপের জন্য হল্কাক্যাম্প বসবে সেই হল্কাক্যাম্পের সাইন বোর্ড ও 'কৃত্রিম গো প্রজনন কেন্দ্র' এর আর একটি সাইন বোর্ড যাচ্ছে হাটের দিকে। অধ্যায়টির শেষ পংক্তিগুলো এরকম—"এখন এই রাস্তাটুকু দিয়ে সেই শেষ হাট চলছে। চলতে গেলেই লাইন বাঁধা হয়ে যায়। আর লাইন বাঁধা হয়ে যায় বলেই আকাশের দিকে ফেরানো 'কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র' আর পিঠে ঝোলানো হল্কা ক্যাম্প যেন এই পুরো লাইনটিরই পরিচয় হয়ে উঠতে চায়। যেন, এই পুরো লাইনটাই গিয়ে ঢুকল গো-প্রজননের কৃত্রিম ব্যবস্থায় বা সেটলমেন্টের হল্কা ক্যাম্পে।" ২

যে দুটি সাইনবোর্ড অধ্যায়ের সূচনাতে দেখা গেল অধ্যায়ের শেষে হাটে যাওয়া মানুষের লাইনের পুরোভাগে সেই সাইনবোর্ড দুটি থেকে যেন সমস্ত লাইনটিকেই বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত করল। 'হাটের পথের' এই ঘটনার মাঝখানে হাটে যাওয়ার পথ, পথে চলার বাহন, হাটুরেদের পোষাক আশাক, তাদের চলার গতি, কথাবার্তা, জিনিসপত্রের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাটের পথের শুরু ও শেষ একরকম নয়। শেষ সময়ে সব কিছুতেই ব্যস্ততা, তাই পথ ব্যস্ত মানুষের চলনে লাইন বাঁধা।

"পয়লা হাটত দোকানিয়া বেচে

মাঝ হাটত দেউনিয়া বেচে

শেষো হাটত ঘরুয়া বেচে।" ৩

হাটের পথের ঠাসবুনোট বর্ণনা অবশ্যই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রচনার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই হাটের পথ ধরেই চলে যাওয়া যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ন্যাওড়া নদীর খেয়া' এপিসোডে। এর প্রথম লাইন 'গাছ গাছালি, বনবাদাড়ের ভেতর দিয়ে এই পাকা রাস্তাটা শেষ হয়ে যায় নদীর পাড়ে।' 'হাটের পথে'তে যে রাস্তা দিয়ে সাইন বোর্ড সহ হাটুরেরা যাত্রা শুরু করেছিল তারা সেই রাস্তা ধরে এসে দাঁড়ায় 'ন্যাওড়া নদীর খেয়া' ঘাটে। এভাবে একটার

পর একটা এপিসোড শেষ শুরুর অদ্ভুত মিল রেখে এগিয়ে চলেছে। অথচ এপিসোডগুলির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও বজায় আছে।

আবার এপিসোডগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকে গিয়ে যে পরম্পরা চলছিল তা, খানিকটা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে এমন উদাহরণও আছে। যেমন ছেষট্টি নম্বর এপিসোড 'নির্বাসনের দিকে' তে বাঘারু তার নির্বাসনভূমি ডায়নার চরের দিকে যাত্রা করেছে। এই এপিসোডের শেষ পংক্তি—"বাঘারুর মাথার পেছনে পিঠের ওপরে পাতার গোছা ভাসে, গলায় পাথর ডোবে আর ভোখা বোকার মতই স্রোতে ভেসে থেকে বাঘারু ওপারে, ফরেস্টে, তার নির্বাসনে চলে যায়।" ৪

কিন্তু তারপর, পরপর তিনটি প্রক্ষিপ্ত এপিসোড 'অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত', 'কৃষি বিজ্ঞানের' কিছু প্রক্ষিপ্ত, 'রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত'। এরপর সত্তর নম্বর এপিসোড 'নির্বাসনভূমি'। 'নির্বাসনের দিকে' 'নির্বাসনভূমি'ই স্বাভাবিক ঘটনা ও স্বাভাবিক গতি। মাঝখানে পরপর তিনটি প্রক্ষিপ্ত, পরস্পরে সম্পর্কযুক্ত এপিসোড এই গতি পথে আপাত সঙ্গতিবিহীন। কিন্তু উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমিতে মোটেই প্রক্ষিপ্ত নয়, সঙ্গতিহীনও নয়। বরং বাঘারুর নির্বাসন ভূমিতে যাওয়ার গল্পের ফাঁকে লেখক আমাদের জানিয়ে দিলেন 'অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত' অধ্যায়ে সরকারি ফরেস্টের হাল হকিকত্। ফরেস্টে গোরু মোষের বাথান ব্যবস্থা, উত্তরবঙ্গে, ভারতে, এ ধরণের বাথান তৈরির আর্থিক দিক। শুধু তাই নয় ডায়নার চরে যে গো-মোষের বাথানে বাঘারু নির্বাসিত হল এই বাথান চিত্র তারই আগাম উপস্থিতি বলতে পারি। কৃষি বিজ্ঞানের কিছু প্রক্ষিপ্ত' অধ্যায়ে জানা যায় ফরেস্ট ভিলেজাররা চাষবাসে যে আধুনিকতা এনেছে, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করছে তার ফলে ফরেস্টের পরিবেশের সন্তুলন বিনষ্ট হচ্ছে; পশু, পাখি অন্যান্য বন্য জীবজন্তু মারা পড়ছে—এইসব বিবরণ। 'রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত' তে জানা যায় ১৯৬২ সালে চীন ভারত যুদ্ধের ফলে উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের বনাঞ্চলে মিলিটারিদের স্থায়ী ক্যাম্প তৈরি হয় এবং তাদের দুধ সাপ্লাই দেওয়ার কাজে বাথানের ভূমিকা খুব জরুরী হয়ে পড়ে। ডায়নার চরে গয়ানাথের বাথান থেকে এ ধরনের দুধ সংগ্রহের বিবরণ 'বনপর্বে' পাওয়া যায়।

বৃত্তান্তর :

'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'র রচনারীতির আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হল বৃত্তান্তর। যে বৃত্তে কথা আলোচিত হচ্ছে সেই বৃত্তে কথা বলতে বলতে আর এক বৃত্তে চলে যাওয়াই হল বৃত্তান্তর। বনপর্বের 'চুরাশি' অধ্যায়ে

লেখক একেবারে ঘোষণা করে বৃত্তান্তরে গেছেন। এই এপিসোডের নামকরণই করা হয়েছে 'পাখোয়ালপর্ব : আর এক বৃত্তান্তের শুরু'।

বাথানে মইষানি একটি বাচ্চা প্রসব করেছে। এই প্রসব কার্যে বাঘারু ধাইয়ের মত রক্ত ক্লেদ ঘেঁটে সহায়তা করেছে। সূর্যগ্রহণ চলছিল। গ্রহণ শেষ হলে দ্বিতীয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল, মোরগের ডাক শোনা যায়। তারই মধ্যে একটি মিলনেচ্ছুক পাখি তার সমস্ত শরীর দিয়ে ডেকে চলে ক-অ-অ-ক্। শুরু হয় পাখোয়াল পর্ব, শুরু হয় আর এক বৃত্তান্ত। এই পাখির ডাকে সারা দিয়ে বাঘারুও পাখির মতো করে ডেকে উঠেছে। "দুটো রক্ত মাখা হাত মুখের কাছে তুলে বাঘারু খুব চাপাস্বরে, গলা না তুলে পাখিটার ডাকে সাড়া দেয়।" ৫ 'একবার, দুবার, বারবার'।

বৃত্তান্তরের আর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্ত্যপর্ব 'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র'কেও উল্লেখ করা যায়। বাঘারুর বৃত্তান্ত-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য পৃথক বৃত্তান্ত 'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র'এর অবতারণা করা হয়েছে। মাদারির মায়ের জীবন বৃত্তান্ত ব্যারেজ বৃত্তান্তর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কাহিনির সম্পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে।

কথান্তর ঃ

বৃত্তান্তরের মতো কথান্তর ঘটেছে উপন্যাসের বহুস্থানে। একটি কথা বলার মধ্যেই অন্য কথা এসে কিছুক্ষণের জন্য বক্তব্যকে অন্য দিকে নিয়ে গেছে। বক্তব্য হয়েছে শিল্পিত, স্বাদু। উপন্যাসের ঘটনা, বিষয় নতুন মাত্রা পেয়েছে। যেমন 'আদিপর্বে উনত্রিশ অধ্যায়টি 'জনসমাবেশ' শিরোনামে চিহ্নিত। এতে সার্ভে পার্টিকে ঘিরে উৎসুক আদিবাসী উপজাতি মানুষের ভিড় জমে উঠেছে। মনে হচ্ছে একটা জনসমাবেশ। এই জনসমাবেশের কথা বলতে গিয়ে ফরেস্টের পাশের পতিত জমির কথা লেখক যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে কিছুক্ষণের জন্য জনসমাবেশের কথা ভুলে থাকতে হয়। এই ভূমিখন্ডের চমৎকার বর্ণনাই যেন মূল বিষয় হয়ে ওঠে।

"এই রাস্তার মত জমিটার ওপর মোটা মুথাঘাস অসম ভাবে বেড়ে উঠেছে। ফলে কোথাও ঘাসের আস্তরণ খুব পাতলা, তলার মাটিই প্রায় বেরিয়ে পড়েছে। আর কোথাও আস্তরণ এত মোটা, যে বসলে ঘাসে লেগে থাকা জলে পেছনের কাপড় চুপসে যায়। এই রাস্তার মত ডাঙ্গার ওপরটা পরিষ্কার যেন যত্ন করে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা হয়। দু-পাশে ডাইনের নিচু জমিটাতে বা বাঁয়ের ছোট নালীর ওপারে বনের গাছ গাছড়ার মধ্যে লম্বা ঘাসের জঙ্গল ঘন ও বড় হয়ে উঠেছে। এসব ঘাসবনে বাঘ থাকে। ঝোপঝাড় জঙ্গলও দুপাশে মাটি কামড়ে, গাছ কামড়ে ছড়িয়েছে, বেড়েছে।" ৬

অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল 'মিছিল পর্বে' একশ ঊনষাট অধ্যায় থেকে। 'একটি প্রয়োজনীয় জীবনী : সংক্ষেপে' নামক এই এপিসোডে বীরেনবাবুর জীবনী আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ময়নাগুড়ি বাড়িতে এই রাজবংশী উকিল তাঁর বাড়ির সামনের জমিতে কিছুটা অংশে কপি চাষ করে। এই কথার সূত্র ধরে কথান্তর ঘটে— "আজকাল অবিশ্যি এদিকে একটা নতুন ব্যবসা চালু হচ্ছে। এরকম বড় জমির ওপর বাড়ি যাদের তাদের কাছে তরকারি চাষীরা এসে ওই বছরের জন্য জমিটা নিতে চায়। সমস্ত খরচ চাষীর। তরকারি যা হবে তার একটা অংশ জমির মালিকের আর কতটা চাষীর তা এখনও স্থায়ী ভাবে স্থির হয়নি, কারণ এক একজন এক এক নিয়মে জমি যদি দেয়, দিতে রাজী হয়। কেউ আধি ভাগে দেয়—তা হলে অবিশ্যি ফলনের খরচাও বারআনি-চারআনি ভাগ হবে। বীরনেবাবুর কাছেও এই প্রস্তাব দিয়ে দু-তিন বছর লোক আসছে।" ৭

এরপর তিনি ধীরে ধীরে সম্পন্ন রাজবংশীদের এই তরকারি চাষের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া, তরকারি চাষিদের আবার শিলিগুড়ির আড়তদার কর্তৃক দাদন দেওয়ার কথা বলেন। এর ফলে এক সময় বহু রাজবংশী পরিবারের ভিটেমাটি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা আসে। ক্রমে যে ময়নাগুড়িতে রাজবংশী বাড়ির সংখ্যা কমে যাচ্ছে এও তার একটি কারণ বলা হয়। এভাবেই চলে আসে অতীতে তিস্তা পার হয়ে জলপাইগুড়ি শহরে যাওয়ার কথা, সেখানে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার কথা, তিস্তা ব্রিজ হওয়ায় অবস্থাটা কিভাবে পাল্টে গেল সে সব কথা। জলপাইগুড়ি শহরে পঁয়ত্রিশ বছর কোর্টে প্র্যাকটিস করার সুবাদে তিনি বেশ ভালোই বুঝতে পারছেন উত্তরবঙ্গের শহরাঞ্চল থেকে রাজবংশীদের সংখ্যালঘু হওয়ার কারণ কী কী।

এভাবে তার নিজের কপিচাষের কথা থেকে কথান্তর ঘটিয়ে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের প্রসঙ্গ চলে আসা দেবেশ রায়ের রচনা রীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এক কথাসূত্রের সাহায্যে অন্য কথা সূত্রে যাওয়ার উদাহরণও হতে পারে এটা।

কথার বিস্তার :

কথান্তরের মতো করেই কথার বিস্তার আর একটি রীতি। একই কথা হয়ত দু এক পংক্তিতেই সমাপ্ত হতে পারে কিন্তু তার বিস্তার ঘটিয়ে উপন্যাসের গঠন, সৌন্দর্য ও শৈল্পিক বিকাশ ঘটানো হয়। যেমন, আদিপর্বে 'এই হাটটা কেমন' অধ্যায়ে ধূপগুড়ি হাটে বিক্রির জন্য হয়ত লরি করে বাঁশ এনে ফেলা হচ্ছে। সেই বাঁশ ফেলার আওয়াজ নিয়ে কথা। 'অন্ধকার সেই মাঠের ভেতর থেকে আওয়াজ উঠে আসে চাপা প্রতিধ্বনির মত, কিন্তু ধারাবাহিক। সেই বাঁশের পাঁজার ওপর সারি সারি বাঁশ ফেলার আওয়াজ। সেই চাপা আওয়াজ একবার

শোনা গেলে কানে আসতেই থাকে। থামে না। হতে পারে ট্রাকের পর ট্রাক লোড হচ্ছে—টিটাগড়ের কাগজ কারখানার জন্যে। হয়ত ফরেস্টের সাপ্লাই। কিন্তু বেশির ভাগই কন্ট্রাক্টরের, নইলে গ্রামের বন্দরের হাটে কখনো বাঁশ হাটি বসত না। আবার হতেও পারে এটা বাঁশের আওয়াজই নয়। এমন ধারাবাহিক আওয়াজ ত অন্ধকারের ভেতর থেকে নানা কারণেই উঠতে পারে। দিনেও হয়ত ওঠে। কিন্তু অন্ধকারেই হয়ত বেশি শোনা যায়। তিস্তা কোন দিকে? কতদূর? তিস্তার বন্যায় ফরেস্টের শাল সেগুন ভেঙ্গে পড়েছে। এখন অন্ধকারে রাতারাতি তা টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসছে। হতে পারে সেই কুড়োল কাটার শব্দ। বা, এখন সন্ধ্যায়, সেই দূরের ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে ট্রাক বাস যাওয়ার আওয়াজ মাটি কাঁপিয়ে আসে। বা পাহাড়ের ওপরের কোনো বন্যা ন্যাওড়া নদী দিয়ে এখুনি বয়ে যাচ্ছে—দুই পাড়ে ধাক্কা দিয়ে আরো বেগে ও আরো বেগে। কোথাও হুড়মুড় করে পাথর পড়ছে? নাকি চা বাগানের জেনারেটরের আওয়াজ ফরেস্টে, নদীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুর পাক খাচ্ছে?"৮ কথার বিস্তারের আর একটি উদাহরণ—আদিপর্বের 'শেষ হাটি থেকে হাট শেষ' অধ্যায়ে হাটে ঘুরে বেড়ানো এক অশ্বারোহী প্রসঙ্গে—

"সেই ঘোড়া আর তার অশ্বারোহী এখন এই শূন্য হাটের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়, যেন এখনো সেখানে হাট, যেন এখনো তাদের মানুষজন ঠেলে ঠেলেই এগতে হচ্ছে। কিন্তু এখন আর অশ্বারোহী তার ভিক্ষার ঝুলি কাঠির ডগায় ঝুলিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে না। এখন আর ঘোড়াটিকে পেছনে ধাক্কা খাওয়ায় চমকে উঠতে হয় না। আর অস্পষ্ট চাঁদনিতে সেই ঘোড়া আর অশ্বারোহী ঘুমুতে ঘুমুতে প্রায় নির্জন হাটের অলিগলি দিয়ে পাক খেতে খেতে যেন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বস্তির দিকেই চলেছে। হতে পারে এই অশ্বারোহী অন্ধ, হতে পারে এই ঘোড়াটি অন্ধ। হতে পারে এই ঘোড়া আর অশ্বারোহী দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো এক সময় পথ পেয়ে যাবে—তারপর আকাশের পটভূমিতে, নদীর চর ও অরণ্যের দূরত্বকে এই ঘোড়া আর তার আরোহী আদিগন্ত প্রান্তরের আলে আলে কমিয়ে আনবে। ভাদ্রের আকাশের ধূসরতার, নীল আর প্রান্তরের সবুজে, অরণ্যের কৃষ্ণাভ হরিতে এই ঘোড়া ও তার আরোহী কখনো মিশে যাবে, কখনো ঘোড়াটির লম্বিত গলাটিই ঝুলে থাকবে, ঘাড়ের ভেতর গুঁজে যাওয়া মাথা নিয়ে আরোহীর ছায়াটুকু ভেসে থাকবে, কখনো ঘোড়ার পেছনটা একটা ভাঙ্গা মেশিনের মত লাফাতে লাফাতে যাবে—যেন কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো নদীর দুই পাড়ে ছায়া, মাঝখানের জল টুকুতে ওদের ছায়া, কখনো জলহীন নদীখাতটুকু যেন ঘোড়ার চারটি পায়ের ভঙ্গুরতা থেকে উজিয়ে গেছে, কখনো নদীর বাঁধের ওপর ছায়ায় আলোয়, নদীর ভেতর চরে বালিয়াড়ি

ভেঙ্গে, বা অরণ্যের কোনো গাছ তলায়। এখন মধ্য রাত্রিতে এই শূন্য হাটে বোঝা যায় না, এই ঘোড়া ও তার আরোহীর কোথাও একটা অবতরণ আছে।" ৯

ডিটেলস :

দেবেশ রায়ের উপন্যাস রচনার একটি উল্লেখযোগ্য রীতি বা বৈশিষ্ট্য হলো ডিটেলস বা অনুপুঙ্খ বর্ণনা। বিষয় সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা না থাকলে ডিটেলস-এ যাওয়া সম্ভব হয় না। এতে বিষয় আরও বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে যে নদী, মানুষ, প্রকৃতি এসেছে সে সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এত বেশি যে এ উপন্যাসে ডিটেলস-এর ছড়াছড়ি। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক— আদিপর্বে 'কৃষক মজদুর শ্রেণি সংগ্রাম' অধ্যায়ে সুহাসবাবুদের জরিপের কাজে ব্যবহৃত চেইন রাধাবল্লভ, হৃষিকেশদের খাস জমিতে পড়ায় তারা সেটাকে খারাপ অভিপ্রায় বলে মনে করে। তারা মনে করে চা বাগানের কোম্পানি 'স্যালায় এই বীরেনবাবুর ঘর, এই কোম্পানির ঘর, আমাদের পাছত দিয়া, লুকাইয়া আমিনবাবুক দিয়ে, এইঠে আমাদের জমিতে চেইন ফেলিছে।'

"দম নেবার জন্য রাধাবল্লভকে থামতে হয়। তখন তার গলার সবগুলো রগ ফুলে উঠেছে। যে কণ্ঠস্বরে ও যে ঘৃনায় সে এই কথাগুলো বলতে চায় তার সবটুকু যেন সে উগরে দিতে পারছে না। তাই তার মুখটা একটু ডাইনে বেঁকে গেছে যদিও তার শ্রোতার বেশির ভাগই বাঁয়ে। আর তার নীচের ঠোঁটটা চেবড়ে যাচ্ছে। তাতে তার ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের কালচে গোড়ায় জমে ওঠা থু থু, দেখা যায়।" ১০

বনপর্ব'এ ছাপ্পান্ন অধ্যায়ে চা শ্রমিক মেয়েদের সেজে গুজে যাওয়ার অনুপুঙ্খ বর্ণনা লক্ষ করা যায়।

"মেয়েদের শাড়ির চড়া রঙ। শাড়িগুলো একটু উঁচু করে পড়া। আঁচল নেই। সামনের দিকটা একটু বেশি তুলে আঁচলটা বুক থেকে নেমে এসেছে। চুলের বাহার পরনের বাহারকে হার মানায়। কারো চুল মাঝখানে সিঁথির দুপাশে পাট করা। কারো বা দুই বেণী মাথার ওপর তুলে গিঁঠ দেয়া। কারো আবার ছোট চুল, ঘাড়ের কাছে গিঁঠ। কারো একটু উঁচুতে খোপা বাঁধা। প্রায় সবার চুলেই ফুল। সকালে যে যা হাতের কাছে পেয়েছে, সেই ফুল গুঁজে দিয়েছে। দু একজনের মাথায় বড় বড় গাঁদা। কাল রাত্রিতে বাংলো থেকে তুলে এনে রেখেছে। বেগনি রঙের ছোট-ছোট ঘাস ফুলও কেউ-কেউ ঝাঁটার কাঠিতে গেঁথে গুঁজে দিয়েছে। ফুলের কাঠি মাথার ওপর উঠে আছে, চলার সময় কাঁপছে।'' ১১

বনপর্বের 'পঁয়ষট্টি' অধ্যায়ে একটি কুকুরের সঙ্গে বাঘারুর দীর্ঘক্ষণ খেলা চলে। খেলার অনুপুঙ্খ বর্ণনার

কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল। "কুকুরটা তার বুকে ভর দিয়ে দাঁড়ানোয় বাঘারুর পা হড়কে যেতে শুরু করে। সে কোমরটা আর বাঁ পা টা একটু এগিয়ে দিয়ে শরীরের ভর ঠিক রাখে। উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা থেকে এতক্ষণ ছাড়া পেয়ে কুকুরটা তার বশ্যতার সম্পূর্ণ শারীরিক তৃপ্তি ছাড়া শান্ত হবে না।

বাঘারু তাড়াতাড়ি কুকুরটার সামনের দুই পায়ের নীচে দুই হাত দিয়ে একটু সামাল দিতে চায়। তারপর বাঁ হাতটা কুকুরটার ঘাড়ের লোমের ভেতর সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের চামড়ার কাছে নখগুলো বেঁধায়। 'হয় হয় সিও, সিও'—এই শান্ত করার ধ্বনিতেও বাঘারুর শ্বাসের উষ্ণতা লাগে।

বাঁ হাতটা কুকুরের ঘাড়ে ঢোকানোয় বাঘারুর বাঁ বাহু ও ঘাড় ও মুখের নাগালের ভেতর চলে আসে। কুকুরটা বাঘারুর বাহুটা হাঁ করে কামড়ে ধরে। বাঘারু তার বাহুতে দাঁতের ধার টের পায়। ডান হাতটা দিয়ে একটু সরাতে হয় বাঘারুকে। পা হড়কে চিৎপাত পড়ে যেতে হয় মাটিতে। কুকুরটা পাশে পড়ে যায় কিন্তু চার পায়ের ওপর ঠিক দাঁড়িয়ে পড়ে। আর এই বার যেন ভাল বাগে পেয়েছে এমন ভাবে বাঘারুর ঘাড়ের খাঁজটার দিকে হাঁ করে মুখ এগিয়ে দেয়। 'খাড়ো', 'খাড়ো' বলে বাঘারু ওকে ঠেকাতে চায়। কিন্তু তবুও জোর খাটায় দেখে, হেসে ফেলে, বাঘারু দু হাতে ওর ঘাড় ধরে, 'শা-লো' বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

কুকুরটা বাঘারুর পায়ের দিকে গড়িয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে, বাঘারু উঠে পড়ার জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত আকাশের দিকে ধনুকের মত তুলে দিয়েছে। সেই ভঙ্গিকে আহ্বান ভেবে তার দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে কুকুরটা বাঘারুর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। কিন্তু ও নিচু থেকে ঝাপ দেয় বলেই ধপ করে বাঘারুর বুকের ওপর পড়ে যায় আর বাঘারু আবার চিত হয়ে পড়ে। এবার কুকুরটা তার ওপরে।" ১২

চরপর্বে 'বন্যার মুখে শয্যা' অধ্যায়ে বন্যার আশঙ্কায় বাঁধে উঠে আসা আব্দুল নামে একটি আধ পাগলা লোক তার পোটলা-পুটলি থেকে একখানা কম্বল যেভাবে বাঁধের মাটিতে পাততে থাকে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা উদ্ধৃত করা হলো—

"আব্দুলের বিছানাটা আসলে একটা তুলোর কম্বল—এরকমই কোনো বন্যার সময় রিলিফে পেয়েছিল। সেটার তুলো অনেক জায়গায় উঠে গেছে, কোনো কোনো জায়গা ফেসেও গেছে, কিন্তু এমন নিপুণ ভাঁজ আব্দুলের যে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। সেই কম্বল খুলে তার ভেতর থেকে আব্দুল একটা পাটের দড়ি বের করে। বের করে দড়িটাকে পাশে রেখে, আবার কম্বলটাকে ভাঁজ করে। কম্বলটা খোলা হয় যতটা, ভাঁজ তার চাইতে বেশি। সেই ভাঁজের ওপর দাগ পড়ে গেছে—বেশ মোটা দাগ। ঐ দাগগুলো ছাড়া অন্য ভাবে

আর এ কম্বল ভাঁজ করাই যাবে না। কিন্তু আব্দুল লম্বা লম্বি ভাঁজ করে আবার খোলে। পুরো কম্বলই-দো-ভাঁজি করে সে উঠে দাঁড়ায়, তার মাথা ধরে সামনে ঝুলিয়ে ঝাকায়, তারপর খুব ধীরে সেটাকে মাটিতে ছোঁয়ায় আর আস্তে করে শোয়াতে শোয়াতে, নিজে কোমর ভেঙ্গে নিচু হতে হতে এগিয়ে কম্বলটাকে একেবারে মাটির ওপর মেলে দেয়। তারপর আবার যেখান থেকে সে শুরু করেছিল, সেই জায়গাটিতে ফিরে আসে। যেন কম্বলের, লম্বা করে শোয়ানো কম্বলেরও মাথা আর পা আছে।'' ১৩

এই আব্দুলের গল্প এক কথাবৃত্ত থেকে আর এক কথাবৃত্তে আসার উদাহরণও হতে পারে। চরপর্বের ছিয়াশি থেকে একশ' এক অধ্যায় পর্যন্ত 'ব্রিজে আলো কেন', 'জগদীশের রাগ', একটা নদীর ভেতর অনেক নদী', 'ভূগোলের ভেতরে ইতিহাস', 'চরের ভেতরে চরুয়া', 'ফ্লাড আসবে কতক্ষণ চার ঘন্টা না ছয় ঘন্টা', 'আটষট্টির বন্যার স্মৃতি', 'হিন্দি সিনেমার জোকার', 'বালিয়াড়ির মাথায় কে'? 'বানা, জাগরণ ও ঘুম'; 'দক্ষিণে পশ্চিমে জাগো আইস', 'নদী এখনো পুরানো', 'অকাল গোষ্ঠ', 'গরুর পালের পাড়ে ও জলে নামা', 'গরুর পালের পাড়ে ও বাঁধে ওঠা', 'চর দুই নম্বর'—অধ্যায়গুলিতে বন্যা অভিজ্ঞ চরুয়াদের আসন্ন বন্যার হাত থেকে বাড়ি ঘর, জমি-জিরেত, গরু-বাছুর রক্ষা করার কর্ম তৎপরতা, বর্ণিত হয়েছে। বাড়ির লোকজন, গরু বাছুর সব বাঁধে প্রতীক্ষা করছে তিস্তার ভয়াবহ বন্যার জন্য। এরই মাঝে ঐ বন্যার্তদের ভিড়ে আব্দুল নামক এক ভবঘুরে মানুষের আগমন। 'একশ দুই' ও 'একশ তিন' বন্যার মুখে জিপগাড়ি অধ্যায় দুটিতে আব্দুলের গল্প বলা হয়েছে। এক বৃত্ত থেকে অন্য এক কথাবৃত্তে এসে পড়া। এরপর 'বন্যার মুখে জীপ গাড়ি'র শেষাংশে আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফেরা হয়েছে।

আদি-মধ্য-অন্ত্য-হীনতা :

উপন্যাস শুরুর কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত উপন্যাসের প্লট নির্মাণ, ভাবনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইংরেজি মডেলের আদি মধ্য-অন্ত্য পদ্ধতিটিই অনুসরণ করে আসা হয়েছে। তাই উপন্যাসে তৈরি হয়েছে নিটোল গল্প। গল্প মানেই তার শুরু মধ্য ও শেষ বা উপসংহার থাকবেই। এতে উপন্যাসকে দুপারের বাঁধন মেনে চলতে হয়। ঐ বাঁধনের মধ্যেই কাহিনির যা ভাঙ্গা-গড়া। কিন্তু দেবেশ রায় তিস্তাপারের বৃত্তান্তে আদি-মধ্য-অন্ত্য'এর ধরা-বাঁধা ছকটি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। উপন্যাস বৃত্তান্তের সুবিধা নিয়ে মুক্তি পেয়েছে ছকের বাইরে গিয়ে। প্রথমে নামকরণের দিক থেকেই আলোচনা করা যায়। 'বৃত্তান্ত' কোন স্থির বিন্দুতে শুরুও হয় না শেষও হয় না। অন্তহীন এর চলা। সমাজের গতিময়তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্তহীন চলার কাহিনিই তো তিস্তাপারের বৃত্তান্তে

লিখিত। তবু কোথাও শেষ তো করতেই হয়। লেখকও করেছেন। কিন্তু পা রেখেছেন সামনে যেখানে তার বৃত্তান্তের চরিত্র বাঘারু ও মাদারি— হেঁটেই চলেছে।

পর্ব ও অধ্যায় বিন্যাসের কৌশল এমনি খোলামেলা বাঁধনমুক্ত যে কোন অংশ যে কোন অংশের সঙ্গে অদল বদল করে নিলেও উপন্যাসের মূল সুরের বিঘ্ন ঘটবে না। এ যেন তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত হাটের মতোই। হাটে প্রবেশের যেমন নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। যখন খুশি যে কোন দিকে যে কেউ প্রবেশ করে, বেরিয়েও যায়। হাটে যেমন বহুস্বর, বহু মানুষের আলাপ আলোচনা, কর্মকান্ড অথচ দূরে একটু কান পাতলে এর একটা সামগ্রিক আওয়াজ কানে আসে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তেও তাই।

যুক্তির ধারাবাহিকতা এতে নেই। যুক্তি মানেই তো সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে এগোনো। জীবন তো সেই নিয়মে চলে না। জীবনের গতি, সমাজের গতি সরল রৈখিক নয়। তাই যুক্তির শৃঙ্খলায় বেঁধে এর রূপ নির্মাণ করাও অসম্ভব। তাই দেবেশ রায় যুক্তি পারম্পর্য ভেঙ্গে 'নির্গুণ চলনের' দ্বারা বাঘারুর গতি পথ তৈরি করেছেন। তাই এই বৃত্তান্তে কোন একক কাহিনি গড়ে ওঠেনি। এর প্রতিটি অধ্যায় বা এপিসোড্ যেন এক একটি গদ্যের বনানী। তার নিজস্ব বিস্তার আছে, গঠন আছে, গহিনতার আছে। লক্ষ লক্ষ শব্দ দিয়ে নির্মিত পাহাড়ের মত গঠিত বহুধা বিস্তৃত এবং ব্যাপ্ত এই উপন্যাসটিতে তিস্তা বনশ্রেণির মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে অগ্রসর হয়েছে আপন খেয়ালে। বন পাহাড় ঘেরা মাটিতে রাজবংশী, মদেশিয়া, ভাটিয়া কে না স্পর্শ পেয়েছে সেই গতিশীলা তিস্তার। এরকম প্রাকৃতিক সজ্জার মতো তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নিয়মভাঙা নিয়ম বিশেষ। তবে এ নিয়ম খোলামেলা, স্বাধীন চলমান জীবনের ছবি আঁকার জন্য এ নিয়মই উপযুক্ত।

তিস্তাপারের মানুষের ছবি, তাদের জীবন যাত্রা, ভাষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, জীবন যন্ত্রণার নানা দিক তাঁর সঙ্গে এর বর্ণনার ভাষাটিও বড় চমৎকার। এর মধ্যেও আছে কিঞ্চিৎ ছক ভাঙার দুরন্ত সাহস।

বাঘারুর মতো একটি প্রান্তিক চরিত্র যা বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই তাকে নির্মাণ এবং নির্মাণের কৌশল ছক ভাঙার আর একটি দৃষ্টান্ত।

বহুস্বর :

দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্তের সংলাপ রচনায় বহুস্বর আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি। বহুস্বর বা 'পলিফনি' সম্পর্কে তাঁর নিজের মতটি প্রথমে আলোচনা করে নেওয়া যাক। 'উপন্যাস নিয়ে' গ্রন্থে ৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠায় উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে বাখতিনের মতামত আলোচনা করতে গিয়ে কীভাবে পলিফনি তৈরি হয়

সে কথার উল্লেখ করেছেন।

"সংলাপ 'প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স' ও 'পরোক্ষ ডিস্‌কোর্স' এই দুই ভাগের পর বাখতিন তৃতীয় আর এক ধরনের ডিসকোর্সের কথা বলেছেন যাতে। 'প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স-এ অর্থের ওপর বক্তার সম্পূর্ণ অধিকার। 'পরোক্ষ ডিসকোর্স'-এ আর এক ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বাচনে। আর তৃতীয় ধরনের ডিস্‌কোর্স-এ থাকছে দুটো কণ্ঠস্বর। কারণ, তার উদ্দিষ্ট হিশেবে থাকে আর একটি ডিস্‌কোর্স। এই দ্বিস্তর ডিসকোর্স-এর নমুনা আমরা দৈনন্দিনে পাই যখন অনুপস্থিত আর একজনের কথা একটু বেঁকিয়ে আমরা জানাই, এমনকী আর এক জনের গলার স্বরও নকল করি। ঔপন্যাসিক যখন আর একজনের বিবরণ দেন তার ভিতরও দুটো স্বরই সক্রিয় থাকে, লেখকের স্বরের মধ্যেই নিহিত থাকে যার কথা তার মত করে বলা হচ্ছে তারও স্বর। এটা দ্বিস্বর ডিসকোর্স বটে। তবে নিষ্ক্রিয়। প্যারডি আর লেখকের বিবরণ—এই দুই ধরনের দ্বি-স্বর ডিসকোর্সের পরেও বাখতিন আর এক ধরনের ডিসকোর্সের নাম দেন 'সক্রিয় দ্বিস্বর ডিস্‌কোর্স। সেখানে বাইরের কথা সাজানো হয় ভিতরে একটা অর্থ ঢুকিয়ে দিয়ে, সেখানে আত্মকথা বলা হয় বা স্বীকারোক্তি নেওয়া হয় আর একটা কণ্ঠস্বর লুকিয়ে রেখে, সেখানে অন্য কোন বক্তার প্রতি কটাক্ষে কোনো মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া হয়, সেখানে অন্য কোনো সংলাপের জবাবে কিছু বলে দেওয়া হয়, সেখানে সংলাপ গোপন করে কথা বলে যাওয়া হয়।.....তখন সেই চরিত্রের কথাগুলিতে আরো বহু বহু চরিত্রের বহু বহু বহু কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এছাড়া অনেক সময় চরিত্রগুলি আলাপ করে না—নিজেরা কথা বলে ফলে সংলাপগুলি দীর্ঘ হয়। 'সেই চরিত্রের জীবনের অনেকটাই যে ঐ সংলাপের ভিতর দিয়ে আমরা জানি—সঙ্গে আরো বহু চরিত্রকে।

এই ভাবেই 'ডায়ালজি' থেকে তৈরি হয় 'পলিফনি।"" ১৪

এ প্রসঙ্গে 'A Glossary of Contemporary Literary Theory' বইয়ে বলা হয়েছে 'Polyphonic literally, many voiced. The term is associated with the theories of Mikhail Baktin, especially with his idea of the polyphonic novel. In this study of Dustoevsky Baktin argues that Dostoevsky was the creator of the polyphonic novel. Baktin uses the word voice in a spcial ways (was), to include not just matters linguistic but also matters relating to IDEOLOGY and power in society, voice for dostoevsky refers not just to and originating person, but to a network of beliefs and power relation-

ship which attempt to place and situate the listener in certain ways" ১৫ নিচে বহুস্বরের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো—

"দুই হাতের পাতায় চোখ ঢেকে, ফরেস্টার অন্ধকারকে আরো অন্ধকার করছিল। নীরবতা তৈরি হচ্ছিল। সে নীরবতায় এতক্ষণের কথাবার্তাগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সেই নীরবতার ভেতর থেকে ফরেস্টার শুরু করে 'শুন হে হুজুর, কাথা মোর একখান। না-হে, একখান না হয় দুইখান। কাথা মোর দুইখান। কী দুইখান কাথা? একখান কাথা হইল যে তোমরা ত জমির হাকিম। ত মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর একখান ত জমি আছিল। আপল চাঁদ ফরেস্টের গা-লোগো। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। মোর নামখান কাটি দাও। ঐ জমিখান লিখি দাও গয়ানাথ জোতদারের নামত্। বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার—জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর। ত ঐ জমিখান মুই, ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন, ছাড়ি দিছু, লিখি দাও; শ্রী ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ করা গে-এ-এ-ইল।'" ১৬

উপরোক্ত বক্তব্যটি বাঘারুর। কিন্তু এখানে লেখকের কণ্ঠস্বর ও শোনা যাচ্ছে। এমনকি প্রচ্ছন্ন পরোক্ষে 'হাকিম' এর কণ্ঠস্বরও লুকিয়ে আছে। গয়ানাথ জোতদারের নামে কেন বাঘারু 'জমিখান' লিখে দিতে চায়, সে একটা বিস্ময় মাখানো প্রশ্ন হাকিম করতেই পারতেন। না করলেও বাঘারুই উত্তর দিয়েছে 'বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার—জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর।' হাকিমের অনুচ্চারিত সংলাপটিও পাঠক শুনতে পাচ্ছেন। এভাবে বহুস্বরের সৃষ্টি হয়েছে বাচনটিতে।

চরপর্বের 'তিরানব্বই' অধ্যায়ে ছোট ছোট সংলাপে দুই কথকের কথোপকথনে বহুস্বরের সন্ধান পাওয়া যায়।

'জগদীশ মাথা ঝাঁকায় সম্মতি জানিয়ে, এমন কি যেন গজেনের পরের কথাটাতেও সে আগাম সম্মতি জানাচ্ছে।

'সেই তোমার রাইত তিন ঘড়িত বসুক আর ধরো কেনে কালি সকালত আসুক?

গজেন আবার প্রশ্ন করে।

'হয় আসুক, সেই প্রায় শোনা যায় না গলায় আবার ধুয়ো ওঠে। জগদীশ মাথা নাড়ে।

'পাহাড় ঠে যে ফ্লাড নামিবার ধইচছে, স্যালায় ত আর হারি যাবার না পারে?

'না—পারে'

'এইঠে নামিবার নাগিবে, এই ঠেই, এই তোমার চরত আসি ধাক্কা মারিবেই।'

'মারিবেই'

স্যালায় হামাক এসকু (রেসকিউ) হবা নাগিবে?

'নাগিবে'

'ও এসকু হবার তানে কী নাগিবে? নৌকা নাগিবে।'

'নাগিবে'

'নৌকা ত নাই রো'

'নাই রো'

এক আছে রংধামালির হাটের ভাঙ্গা নৌকাখান— সেইটা কুনো কাজে লাগিবার না হয়।

'না হয়'

'হামরালা যেইলা এসকু হয়্যা যাম তার পাছত মিলিটারি নৌকা নামিবে।'

'নামিবে'

এ্যালায় এসকু আছে, নৌকা নাই।'

'নাই'

'স্যালায় নৌকা আছে, এসকু নাই।'

'নাই'

নিতাই দুহাতে তার পাশের লোকজনকে একটু সরিয়ে দিয়ে নিজে দুই পা পেছিয়ে যায়। তারপর গজেনের পেছনে এমন জোরে লাথি কষায় যে গজেন উল্টো দিকে রাবণের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যায়।" ১৭

এখানে 'সক্রিয় দ্বিস্তর ডিসকোর্সে' পলিফনি লক্ষ করা যায়।

এছাড়া আর এক ধরনের বহুস্বর আছে যখন বক্তা অন্যকারও সঙ্গে আলাপ করে না; নিজে নিজেই কথা বে যায়। সেখানে সংলাপ হয় দীর্ঘ। সেই সংলাপের ভেতরই বহুকণ্ঠস্বর লুকিয়ে থাকে। যেমন—''গাছ গিলা গয়ানাথের, পাখি গিলা গাছের, পাখিগিলা গয়ানাথের না হয়। গাছগিলার চামড়ার নাখান পাখি গিলা গাছের ডালত বাসা বান্ধি ধরোছে। যেইলা বাও দিবার ধরে, ঝড়ের নাখান বাও দিবার ধরে, বাওড় গাছ গিলার

ডালপালা ওটলপালট খাবার ধইচছে—এ্যানং ওলটপালট য্যান গাছের মাথা গিলা মাটিত নামি আসিবে আর গাছের শিকড়খান আকাশত উঠি যাবে—স্যালায় বৃক্ষের কুনোপ্রাণী বৃক্ষ ছাড়িবেন না। পাখপাখাল ডালপালা আঁটি ধরি থাকিবেন, পিঁপিড়া গাছের গাওত সিন্ধি যাবে, সাপখোপ গাছের গর্তত ঢুকি যাবে। সেই বৃক্ষখান যদি ঝড়ত উলট্ খায়, পড়ি যায়, স্যালায়ও বৃক্ষের কুনো প্রাণী বৃক্ষ ছাড়িবেন না। তারপর বাও থামিবেন, বৃষ্টি থামিবেন, বৃক্ষের পাতা পচি-খসি যাবার ধরিবেন—স্যালায় পাখপাখাল সাপ পিঁপিড়া নতুন গাছত বাসা বান্ধিবার ধরে। গয়ানাথের ঝড় গয়ানাথের গাছক-উপড়ি দিছে। গয়ানাথের বাঘারু মুই, গয়ানাথর গাছক ভাসি দিছি। গয়ানাথের বাঘারু মুই 'গয়ানাথর গাছ নিগি ভাসিছু। তিস্তার এই বানাত ভাসি যাছু। তিস্তার বানত ভাসি যাছু। তিস্তার বানার নাখান এই ঝড় আর বৃষ্টির বানাত ভাসি যাছু। গয়ানাথের বাঘারু মুই গয়ানাথর গাছনিগি ভাসি যাছু। গয়ানাথর জোয়াই আর গয়ানাথ ভটভটিয়া খান চড়ি সদর আস্তা (রাস্তা) দিয়া তামান চর আর কায়েম দেখি দেখি খুঁজিবার ধরিবেন—কোটে গিয়া ঠেকিল্ গয়ানাথর গাছ আর গয়ানাথর বাঘারু। মোর আর কী কষ্ট? বসি আছু, খাড়ি আছু, তিস্তার বানা মোক টানি নিয়া যাছে। গয়ানাথ দেউনিয়াখানের বড় কষ্ট। আসিন্দির জোয়াইখানের বড় কষ্ট। এ্যালায় এ্যানং বানা। কোটৎচর, কোটৎটাড়ি। আর এ্যানং ঝড়। এ্যানং বৃষ্টি। কোটত মোক খুঁজি খুঁজি বেড়িবার লাগিবে। মুই চিল্লি পারি—হে দেউনিয়া মুই এইঠে। কিন্তুক শুনিবেন সেই চিক্কার। কি আর করিবেন রে দেউনিয়া? তোমারলার গাছগিলা আর বাঘারুক জেলায় ভাসি দিছেন, স্যালায় ত তুলি নিবার নাগিবে। না-হয় ত সব খানই তোমার 'লস্', পুরাখান 'লস', এই চারিখান গাছ 'লস', এই বাঘারুখান 'লস'। জালিয়া যেই লা জালখান নদীতে ফেলেন, স্যালায় ত গুটিবার নাগিবেই। না হয় ত জালখানই 'লস'। তোমরালার গাছ গিলাক আর বাঘারু খানক-যেই লা ভাসি দিছু স্যালায় গুটিবার নাগিবেই। এই ঝড়ত্, এই বৃষ্টিত্ তোমার ভট ভটিয়াখান নিগি বাহির হওয়া নাগিবে। কিন্তু গাছের এই পাখি গিলা ত গয়ানাথ দেউনিয়ার না হয়। পাখিগিলা গাছের। গাছখান ফ্লাডত ভাসিবার ধরিছে ত পাখি গিলাও ভাসিবার ধরিছে। এ্যালায় ঝড়ত কাঁপিছে, বৃষ্টিত ভিজিছে, কিন্তুক পাখিগিলাই আন্ধার কাটি দিছে। পাখি গিলার কুনো গয়ানাথ নাই রো, কিন্তু পাখি গিলার ত বাঘারু আছো, মুই আছো। মোক দেখিবার নাগিবে না কেনে ভয় খাছে পাখিগিলা? ১৮

বাঘারুর এই দীর্ঘ স্বগত সংলাপে তার কণ্ঠে শোনা গেছে বহু মানুষের স্বর। গয়ানাথের ও গয়ানাথের জোয়াই আসিন্দিরের। সেই সঙ্গে লেখকেরও।

তিস্তাপুরাণের রচনা রীতি

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মত তিস্তাপুরাণেরও গঠন রীতি 'এপিসোডিক'। এখানেও সমগ্র উপন্যাসটি মোট সাতটি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি 'শেষ', 'আর এক শেষ', 'আরম্ভ' 'আরম্ভের পর', 'আর এক আরম্ভ', 'শেষান্তর' ও 'কথান্তর'। প্রতিটি পর্বে কয়েকটি করে অধ্যায় মিলে ১১০টি অধ্যায় আছে। অধ্যায় গুলির নামকরণ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত অপেক্ষা আকারে ছোটশব্দ বা বাক্যাংশ দিয়ে প্রস্তুত। যেমন— 'বুড়িমা', 'বাঁচা', সব কিছুর পেছনে', 'ধূপগুড়ি হাটে যাওয়ার প্রস্তুতি ইত্যাদি।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর পর দেবেশ রায় লিখেছেন তিস্তাপুরাণ। তাও আবার প্রায় ২০ বছর পর। 'বৃত্তান্ত'-এ যে রীতির শুরু 'পুরাণে' তার আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রয়োগ। পুরাণে তো সময়ের কোন পরম্পরা নেই। কোনটা আগে, কোনটা পরে সে হিসেব কে রাখে। তাই তিস্তাপুরাণ শুরু 'শেষ' দিয়ে। তারপর 'আর এক শেষ'। তারপরে 'আরম্ভ'। দুটি শেষের পর, তিনটি আরম্ভ, আরম্ভের পরও আর এক আরম্ভ। দুটি শেষেও যথেষ্ট নয়, আছে 'শেষান্তর'। তারপরেও কথা থাকে তাই 'কথান্তর', বলে আর এক পর্ব।

পর্বসজ্জাতেই দেখা গেল শেষের কথা আগে, আগের কথা মাঝে বা শেষে লিখে তিনি গতানুগতিক উপন্যাস কাঠামোর পরম্পরা ভেঙে দিয়েছেন। অথচ পুরাণ কথার মতই প্রতিটি পর্বের প্রতিটি অধ্যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং পরস্পরের সঙ্গে কোন সূত্রে সঙ্গতিপূর্ণ। তিস্তাপুরাণেও দেখা যায়, একটি কথাবৃত্ত থেকে অন্য এক কথাবৃত্তে চলে যাওয়া, কথার বিস্তার, অনুপুঙ্খ বর্ণনা। এখানেও বহু স্বরিক সংলাপ। রাজবংশী কথার ব্যবহারে বক্তব্যকে দুটি তিনটি স্তরে কাজ করানো বা বহুস্বরের প্রয়োগ। কথকতার ভঙ্গিতে গল্প বলা, ফের আগের সূত্রে ফিরে আসা।

কথার বিস্তার :

'পরজন্ম' থেকে অধ্যায়ে নতুন সোলংগা তৈরি করার জন্য নতুন গাছ খোঁজার কথা চিন্তা করতে করতে ঘাটোয়াল এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠে একটা আলো অনুসরণ করে দেখতে পায় এক পাতায় ছাওয়া ঘর। সেখানে গিয়ে সে দুই বুড়োবুড়ির গল্পে প্রবেশ করে। সেখানে ঘাটোয়াল একটি মাথোয়াল পায়। সেই মাথোয়ালের বর্ণনা করতে গিয়ে কথার বিস্তার লক্ষ করা যায়। কথা যেন ফুরোয় না — "মাথোয়ালটা নিয়ে এত-যে দেখে ঘাটোয়াল, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, উল্টে-পাল্টে, একবারও সে মাথায় দেয় না। মাথায় দেওয়ার জিনিশ

তো মাথাতেই দেওয়ার কথা, প্রথমেই। মিছিমিছি ত আর ঘাটোয়াল এত নদীর জল খায়নি। হাতে তোলার জিনিশ সবচেয়ে শেষে হাতে তুলবে — হাটে যদি কেউ হাত দাও কিনতে যায়, তবে কি সে বেচুয়ার কাছ থেকে দাওটা নিয়েই আগে ধার দেখবে, নাকী আগে হাতলটা দেখবে? আগে হাতল দেখবে, হাতে মুঠো করে দেখবে, মুঠো করে হাত মাথার ওপর তুলে দেখবে, মুঠো করে হাত মাথার ওপর থেকে নামিয়ে দেখবে। হাতল যদি হাতের মুঠোয় মুঠোয় লেগে যায়, তখন দাওয়ের কাঁধ দেখবে। ধারের দিকে তো ধার থাকবেই, তবে কোপটা জুত মত পড়বে কিনা তা নির্ভর করে দাওয়ের কাঁধ কতটা চওড়া, কতটা পেটানো, কতটা বেঁকা তার ওপর। সেটাও যদি লাগসই হয়, তাহলে দেখবে দাওয়ের মাথা। কত সরু, কত শক্ত, কত খাটো। এক কোপে যদি দাওয়ের মাথা ভেঙে যায়, তাহলে তো সারা জীবন ওই খুঁতো দাও নিয়ে কাটাতে হবে। এক জীবনে লোকে আর কটা দাও কিনবে?" ১৯

কথান্তর :

কোন কথা বা বিষয় বলতে গিয়ে তার ভেতর অন্য কথা ঢুকিয়ে দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা এই উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য যেমন—'কোন একদিন নিশ্চয় ছিল যখন বুড়িমাই সবার খেয়াল রাখত। আর সেকারণে বুড়িমাকেও সবার খেয়াল রাখতে হত। কবে যে এমন ছিল তা মাপার সব হিশেব এখন তামাদি হয়ে গেছে।'

এই মাপার হিসেব তামাদি হওয়া বিষয়টি বোঝাবার জন্য, " এবারের ধান গতবারের সমান হল, নাকী কম হল, নাকী বেশি হল, সে তো শুধু স্মৃতি দিয়ে মাপা হয় না, শরীরের স্মৃতি দিয়ে মাপা হয়। তাও একজনের নয়, যতদূর চোখ যায় ততদূর, যত মানুষ যতদিন ধরে খাটে, সেই সব ছড়ানো টাড়ি বাড়িতে যত বৌ-বেটি আছে তারা যতদিন ধরে পা নাচায়, হাত ছড়ায়, ধান সেদ্ধ জল গড়িয়ে দেয়—সেই সব প্রান্তর জোড়া আর ঘরভরা স্মৃতি দিয়ে একবছর তো দূরের কথা দশ বছরও মনে রাখা যায়, বা মাটির কথা.....যেন গুঁড়ি থেকেই শাল গাছ বাড়ে।" ২০

বুড়িমাকে খেয়াল রাখা ও বুড়িমার সবার খেয়াল রাখার বিষয়টা এতটা পুরনো হয়ে গেছে যে শুধু স্মৃতি দিয়ে নয়, শরীরের স্মৃতি দিয়ে মাপারও বাইরে, কোনো একা মানুষের নয় টাড়ি বাড়ির যত বৌ বেটি আছে তাদের শত সহস্র কাজের কথা যা দশ বছরও মনে রাখা যায়, তার থেকেও পুরনো। এই যে স্মৃতি মাপার জন্য-বুড়িমার গোতের বা টাড়ি বাড়ির মানুষ জনের কাজের বিস্তারের প্রসঙ্গ আনা, এটা দেবেশ রায়ের লেখার

একটা বিশেষ ধরন। কথান্তরে চলে গিয়ে বিষয়ের ব্যাপকতা বোঝানো। এ জন্য সাধারণত তিনি জটিল বাক্য ব্যবহার করেন। সে জন্য বাক্য বড় হয়। বস্তুনিষ্ঠঅনুপুঙ্খ বর্ণনা তিস্তাপুরাণে প্রায় প্রতিটি পৃষ্টাতেই দেখা যায়।

'লেভির আওয়াজ' অধ্যায়ে "লেভির আওয়াজটা যখন প্রথম এসে বুড়িমার গাঁওতে পৌঁছল তখন তাই মনে হল ভূটান পাহাড়টা আর উত্তর দিকে নাই। কোন ক্ষেতে কী রোয়া হবে কোন ক্ষেতে কতটা করে পচা সার খাওয়াতে হবে, শীতকালের শিশির আর হিম সাত সকালে পাতলা হাল দিয়ে কবে মাটিকে খাওয়াতে হবে, ভাদই চাষের জন্যে, কোন কোন ক্ষেত আগে তৈরি করতে হবে, গেল বছর বৃষ্টি না হওয়ায় এ বছর যদি আগে বৃষ্টি হয়। সে জন্য বিতরি ধানের জমিই বেশি করে তৈরি হচ্ছে, এত জমিতে ছিটানোর মত বিতরির বীজ এক বাড়িতে থাকে না, সে জন্য অন্যসব হাউলিয়ার বাড়িতে খোঁজ করতে হয়, কেউ ধার দিতে রাজী আছে কিনা, ফাল্গুন-চৈত্র, বৈশাখে বীজ ছিটিয়ে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়-শ্রাবণে ধানকাটা যায় এমন হিশেব করে জমি খুঁজতে হয়। বৃষ্টি যদি আগুরি হয় তাহলে আষাঢ়-শ্রাবণের ঢলে মাঠের পাকা ধান পচে যাবে। ঢালের জমি চাই, জল যাতে না দাঁড়ায়, চালের দাম যখন এত বেড়ে গেছে তখন বড়ি বাংলা, লুধিয়ান বা ধৌলির মত দামি পাতলা চাল কম করতে হবে। দামি চালের দাম আর কত বাড়বে, তার বদলে জমিরা, কালশনি, আর কাশিয়াপাঞ্জা বেশি করে লাগাতে হবে—টাউনের মানষি সে চাল পছন্দ করবে,.....তখন তো মনে হল ভুটান পাহাড় যদি পাহাড়েও থাকে, তাহলে মরাঘাট ফরেস্টে আগুন লেগেছে।" ২১

গল্প ঃ

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর জাতকের গল্প বা বাংলার রূপকথা, মঙ্গলকাব্য, নাথকাহিনি ইত্যাদিতে এক গল্পের সূত্রে অন্য গল্প বলার রীতি লক্ষ করা যায়। রামায়ণ, মহাভারতাদি পুরাণ কাহিনি গুলিতেও এরকম অসংখ্য গল্পের সন্ধান মেলে। তিস্তাপুরাণেও বাংলার প্রাচীন গল্প বলার রীতি অনুসৃত হয়েছে। গোত্রনারী বুড়িমার গল্প বলতেগিয়ে লেখক বিভিন্ন পর্ব ও অধ্যায়ে আরও অনেক গল্পের অবতারণা করেছেন। সেই গল্প গুলির কাহিনির মজা তো আছেই—তাছাড়া সে গুলি দিয়ে উপন্যাসের লক্ষপূরণও হয়েছে। রাজবংশী সমাজেরও নানা দিক গল্পগুলির মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে।

তিস্তা নদীর মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে 'জননী কাউঠানি' অধ্যায়ে বলা হয়েছে' শিবঠাকুর মেচেনী পার্বতীর গল্প 'পরজন্ম থেকে' অধ্যায়ে সময়ের তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে গল্প বলার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন "যে গল্পে

ইহজন্ম পরজন্ম সব একাকার হয়ে যায় সে সব গল্পে সময়ের কোন পরম্পরা থাকে না, যেন এক এর পরে দুই সব সব সময়ে আসে না।" ২২ আবার কয়েক পঙক্তি পরে বলেছেন অবিশ্যি এর উল্টোটাও হয়। কোন কোন গল্প এমন ব্যাঙের মত থাকতেও পারে, আছেও যেখানে একেবারে পিঠে পিঠে চার না এলে সবটাই একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। এরকমই একটি গল্প এক থ্যামথ্যামা মানষির হটকোটিয়া বউ-র গল্প। গল্পের শেষে বলেছেন -'এমন গল্পে তো সবই টাইমের হিশেব দিয়ে।'

এ ধরনের গল্প এসেছে ঘাটোয়ালের নদীতে সোলংগা ফেঁসে যাওয়ার পর নতুন গাছ খুঁজতে গিয়ে 'বুড়ো বুড়ির গল্প' এরপর 'বাপব্যাটা আধিয়ার' অধ্যায়ে বাপব্যাটা আধিয়ারের গল্প এসেছে জমি আধিতে চাষ প্রসঙ্গে। 'ঘোড়া জোতদার' অধ্যায়ে আগের গল্পটির সূত্র ধরেই ঘোড়াহীন ঘোড়া জোতদারের একটি মজাদার গল্প বলা হয়েছে। 'শেষান্তর' পর্বের হস্তিকন্যা অধ্যায়ে তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়ার অণুসঙ্গে যে গান তৈরি হতে থাকে, সেই গানের সূত্রে এক গল্প তৈরি হয়—'হস্তি কন্যা'। ব্রাহ্মণ জয়নাথ আর ব্রাহ্মণী জয়মালা। জয়মালা কী করে হস্তিকন্যা হয়ে ওঠে—সেই মরমী কাহিনি।

ভাষা ঃ

ভাষা ব্যবহারে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ তিস্তাপুরাণকে অনন্যতা দিয়েছে। সুতরাং আঞ্চলিক ভাষা তিস্তাপুরাণের রচনা রীতিতে একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তিনি 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে'তে প্রথম আঞ্চলিক উপভাষার আধুনিক প্রয়োগ করেছেন। এরপর 'মফস্বলি বৃত্তান্তে' রাজবংশী ভাষার সার্থক প্রয়োগ। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ও তিস্তাপুরাণে তা আরও অধিক সার্থকতা লাভ করেছে। তিস্তাপুরাণের রচনা রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজবংশী ভাষার ব্যবহার। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে রাজবংশী ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে লেখকের নিজের উক্তি "আমি রাজবংশী ভাষা রাজনীতির প্রয়োজনে শিখেছি। যখন শিখলাম তখন একবারও ইচ্ছে হয়নি ওই রাজবংশী ভাষায় আঞ্চলিক গল্প লিখব। আমার মনে হয়েছিল ওই রকম আঞ্চলিক লেখালেখির প্রয়োজন নেই। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম স্বাভাবিক গদ্যে একটা গল্প এগোচ্ছে হঠাৎ একটা রাজবংশী সংলাপ এসে গেল, সেখানে অ্যাখ্যান অন্য অর্থের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সেখান থেকে আবার বর্ণনার ভাষায় চলে আসতে পারছি। আখ্যানটাকে দু'তিনটে স্তরে কাজ করানো যাচ্ছে।" ২৩ রাজবংশী ছাড়াও ব্যবহার করেছেন পূর্ববঙ্গীয় ভাটিয়া ভাষা, চা বাগানের শ্রমিক মজুরদের মদেশিয়া ভাষা। ভাষা সম্পর্কে

একটি পৃথক অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বলে এই অধ্যায়ে এ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করা হলো না।

দীর্ঘভূমিকা ঃ

যে শিরোনামে অধ্যায় চিহ্নিত হয়েছে, সেই অধ্যায়গুলির বস্তুনিষ্ঠ বিষয় আলোচনার আগে দীর্ঘ ভূমিকা এবং সেই ভূমিকায় নানা কথা বলে মূল বিষয়ে আসা তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য।

'খরার পাক' অধ্যায়টি আলোচনা করে বিষয়টি বোঝানো হল। প্রথম অনুচ্ছেদে "কেউ কি কোন দিন শুনেছে, কেউ বলেছে ওই পাহাড়টা পুরনো বা ওই নদীটা পুরনো। বা এই ফরেস্টখান পুরনো? যদি কেউ বলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় এই মানষিটা পাহাড় দেখেনি, নদী দেখেনি বা ফরেস্ট দেখেনি। ....। পাহাড়, ফরেস্ট, নদী এই সব পুরনো হয় না, এসব নতুনও হয় না। এসব যেখানে থাকে, সেখানে থাকে। একটা মানব জন্মে আর কটা নদী, কটা পাহাড়, কটা ফরেস্ট দেখতে পারে একটা মানুষ।" ২৪

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "মানুষ তো মানুষ। মানুষ আর কতদিন বাঁচে? এমন সাত আট জন মানুষ বাবা দাদা থেকে পুতির পুতি পর্যন্ত পরপর যতদিন হয়, ভূটান পাহাড়ের হাতি তো তত দিন বাঁচে — এক সঙ্গে সাত আট মানব জন্ম। .....আটদশ মানব জন্মের সমান এমন কটা হাতিও কি একটা পাহাড় বা ফরেস্ট দেখে বলতে পারে—এই ফরেস্টটা পুরনো? বা এই পাহাড়টা নতুন?" ২৫

তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'এমন কথা বলা হয় না। ভাষাটাই এমন নয় যে এই রকম একটা কথা তাতে বলা যাবে। এই কথার মধ্যে কেমন একটা অহঙ্কার মিশে থাকে না? যেন, আমি যখন দেখব তখনই পাহাড়টা থাকবে। .....বড় জোর আমি বলতে পারি আমার দেখাটা আজ নতুন হল, আমার ভেজাটা আজ নতুন হল। আর, তাও কি বলা যায়? অত বলাবলির থাকেই-বা কী?" ২৬

চতুর্থ অনুচ্ছেদে "এই বুড়িমা আছে, বুড়িমার গোত আছে, ক্ষেত বাড়ি আছে— এগুলো থাকে বলে আছে। বাইরের কোন আওয়াজ যদি এতদূর পর্যন্ত আসেই তাহলে তাকে এখানে আসার জন্যই আসতে হয়।" ২৭

পঞ্চম অনুচ্ছেদে "এই তল্লাটে যদি খাশজমি ক্ষেতজমি এসব নিয়ে কোন আওয়াজ তৈরি হয়, সে ধূপগুড়ির হাটেই হোক আর মাদারিহাটেই হোক, সে আওয়াজকে বুড়িমার গোতে আসতেই হবে। এ তল্লাট যত পুরনো

বুড়িমার গোতও তত পুরনো। পুরনোও নয়, বরাবরের।" ২৮

ষষ্ঠঅনুচ্ছেদে "বুড়িমার এই ক্ষেতবাড়িতে কত রকম জমি যে আছে, তার হিশেব এ বাড়ির যারা নিজেরা হাল ধরে ক্ষেতবাড়ির কোন এক টুকরোয় হাল দেওয়া থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত সব কাজ সেরে আবার নতুন এক টুকরোয় নতুন ক্ষেত বানাতে শুরু করে সেইসব জোয়ান মদ্দ, জোনাকুর ছোয়ার ছোয়া জংলু বকা দুখার বড় ছোয়া শানুর বড় ছোয়া আষাঢু বা ওই শানুরই মাইঝান বেটা ভাসার বড়বেটা ঢেপা বা ভিরার বড় বেটা মুতারু, বা বড়চিলার বেটা বড় মুতুরা এরা কিছুই জানে না। ..... তেমনি ক্ষেতবাড়িরও কোন হিশেব নেই, সারা বছর সেটা নানা ফসলে ভরাই থাকে।" ২৯

সপ্তম অনুচ্ছেদে "তেমন তেমন সময় হিশেবের কথা সবারই মাথায় আসে। যখনকার ঘটনা বলার জন্যে এতসব কথা উঠেছে, ৬৮ সালের বড় বানার সেই আগের পরের ভোটেরও কয়েক বছর আগে এখন যারা বুড়িমার গোতের মাতব্বর, সেই মাঘু সানঝু, ছোটবাবা, দুখারুর মধ্যে সানঝু তখন মায়ের বুক ছাড়েনি। আর মাঘু তখন একটা কঞ্চি নিয়ে গরুর দল যখন ফেরে তখন হৈ হৈ করে, তবু সেই দুই তিনখান খরার কথা বুড়িমার গোতের যে বাচ্চাদের শোনার ও মনে রাখার বয়স হয়েছে, তারা শোনে ও মনে রাখে। তাদের শুনতে হয় মনে রাখতে হয়। এই শোনা ও মনে রাখা বুড়িমার গোতের ইষ্ট।" ৩০

দেখা গেল ছটি অনুচ্ছেদের পরে সপ্তম অনুচ্ছেদে দুই তিনটি খরার কথা আমরা শুনতে পেলাম। তাহলে কী পূর্বোক্ত ছটি অনুচ্ছেদ অপ্রাসঙ্গিক? মোটেই নয়। দেশজ রীতির ধরনটাই এমন মূল কথায় যাওয়ার আগে অন্য কথা বলে তবে মূল কথায় আসা। আরও একটি জিনিস লক্ষণীয় যে এই অন্য কথা গুলি নানা তত্ত্বে, তথ্যে, গল্পে, বিবরণে ঠাসা।

ওপরের প্রথম অনুচ্ছেদে রাজবংশীদের জীবনযাত্রায় ফরেস্ট, পাহাড়ের ভূমিকা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মানুষের বাঁচার সঙ্গে ফরেস্টের, পাহাড়ের, নদীর বাঁচার তুলনা, তৃতীয় অনুচ্ছেদে ফরেষ্ট, পাহাড়ের প্রাচীনতা, চতুর্থ অনুচ্ছেদে সেই প্রাচীন পাহাড়কে নতুন রূপে দেখা, পঞ্চম অনুচ্ছেদে বুড়িমার গোতে কোন নতুন আওয়াজ আসার কথা এবং ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে বুড়িমার কত রকমের ক্ষেতবাড়ি, তাতে সারা বছরের কত রকমের ফসল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

এই ভাবেই অধ্যায়গুলিতে শুরুতে, মধ্যে বা শেষে ইচ্ছেমত মূল বিষয়কে লক্ষ করে নানা বিষয়ের অবতারণা

করা হয়েছে। মূল বিষয় বহির্ভূত এই বিষয় গুলি উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও তিস্তাপুরাণ' এর স্বরূপবিচার

উপন্যাস, বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে 'গতিশীল' ও 'জনপ্রিয়' এই শাখাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করা বেশ শক্ত। কারণ এর মতো সর্বগ্রাসী স্বভাবযুক্ত সাহিত্যশাখা বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি নেই। তবু এর গড়ে ওঠার বিবিধ উপাদান লক্ষ করে উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

" আসলে উপন্যাসলেখক জীবনকে দেখেন, জীবনের গভীর ও বিচিত্র স্বাদ পেয়ে বিস্মিত ও উদ্বুদ্ধ হন এবং সেই বিস্ময়ের উদ্বোধনকে অনিবার্য ভাবেই স্বকীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে চান গল্প কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এই পরিবেশনায় ঔপন্যাসিকের অবরুদ্ধ আবেগ মুক্তি পেলে তবেই তার তৃপ্তি। জীবনই হলো সমস্ত শিল্প সৃষ্টির মৌলিক উপকরণ এবং ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউই বোধ হয় জীবনের মৌলিক উপকরণের সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ট নন। মানুষ, ঘটনা, দৃশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সংলাপ এই সমস্ত কিছুই ঔপন্যাসিককে ব্যস্ত রাখে, কৌতূহলী করে, তার পাঠককে বলে বা শুনিয়ে সেই উত্তেজনাকে শান্ত করে তবে তিনি স্বস্তি পান।' ৩১

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি মানুষের জীবন যখন লেখকের গভীর উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, যখন তা গল্পের আকারে, ঘটনা, দৃশ্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সংলাপ ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে শিল্পরূপ ধারন করে তখনই সেই গল্প, কাহিনি বা আখ্যান বা বৃত্তান্ত হয়ে ওঠে উপন্যাস।

"একজন ইংরেজ সমালোচক বলেছেন : 'Novel is a narration in prose, based on a story in which the author may portrary character and the life on a age and analyse sentiments and passions and the reactions of men and women in their envirment' এই সংজ্ঞার তাৎপর্য দাঁড়ায় এরকম—উপন্যাসে থাকবে — ১, গদ্যাশ্রয়ী আখ্যান ২, বিশেষ যুগের চরিত্র ও ৩, কল্পিত নরনারীর অনুভূতি আবেগ প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ।' ৩২

জীবনের কথা বলা এই উপন্যাস মাধ্যমটির শ্রেণি বিচার করা কিন্তু সহজ কাজ নয়। কারণ বিভিন্ন লেখকের জীবনদৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন, লেখার ভঙ্গিমা বিচিত্র এবং লেখার বিষয়ও বিচিত্র। শ্রেণি নির্ণয়ের আর একটি অসুবিধার দিক হলো এক শ্রেণির লেখার ভেতর অন্য শ্রেণিলক্ষণ ঢুকে পড়া। এছাড়া শিল্পীব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতার দরুণ শ্রেণির সাধারণ লক্ষণগুলি আলাদা হয়ে যায়।

বিষয়, গঠন ইত্যাদি নানা দিক বিচার করে বাংলা উপন্যাসকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

১) ক) ইতিহাস-রোমান্স ধর্মী উপন্যাস খ) পারিবারিক-সামাজিক উপন্যাস।

২) ক) চিত্রাত্মক উপন্যাস খ) কাহিনিমূলক উপন্যাস গ) চিত্র কাহিনি মিশ্রধর্মী উপন্যাস।

৩) ক) কাব্যধর্মী উপন্যাস খ) নাট্যধর্মী উপন্যাস গ) কাব্য-নাট্য-মিশ্র উপন্যাস ঘ) মহাকাব্যিক ঙ) খন্ডোপন্যাস।

৪) ক) ঘটনা প্রধান উপন্যাস খ) চরিত্র প্রধান উপন্যাস গ) চেতনা প্রবাহী উপন্যাস।

৫) ক) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস খ) ভ্রমণোপন্যাস গ) পত্রোপন্যাস ঘ) ডায়েরীধর্মী উপন্যাস।

৬) ক) নীতি-ধর্ম-তত্ত্ব প্রচারমূলক উপন্যাস খ) রাজনৈতিক উপন্যাস, গ) জীবনীমূলক উপন্যাস ঘ) অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাস ঙ) গোয়েন্দা উপন্যাস চ) প্রেমোপন্যাস, ছ) ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস জ) ফ্যানটাসি

৭) ক) কথক চরিত্র মূলক উপন্যাস খ) কথক-লেখক চরিত্র মূলক উপন্যাস ইত্যাদি।

রোমান্স ও সামাজিক উপন্যাস—বাংলা উপন্যাসের সবচেয়ে পরিচিত শাখা। বাংলা উপন্যাসের ধারায় প্রথম প্রায় চল্লিশ বছর এই দুটি ধারা একসঙ্গে চলেছে। তারপর অবশ্য রোমান্স ধারাটি অবলুপ্ত হয়েছে এবং সামাজিক উপন্যাস ধারাটি ক্রমবিস্তার লাভ করেছে।

শুদ্ধ রোমান্সের উদাহরণ হিসেবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালের মন্দিরা', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মাধবীলতা'র নাম উল্লেখ করা যায়। আর ইতিহাস মিশ্রিত রোমান্স যাকে অনেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়েও ফেলেন তেমন গ্রন্থগুলি হলো—বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ইত্যাদি।

পরিবারকে কেন্দ্র করে পরিবারের নানা সমস্যা এবং সেই সূত্রে সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত হয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস। তারাশঙ্করের গণদেবতা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সামাজিক উপন্যাসের বিভাগে পড়ে। আর শরৎ চন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' বা 'বৈকুণ্ঠে'র উইল' কে ফেলা যায় পারিবারিক উপন্যাসের বিভাগে।

চিত্রাত্মক উপন্যাসে শুধু চিত্রই প্রাধান্য পায়। যেমন 'আলালের ঘরের দুলাল'। কিন্তু শুধু চিত্রে ঠিক উপন্যাস হয় না, কাহিনির উপস্থাপন চাই। যেজন্য আলালের ঘরের দুলাল কিছু পরিমাণে উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত হয়েও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি।

কাহিনি মূলক উপন্যাসে কাহিনির আর্কষণই প্রধান। এক কাহিনির সঙ্গে আরও একাধিক কাহিনি যুক্ত হতেও পারে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এ জাতীয় উপন্যাস। এ উপন্যাসে অন্নদাদিদি, অভয়া, কমললতা চিত্র না থেকে কাহিনি হয়ে উঠেছে, একাধিক কাহিনির সংযুক্তি ঘটেছে।

আধুনিক উপন্যাসে চিত্র ও কাহিনির নানা আনুপাতিক মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। তাতে কাহিনিগুলি লেখকের প্রধান লক্ষ থাকে না। কাহিনির চলতে থাকা অবস্থায় আগে পিছে মধ্যে লেখক নানাস্থানে নানা সুযোগে সমাজের নানা ছবির অনুপ্রবেশ ঘটান।

যে উপন্যাস আগাগোড়া গদ্যে রচিত হলেও কাহিনি ও চরিত্র একটা সঙ্গীতের মূর্ছনা ও একটা কাব্যিক সুগন্ধ নিয়ে আসে তাকে বলে কাব্যধর্মী উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' তারাশঙ্করের 'কবি' এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে।

নাটকের আদর্শে রচিত উপন্যাসকে বলা হয় নাট্যধর্মী উপন্যাস। কাহিনি, উপকাহিনি থাকে। কিন্তু উপকাহিনি মূল কাহিনির সম্পূর্ণ অনুগত। ক্রিয়া-প্রাধান্য, নাটকীয় চমক, আকস্মিক বাঁক ফেরা এ জাতীয় উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসে এসব নাটকীয় লক্ষণ বর্তমান।

চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস—'চেতনা প্রবাহ' কথাটি মনস্তত্ত্ব জাত। কাহিনি নয়, চরিত্র নয়, এমনকি সেই অর্থে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নয়, মানব মনের চেতনার গভীরে অবস্থিত মনস্তর যে চিন্তনস্তর সেই প্রাক-বাচনিক স্তর থেকে উঠে আসা গতানুগতিক যুক্তি পারম্পর্য, বাক্যগত অন্বয়, শব্দের ব্যাকরণ সম্মত বা প্রথাগত বিন্যাসমুক্ত বাক্‌শিল্পকেই বলা হয় চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস। রবার্ট হামফি প্রদত্ত চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসের সংজ্ঞা বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 'We may define stream of consciousness as a type of fiction in which the basic emphasis is placed on explanation of the pre-speech levels of consciousness for the purpose, primarily, of revealing. The sychic being of the caracters'. প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ক) এ জাতীয় উপন্যাসের প্রকাশের বিষয় অন্তর্জগতের জটিল টানাপোড়েন।

খ) কোনো আকর্ষণীয় গল্প বা কাহিনি, সুসংবদ্ধ প্লট লিখে কী ঘটেছে দেখানোর চেয়ে কেন ঘটেছে দেখানোটাই এর মূল উদ্দেশ্য।

গ) 'অন্তরস্থ স্বগতোক্তি'র কৌশল অবলম্বন করে লেখক মানবমনের বিচিত্র ভাবনা, অসংখ্য অনুভবকে

টেনে বের করে আনেন। তাতে অনেক সময় প্রচলিত যুক্তি পরম্পরা, বাস্তবতার স্তর ভেদ রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

ঘ) চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাসে সময় থাকে, কিন্তু 'সময়ানুক্রমিক' বিন্যাস থাকে না। বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ সব কেমন এলোমেলো হয়।

ঙ) সিনেমার রীতি অবলম্বন করে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া মানব ধারণাগুলিকে আগে পিছে, সমান্তরালে নিয়ে গিয়ে দৃশ্য করে তোলা হয়।

চ) এইসব ভাবনা বা অনুভব বর্ণনার ভাষাও ভিন্নতর। কখনো আপাত অসংলগ্ন, কখনো বা ছেদযতি বর্জন করে চেতনা প্রবাহের মতোই গতিশীল।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', রবীন্দ্রোত্তরকালের বুদ্ধদেব বসুর 'লালমেঘ', গোপাল হালদারের 'একদা', মতি নন্দীর 'নক্ষত্রের রাত'। এই পর্যায়ের আরো ভালো উদাহরণ সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'।

মনস্তত্ত্ব মূলক উপন্যাস—যে উপন্যাসে আখ্যান বা প্লটের চেয়ে চরিত্রের মন-মনন-মেজাজ মানসিকতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় তাকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস—'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহনা', এই শ্রেণির উপন্যাসের মধ্যে পড়ে।

রাজনৈতিক উপন্যাস—যে কোন উপন্যাসই, কোনো সময়ে, কোনো রাজনৈতিককালে মানুষের রাজনৈতিক আবহে নির্মিত। সেই দিক থেকে সব উপন্যাসের মধ্যেই রাজনীতি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবু শুদ্ধ রাজনৈতিক উপন্যাস তাকেই বোঝানো হয় যার মধ্যে একটি দেশ ও জাতির প্রাণময় আবেগ ও উত্তেজনা, সর্বজনীনতা লাভ করে। কোনো রাজনৈতিক মত আড়ালে থাকলেও তার আবেদন হয়ে ওঠে ব্যাপক ও মানবিক। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথেরদাবী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস—যে উপন্যাসে লেখক তাঁর অতীত স্মৃতি বা হারিয়ে যাওয়া দিনের অভিজ্ঞতা-রোমন্থন করেন এবং পাঠকের সঙ্গে গড়ে তোলেন নিবিড় একাত্মতা তখন তাকে বলা হয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এই শ্রেণির উপন্যাসে লেখক কখনো সরাসরি উত্তম পুরুষে তার বক্তব্য শোনাতে থাকেন, আবার কখনো কথক চরিত্রের মুখে উত্তম পুরুষে কথা বলানো হয়। যেভাবেই কথক কথা বলুক উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলি তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে আসলে লেখকেরই ব্যক্তিজীবনের নানা দিক উন্মোচন করতে থাকে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক এই শ্রেণির উপন্যাস।

পত্রোপন্যাস—যে উপন্যাসে পত্রের আকারে উপন্যাসের ঘটনা, তথ্য প্রকাশিত হয়, উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলি পত্রের মাধ্যমেই তাদের আপনাপন বক্তব্য উপস্থাপিত করে; সর্বোপরি পত্রের মাধ্যমেই আখ্যানের বিস্তার ঘটে তাকেই বলা হয় পত্রোপন্যাস। বাংলায় তেমন সার্থক পত্রোপন্যাসের সন্ধান না পাওয়া গেলেও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'পোনুর চিঠি' শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চমিথুন', তরুণকুমার ভাদুড়ীর 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' কে অংশত পত্রোপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

আর এক ধরনের উপন্যাসের সন্ধান মেলে যা অনেকটা ডায়েরির মতো। তবে দিনলিপি বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। এতে প্রতিদিনের কথা কালানুক্রমিকভাবে লিখিত হয় না। কোনো দিন মনে হল তো অনেক লেখা হলো আবার কিছু লেখা হলো বেশ কিছুদিন পর। কোনো সূত্র হারিয়ে গেল, কোনটা আবার ফিরে এসে খেই ধরল। এভাবে লেখা উপন্যাস কখনো ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক, কখনো বা ডায়েরিমূলক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিনকে এর কাছাকাছি বলা যেতে পারে। যদিও 'আরণ্যকে'র ভূমিকায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন—'ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরি নহে—উপন্যাস।'

অ্যাবসার্ড উপন্যাস—আলব্যের কাম্যুর 'দি মিথ অব সিসিফাস' প্রবন্ধে প্রথম অ্যাবসার্ড কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পন্ডিতেরা অ্যাবসার্ড বলতে বুঝিয়েছেন ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা, divorce between man and his life উদ্দেশ্য বিযুক্ততা ইত্যাদি অনেক কিছু। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা দিল। মানুষ হয়ে উঠল আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, জটিল, বিচ্ছিন্ন। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে অণু পরিবার তৈরি হল। অতি নৈকট্য দূরত্বের কল্পনা চূর্ণ করে দিয়ে নিয়ে এলো বিষাদ। এইসব ভাবনার ওপর ভিত্তি করে, এইসব মানসিক দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গতা, ব্যাকুলতা নিয়ে রচিত হল অ্যাবসার্ড শ্রেণির উপন্যাস। যাকে কেউ বলেন উদ্ভট, কেউ বলেন অমূর্ত। বাংলায় তেমন কোনো অ্যাবসার্ড উপন্যাসের সন্ধান মেলেনি। সমরেশ বসুর 'বিবর' খানিকটা কাছাকাছি গেলেও, জীবনকে শূন্য ভাবতে না পারায় পুরোপুরি অ্যাবসার্ড হতে পারেনি।

নীতি-ধর্ম-তত্ত্ব প্রচার মূলক উপন্যাস একালে আর তেমন লেখা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী'কে ধর্মতত্ত্বমূলক উপন্যাস বলা চলে।

দুঃসাহসিক ঘটনা নিয়ে রচিত হয় অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস। বিশেষত এজাতীয় উপন্যাস কিশোরদের জন্যই

লিখিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সূর্য কাঁদলে সোনা' এই শ্রেণির উপন্যাস। সত্যজিৎ রায়ের কিছু গল্প এই জাতীয়। তবে এগুলিতে উপন্যাসের বিস্তার না থাকায় উপন্যাস নয়।

গোয়েন্দা কাহিনিমূলক উপন্যাস আজকাল খুবই জনপ্রিয়। জট পাকানো ব্যক্তিত্ব, অপরাধ, রহস্য উদঘাটন ইত্যাদি এর প্রতিপাদ্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের কাহিনিগুলি এবং সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজ এই শ্রেণির উপন্যাসের মধ্যে গণ্য।

আঞ্চলিক উপন্যাস— বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি শ্রেণি করণের প্রবনতা দেখা দিয়েছে। অঞ্চল বিশেষের ভূপ্রকৃতি, নিসর্গ, মাটি, মানুষকে নিয়ে সেই অঞ্চলের নিজস্ব ভাষায়, একটি জনগোষ্ঠীর জীবন চিত্র অঙ্কন করাই এর উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যেও এধরণের উপন্যাস রচিত হয়েছে। সেখানে এদের 'Novel of the local colour' বা 'Novel of the soil' ইত্যাদি নাম নেওয়া হয়েছে। Regionel Novel কথাটিও প্রচলিত।'

সমালোচকের ভাষায় — " A regional writer is one who concentrates much attention on a particular area and use it and the people who inhabit it as the basis of or his or her stories. Such a local is likely to be a rural and or provincial" ৩৩

এই শ্রেণির উপন্যাসের মূল লক্ষণগুলি লক্ষ করে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এর একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।

"কোন ঔপন্যাসিক যখন কোন বিশেষ দেশাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সমাজ প্রেক্ষিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে তাঁর রচনায় রূপ দেন যাতে ঐ অঞ্চল যেন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মিকযোগে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জনজীবনে তার সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্য দিয়েও সর্বজনীন রসবেদনে পৌঁছায়—তখনই তাঁর রচনাকে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বলা যেতে পারে।" ৩৪

সূত্রাকারে লক্ষণগুলি এরকম হবে—১) উপন্যাসটি একটি বিশেষ ভূখন্ড আশ্রয়ে রচিত হবে, ২) এই ভূখন্ড-ধৃত একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা হবে, ৩) ভূখন্ডই একটি চরিত্র হয়ে উঠবে, ৪) এখানকার জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, রীতিনীতি, আশা আকাঙ্খা ব্যক্ত হবে, ৫) এরা বাংলাভাষী হয়েও, আঞ্চলিক প্রভাবে ভাষায় আঞ্চলিক রূপ থাকবে; ৬) আঞ্চলিকতার সব লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসে একটি সর্বজনীন আবেদন থাকবে; ৭) লেখক এই অঞ্চলটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

বাংলা উপন্যাসে শৈলজানন্দ এই আঞ্চলিক ধারার সূচনা করেন। কিন্তু সার্থকতা লাভ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'; সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' প্রভৃতি উপন্যাসে।

মহাকাব্যিক উপন্যাস — আপাত দৃষ্টিতে মহাকাব্য ও উপন্যাসের মধ্যে অমিলটাই বেশি চোখে পড়ে। মহাকাব্য সেকালের উপন্যাস একালের। মহাকাব্য পদ্যে রচিত, উপন্যাস গদ্যে। মহাকাব্যের নায়ক 'ধীরোদাত্ত, সদবংশজাত। আর উপন্যাসের নায়ক রাজা, জমিদার, কৃষক, শ্রমিক সমাজের অত্যন্ত নিচুতলার মানুষও। মহাকাব্যের বাস্তবতার সঙ্গে অলৌকিকত্ব, অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্পৃক্ত। কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতা জীবনেরই দৈনন্দিনের বাস্তবতা। তা সত্ত্বেও মহাকাব্যিক উপন্যাস বলতে উপন্যাসের এমন একটা শ্রেণিকে বোঝায় যেখানে মহাকাব্যের অন্তর-স্বভাবের সঙ্গে উপন্যাসের মিল প্রচুর। অর্থাৎ যে উপন্যাস মহাকাব্যের মতো একটা বিশাল বিস্তৃতি নিয়ে কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবনবোধ, জন্ম-মৃত্যু-জয় পরাজয়, দ্বন্দ্ব, হাসি-অশ্রু-র বিবরণ দেয় এবং মহাকাব্যের মূল অনুভব সাব্লাইম-এর কাছে নিয়ে যায় তাকে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলে। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' উপরোক্ত উপন্যাস শ্রেণির কোন শাখাভুক্ত বা কোন কোন শ্রেণির লক্ষণযুক্ত তা আলোচনার আগে উপন্যাস দুখানির স্বরূপ বিচার আবশ্যক।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর স্বরূপ বিচার

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', আদি পর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব, বৃক্ষপর্ব, মিছিল পর্ব, অন্ত্যপর্ব মোট ছ'টি পর্ব ও পরিশিষ্ট নিয়ে এক বৃহৎ উপন্যাস। এতে আছে গয়ানাথ-আসিন্দির, বাঘারু-কাদাখোয়া, সুহাস-প্রিয়নাথ, এম,এল,এ, ইঞ্জিনিয়ার, হৃষিকেশ-রাধাবল্লভ, পঞ্চানন মল্লিক-সম্পৎ রায়, মাদারি-মাদারির মা'র মতো অসংখ্য চরিত্র।

এই চরিত্রগুলি ছড়িয়ে আছে গাজোলডোবার তিস্তার পারে জমি জরিপের কাজে, কৃষক-মজুর শ্রেণি সংগ্রামে, বাঘারুর পিঠে চড়ে এম, এল, এ-র নদী পার হওয়ার ঘটনায়, ডায়নার চরে বাঘারুর নির্বাসনে, চরুয়া নিতাই-জগদীশদের বন্যায় ভেঙ্গে পড়া গয়ানাথের গাছ নিয়ে বাঘারুর বন্যা-উন্মত্ত-তিস্তায় ভেসে চলার ঘটনায়, স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে উত্তরখন্ড আন্দোলনে এবং মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে। এবং আরও বহু ঘটনা, কাহিনি ও গল্পে।

তিস্তাপারের এই চলমান বিশাল বৃত্তান্ত তো কোথাও থামাতেই হয়েছে। সেটা থেমেছে গিয়ে অন্ত্যপর্বে তিস্তার বুকে ব্যারেজ নির্মাণ ও তার উদ্বোধনের ঘটনায়।

উপন্যাসখানির অন্তর্গত ঘটনা বা আখ্যানগুলি ছাড়াও এর বহিরাবয়ব তথা অঙ্গসজ্জার দিকে নজর দিলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা উপন্যাসখানির স্বরূপ নির্ণয়ের সহায়ক। উপন্যাসের প্রচ্ছদে অঙ্কিত তিস্তাপারের বনভূমি। দীর্ঘ চির হরিৎ বৃক্ষের বন। বিশেষ অর্থবহ এই বনভূমির চিত্র। সন্দর্ভকারের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় লেখক বলেছেন যে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নামটি দেওয়ার আগে তিনি উপন্যাসটির নামকরণ করেছিলেন 'বনান্তরালে'। ছাপানোর জন্য কম্পোজও হয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে তা পাল্টিয়ে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' রাখা হয়েছে। প্রচ্ছদ সেই 'বনান্তরালে'র চিহ্নবহন করছে বলে মনে হয়। 'উপন্যাসটির উননব্বই অধ্যায়ে একটি পংক্তিতে 'বনান্তরাল' শব্দটির ব্যবহার আছে। ".....সে নদীকে নদীর জায়গা ছেড়ে দিয়ে রাজবংশীরা বনান্তরাল থেকে নদীকে ব্যবহার করত।" ৩৫

প্রচ্ছদের পরের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' নামাঙ্কিত পৃষ্ঠায় একটি পেশি বহুল দীর্ঘাকৃতির চলমান পুরুষের ছবি। ছবিটি অবশ্যই বাঘারুর। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে তিস্তাপারেরই চারজন—নন্দনপুর বোয়ালমারির নিতাই সরকার, ঘুঘুডাঙ্গার আকালুদ্দিন, বানারহাটের যমুনা ওরাওঁনি, গয়েরকাটার রাবণ চন্দ্র রায়কে। এরা তিস্তাপারের রাজবংশী ভাটিয়া, মদেশিয়া, জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। লেখক বলেছেন—'এই বৃত্তান্ত তারা কোনদিনই পড়বে না, কিন্তু তিস্তাপারের জীবনের পর জীবন বাঁচবে।' সূচিপত্রের পরের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত আছে তিস্তাপারের একটি ম্যাপ। মোটা কালো দাগে তিস্তা, নাগরাকাটা, ডায়না, জলঢাকা নদী আকাঁ। একেবারে পূর্ব সীমান্তে তোর্সা নদী। মোটা সাদা দাগে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে, ল্যাটারাল রোড। বনাঞ্চলের ছবি এঁকে আপলচাঁদ ফরেস্ট, মালবাজার, চালসা, মাদারিহাট ইত্যাদি বনভূমি দেখানো হয়েছে। আর জলপাইগুড়ি, গাজোলডোবা, ক্রান্তির হাট, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, দোমহনি, জল্পেশ, ধরমপুর ইত্যাদি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। উপন্যাসের ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠার মাঝখানে আর একটি ম্যাপ দেওয়া হয়েছে। এই ম্যাপে আপলচাঁদ ফরেস্টকেই বেশি করে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিস্তাপারের জমি জরিপ চলাকালীন মৌজা ম্যাপ হিসেবেই এই ম্যাপখানি অঙ্কিত। বাংলা উপন্যাসে এরকম ম্যাপের ব্যবহার এই প্রথম।

শিলিগুড়ি থানা
বাংলাদেশ
কোচবিহার
তোর্ষা নদী

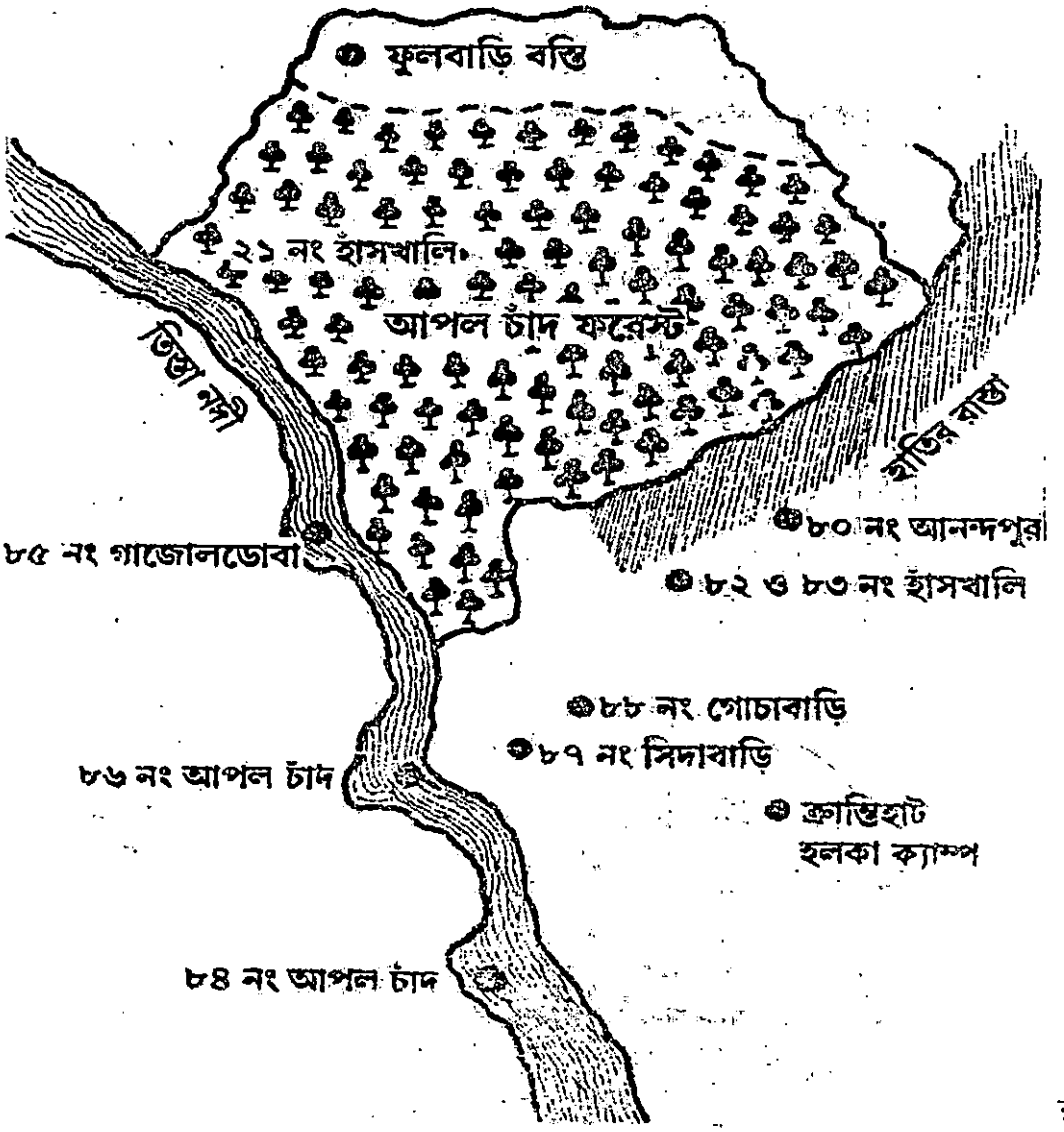

র

আঞ্চলিকতার নানা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। ঘটনার কেন্দ্র তিস্তাপারের গাজোলডোবা। এই গাজোলডোবায় তিস্তাপারের জমি জরিপের কাজ দিয়েই বৃত্তান্তের শুরু। আবার এই গাজোলডোবাতেই তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ ও উদ্বোধন দিয়েই বৃত্তান্তের সমাপ্তি। গাজোলডোবা থেকে গাজোলডোবা। যেন একটা বৃত্ত। একটি ভূখন্ড। পশ্চিমে আপলচাঁদ থেকে পুবে ডায়না, এই তো তিস্তাপার। এই ভূখন্ডের অন্তর্গত গাজোলডোবার উত্তরে পশ্চিমে শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং এর সীমান্ত সন্নিহিত পাহাড় বনাঞ্চল। পুবে দক্ষিণে চালসা, মালবাজার, লাটাগুড়ি, ওদলাবাড়ি, মাদারির হাট, লাটাগুড়ি, মাদারির হাট, ফালাকাটা একেবারে তোর্সার পারে পুন্ডিবাড়ি, মাদারির মায়ের সাকোয়াঝার ইত্যাদি নানা ঝোরা, সোঁতা, নদী, চা বাগান, বনজঙ্গ ল ঘেরা ডুয়ার্স।

এই এলাকায় বসবাস করে প্রধানত রাজবংশীরা। এছাড়া আছে চা-বাগানের শ্রমিক মদেশিয়া, ওরাওঁ, প্রভৃতি আদিবাসি মানুষ, আছে পূর্ববঙ্গাগত নম:শূদ্র ভাটিয়া। কিছু চা-বাগানের বাঙালীবাবু, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। গয়ানাথ, নাউছার আলম, আসিন্দির, বাঘারু, সুহাস, প্রিয়নাথ, এম,এল,এ হৃষিকেশ, রাধাবল্লভ, নিতাই রাবণ, জগদীশ, কাদাখোয়া, নরেশ, অমূল্য, আলবিশ, বীরেন, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষীগণ, অশ্বিনীরায়, ডি.এম. অন্যান্য অফিসারগণ, টিভি ও রেডিও-র লোকজন, পঞ্চানন মল্লিক, সম্পৎ রায়, তিলক রায়, বীরেন উকিল, সন্তোষ উকিল, হেমেনবাবু, উপেন বর্মন, মাদারি প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র এবং নারী চরিত্র—মাদারির মা, শ্রীদেবী, ধর্ষিতা মেয়েটি ও বাঘারুর মা। এই চরিত্রগুলির অধিকাংশই রাজবংশী সম্প্রদায়ের। মূলত তাদের জীবনযাপন, বিশ্বাস, সংগ্রাম, সমস্যা উপন্যাসের পর্বগুলিতে নানা ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। আর তা বর্ণিত হয়েছে তাদেরই ভাষা, রাজবংশী ভাষায়। বর্ণনার ভাষা বাংলা। আর সংলাপ বা কথোপকথনের ভাষা প্রধানত রাজবংশী। এছাড়াও আছে পূর্ববঙ্গের ভাটিয়াদের বঙালী ও মদেশিয়াদের নিজস্ব বুলি। সব মিলিয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষের বিশেষ ধরনের ভাষায় কথিত উপন্যাস। কিন্তু স্থান কাল পাত্রগত সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে একটি সর্বজনীন আবেদন উপন্যাসখানিকে মহত্ব দান করেছে। তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে প্রাকৃতিক তিস্তার ইতিহাসের তিস্তায়, মানুষের তৈরি তিস্তায় রূপান্তর এবং তার ফলে তিস্তাপারের মানুষ, পশু, পাখি ও প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হবে তাতে বাঘারু মাদারি মাদারির মা'র মতো দরিদ্রতম মানুষেরা চিরবঞ্চনার ভেতরেই ডুবে থাকবে। আধুনিক উন্নয়ন, এমনকি কমিউনিস্ট প্রভাবিত বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নও তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। লেখকের কমিউনিস্ট মন সেই উত্তর বা সমাধান খুঁজতে বাঘারু ও মাদারির পিছু পিছু হেঁটে চলেছে নতুন নদী, নতুন বনপথে নতুন সূর্যোদয়ের দিকে।

রাজনীতি ঃ

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের ঘটনা মূলত ইতিহাস ও রাজনীতি কেন্দ্রিক। তিস্তার জল প্রবাহের মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক বিশ্বাস, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তিস্তাপারের রাজবংশী, চা-বাগানের শ্রমিক, মদেশিয়া, ভাটিয়াদের জীবনকে ছুঁয়ে গেছে। ১৯৬৮ সালের তিস্তার বড় বন্যার পর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তিস্তাপারে জমি জরিপের কাজ শুরু হয়। গাজোলডোবায় তিস্তার বুকে ব্যারেজ নির্মাণ করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। জরিপের কাজে অফিসার হয়ে আসে সুহাস, এক সময়ের নক্শালিয়া। যে নকশালদের এক সময় কাজ ছিল 'জোতদার খতম', জোতদারদের জমি দখল—ঘটনাক্রমে সেই সুহাসকে মুখোমুখি হতে হয় গয়ানাথ, নাউছার আলম

প্রমুখ জোতদারদের সঙ্গে। গয়ানাথ এক ধুরন্ধর জোতদার। খাশজমির ব্যাপারে অনেক মামলা মোকদ্দমা সে সরকারের সঙ্গে লড়েছে, লড়ছে। নানা ভাবে গয়ানাথের দ্বারা সুহাসকে, সুহাসের লোকজনদের হাত করার চেষ্টা হয়। চারদিক আলোড়িত করে সুহাসের সমানে আবির্ভূত হয় একটি সর্বরিক্ত চরিত্র 'গয়ানাথের মানষি' বাঘারু। 'হু-জু-উ-র, মুই আসি গেইছু' বলে সে আত্মঘোষণা করে। সে দুটি কথা বলতে এসেছে বলে জানায় (এক) 'মোর' একখান ত জমি আছিল। আপল চাঁদ ফরেস্টের গা-লোগো। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর। অ্যালয় আর নাই। মোর নামখান কাটি দাও।' (দুই) 'ত ঐ জমিখান মুই, ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন, ছাড়ি দিছু। লিখি দাও, শ্রী ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ দেয়া গে-এ-এ-ই-ল'।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যখন জোতদারের জমি ভূমিহীন কৃষকদের দেওয়ার কর্মসূচি, তখন বাঘারুর জোতদার গয়ানাথের নামে জমি লিখে দেবার আর্জি বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

এরপর আসে জরিপ নিয়ে কৃষক নেতাদের বক্তৃতা, কৃষক-মজুর সংঘর্ষ—ঠাট্টা করে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'ভাষণ-সংগ্রাম' 'সম্মুখ সংগ্রাম', কৃষক-মজুর, ঐক্যের সংগ্রাম। এম, এল, এ-র জিপে করে ফুলবাড়ি যাত্রা রাজনৈতিক সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যে। পথে বাঘারুর সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা তার বিষয়ও রাজনৈতিক। বাঘারুর জন্মের ঘটনা বলতে গিয়ে মায়ের প্রসঙ্গে বাঘারু বলে "মোর মাওখান ত গয়ানাথেরই আছিল।"৩৬ জোতদারদের সর্বগ্রাসী চিত্র। বাঘারু, এম, এল, এর-র কাছে একখান জ্যান্ত এমেলিয়ার ঘর। বাগানিয়া মানষিক ঝান্ডা দিছেন, বস্তির মানষিক জমি দিছেন আর মোক একখান নাম দিবার না পারেন?' পরে এম, এল, এ, ফিরে চলে গয়ানাথের সঙ্গে বাঘারু বিষয়ে আলোচনার সময় বাঘারুকে আধিয়ারি দেওয়ার প্রসঙ্গে গয়ানাথ বিশ্বাস করে বাঘারু বোধ হয় এম, এল, এ-কে আধিয়ারির কথা বলেছে। গয়ানাথ জিজ্ঞাসা করে—'উ কহিছে তোমাক? আধিয়ারি দিবার কাথা?' এম, এল, এ বলেন। না হয়, না হয়। মুই কহিছু।' তবুও ভুল বুঝে গয়ানাথ বাঘারুকে শাস্তি দেয় ডায়নার চরে নির্বাসনে পাঠিয়ে।

ক্রান্তির হাটে সুহাসের ক্যাম্পের ঘরে মণিবাবু গয়ানাথ ইঞ্জিনিয়ার ও ফুলবাড়ির লোকদের নিয়ে যে মিটিং তার বিষয়ও রাজনৈতিক, ব্রিজ বানানো নিয়ে। "এইসব মিটিং যেমন ভাঙে, এই মিটিংটাও তেমনি ভাঙতে শুরু করে। কথাবার্তা, ঝগড়াঝাটি, রাগারাগি, মিলমিশ এই সবের ভেতর দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব আসে।"৩৭

ডায়নার চরে নির্বাসনে যাওয়ার পথে নিপুছাপুর চা বাগানের শ্রমিকদের প্রতিদিনের শ্রম-জীবনের বর্ণনা পাওয়া যায়। সাতষট্টি, আটষট্টি, উনসত্তর অধ্যায়ে যথাক্রমে 'অর্থনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত,' কৃষি বিজ্ঞানের কিছু প্রক্ষিপ্ত' ও 'রাজনীতির কিছু প্রক্ষিপ্ত' অধ্যায়ে 'ফরেস্টের জমিতে জোতদারের আধিয়ারি, বাথান তৈরি, ফরেস্টে আধুনিক চাষের ফলে কীট নাশকের ব্যবস্থার ও পশু নিধন ও চীন ভারত যুদ্ধের পর ডুয়ার্সে মিলিটারি বেস তৈরি, এদের দুধ সাপ্লাইয়ের জন্য বাথানের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হয়েছে।

চরপর্বে চরুয়াদের কথা প্রসঙ্গে দেশভাগ, পূর্ববঙ্গাগত নমঃশূদ্র ভাটিয়াদের চরে বসবাস, তিস্তা নদীর জল-মাটির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া, এখানকার রাজবংশীদের সঙ্গে সম্পর্ক, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ, ইত্যাদি নানা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বন্যা বিধ্বস্ত সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অবস্থা ও উভয় দেশের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

বৃক্ষপর্বে লোভি গয়ানাথ ও তার জামাই আসিন্দিরের চারটি গাছ রক্ষা করার জন্য বাঘারুকে বন্যার তিস্তায় 'বাঘারু হে তুই ভাসি যা' বলে ভাসিয়ে দেয়। ভেসে আসা বাঘারুকে অশ্বিনী রায়দের ডুবন্ত চাল থেকে উদ্ধারের জন্য শুরু হয় রাজনৈতিক চাপান উতোর। মূলত কাদাখোয়া, নরেশ, অমূল্য বা তাকে উদ্ধার করলেও সরকারের রেডিও, টি.ভি এর প্রচার নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সংবর্ধনা দেওয়া হয় বাঘারু ও কাদাখোয়াকে।

মিছিল পর্বের মূল বিষয় বামফ্রন্টের উন্নয়নের কর্মসূচি হিসেব তিস্তা ব্যারেজ নির্মান ও সেই ব্যারেজের বিরোধিতায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ও অর্থনীতি রক্ষায় স্বাধীনকামতা পুর রাজ্য গঠন আন্দোলন। উত্তরখন্ড দল এক সম্মিলনের আয়োজন করে ময়নাগুড়িতে। ছ'দিনের সম্মেলনে প্রতিদিনই আসাম থেকে দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি থেকে আসা নেতারা জোরালো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন। শেষ দিনে সম্মিলনের ফাংশান কমিটি বোম্বের শ্রীদেবীর নাচের ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য সেই বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে পরের দিন জল্পেশ অভিযান করবে। উদ্দেশ্য সফল হয় না দুটি কারণে। প্রথমত রাজনৈতিক ভাবে এই কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য ময়নাগুড়ির বামফ্রন্টের এম, এল, এ হেমেনবাবু বা মন্ত্রী, আমলাদের নিয়ে জলপাইগুড়ির সার্কিট হাউসে বসে মিটিং করে সম্মিলন বন্ধের চেষ্টা ও জল্পেশ অভিযান স্থানান্তরে করাতে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত শ্রীদেবীর নাচ দেখতে আসা দর্শকরা নাচ দেখে বাড়ি চলে যায়। ফলে গুটি কয়েক লোক নিয়ে জল্পেশ অভিযান হাস্যকর হয়। 'নিখিলবঙ্গ উত্তরখন্ড সমিতি' লেখা ফেস্টুন নিয়ে এগিয়ে চলা মিছিল থেকে স্লোগান ওঠে— 'কামতাপুর রাজ্য কায়েম করো, কায়েম করো'। 'উত্তরখন্ড দিচ্ছে ডাক, ভোটের বাক্স খালি যাক।'

'কৃষকের জমি কাড়ি তিস্তা ব্যারেজ চলিবে না।' তিস্তা ব্যারেজের মিছিলে যোগ দিন যোগ দিন।'

'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র'-এ এক অকল্পনীয় অবর্ণনীয় জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। মাদারির মায়ের রাষ্ট্র স্বতন্ত্র-ই বটে, বিশাল ভারতবর্ষের ভেতরেই এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অবস্থান। সে রাষ্ট্রে সে বনের ধারে পাতায় ছাওয়া ঘরে থাকে, বন থেকে শুকনো ডাল পালা কুড়োয় বনের ছোট ছোট জীবজন্তু মেরে খায়। তার-পাঁচ পাঁচটি পুরুষ জোটে পুরুষদের দ্বারা তার সন্তানও হয়। কিন্তু তাদের মাথা টেবিলের সমান উঁচু হলে কোথায় হাসিমারা, নেপাল চলে যায়। সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। শেষ সম্বল মাদারি। সেও তিস্তাব্যারেজের মিছিলে গিয়ে হারিয়ে যায়। সেও মিছিলে গিয়েছিল। কিন্তু একা ফিরে আসে। এসে ঢোকে সেই নির্জন পাতার কুড়ে ঘরে। বাকি জীবন ওখানেই কাটিয়ে একদিন সে ঐ ধূলো-মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

অসম্পূর্ণ তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন বৃত্তান্তের একটি বড় রাজনৈতিক ঘটনা। আসন্ন নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের মানুষের সমর্থন আদায় করার লক্ষে, উত্তরখন্ডের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য বামফ্রন্টের নেতামন্ত্রীরা তড়িঘড়ি অসম্পূর্ণ ব্যারেজ উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। সেই সঙ্গে তিস্তাব্যারেজ উদ্বোধনের বিরোধিতা ক'রে গয়ানাথ, তিলক বাঘারুদের যে মিছিলটা বেরিয়ে ছিল যা বামফ্রন্টের মিছিলের তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। সেটাকে পুলিশ দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে হারিয়ে যাওয়া মাদারিকে পুলিশ বাঘারুর হাতে তুলে দেয়। বাঘারু ও মাদারি ব্যারেজ দেখে, ব্যারেজের ওপর থেকে তিস্তাকে দেখে, আপলচাঁদকে দেখে। সব তার অচেনা মনে হয়। সে উন্নয়নের সমস্ত সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে মাদারির হাত ধরে নতুন নদী নতুন ফরেস্টের খোঁজে হাঁটতে থাকে।

ভারতবর্ষের এমন কোটি কোটি বাঘারু, মাদারি, মাদারির মা-যা ব্যারেজের কেউ নয়, উন্নয়নের কেউ নয়, অর্থনীতির কেউ নয় তাদের প্রতি মমতা দেখিয়ে দেবেশ রায় বৃত্তান্ত সমাপ্ত করেন। রাজনীতির কথা উপন্যাসটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও আরও নানা বিষয়-এর বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়েছে।

নদী ও বন ঃ

তিস্তাপার, বন-নদী-পাহাড় বেষ্টিত ভূখন্ড। বন ও নদীই এখানকার মানুষের ওপর প্রভাব ফেলেছে বেশি। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নদী ও বন যেন পৃথক চরিত্র হিসেবেই দেখা দিয়েছে। তাই উপন্যাসের স্বরূপ আলোচনায় নদী ও বন সঙ্গত কারণেই এসে পড়ে।

নদী এই উপন্যাসের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। তিস্তাপারের জীবন নিয়ে বৃত্তান্তের শুরু এবং যা

আপাত শেষ হলেও নদীর মতোই চলতেই থাকবে। সেই তিস্তার বন্যা, নৈসর্গিক শোভা ইত্যাদি উপন্যাসে সর্বত্র ব্যাপ্ত। জোতপর্বে তিস্তার পারেই জমি জরিপের কাজ শুরু। শেষও তিস্তার ঐ গাজোলডোবাতেই। তিস্তার ওপর উঠেছে মানুষের তৈরি 'মৈনাকের মাথা' তিস্তাব্যারেজ। বামফ্রন্টের উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অঙ্গ হিসেবেই তিস্তাব্যারেজ। তিস্তার নদী ভাঙ্গনেই আপল চাঁদের গাছপালা ভেঙ্গে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে বলে চারচারটি গাছ ধরে আসিন্দির ও গয়ানাথ গাছগুলিকে কোথাও কোনো চরে বা কিনারে আটকাবার জন্য বাঘারুকে বন্যার দুরন্ত তিস্তায় ভাসিয়ে দেয়। বৃক্ষপর্ব জুড়ে চলে সেই তিস্তার ভয়ঙ্কর জলস্রোতের নানা বর্ণনা।

চরপর্বে তিস্তার বন্যার হাত থেকে বাঁচার জন্য রংধামালি বাঁধে ওঠার জন্য নিতাইদের বা চরের মানুষের কতরকম চেষ্টা। বন্যা আসার অপেক্ষা থেকে শুরু করে বন্যা আসা, চর ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মানুষজনের নিরাপদ আশ্রয়ে গরুবাছুর, বিষয় আশয় নিয়ে বাঁধে তোলার নানা চিত্র এবং নদীর জল বাড়ার নানা দৃশ্য দেখা যায়। বন্যা তো রংধামালি রায়পুর অঞ্চলেই থেমে থাকে না। দোমোহানি, পদমতী ভাসিয়ে কাসিয়াবাড়ি হয়ে চলে যায় বাংলাদেশ সীমান্তে কত গ্রাম-গ্রামান্তরে। সেখানে বাংলাদেশের সীমান্তবাহিনীর কম্যান্ড্যান্ট ভারতের সীমান্ত বাহিনীর কম্যান্ড্যান্টকে ফোন করে না পেয়ে লোক পাঠিয়ে তাদের আশ্রয়ে যেতে বলে। ভারত যায়ও সেখানে। বন্যা দুদেশকে কীভাবে ভূগোল ও ইতিহাসে এক করে দেয়।

শুধু তিস্তা নয়, জলঢাকা, গয়েরকাটা, ডায়না ইত্যাদির কথাও উপন্যাসে এসেছে। ডায়নার চরেই বাঘারুর মোষের বাথানে নির্বাসন। ডায়নার বুকভরা পাথর আর স্বচ্ছ জলধারা তীব্র বেগে বয়ে চলার দৃশ্য অতুলনীয়। "....লম্বালম্বি ডায়নার অনেকটা একসঙ্গে দেখা যায় না, পাথর ও পাহাড়ের নদী এমনই ক্রমশ আড়াল হয়। নদীর বুকের কিছু অংশে, জলের দুপাশে, বালি। তারপর অনেকটা জুড়ে শুধুই পাথর, যেন মনে হয় পাহাড়কে পাহাড় ভেঙ্গে হঠাৎ ওখানে ছড়িয়ে আছে। ছোট ছোট পাহাড়ের সমান এমন বড়বড় পাথর নদীর মাঝখানে আলগা পড়ে আছে, যার মাথায় উঠতে মানুষের বুদ্ধি, আর বাঘ বা কুকুরের নখ দরকার। পাহাড়ের মত এত পাথর, নুড়ির মত ছড়িয়ে আছে বলেই চট করে বোঝা যায় না, নদীর সারাটা বুক বোল্ডারে ঠাসা কেন, যেন বাঁধানো বালিভূমি ও নদীখাত জুড়ে এত বোল্ডার পড়ে, মনে হতে পারে, এই পাহাড় পাহাড় পাথর দিয়ে নদীটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।"৩৮

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের নদীতে বালি আছে, পাথর আছে, পাড়ে বনের শোভা আছে, বিস্তৃত জনপদ আছে, মোষের বাথান আছে কিন্তু নেই নদীর বুকে পালতোলা নৌকা, মাছ ধরার নৌকা, নদীর জলে মাছ ধরে জীবন

জীবিকার ছবি। কিন্তু আছে তিস্তাকে দেবতা ভেবে তিস্তাবুড়ি রূপে পুজো দেওয়ার কাহিনি। আছে অসংখ্য গান, নদীর গান, তিস্তা বুড়ির গান।

তিস্তা শুধু তিস্তা নয়, তিস্তারবুড়ি। ব্যারেজ বন্ধ করার দাবিতে উত্তরখন্ড আন্দোলনে জল্পেশ্বর মন্দিরের সামনে তিস্তাবুড়ির গান গেয়েছে মেয়েরা। ময়নাগুড়ির বামফ্রন্টের এম, এল, এ হেমেনবাবুকে সেন্টিমেন্ট দিয়ে কোচবিহারের সন্তোষবাবু—তিস্তাবুড়ির প্রসঙ্গ তুলে রাজবংশী সমাজের কাজে তার ধর্মীয় গুরুত্বের কথা বলেছেন। এই তিস্তার বুকে ভেসে আসা বাঘারু যখন অশ্বিনী রায়ের টিনের চালায় আটকে গিয়ে সুপুরি গাছে উঠে বাঁধের লোকদের চোখের আড়ালে চলে গেল, তখনও একে 'কমলে কামিনী' দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে একটি 'মিথ' এর আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ঘটনা তিস্তাবুড়ির মাহাত্ম্য ছাড়া কী— এরকম ধারণা করা হয়েছে।

এভাবে নদী, বিশেষত তিস্তা উপন্যাসে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে গেছে।

তিস্তার গতি পথ ওপরে পাহাড় ও নিচু কিছুটা সমতল অংশ বাদে পুরোই বনভূমিতে ঢাকা। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তাই তিস্তা নদীর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ফরেস্টের কথাও সমান ভাবে বলা হয়েছে। উপন্যাসের শুরু তিস্তার পাড়ে গাজোলডোবায় আপল চাঁদ ফরেস্টে। গয়ানাথের জোতজমি শুধু চাষের জমিতেই সীমাবদ্ধ নয়। আপল চাঁদ ফরেস্টেরও কিছু অংশ তার দখলে। এই দখল নিয়ে হাইকোর্টে মামলা পর্যন্ত আছে।

বাঘারুর আর এক নাম ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন। তার মা 'গয়ানাথেরই মানষি' ফরেস্টে কাঠকুড়ুনির কাজ করত। ফরেস্টেই বাঘারুর জন্ম। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্রের জন্ম ফরেস্টে। ফরেস্টেই বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে পেছনে বাঘের থাবার চিহ্ন নিয়ে তার নাম হয়ে যায় বাঘারু। এই বাঘারু হওয়ার বৃত্তান্তও বাঘারু এম, এল, এ সাহেবকে শোনায় ফুলবাড়ি যাওয়ার সময় ফরেস্টের পথেই। জোতপর্বের উনিশ নম্বর অধ্যায়ে সুহাস জ্যোৎস্নাবাবুরা এক বৃষ্টিহীন মেঘহীন সকালে জমি জরিপের কাজে বেরিয়ে 'মালহাটি' নামে এক ফরেস্ট পায়। এই নামে একটা চাবাগানও আছে। ওরা ফরেস্টটাকে বাঁ হাতে রেখে হাঁটতে থাকে। "ডাইনে তাকালে কালচে সবুজ ঘন ঘাসের প্রান্তর, আর বাঁয়ে তাকালে নিশ্চিদ্র প্রায়ান্ধকার জঙ্গল—গাছের কান্ডগুলোও জঙ্গলের সবুজে ঢাকা, শ্যাওলায় বা লতায়।"৩৯ বনপর্বের সাতষট্টি, আটষট্টি ও উনসত্তর অধ্যায়ে বন, বনে গোরু মোষের বাথান, বনে কাঠচুরি, পশু শিকারীদের কথা, চাষবাসের কথা ও বনে মিলিটারি ক্যাম্পের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। শীতের সময় বনে আগুন লাগিয়ে বন সাফ করা হয়। "আগুন লাগানোর পর

সারাটা ফরেস্ট কেমন খালি খালি লাগে। তলায় তলায় বহুদূর পর্যন্ত চোখ চলে যেতে পারে—এক নদীর পার থেকে আর এক নদীর আর এক পার।.....

....কখন এক সময় নতুন ঘাস গজানো শুরু হয়ে যায়। ফরেস্টের মাটি দেখতে দেখতে কচি কচি ঘাসে ভরে যায়। দেখতে দেখতে পোড়া জঙ্গল জুড়ে এই সবুজ নতুন ঘাস লক লক করে ওঠে। সেই সময়ে গরু আর মোষের বাথানে বিভিন্ন এলাকা ভরে উঠতে থাকে।"৪০

বাথান ছাড়াও বাথানের মালিকরা ফরেস্টের পতিত জমিতে চাষবাস শুরু করে। 'এটাকে দুদিক থেকেই দেখা যায় ফরেস্টের জমিতে জোতদারের আধিয়ারি বা ডুয়ার্সের গভীর অরণ্যে কৃষি কর্মের বিস্তার।'

ফলে অন্য একটা সমস্যা তৈরি হয় ফরেস্টে। ফরেস্টের জমিতে কলা, ধান, পোকার হাত থেকে পাখির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক ওষুধ দিতে হয়। সেই ওষুধের মেশানো ধান খেয়ে হরিণ, গন্ডার, বুনো মোষ ইত্যাদি মারা পড়ে। তাদের মাংস খেয়ে আবার শিয়াল, বাঘও মারা যায়। অবশ্য 'জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে অবস্থা এখনো অতটা খারাপ নয়।'

১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধের পর শিলিগুড়ির উত্তরে আসাম পর্যন্ত, হাইওয়ের দুপাশে জঙ্গল পরিষ্কার করে মিলিটারির ক্যাম্প বসল। বনের ভেতরটা পরিষ্কার করে পাকাবাড়ি, পাকা রাস্তা, তৈরি হলো। ফরেস্টের বড় বড় গাছ থেকেই গেল, তলাটা সাফ করে নেওয়া হল। 'সত্তর' অধ্যায়ে বাঘারুর 'নির্বাসনভূমি'—ডায়নার চর। ডায়না চর তো জঙ্গল। ডায়নার মাঝখানের গা বেয়ে ফরেস্ট উঠে গেছে খাড়া ও ধনুকের মত বাঁকা। ডায়নার মাঝখানের চরটাতেও জঙ্গল। 'এইসব চরের জঙ্গল বাড়ি—ঘাসবাড়িতে একমাত্র ভয় গো বাঘার।' বাঘারু যে বাথানে থাকে তার প্রায় চারদিকেই জঙ্গল। সেখান থেকে পাখির ডাক, বনমোরগের ডাক শোনে। 'একাত্তর' অধ্যায়ে এরকম একটি পাখির 'ডায়নার ওপরে, জঙ্গলের ভেতরে কোনো উঁচু ডালে' ক-অ-অ-ক-ধ্বনি শুনতে পায়।

'আটাত্তর' অধ্যায়ে 'বাঘারু বাড়ি'তে বাঘারু এক বুড়িয়াল মোষের পিঠে শুয়ে শুয়ে ভাবে—'এই বুড়িয়ালটা গয়ানাথের। এই বাঘারুখান গয়ানাথের, এই জঙ্গল খান গয়ানাথের। ....বাঘারু আকাশের দিকে তাকিয়ে বনের গাছগুলো দেখে আর চেনে, এইঠে কোশল বাড়ি (হরিতকি গাছের জঙ্গল) শুরু হয়্যা গেইল। তামান বনত এইঠে সুধু ধর কেনে পঁচিশ তিরিশ খান কোশল গাছ আছে। আর কোটত নাই। কোনা মারা পাতা খান, আর গুলটি মারা ডাটখান। ...বাঘারু এই জায়গাটার নাম দিয়েছে 'কোশলবাড়ি'। 'আশি' অধ্যায়ে বাঘারু

চোরাই গাছ কাঠুরেদের পরিচয় পায়। তারা বাঘারুর চারটি মোষ দিয়ে তাদের গাছ বয়ে নিয়ে যায়।

চরপর্বের 'উননব্বই' অধ্যায়ে রাজবংশীরা বনান্তরাল থেকে তিস্তাকে নিসর্গের মতো ব্যবহার করত প্রসঙ্গে নিসর্গের একটি যে বন তা উঠে এসেছে। "এ যেন এই নিসর্গের মতই ব্যবহার-জলপাইগুড়ির এই নিসর্গ যেখানে গহনতম ফরেস্ট নদীর জলপ্রান্তর কে আড়াল দিয়ে রাখে, যেখানে পাহাড়ের ঘের সেই ফরেস্টকে ঘিরে রাখে। যেন মনে হয় এ নিসর্গকে দেখতে পারে, পাহাড় বন নদী দিয়ে ঘেরা, পাহাড়-বন-নদী দিয়েই তৈরি এক রক্ষিত নিসর্গের মত। দেখাতে পারে যে ঘিরে রাখা পাহাড় থেকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে এই নদী বন-পাহাড়, যেন, এখানে এই ঘেরের মধ্যেই থাকবে বলে।"৪১

বৃক্ষ পর্বের 'একশ কুড়ি' অধ্যায়ে আবার আপল চাঁদ ফরেস্টে রাত তিনটার সময় ফিরে আসা। বন্যার তোড়ে ফরেস্ট ভাঙছে। গয়ানাথ ও তার জামাই আসিন্দির অপেক্ষা করে আছে গাছ ভেঙ্গে পড়লেই ধরবে, বা ভাঙার সম্ভাবনা দেখা দিলেই বাঘারুকে দিয়ে কাটিয়ে নেবে। এরকম চারটি গাছ এক সঙ্গে বেঁধে সেগুলোকে নিরাপদ স্থানে পাঠাবার জন্য—বিপদ সঙ্কুল বন্যার তিস্তায় বাঘারুকে গাছের সঙ্গে ভাসিয়ে দেয় তারা। সারাটা পর্ব জুড়ে বাঘারুর ভেসে চলার কাহিনি। শেষে গাছ সহ বাঘারু উদ্ধারের ঘটনা।

মিছিল পর্বে 'একশ নব্বই' অধ্যায়ে 'তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন উত্তরখন্ডীরা চ্যাংমারি ব্যারেজের রাস্তাটা বেছে নেয়, কারণ, ক্রান্তি হাটের পাকা রাস্তা সেদিন বামফ্রন্ট ও সরকারের দখলে। তাই ওদের মিছিল, দু'দিক থেকে আসা মিছিল আপল চাঁদের ভেতরে ঢুকে এক হয়ে যায়। সামনে ঝান্ডা হাতে বাঘারু।

"আপলচাঁদ বাঘারুর। বাঘারু আপলচাঁদের। তার পায়ের চাপে এর শুকনো পাতা ভেঙ্গে যায়। তার হাত নাড়ালে এ ফরেস্টের আপাত দুর্ভেদ্য বাধা দূর হয়ে যায়। এই ফরেস্টের ভেতরেই কোথাও তার জন্ম হয়েছিল। এই ফরেস্টের ভেতরই বাঘ তার পিঠে ও উরুতে সিল মেরে দিয়েছে যে সে আপলচাঁদের।"৪২

বাঘারুর সঙ্গে আপলচাঁদের সম্পর্ক কত নিবিড় তা বোঝা যায় এই বর্ণনায়—"এখানে এই আপলচাঁদে বাঘারু না দেখলে একটা বিরাট লাম্পাতি গাছের বাড় আটকে যায়। কী লাভ বেড়ে যদি বাঘারুই না দেখে? এখানে এই আপলচাঁদের একটা লতার কুঁড়ির ফুল আটকে যায় বাঘারু না দেখলে। কী লাভ বেড়ে যদি বাঘারুই না দেখে? এখানে এই তিস্তার একটা স্রোতের একটু উদাসীন সরে যাওয়াও থমকে যায় বাঘারু না দেখলে। কী লাভ সরে গিয়ে যদি বাঘারু না দেখে।"৪৩

অন্ত্যপর্বে মাদারির মায়ের স্বতন্ত্ররাষ্ট্র এ 'মাদারির মা-র ঘর ফরেস্টের সীমায় রাস্তা থেকে দেখলে ওটাকে

ফরেস্টের সীমা মনে হতেই পারে। ন্যাশানাল হাইওয়ের পরে খানিকটা জমি তারপর ফরেস্ট।' জায়গাটা নিচু, বর্ষাকালে জল জমে থাকে। পাশে ঝোরা। 'মাদারির মা রাস্তার ঠিক পাশে, ঝোরার ভেতর থেকে ওঠা একটা শ্যাওড়া গাছের তলায় কয়েকটা পাথর বসিয়ে একটা বেদি মত বানিয়েছে।' এটাই হয়ে উঠেছে 'বৃক্ষদেবতা'। 'এখানেই একটু ফাঁকাতে নানা পাতায় ছাওয়া মাদারির মা-র ঘর।' এই ঘরের পেছনের জঙ্গলেই মাদারির মার জীবন জীবিকার স্থল। বনের সরু ডাল কুড়িয়ে, ছোট ছোট পশু শিকার করে তার দিন গুজরান। 'সারাদিন ফরেস্টের ভেতরে ভেতরে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়—ঘুরে বেড়াতে হয় মাটিতে চোখ রেখেই। ফরেস্টের ভেতরে তো আর মাটি দেখা যায় না, 'শুধু বুনো লতা পাতা আর ঘাস'।

'একশ সাতানব্বই' অধ্যায়ে দার্জিলিংয়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ির সম্পর্ক বোঝাতে দুই জেলার সীমানার জঙ্গল পাহাড়ও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মত।

"জলপাইগুড়ি জেলার ওদলাবাড়ি থেকে গরুবাথানের রাস্তা সোজা উঠে গেছে লাভা আলগাড়া হয়ে কালিম্পং। দার্জিলিং পাহাড় থেকে কালিম্পং পাহাড় আলাদা। আর, এই কালিম্পং পাহাড়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ির সংযোগ অনেক প্রাচীন। এই গরুবাথানের রাস্তায় বা লাভা আলগাড়ার রাস্তায় বা সরকারি ভাষায় ওল্ড মিলিটারী রোডে জলপাইগুড়ির অনেক চা বাগান ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পাহাড়ে উঠে গেছে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঢুকে গেছে, পাহাড়ের আড়াল থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছে। পাথরঝোরা, শুড়িবাড়ি, ছোট ফাগু, বড় ফাগু। আবার এই সব পাহাড় জুড়েই উঠে গেছে জলপাইগুড়ি-ডিভিশনের অধীনে ফরেস্টের নানা রেঞ্জ।"৪৪

তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের দিন সেই শ্যাওড়া ঝোরা থেকে গাজোলডোবা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা জুড়েই তো বন-পাহাড়-নদী। মিছিলের ট্রাকগুলি সেই নদী জঙ্গল পার হয়েই ব্যারেজের স্থানে উপস্থিত হয়। ট্রাকে "মাদারির মা যেখানে বসেছিল সেখান থেকে দেখা যায় যেন পাহাড়গুলো পেছন থেকে ছুটে আসছে।... আবার কোনো এক সময় পাহাড়ের দেয়ালটা ভেঙে যায় যেন। বরং বাঁ দিকে তাকালে সে দেখে টানা খাদ চলেছে, আর সেই খাদের ভেতরে নদী, ঝোরা, চা-বাগান, চাষক্ষেত, দূরে দূরে ফরেস্ট।"৪৫

চরিত্র ঃ বাঘারু

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বহু চরিত্রের সমাবেশ। এখানে সুহাসের মতো জরিপ-অফিসার, এক সময়ের নক্‌শালিয়া যেমন আছে তেমনি আছে গয়ানাথের মতো ধূর্ত জোতদার, আছে তার 'মানষি' বাঘারু, আছে বামফ্রন্ট

সরকারের এম, এল, এ, কৃষক আন্দোলনের কর্মী ও নেতা, উত্তরখন্ড আন্দোলনের কর্মী ও নেতা, ইঞ্জিনিয়ার, মন্ত্রী, মদেশিয়া, ভাটিয়া নানা চরিত্র। আর আছে মাদারি ও মাদারির মা। প্রকৃত পক্ষে নারী চরিত্র একটিই— মাদারির মা। তবে পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে শ্রীদেবী ও সীমান্তে ভেজা শরীরে, ভেজা মাটিতে ধর্ষিতা একটি মেয়ে নিয়ে মোট তিনটি নারী চরিত্র।

প্রতিটি চরিত্রই প্রয়োজনীয় এক এক সময়ে এক এক পরিবেশে এদের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। এমনকি পার্শ্ব চরিত্র শ্রীদেবী উত্তরখন্ডের সম্মিলনের ফাংশানে প্রধান চরিত্রের ভূমিকা পালন করে। তাঁর উপস্থিতি উপলক্ষে সারা উত্তরবঙ্গ এমনকি আসাম-বিহারের বাংলা সংলগ্ন অংশ তোলপাড় হয়ে ওঠে।

সুহাস-প্রিয়নাথ, গয়ানাথ-আসিন্দির, হৃষিকেশ-রাধাবল্লভ, পঞ্চানন, বীরেন, মাদারি-মাদারির মা, বাঘারু-কাদাখোয়া, ইত্যাদি চরিত্র উপন্যাসে এক এক স্থানে এক একটি স্তম্ভ স্বরূপ। উপন্যাসে বিভিন্ন অধ্যায়ে এরা প্রধান চরিত্র। এতো চরিত্রের পৃথক পৃথক আলোচনা সন্দর্ভের কলেবর বৃদ্ধি করবে বলে শুধু বাঘারু চরিত্রটিই আলোচনায় আনা হলো। আশা করি বাঘারুকে দিয়ে অনেককেই ছোঁয়া যাবে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র একমাত্র 'চরপর্ব' বাদে সারা উপন্যাস জুড়ে বাঘারুর উপস্থিতি। উপন্যাসে বর্ণিত সমাজে বাঘারুর অবস্থান, তার একাকীত্ব, ব্যক্তিত্বহীনতা, অস্তিত্বহীন উপস্থিতি, তার সংলাপ, নেতিবাচক জীবন ইত্যাদি লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে, সংবেদনশীল হয়ে অঙ্কন করেছেন। এ কোনো টাইপ চরিত্র নয়। দেবেশ রায় তাঁর মফস্বলি বৃত্তান্তে খেতখেতু, চ্যারকেটু, টুলটুলি, ব্যাঙ্গুদের মতো ভুখা চরিত্র এঁকেছেন। কিন্তু বাঘারু সে সব চরিত্র থেকে আলাদা। তার দারিদ্র্য এ যাবৎ কালের পরিচিত সংস্কারে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বাঘারু এক এবং অদ্বিতীয়।

বাঘারুর দারিদ্র্য তার অস্তিত্বে। তার কোনো সত্যিকারের নাম নেই। তার মা ফরেস্টে কাঠ, ডালপালা কুড়ায় বলে তাকে কেউ কেউ 'কুড়িনীয়ার ছোয়া' বলে ডাকে। ফরেস্টেই তার জন্ম এবং জন্মের সময় তার মা নিঃসঙ্গ অবস্থায় কুড়াল দিয়ে নাড়ি কেটে ছিল বলে তার নাম হয়েছে 'কুড়ালিয়া কাটা'। বাঘের সঙ্গে লড়াই করে পেছনে বাঘের থাবার চিহ্ন বহন করে আছে বলে তার নাম 'বাঘারু'। জমি জরিপের হাকিমের সামনে তার আত্মপরিচয় 'মুই ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন।' কিন্তু কোনোটাই তো তার আসল নাম নয়। তাই এম, এল এ সাহেবের কাছে একটা ছোট নাম সে চেয়েছে। এতো অজস্র নেতিবাচক পরিচয়ের মধ্যে তার একটা ইতিবাচক পরিচয় সে 'গয়ানাথের মানষি,' তার মাও গয়ানাথেরই মানষি। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন আত্ম পরিহাস

আর দেখা যায় না।

বাঘারুর অস্তিত্ব সমগ্র উপন্যাসে শুধু 'গয়ানাথের মানষি' হিসেবে। তার শরীরটা যেন শালগাছ, তার আয়ত্বাধীন নয়। গয়ানাথ যখন যে কাজে লাগাতে চায় সেই কাজে লাগে। এম, এল, এ কে পিঠে করে নদী পার করে দেওয়া, আদেশমাত্র ডায়নার চরে চলে যাওয়া-গোরু মোষের মতো জীবন কাটানো, বন্যায় ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় গাছ কেটে তা ভাসিয়ে দিয়ে সে গাছ রক্ষার জন্য গাছের সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া উত্তাল তিস্তার জলে এ এক অবিশ্বাস্য আনুগত্য—যা একান্তভাবেই শারীরিক।

বনপর্বে বাঘারু যেন খানিকটা অন্য মানুষ। নির্বাসনভূমির দিকে যাত্রা যেন পৌরাণিক মহাপ্রস্থানের তুল্য। পথে অস্ত্রলাভ। তারিকাপাতা জোগাড় করা পাতা কাটার জন্য পাথর খোঁজা, কুকুরের সঙ্গ লাভ—সবই তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাই এর মধ্যে এতো ডিটেলস।

চরপর্বে বাঘারু অনুপস্থিত। কিন্তু সেখানে বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের বিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে পরোক্ষে বাঘারু যুক্ত হয়ে যায়। এরপর নির্বাসন থেকে বাঘারু ফেরে গয়ানাথেরই প্রয়োজনে। আপল চাঁদ ফরেস্ট বাঁচানোর জন্য গয়নাথের আদেশে বাগারুকে ভাসতে হয় তিস্তার জলে গাছের সঙ্গে। এক সময় চরের বাড়ির টিনের চালে তাকে দেখা যায়। তাকে উদ্ধারের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা হয়। টিভির লোকজন এসে ছবি তোলে।

মিছিল পর্বেও দেখা যায় বাঘারু গয়ানাথের হুকুম মতো উত্তরখন্ড আন্দোলনে সামিল। ময়নাগুড়িতে উত্তরখন্ডের সম্মেলন। সম্মেলন ঘিরে ফাংশান। শ্রীদেবীর রমননৃত্য। বাঘারুও সেই নৃত্যের সামনে দাঁড়ানো। দুই নগ্নতা মুখোমুখি। পরের দিন জল্পেশ যাত্রা। ব্যারেজের বিরুদ্ধে শ্লোগান। এখানেই তিলক রায়বর্মনের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে বাঘারু তার আসল পরিচয়টা ব্যক্ত করে—'হামরালার-কুনো মানষি নাই। হামরালার কুনো খন্ড নাই, কুনো জয়েন নাই/ 'মুই রাজবংশী না হও'/'মুই ভাটিয়া না হও'/'মুই এই ঠেকার না হয়'/' মোর কুনো পার্টি নাই'/'মোর কুনো ঝান্ডা নাই'।

তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের দিনে আবার বাঘারুকে তো কোনা ঝান্ডা কাঁধে ব্যারেজের বিপক্ষের মিছিলে দেখা যায়। ব্যারেজের পক্ষেও বামপন্থী মিছিল চলে। যে আপল চাঁদের সঙ্গে তার আজন্ম সম্পর্ক তার ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সে দেখে আলোক মালায় সজ্জিত; উদ্বোধনের অপেক্ষায় তিস্তা ব্যারেজ যার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার কোনো মিল নেই।

উদ্বোধনের মিটিং জমে ওঠে। হাজার হাজার মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ে মাদারি ও মাদারির মাও এসেছিল।

মাদারির মা ভিড়ের মধ্যে তার হারানো সন্তানদের খোঁজে। এক সময় তার একমাত্র সম্বল মাদারিকেও হারিয়ে ফেলে। তাকে একাই যেতে হবে সেই শ্যাওড়া ঝোরার কুটিরে। এই উদ্বোধন উন্নয়নের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্কই নেই।

বাঘারু ঝান্ডা ফেলে উদ্বোধন মঞ্চের দিকে এগোয়। পুলিশ বাধা দিলে সে বলে—'মোর কুনো মিছিল নাই, 'মুই মিটিংয়ের মানষি না হই।'—এই সময় হারিয়ে যাওয়া মাদারির সঙ্গে বাঘারুর মিলন ঘটিয়ে দেয় পুলিশ। দুজনের সংলাপে ব্যারেজ শাসিত অচেনা তিস্তাকে তারা দেখে। ফিরে যায় আপলচাঁদে—যেখানে থেকে ব্যারেজ উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন ফরেস্ট, নতুন নদীর সন্ধানে কেবল হাঁটতেই থাকে দুজনে। লেখকও চান 'এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে 'হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক'।

ইউরোপীয় মডেলকে অস্বীকার করে পুরাণের আবহ তৈরি করে সম্পূর্ণ নতুন রীতিতে লেখা উপন্যাসে দেবেশ তার দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাসকে নবতর অন্বেষণমুখী করেছেন। বৃত্তান্ত তো শেষ হয় না, বিশ্বাস তো শেষ হয় না, বাঘারুদের প্রাকৃতিক জীবন উন্নয়নের কতটুকু স্পর্শ পায়, আদৌ পায় কী! তাদের হাঁটা ছাড়া উপায় কী! বাঘারুর সঙ্গে শুধু মাদারি নয়—লেখকও হাঁটছেন নতুন সূর্যোদয়ের আশায়। 'বাঘারু' সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"পরিবর্তমান ভূ-প্রকৃতি এবং আর্থ সামাজিক পটে বাঘারুর অপরিবর্তনীয়তা আর ভাঙচুরের—বাঘারুর নতুন নতুন মূর্তির দ্বান্দ্বিকতা শ্রমনিষ্ঠ কব্জিতে ও মেধাবী প্রত্যয়ে লেখক গড়ে তোলেন, হয়তো বা ভাস্করের পাথুরে কাজের সঙ্গেই তার তুলনা। কখনও বা লোককথার প্রাচীন উপাদান প্রতিমায়িত হয় বাঘারুর একান্ত লৌকিক অথচ ব্যক্তিক অনুভূতি। বাঘারুর শারীরিকতা এবং প্রাচীনতার ছন্দকে দেশকালের তরঙ্গায়িত পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে এ বৃত্তান্ত বিস্তার পায়।"[৪৬] এই আলোচনার শেষ অংশে তিনি আবার বলেছেন—"প্রকৃতি বনাম বাঘারু, পরিবর্তনমান সমাজ বনাম বাঘারু, বাঘারু বনাম বাঘারু— দেখতে দেখতে মনে হয় আর সবই অলীক। মাদারিকে নিয়ে হাঁটতে থাকুন বাঘারু। বাঘারুই ভারতবর্ষ।"[৪৭]

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এক মহাকাব্য

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' আলোচনায় নিশ্চিতভাবেই জেগে ওঠে মহাকাব্যের স্মৃতি। উপন্যাসটির গঠন ও বিষয় সংরচনায় ভারতীয় মহাকাব্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নজরে আসে।

রামায়ণ, মহাভারতাদি মহাকাব্যগুলিতে যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন ধরা পড়েছে তা উচ্চবর্ণের, রাজা

মহারাজাদের। কিন্তু তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ঠিক তার বিপরীতে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর, সেই সঙ্গে সমাজের নানাস্তরের মানুষের। যে উচ্চবিত্তের উচ্চ বর্ণের মানুষের কথা আমরা মহাকাব্যের এতোদিনের সংস্কারে জেনেছি, বিশ শতকের শেষ পর্বের এই নবমহাকাব্যে আমরা দেখতে পেলাম তার প্রতিবাদ, অন্তবর্গীয় মানুষের জয়পরাজয়, আশা আকাঙ্ক্ষার বহু কৌণিক উপাখ্যান।

এই উপন্যাসে একই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠী পরিচয়। মহাকাব্যের ভাষায় বংশ পরিচয়, রাজবংশী সমাজের হৃতগৌরব হৃত রাজ্য ফিরে পাবার আন্দোলন, রাজবংশী সমাজেরই একজন সর্বরিক্ত চরিত্র বাঘারুর (নায়ক চরিত্র) নেতিবাচক জীবন কাহিনি ও একই জনগোষ্ঠীর জোতদারের দ্বারা চূড়ান্ত শোষণ ও বঞ্চনার কাহিনি, সব শেষে বামপন্থী সরকারকৃত তিস্তা ব্যারেজের উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোথাও যাত্রা করার আখ্যান।

প্রশ্ন হতে পারে, বৃত্তান্তের পটভূমি কেবল তিস্তাপার। এখানকার রাজবংশীদের জাতি-ধর্ম-বংশ ইত্যাদি বর্ণন কি সারা ভারতের দর্পণ হতে পারে? উত্তরে রামায়ণ-মহাভারতের পটভূমি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও তো কাহিনির উৎসকেন্দ্র মূলত উত্তরভারত। দক্ষিণ ভারত তো অন্য দেশ। সেখানকার বর্ণিত সংস্কৃতি, ভাষা আচার আচরণ সবই উত্তর ভারতীয়। বরং দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্তে যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় তা সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু বহু জনগোষ্ঠীর আত্মচেতনা বৃদ্ধি-হেতু স্ব-মর্যাদা-স্বভূমি পুনরুদ্ধারের কাহিনির সমান। ভারত স্বাধীন হওয়ার অর্দ্ধশতাব্দী পরেও যখন নানা ভাষা, নানা মতের দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি তখন সঙ্গত কারণে নানা স্থানে তা অধিকার অর্জনের লড়াইরূপে দেখা দিয়েছে। সরকার তাদের অনেকের দাবি মেনে নতুন নতুন রাজ্যও তৈরি করে দিয়েছেন। সুতরাং সেই দিক থেকে রাজবংশীদের উত্তরখন্ডের আন্দোলনের ঘটনা-প্রতীকে সমগ্র ভারতচিত্রই এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। এপথেই সমাধান আসবে কিনা তা বলা যায় না। কিন্তু লেখক এ আন্দোলনের উল্লেখ করে উপন্যাসের মহাকাব্য লক্ষণের বংশবর্ণন ও রাজ্যদাবি এ দুটি উপাদান তুলে ধরেছেন।

ব্যষ্টি জীবনের মধ্য দিয়েই সমষ্টির ইতিহাসকে ছোঁয়া আধুনিক মহাকাব্যের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। রামায়ণ মহাভারতেও তার পরিচয় মেলে। এখানে তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্বের সংকট দিয়েই

উপন্যাসের সূত্রপাত। আর এই ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে কোনো পৌরাণিক মহাকাব্যের চরিত্রের আবির্ভাবের মতো করেই।

দেবেশ রায়ের এ উপন্যাসের নায়ক অবশ্যই ধীরোদাও সদবংশ জাত কোনো রাজপুরুষনয়, একান্ত ভাবেই একালের সহায় সম্বলহীন, নাম গোত্রহীন, সর্বাবয়বে বঞ্চনার চিহ্ন নিয়ে রিক্ততার মূর্ত প্রতীক বাঘারু বর্মন।

তিস্তাপারের ক্রান্তি হাটে এক হল্কা ক্যাম্প বসেছে। সেখানে 'জমিজমা মাপামাপি হবে। কোন জমি কার এইসব। তার ওপর কোন জমিতে কে চাষ করছে সে সব রেকর্ড হবে।' এই কাজে ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুহাসের সামনে এসে এলাকার লোকজন নিজ নিজ তথ্যাদি পেশ করছে। সেখানেই বাঘারু এসে হাজির হয়। তার উপস্থিত হওয়া যেন আবির্ভূত হওয়া। যেন ত্রিলোক কম্পিত করে তার আর্বিভাব ঘটে। এবং সে তার আবির্ভাব ঘোষণা করে। 'হুজুর মুই আসি গেছু, মুই ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন।' তারপর সে গম্ভীর কণ্ঠে ফের ঘোষণা করে 'শুন হুজুর, কাথা মোর একখান। না হে একখান না হয় দুইখান। কাথা মোর দুইখান।' একখান কাথা মোর নামখান কাটি দাও। ঐ জমিখান লিখি দাও গয়ানাথ জোতদারের নামত।' দুইখান কাথা'র আর একটি হলো তার নাম প্রসঙ্গ। তার তো সত্যিকারের কোন নাম নেই। ফরেস্টে জন্ম বলে ফরেস্টার। আর বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে বাঘ তার পেছনে থাবা মেরে ছিল বলে 'বাঘারু'। দুয়ে মিলে ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন। আপলচাঁদের কাছে সামান্য কিছু জমিতে যে চাষ করত তার স্বত্বও গয়ানাথকে দিয়ে সে কেবলই 'গয়ানাথের মানষি' হতে চায়। একখানা কটি বস্ত্র সম্বল করে এমন একজন নিরলম্ব মানুষের পুরানো শালগাছের মত শ্যাওলা ধরা শরীর নিয়ে নায়ক রূপে আত্মপ্রকাশ বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

মহাকাব্যের নায়কদের যুদ্ধ আছে, কীর্তি আছে, জয় আছে খ্যাতি আছে। বাঘারুও বহু কীর্তির অধিকারী। সে স্থানীয় এম, এল, এ কে পিঠে করে নদী পার করে দেয়; সেটেলমেন্টের অফিসার-সুহাসবাবুর সামনে গয়ানাথের ইঙ্গিত মাত্র তিস্তায় ঝাপ দিয়ে সাঁতার কেটে সীমানা নির্দেশ করে; আদেশ মাত্র ডায়নার চরে যাত্রা করে। যাত্রাকালে 'বাঘারুর অস্ত্রলাভ' 'সঙ্গীলাভ' হয়। এ যাত্রা সাধারণ যাত্রা নয়, নির্বাসন-মহাকাব্যের নায়কদের মতো। আবার তিস্তার বন্যায় গয়ানাথের গাছ বাঁচানোর জন্যে উত্তাল জলরাশিতে নিজেকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্দ্বিধায় ঝাপিয়ে পড়ে অনির্দিষ্ট স্থান ও কালের দিকে যাত্রা করে। নিতাইদের চরের কাছে অশ্বিনী রায়দের ডুবন্ত চালে আটকে যায়। মহাকাব্যের নায়কের অভিনব, উৎকৃষ্ট কর্মগুলি এসময়েই দেখতে পাওয়া যায়। এই

সময়ের এপিসোড বা অধ্যায়গুলির নাম 'অন্ধকার জলস্রোতের মাঝখানে', 'জলস্রোতে বৃক্ষবাহন', 'দুই আঘাতের মাঝখানে',

বৃক্ষপর্বে কয়েকদিন বানের জলে ভেসে উদ্ধার হলে বাঘারু হয়ে ওঠে সংবাদ। দূরদর্শনের চিত্রশিল্পীরা এসে নানা 'পোজে' তার ছবি নেয়। "টিভি-র ক্যামেরাম্যান অবিশ্যি একেবারে তলা তেকে আকাশ পর্যন্ত একটা দারুণ প্যানিং করেছে-বন্যার জল, ক্লোজ আপে আবর্ত, গাছের ডালপালায় জলের স্রোতের আঘাত, আরো ডালপালা, বাঘারুর দুটো পা-ক্লোজ আপে, ধীরে ধীরে হাঁটু, উরু কোমর, নেংটি মিডিয়াম শটে পেট, বুক তারপর মাথা। সেখান থেকে বাঘারু ধীরে ধীরে দিগন্ত থেকে দিগন্তে, আকাশে নদীতে স্থাপিত হয়।"৪৮

মিছিল পর্বে বাঘারু উত্তরখন্ডের মিছিলের পুরোভাগে ঝান্ডা হাতে। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নয়—গয়ানাথের নির্দেশে, মিছিলে বহু লোকের সঙ্গে থেকেও সে একা। নেতা তিলক রায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে 'মোর কোন পার্টি নাই, 'মোর কুনো মানষি নাই', 'মোর কুনো ঝান্ডা নাই।' ব্যারেজ উদ্বোধনে এসে এক সময় ঝান্ডা ফেলে সে একা এগোতে থাকে। এতোদিন গয়ানাথের মানষি বলে সে পরিচয় দিত, আজ সে তাও নয়—না রাজবংশী, না ভাটিয়া, না উত্তরখন্ডী না বামপন্থী। সে কেবল একা বাঘারু। ব্যারেজ বদলে দিয়েছে ফরেস্ট বদলে দিয়েছে তিস্তা—তার চেনা প্রকৃতি। এখানে যে উন্নয়নের বাজনা বাজছে তা আর যার হোক বাঘারুর নয়। তাই একবার ব্যারেজের তিস্তাকে দেখে সে একা হাঁটে। লেখক অবশ্য তার সঙ্গে জুড়ে দেয় আর এক মা হারিয়ে যাওয়া কিশোর-মাদারিকে। যেন জয়-যুদ্ধ-অভিযান শেষ করে মহাকাব্যের নায়ক মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ায় সঙ্গী—নতুন স্বপ্ন ও আসার প্রতীক মাদারি। মহাভারতে পান্ডবদের গন্তব্যস্থল ছিল স্বর্গ। কিন্তু এখানে গতি আছে নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। গন্তব্যের সন্ধানে শুধু হাঁটা আর হাঁটা।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র স্বরূপ বিচার করে দেখা গেল এই উপন্যাস খানিতে উপন্যাসের নানা শ্রেণি লক্ষণ বিদ্যমান। তিস্তাপার নামক একটি বিশেষ ভূখন্ডে একটি বিশেষ সম্প্রদায় রাজবংশী সমাজের, তাদের ভাষায় রচিত তাদেরই জীবন যাপন ও জীবন সংগ্রামের কথা লিখিত হওয়ায় আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। আবার আমলা সুহাস ও জোতদার গয়ানাথের জমি জরিপ, বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিনীতি, উন্নয়ন, ব্যারেজ নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যাত্রাণ, কৃষক-শ্রমিক বিবাদ, সড়ক নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, এম, এল, এ কৃষক নেতা, দলীয় কর্মীদের রাজনৈতিক সভা ব্যারেজ উদ্বোধন; নির্বাচন সামনে রেখে উদ্বোধনে

মহা মিছিল করে ক্ষমতা প্রদর্শন এবং উত্তরখন্ডের ব্যারেজ বিরোধী তথা উন্নয়ন বিরোধী শক্তিকে প্রর্যুদস্ত করা উদ্বোধন উপলক্ষে কত মন্ত্রী আমলার সমাবেশ, সব শেষে মাদারির মা, বাঘারু-মাদারিদের এসব তথাকথিত উন্নয়নকে প্রত্যাখান করা ইত্যাদি ঘটনা তো রাজনৈতিক উপন্যাসেরই লক্ষণ। দেশ বিভাগের পরিণতিতে ওপার বাংলার উদ্বাস্তু, বিশেষত নম:শূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষিজীবী মানুষদের এপারে আসা, তিস্তার চরের জমি বেছে নিয়ে বন্যার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার কাহিনি অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এ পারে এসে এখানকার রাজবংশীদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে মাঝে মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ, অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আবার এরাই চরুয়া হয়ে পঞ্চায়েতে অংশ নিয়েছে; এখানকার নাগরিক হয়ে উঠেছে। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা উপন্যাসখানির ঐতিহাসিক লক্ষণ চিহ্নিত করে।

বন-পাহাড়-নদীর কাহিনী, তিস্তা বুড়ি, 'কমলে কামিনী'র মিথ উপন্যাস খানিতে কেমন যেন রোমান্সের গন্ধ বয়ে আনে।

মিছিল পর্বের রাজবংশী সমাজের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রাজবংশের রাজকীয় কাহিনি। রাজ্যলাভ, রাজ্যহারানো, ভারতভুক্তি, রাজবংশীদের হৃত গৌরব উদ্ধারের আন্দোলন, স্বভূমি ফিরে পাওয়ার জন্য উত্তরখন্ড দল গঠন ইত্যাদি যেন মহাভারত, রামায়ণের কাহিনি। পঞ্চানন মল্লিক বীরেন বসুনিয়াদের সঙ্গে সম্পৎ রায়, গয়ানাথ, বাঘারু, আসিন্দির যোগ দেওয়ায় এতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এবং উপন্যাস খানির মহাকাব্যিক মহিমা প্রকট হয়েছে। সুতরাং এত লক্ষণ যুক্ত তিস্তাপারের বৃত্তান্তকে কোনো বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা খুবই মুশকিল। তবু একথা স্বীকার করতেই হয় যে উপন্যাসখানিতে মহাকাব্যিক লক্ষণই সবচেয়ে বেশি পরিস্ফূট। মহাকাব্যের বিশাল বিস্তারে অন্য সব লক্ষণ যেন একাকার হয়ে যায়। এবং দেবেশ রায়ের উপন্যাসের ধারায় তথা বাংলা উপন্যাসের ধারায় আর একটি মহাকাবিক উপন্যাস সংযুক্ত হয়েছে।

তিস্তাপুরাণের স্বরূপ বিচার

তিস্তাপুরাণের স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে এর বিষয়বস্তুর চারটি স্তর চোখে পড়ে। প্রথম স্তর পৌরাণিক আবহ। নামকরণ, প্রচ্ছদচিত্র, রাজবংশী প্রবাদ, উৎসর্গ, বংশ তালিকা, প্রতি পর্বের শেষে পুরাণ পরিচিতিমূলক কথা, উপন্যাস জুড়ে নানা তত্ত্বকথা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপন্যাসখানিকে পুরাণ করে তোলার পরিবেশ রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর লৌকিক, বাস্তব। বুড়িমা গোত্রনারী। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের অখ্যাত গ্রাম দলগাঁও-এ বুড়িমার গোত বা বংশ। বুড়িমাই সেই পুরাণ কন্যা যার বংশের কথা উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় স্তর বুড়িমার গোতের আড়ালে আসলে রাজবংশী সমাজের কথা। তাদের দৈনন্দিন, জন্ম, মৃত্যু, আচার-বিশ্বাস, পূজাপার্বন, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ স্তর সমগ্র উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা ও কথার সূত্র ধরে রাজনীতি ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়।

'তিস্তাপুরাণ' উপন্যাসখানির এই নামকরণের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা হয়েছে এটি একটি পুরাণ। '"বঙ্গীয় শব্দ কোষ' এ পুরাণ কথাটির বাচ্যার্থ করা হয়েছে 'পুরাতন'। 'পুরাণ বিন [পুরাভবম ইতি পুরান + তন (ষ্টান), নিপাতনে 'ত' লোপ, নত্ব (অ: টী:), সং পুরাতন > প্রা পুরাঅন > °ন (?)]"৪৯ (বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্বিতীয় খণ্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাডেমি ১৯৬৬, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, পৃঃ ১৩৪৫) এছাড়া পুরাণ শব্দটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, গুণরাজখান, মালাধর বসু বিরচিত' গ্রন্থের ভূমিকাংশে।

"পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরাকালে প্রাচীন কাহিনীর এক বিশেষ গ্রন্থের নাম ছিল পুরাণ। বেদাদি গ্রন্থে এর উৎপত্তির কথা আছে। অথর্ববেদে, শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে, আপস্তম্ব বা গৌতমের ধর্মসূত্রে এবং মহাভারতে ও মনুসংহিতায় পুরাণ প্রসঙ্গ রয়েছে। পুরাণ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'পুরাকালীন', ইতিহাস শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ 'এই রূপ ছিল' পুরাভবম ইতি পুরাণম আর ইতি-হ-আস হল ইতিহাস। মূলতঃ পুরাণ বলতে বেদোত্তর যুগের ইতিহাস আখ্যায়িকা উপকথা ও ধর্মমূলক এক শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থকে বোঝায়।

পুরাণের প্রধান লক্ষণ পাঁচটি এক, সর্গ (সৃষ্টি), দুই, প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নব সৃষ্টি), তিন, বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশবর্ণনা), চার, মন্বন্তর চৌদ্দজন মনুর শাসন বিবরণ) এবং পাঁচ, বংশানুচরিত (পৌরাণিক রাজগণের আখ্যায়িকা)"৫০

পুরাণ তো মহাকাব্য । তাই তিস্তাপুরাণ-এ মহাকাব্যের নানা বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

তিস্তাপুরাণের প্রচ্ছদে এবং তিস্তাপুরাণের শিরোনাম জ্ঞাপক ভেতরের পৃষ্ঠায় নদীতে হাত ধরাধরি করে

বুড়িমার গোত

নানা ঘটনায় নানা মানুষজনের ও তাদের ভিতরের সম্পর্কের কথা ঘুরে-ঘুরে এসেছে। এদের পরিচয় খানিকটা ছকে দেয়া হল—কারো-কারো বেলায় আনুমানিক জন্মবছর, এমনকী বিয়ের বছরও। এ সবই নিছক বানানো।

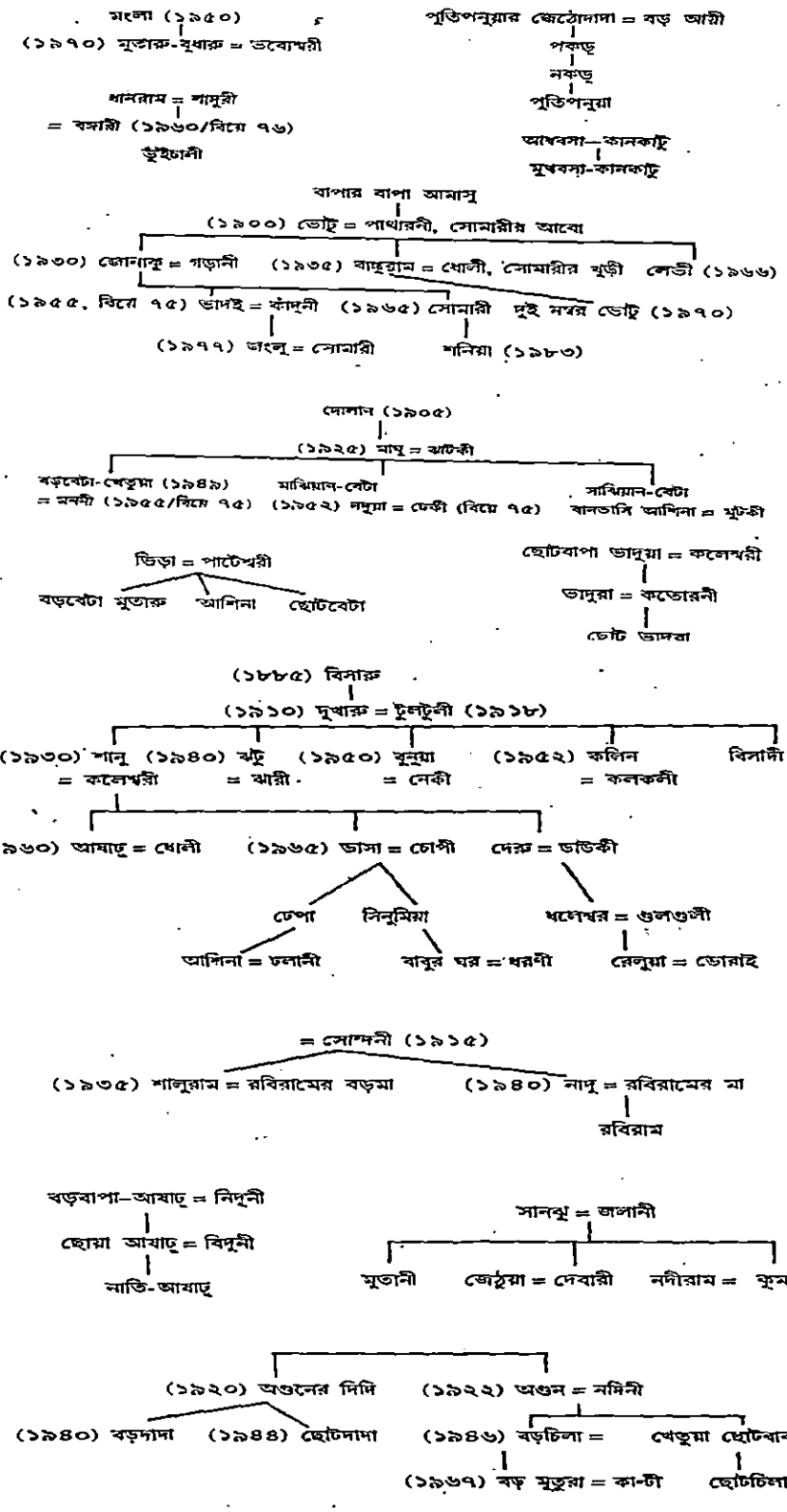

বৃত্তাকারে জলক্রীড়ারত নারী পুরুষের দুটি ছবি আছে। পুরাণের সময় ঘুর্ণায়মান। এর শুরু ও শেষের হিসেব নেই। যেখানে শুরু আসলে সেখানে কোনো কিছুর শেষও বটে। শেষ না হলে শুরুই বা হবে কেমন করে, বা অন্য কোন শেষও শুরু হতে পারে সেখান থেকে। এমনই এক সময়ের এলোমেলো হিসেব বুড়িমার গোতের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পুরাণের মতো বুড়িমার গোতেরও পরিচয় জ্ঞাপক একটা বংশ তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সূচিপত্রের পরের পাতায়। সেখানে লেখক লিখেছেন —" নানা ঘটনায় নানা মানুষজনের ও তাদের ভিতরের সম্পর্কের কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে। এদের পরিচয়ের খানিকটা ছকে দেয়া হল — কারো কারো বেলায় আনুমানিক জন্ম বছর, এমনকি বিয়ের বছরও। এ সবই নিছক বানানো।"

ভূমিকা অংশে দেবেশ রায় লিখেছেন—".....নদীমানুষের একই ভুবনে যে এমন ঘুরছি সে হয়তো বেরিয়ে আসার পথ জানিনা বলে। বা, হয়তো বেরিয়ে আসার পথ চাই না বলেও। বা হয়তো বেরনোর পথ নেই বলেই।" লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘুর্ণায়মান ছবিটির মিল দেখতে পাওয়া যায়। সময়ের বাইরে যাবার সাধ্য কার। বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে গিয়ে আবার সেই বৃত্তে ফিরে আসা ছাড়া উপায় কী? এমন দার্শনিকতার আশ্রয় করেই বুড়িমার গল্প সাজানো হয়েছে। উৎসর্গ অংশের রাজবংশী প্রবাদ 'দিন যায়, কথারয়', সেই অর্থ বহন করে। আবার কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী তীর্ণাকে উদ্দেশ্য করে লেখকের উক্তি 'একদিন তোকে এ গল্পের পাকে পড়তেই হবে।' শুধু তীর্ণা কেন জগতের কারোরই এই গল্পের পাক থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

লক্ষ করা যায় উপন্যাসটির একেকটি পর্ব সমাপ্ত হয়েছে কোন পৌরাণিক ঘটনার স্মৃতিমণ্ডিত কথা দিয়ে। এমনকি কোন কোন পর্বের শেষে এপিসোডের নামকরণও 'পুরাণকন্যা', 'পুরাণপুরুষ' এরকম রাখা হয়েছে।

প্রথম পর্ব 'শেষ' এর পংক্তি দুটি— 'সে মাটিতে গোহি, হলরেখা, এখনো মিশে যায়নি। সে হলরেখা থেকে এই বানা জাগা প্রহরে সেই পুরাণকন্যা উঠে আসতে পারে।' সে হলরেখা থেকে উঠে আসা পুরাণকন্যা সীতা ছাড়া কে? এখানে এক কৃষি নির্ভর রাজবংশী সমাজের কথা সে বর্ণিত হয়েছে। তার প্রধান চরিত্র বুড়িমা সীতার সঙ্গে উপমেয়।

দ্বিতীয় পর্ব 'আর একশেষ' এর শেষ অধ্যায় 'পরজন্ম থেকে', তার আগের অধ্যায় 'পুরাণ পুরুষ'। 'পুরাণ পুরুষ'এর শেষ দুটি পঙক্তি-'লগিটা সোলংগার ভিতরে ফেলে দিয়ে দুই হাতে দুই বৈঠা দুদিকে নামিয়ে তিস্তার অন্ধঝর স্রোতকে প্রতিহত করতে সেই শেষ কৈশোরের ঘাটোয়াল শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলে 'মোক তো

নদীখান খুঁজিবারই লাগিবে।' যেমন নদী খুঁজতে বেড়িয়েছিল কোন এক কালে কোন এক পুরাণ পুরুষ।'

এই পুরাণ পুরুষ তো ভগীরথ। যিনি স্বর্গ থেকে মর্তে গঙ্গা আনয়ন করে সেই গঙ্গার পূত পবিত্র জলের স্পর্শে সগর বংশের ষাট হাজার মৃত সন্তানের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। ঘাটোয়ালও সেই রকম ভগীরথ যে নদী চিনতে বেরিয়েছে— তিস্তার জলে, দশনদী, বিশনদীর জলে মৃত প্রায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে। এ জন্মে না হলেও পর জন্মে।

তৃতীয় পর্ব 'আরম্ভ'। পুরোপুরি রাজনৈতিক পর্ব পুরাণে যেমন থাকে। এর শেষ অধ্যায় 'লেভি'র শেষ পঙক্তি—'এরা এদের দৈনন্দিন এক পুরাণ থেকে যে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই পৌরাণিক দৈনন্দিনে আবার প্রবেশ করে'।

'আছে, আছে, আছে।'

এখানে বুড়িমার গোতের দৈনন্দিনকে পৌরাণিক দৈনন্দিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে গোত্র প্রধানা বুড়িমা অবশ্যই বেঁচে আছেন —'আছে, আছে, আছে।'

চতুর্থ পর্ব - 'আরম্ভের পর' এর শেষ লাইন 'এমন নির্বাসন পুরাণ পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে'। রামায়ণে রাজ্যাভিষেকের মুখে রামচন্দ্রের নির্বাসন। মহাভারতে যুদ্ধজয়ের পর যুধিষ্ঠিরাদির স্বেচ্ছা নির্বাসনের কাহিনি আছে। এখানে ছোটদাদাও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ব্যর্থ হয়ে নির্বাসিত হয়েছে।

পঞ্চম পর্ব - 'আর এক আরম্ভ' এর শেষ লাইন - 'ঢেমনার মুখে বড়দাদা আগুন ছোঁয়াবার আগেই বুড়িমার গোতের তিন গোত্রধর এই পৃথিবীর সেই স্থানটিতে পৌঁছয়, যে স্থানটি ঢেমনার ক্ষেত' বলে নামাঙ্কিত হয়ে গেছে— পুরাণে যেমন গোত্র ও দেশ এক একজন পুরাণ পুরুষকে ধরে আবর্তিত হয়।' এখানেও পুরাণ পুরুষের নামে নামাঙ্কিত দেশটি ভারত, বংশ পুরুবংশ, এবং পুরাণ পুরুষটির নাম ভরত।

ষষ্ঠপর্ব - 'শেষান্তর' এর শেষ পঙক্তি '..... পুরাণে যেমন অনেক অনেক যুদ্ধ, জয়পরাজয় ও জন্মমৃত্যুর পর একখান গোত বহুখান হয়ে বহু দিকে চলে যায়।' মহাভারতের পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করে। কিন্তু রেখে যায় তাদের বংশধরদের।

সপ্তম পর্ব - 'কথান্তর' এর শেষ পৃষ্ঠায় বুড়িমার বিসর্জন—'মোক নিগি যা পিঠত বুকুনি বান্ধি। তিস্তার জলত মোর বিসর্জন দে। মোক তিস্তাত ভাসি দে।' ছোটদাদা এ বিসর্জনের কাজ করে। সঙ্গে কুকুর ভেউলা। 'পশুর টের পাওয়ার শক্তিতে পুরাণ শেষ হল। বুড়িমার গন্ধ চলে যাচ্ছে একদিকে বুড়িমার গোত

পড়ে আছে উল্টোদিকে।' যেন সীতার পাতাল প্রবেশ - উল্টো দিকে পড়ে থাকলো তার গোতবংশ।

সাতটি পর্বের সাতটি পৌরাণিক ঘটনার আবহ ছাড়াও উপন্যাসে আরও তিনটি বড় অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। এক- বানা ঝোলা, দুই- নদী খোঁজা, তিন- তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়া। উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "যে বানা খান পাহাড়ঠে ঝুলিবার দেখিছুঁ ঐ বানাখান তো নামিবে। যে সোলংগা খান তিস্তাত্ নদী খুঁজিবার দেখিছুঁ ঐখান তো ফিরিবে। যে হাতিখান তিস্তার চরত ডুবিবার দেখিছুঁ ঐখান তো পাতালঠে পাখামেলি কোনোদিন উড়িবে।"৫১

তিস্তাপুরাণ এই পৌরাণিক কাঠামোর ভেতর এক আধুনিক পুরাণ। বুড়িমা গোত্র নারী। তাঁকে কেন্দ্র করে দশনদী-বিশনদীর পৃথিবীতে বুড়িমার গোত ও জোত। সেই গোত ও জোত আসলে অন্য কোথাও নয়, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত দলগাঁও সরুগাঁও গ্রাম। "কে না জানে আংরাভাসা আর গোলুন্দি এই দুই নদীর মাঝখানে একটা ঝারে কয়েকটা টাড়ি আছে? তার পুবে দুদুয়া আর কুলজুয়া এই নদীর মাঝখানের একটা ঝারে কয়েকটা টাড়ি আছে? তার পূবে-উত্তরে ডুবুরি বন্দরহাট আর দক্ষিণে শিসতলির হাট এই হাটের মাঝখানে দলগাঁও সরুগাও। .....সেই দলগাঁও - সরুগাঁও থেকে খানিকটা পূবে গেলে বুড়িমার গাঁও।"৫২

এ পুরাণ আসলে এক ইতিহাস। যে ইতিহাসের স্থান, তিস্তাপারে বড়বাঁক, আংরাভাসা, গোলুন্দি, নোমাই, গরাতি, দুদুয়া, কুলজুয়া, জলঢাকা, ইত্যাদি ছোটবড় নদীবেষ্টিত অঞ্চল এবং আরও দূরে হিলির দুই-তিন মাইল ভেতরে নীলফামারি ও পূর্বে তোর্সার পারে পুণ্ডিবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত।

কালের দীর্ঘতা বোঝানো হয়েছে এভাবে—"একখানা শালগাছ পাকা হতে লাগে অন্তত আটটা মানুষের জীবন। তার মধ্যে অন্তত চারখান মানুষের জীবনের আগে, বুড়িমা বৌ হয়ে আসারও অনেক অনেক আগে মরাঘাট পরগনার - প্রথম সেটলমেন্টে বুড়িমার গোত তৈরি হয়ে আসছে।" ৫৩

উপন্যাসের ঘটনা কাল ১৯৬৪,৬৫,৬৬- খরার আগের ও ৬৭,৬৯ -র ভোটের পরের সময়। বুড়িমা তাঁর বানা ঝোলা ঘোষণা করেন লেভি-খাশ-ভোটের ঘটনার তিরিশ বছর পর, যে কথা সোমারী, ক্ষেতবাড়ির সবাইকে চেচিয়ে বলবে—"বড় বানা ঝুলি আছে-এ বুড়িমা কহি দিছে-এ-এ।" ৫৪

আর বিষয়—বুড়িমার গোত ও জোতের কথা। "বুড়িমার গোতের জোত তো পাকুর গাছের মত। তা থেকে কত ঝুড়ি নেমেছে। কত শিকড় গজিয়েছে, কত শিকড়ের শিকড় কত দিকে ছড়িয়েছে।"৫৫ সেই

গোতের নরনারী তাদের জন্ম মৃত্যু বেড়েওঠা, বিবাহ, আচার অনুষ্ঠান, খাওয়া-পরা-ভাষা ভাবভঙ্গি-আদবকায়দা, বাড়িঘর-এগিনা, রাজনীতি, সামাজিকতা ইত্যাদির বিশিষ্টতা। এছাড়া এদের সঙ্গে সম্পর্কিত পূর্ববঙ্গের ভাটিয়া, চা বাগানের-মদেশিয়া, কুলি মজুর, বিডিও অফিস, হাটবাজারের মানুষজনেরও নানা কথা।

বুড়িমার গোত সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর রাজবংশী জনসমাজের একটি অংশ। একান্নবর্তী পরিবার। পরিবারে শুধু রক্তসম্বন্ধে বা বৈবাহিক সূত্রে নারী পুরুষরাই বসবাস করে না—এখানে আছে ঢেমনা, ছোটদাদার মত আপাত সম্পর্কহীন মানুষেরাও আর আত্মীয়স্বজন। টাড়ি বাড়ির বহু লোকের নিত্য যাওয়া আসা।

বুড়িমার গোতের এত মানুষজন, তার বিশাল বিস্তৃত জোতে কৃষিকাজ ও দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে কী ভাবে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছে, কী ভাবে ধীরে ধীরে নানা ঘটনা ও পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়েছে—তারই কাহিনি এক ঘটনার সূত্রে আর এক ঘটনা, এক কথার সূত্রে হাজার কথা, একই কথা অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট, গোটা রাজবংশী সমাজের জীবনালেখ্য। ব্যষ্টির ইতিহাস হয়ে উঠেছে সমষ্টির ইতিহাস।

বুড়িমার জোতের ও গোতের লোকজন ঃ

বুড়িমার গোতে রক্তের সম্পর্কের ও নানা ভাবে যুক্ত মানুষজনের একটি তালিকা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওরা এবং আরও কিছু লোকজনের পারস্পারিক সম্পর্কের আর একটি তালিকাও সংযোযিত হল —

শাদুরী - ধানরামের বৌ, নদিনী - অগুনের বৌ, বড় চিলার মা, কাল্টি- বড় চিলার বৌ, বড় মুতুরা - বড় চিলার ছেলে, ছোটদাদা - ঢেমনার বেটা, ধাপগঞ্জের পিসির ছেলে, টুলটুলি - দুখারুর বৌ, সোন্দনী - দোলানের বৌ, সোমারী - জোনাকুর মেয়ে, জোনাকু - বাঙ্কুরামের বড় দাদা, পাথারনীর মেয়ে (লেভির সময় জন্ম), শনিয়া - সোমারীর মেয়ে, ভোটু—জোনাকু-বাঙ্কুরামের বাবা, কলকলি- কলিনের বৌ, নেকী - বুনুয়ার বৌ, ধোলী - বাঙ্কুরামের বৌ, ঝটু—দুখারু-টুলটুলির ছেলে, বৌ সোমারী - জোংলুর বৌ, কলেশ্বরী - ভাদুরা ছোটবাপার বৌ, কতোরানী - ছেলে ভাদুরার বৌ, খেতুয়া—মাঘুর ব্যাটা, আর এক খেতুয়া - ছোটবাপা-মাটকীর ছেলে, মননী - খেতুয়ার বৌ (এবাড়ির এখনও পর্যন্ত ছোট বৌ, বাপের বাড়ি পুন্ডিবাড়ি) মংলা - মুতারু-বুধারুর বাপ, আমাসু-জোনাকু-বাঙ্কুরামের বাপের বাপা। ভাসা - সানঝুর মাইঝন বেটা, দেবু-ডাউকির স্বামী, ধলেশ্বর - ডাউকির ছেলে, গুলগুলি - ধলেশ্বরের বৌ, ঢেকী - মাঘুর মাইঝন বেটা নদুয়ার বৌ, কাদুনী -

ভাদইয়ের বৌ, ঢেপা - সিমুনিয়া—ভাসা ও চোপীর দুই ছেলে। ২ নং ভোটু - বাঙ্কুরামের ছেলে, আশিনা - ঢেপার ছেলে, বাবুর ঘর, সিমুনিয়ার ছেলে, শানু - দুখারুর ছেলে, মুতারু, বুধারুর বৌ - ভব্যেশ্বরী। শাদুরী - আত্রেয়ীর পারের মেয়ে, আষাঢু - কলকলির বড় ভাসুরের বেটা, বিদুনি - ছোয়া আষাঢুর বৌ।

এ ধরনের নাম বাংলা-সংস্কৃত নামের অনুরূপ নয়। রাজবংশী সমাজের এই বিশেষ ধরনটির কারণ ও বর্ণনা করা হয়েছে উপন্যাসে।

" বৈশাখ মাসে যে জন্মায় তার নাম বৈশাখু, আষাঢ় মাসে যে জন্মেছে তার নাম আষাঢু বা আষাঢ়ী, চৈত্রমাসে যে জন্মে তার নাম চৈতা, বুধবার যে জন্মেছে তার নাম বুধারী, খুব ঝড়-জলের রাতে যে মেয়ে জন্মেছে তার নাম আনধারনী। মাস তো মোটে বারোটা। দিন তো মোটে সাতটা। বুড়িমার এই সংসার তো তার চাইতে অনেক বড়। এতই বড় যে বড়-বুধারী আর ছোট বুধারী বা কালা-চৈতা আর ধলা-চৈতা এখন সব পার্থক্য করে করেও এক নামে আর ক'জনকে আঁটানো যায়। যার নাম সেও তো শেয়ানা হয়। বিয়ে করে, সে-মেয়েও তো বিয়াত্তী হয়। তখন সেই বৈশাখু বা আষাঢু ঘরের ছাওয়া-ছোটও তো বৈশাখ বা আষাঢ় মাসে, চৈত্রে বা ভাদ্রে, বুধবারে বা সোমবারে, ঝড়জলের অন্ধকার রাতে বা জ্যোৎস্নায় জন্মেছে। তখন তো আর তাদেরও বৈশাখু বা আষাঢু বা ভাদই বা চৈতা, বুধারী বা সোমারী, আনধারনী বা পুনিয়া এইসব নামে ডাকতে হয়। বড় জোর তার সঙ্গে যোগ হয়, আষাঢুর ঘরের বুধারি বা ভাদই এর ঘরের পুনিয়া। এমন কত আর আলাদা করা যায়? খুব বেশী হলে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, খুব সকালের দিকে জন্মেছে বলে পোহাতী বা রবিবারে জন্মেছে বলে দেবারু বা অগ্রানে জন্মেছে বলে অগা, বা কোন কুটুম বাড়িতে জন্মেছে বলে সোদোরু। তারও তো শেষ আছে। তারাও তো সেয়ানা গাবুর হয়েছে। তারাও তো বিয়ে বসেছে। মেয়ে হলে যে বাড়িতে বৌ হয়ে গেল সে বাড়িতেও তো এই বৈশাখু, আষাঢু, দেবারু, সোমারু, পোহাতী আছে। তাদের যখন ছাওয়া ছোট হতে শুরু করবে তখন তো আর সেই বৈশাখু, চিলা, বগী, সোদর এই সব নামের মধ্যে তারাও ঢুকে যাবে। অতিরিক্ত হয়তো এই টুকু যোগ হয় — পায়খানা করতে গিয়ে পেট থেকে বেরিয়ে গেছে দেখে, জংলু বা জন্মের অনেকক্ষণ পর প্রথম পেচ্ছাব করেছিল বলে, বাসিয়া। তখনো এসব বলা হয় ছোট জংলুর বড় অগী, বা বড় চিলার ছোট পুনিয়া। তবে এই বড় আর ছোট দিয়ে কত ভাগ করা যায়? একটাই রক্ষা ছাওয়া ছোটরা যত মাথা চাড়া দেয়, যত শেয়ানা হয়, যত গাবুর হয়, ততই তার নাম ছাড়িয়ে ওঠে। কেউ হয়ে যায় বড় বহিন, পুনিয়ার ঘরের বড় বহিন, বা ছোট বুধারুর ঘরের বড় বহিন। কেউ হয়ে যায় মোটা। কেউ ছোট

বাপা, কেউ বড় মাইঝিলা, কেউ খুড়াবাপা, কেউ বড় বাপা, কেউ খুড়ী, কেউ আপা, কেউ আয়ী। এমন বড় হয়ে গেলে নামটা তখন ছাওয়া ছোটর ঘর ছাড়িয়েও যেতে পারে।" ৫৬

রাজবংশী বাড়ির আদল ও জীবনযাপন

এ রকম নাম বিশিষ্ট রাজবংশী সমাজের বাড়ির আদল, বসবাসের নিজস্ব ভঙ্গিও আছে। "একখান বড় জোতদারের বাড়ি, বা খুব বড় বড় জোতদারের বাড়ি, শাল খুঁটির ওপর দেড়তলা হতে পারে, টিনের চাল হতে পারে, কাঠের বেড়াও থাকতে পারে। বাড়ির নকশাটা তাতে বদলে যাবে না। চারদিক খোলা বলেই পুবে বাহির এগিনার উত্তরে দেওঘর, তার আগে কুয়ো-কাঁচা অথবা পাকা, আর পাট শুকতে দেওয়ার বাঁশ। দারি ঘরের তো দু'দিকেই দরজা। দারিঘর আর গোলা ঘরের মাঝখানে ছোট এগিনা গোলাঘরের দুদিকে দরজা। গোলাবাড়ি যে ভিতর এগিনার পশ্চিমমুখো পুব ভিটেয়, সেই এগিনারই দক্ষিণ মুখো উত্তর ভিটেয় বাস্তুঘর আর দুটো বা একটা শোয়ার ঘর সেই এগিনারই পুব মুখো পশ্চিম ভিটেয় আরো শোয়ার ঘর। সেই এগিনার উত্তর মুখো দক্ষিণ ভিটেয় খড়ি ঘর- রান্না ঘর থাকার কথা, বৃষ্টি হলে যে ঘরে রান্না হয়, আর বাইরে দুটো বড় বড় উনুন, বৃষ্টি না থাকলে যেখানে রান্না হয়।" ৫৭

রাজবংশী বাড়ি সম্পর্কে প্রচলিত ছিলকা এরকম —

'উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া
পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।'

অর্থাৎ বাড়ির উত্তর দিকে সুপুরি বাগান, দক্ষিণ দিক ফাঁকা, পূর্বদিকে পুকুর এবং পশ্চিম দিকে বাঁশ বাগান।

বিশেষ আদল যুক্ত রাজবংশী বাড়ির আরও বিশেষত্ব হলো তার এগিনা। ভেতর, বাহির, নতুন, খন্দক, বরহ, পাছত নানা নামে পাঁচটি ছটি, এগিনা যুক্ত বড় জোতদারের বাড়ি দেখা যায়। আট-দশ বিঘা জমির ওপর - পাঁচ-ছ'টি এগিনার বিশেষ আদলের বাড়ি, বুড়িমার বাড়ি। গাছপালা, এগিনা, আর বহুঘর দরজার বাড়িতেই বুড়িমার গোত অবস্থিত। বাড়ির সঙ্গে উঠোন বা এগিনা বাড়ির একটি অচ্ছেদ্য অংশ। এগিনা বহু রকমের, এর ব্যবহার বহু ধরনের। রাজবংশী সমাজে বাড়ির সঙ্গে এগিনা বা উঠোনের গুরুত্ব সমান। অনেক লোকের বসবাস থাকলে এক এগিনায় কুলোয় না। ফলে আরও কয়েকটি এগিনা নিয়ে গড়ে তুলতে হয় 'বরহবাড়ি'। বুড়িমার বাড়ি সেই রকমই। "বুড়িমার বাড়িতে শোয়ার লোক এত বেড়ে গেছে যে এক এগিনার দুই ভিটের ঘরে কুলোয় না, তাই রান্নাঘর, খড়িঘর, আর উনুনও ভিতর এগিনার দক্ষিণ ভিটেয়

নেই। সেখানে কলোবাড়ি, আমরাড়ি, খেড়িবাড়ি। ভিতর-এগিনার পেছনে পাছত-এগিনায় উত্তর ভিটেয় দুটো শোয়ার ঘর আর পশ্চিম ভিটেয় দুটো শোয়ার ঘর। এই পাছত এগিনাতেই দক্ষিণ ভিটেয় খড়ি ঘর, রান্নাঘর আর বাইরের উনুন। এই পাছত এগিনাতেও তো কুলোয় না, বুড়িমার বাড়িতে শোয়ার লোকজন এতই বেড়ে যায়। তাই পাছত এগিনার পেছনে নতুন এগিনা তৈরি হয়। সেখানেও উত্তর ভিটেও দক্ষিণ মুখো আর পশ্চিম ভিটে পুব মুখো চার চারটে শোয়ার ঘর আর দক্ষিণ দিকে খেড়ি বাড়ি। পাছত এগিনা আর নতুন এগিনার মাঝখানে একপাশে কাঁচা কুয়ো। তাতেও যখন কুলোয় না, তখন পাছত এগিনার পেছনে এক এগিনার দুই ভিটেয় চারটে শোয়ার ঘর তৈরি হয়। বাড়ি যদি পেছন দিকে বাড়তেই থাকে তাহলে জঙ্গল বাড়ি তো শোয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকবেই। জঙ্গল বাড়ি না-হয় কেটেকুটে পুড়িয়ে এগিনা বানানো যায়। এ যে আস্ত একটা ফরেস্ট। সেই বহর গাছটাকে দক্ষিণের ভিটেয় ফেলতে এই বহর এগিনাটা ডানদিকে কেতরে গেছে। তেমন কেতরানোর ফলে তো দিকও বদলে গেল। পশ্চিম মুখো বা উত্তরমুখো ঘরে তো আর কেউ শুতে পারে না। কেতরে যাওয়া এগিনায় পুবমুখো আর দক্ষিণমুখো শোয়ার ঘর দুটো ভিটেকে কেমন কোনাচে চেহারা দিয়েছে। সেই বহর গাছের ধাক্কাতেই বহর এগিনারও পেছনে যে খন্দক এগিনা তৈরি হল — তাও ডানদিকে আরও কেতরে গেল আর এগিনার মাঝখান দিয়ে ফরেস্টের পুরোনো বাতিল নালী চলে গেছে।" ৫৮ নালী যাওয়ার ফলে বর্ষাকালে জায়গাটা পিছল হয় তাই ওটার নাম মুখে মুখে পাছল এগিনা হয়ে গেছে। ঘর এগিনা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। ঘর না হলে এগিনা হয় না। তাই এগিনার জন্য ঘর তৈরি আবশ্যক। ঘরে থাকার মত আছেই বা কী। শোয়ার জন্য তো এগিনাই ভালো। এছাড়া এগিনায় ধান শুকোবে, পান শুকোবে গরু-বলদ একটু-আধটু ঘুরবে, কুকুরটা ছোটাছুটি করবে, তবে তো সেটা এগিনা। একটা মানুষের গোড়ালি থেকে চুল পর্যন্ত খোদিত হয়ে যাবে এমন একটা লম্বা চওড়া ঘর-ঘেরা, কলোবাড়ি, আমবাড়ি, গুয়াবাড়ি, ঘেরা জায়গা না হলে সেটা এগিনা হবে কি করে? এগিনায় ঘোরাফেরা করে কাজকর্ম করে যে নারীপুরুষ, তাদের দেহভঙ্গি ফুটে ওঠে এই এগিনারই প্রেক্ষাপটে। মাঠ থেকে পুরুষটি যখন এগিনায় ঢোকে "তার সারা শরীরে পেশি গুলো কেমন নেচে ওঠে, তার নেংটি পরা শরীরের পেশিগুলো। বা নারীটি যখন এগিনায় দাঁড়ায় বা এগিনা পার হয় তার শরীরের আশির নখ লাবণ্য উছলে ওঠে, আর ফোতার ওপর থেকে তার নিরাবরণ ঊর্দ্ধবুক, কাঁধ, গলার কম্বুরেখা, বাহুসন্ধির হাড়ের সজীবতা ঘাড়ের দৃঢ়তা, মেরু রেখার অবনয়ন আর ফোতার নীচে তার কর্মঠ পায়ের চারুতা তার পদক্ষেপ, এসবই আকার পায়, ভেঙে যায়, আবার নতুন আকারে জেগে ওঠে।" ৫৯

ঝুলে থাকা বানা যে কোন মুহূর্তে নামতে পারে ভেবে গোতের লোকজনের গোহালিয়া ঘররক্ষা, পাটাঘর রক্ষা ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত থাকাকালীন পরিশ্রমী ছোট বাপার ঘামঝরা শরীরের বর্ণনাও গোটা কুষিজীবি রাজবংশী সমাজের শ্রমক্লান্ত জীবনের ছবি।

"ছোটবাপা ঘামছিল দর দর করে। সে ছুটছিল আর তার মেরুদণ্ডের খাত দিয়ে জল বইছিল ঘাড়ের মধ্যবিন্দু থেকে। তার পিঠের দু'দিকের ওপরের পেশি থেকে ঘামের স্রোত সেই মেরুদণ্ডের খাতে এসে পড়ছিল, তার পাছার খাতের দু'দিকের পুষ্ট অথচ পৌঢ়ত্বে শিথিল পেশি ভিজে সপসপ চকচক করছিল আর সেখান থেকে ঘামের ধারা পাছার পেশির নীচের খাঁজ বেয়ে উরুর ভিতরে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। তার উরুর পেশিও পৌঢ়ত্বে শিথিল অথচ হাঁটুর ওপরে সেই পেশির খাঁজ স্পষ্ট দৌড়ানোর ফলে সেই খাঁজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই পেশির চাঞ্চল্যের দ্রুততায় ঐ শরীরের, ঐ শ্রম পুষ্ট শরীরের ভিতরে তাপ ঠিকরে বেরচ্ছে। ....প্রায় নির্লোমি শরীরে পেটের মাঝখানে গর্তের রোমরেখা ঘামে চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে গেছে।"৬০

সংসারে মেয়েদের অন্যতম প্রধান কাজ ধানভোখা, চাল-চিড়ে তৈরি করা। এখানে সে বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।

"শাল গাছের গোটা গুড়ি ওপর থেকে খুঁড়ে, বড় গর্ত বানিয়ে সাম-উরোন বানানো হয়। সেই গর্তের ভিতরে ধান ফেলে শাল গাছের একটা খুঁটি দিয়ে মেরে ধান বের করা হয়। সেই খুঁটির তলায় লোহার একটা আংটার ঘের থাকে, যাতে খুঁটি ফেটে না যায়। দুই পা ফাঁক করে, ফোতার উপরে মুক্ত কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসা দুই হাতে সাম জাপটে ধরে মাথার উপর তোলে মেয়েরা আর উরোনের ভেতর ফেলে। বস্তা বস্তা ধান এই পদ্ধতিতে, চাল বানানো হয়। চিড়েও বানানো হয়—তার জন্য কম উঁচু, কম গর্ত সাম-উরোন আছে।" ৬১ ধানভানার জন্য, চিড়ে কোটার জন্য, রাজবংশী সমাজে সাম-উরোনই ব্যবহার করা হয়। ঢেঁকির চল নেই। সাম উরোন কোন কোন অঞ্চলে সাম-গাইন নামে পরিচিত। এবং সেখানে সাম বলতে যাতে ধান রাখা হয় এবং গাইন বলে যা দিয়ে সামে রাখা ধান ভুখানো হয়। সাম উরোনের ঠিক উল্টো। 'একখান দশমুণ্ডের নাখান উরোনে একসঙ্গে তিনটা সাম আকাশ থেকে খোঁদলে পড়ে - কখনো বাঁ হাতে কখনো ডান হাতে। একটার ফাঁকে আর একটা, আর একটার ফাঁকে আর একটা।'

মেয়েদের ধান ভোখানোর মত পুরুষদের সারা বছরের প্রধান কাজ চাষবাস। এই চাষবাসের দৈনন্দিন ছবি বর্ণিত হয়েছে এভাবে — " শাওনের এই কুড়িদিন বাদ দিলে সারা বছরই তো বেটাছোয়ার ঘর সকাল

হওয়ার আগে মাঠে যায় আর বেলা ঠাকুর মাথার ওপর ওঠার আগে ফিরে এসে গা ধুয়ে খোকসা ভাত খেয়ে আবার ক্ষেতবাড়িতে যায় আর ফিরে আসে বেলা শেষ হওয়ার মুখে। ক্ষেতের আলে বসে চিড়া মুড়ি বা ভাত-জল খাবার রীতি নেই। গা ধোয়া নেই, হাত ধোয়া নেই, খাওয়া হলেই হল। তাই ক্ষেতবাড়ির মানষির জন্যে খোয়া পাঠানোর কোন ধকল নেই সারা বছর।" ৬২ মেয়েদের ধান ভোখানো, ছেলেদের চাষবাসের দৈনন্দিন ছাড়াও ভাত খাওয়া, খাওয়ার ভঙ্গি, হাটে যাওয়া, কেনা বেচা করা, কথাবার্তা, আনন্দ উৎসব, ব্রত পার্বণ, ধর্মীয় সংস্কার, ইত্যাদি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ধরা পড়েছে।

রাজবংশী সমাজের প্রধান খাদ্য ভাত। দু'বেলা এমনকি তিনবেলাও ভাত খাওয়ার রীতি এ সমাজে দেখা যায়। সারা দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় ভাত খাওয়ার ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে উপভোগ্য। ভাতের গন্ধ, ক্ষুধার তীব্রতা জাগিয়ে তোলে — শুধু তাই নয় সেই গন্ধ জীবনের নানা স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। ভাত খেতে বসে সারা দিনের কাজের সমীক্ষা, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি তৈরি হয়। তাই ভাত খাওয়া নিতান্ত ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যাপার শুধু নয়, সংসারের নানা সমস্যা নানা কর্ম পরিকল্পনার এক আদর্শ ক্ষেত্র।

"সন্ধে বেলার গরম ভাত খাওয়া রোজকার একটা নেশার মত—অন্তত প্রথম কয়েকটা মুঠো, যখন ভাতের ধোঁয়া থালা থেকে উঠে মুখ ঘামায়, তখন ভাতের দানা গুলো আলাদা করে চেনা যায় না আর খাউয়াইয়া যতটা পারে সেই উত্তাপ মুখের বিবর ভরিয়ে গলা দিয়ে শরীরের ভিতরে পাঠিয়ে দিতে চায়। শুধু উ-ম-উ-ম আওয়াজ। সেই প্রথম ক-মুঠোই ভাতের নেশা শরীরে চারিয়ে যায়, সদ্যসিদ্ধ, গরম ফেনে সিক্ত, টগবগে ভাতের নেশা।" ৬৩

"সকলেরই ভাত খাওয়ার ভঙ্গি একই রকম। ছোট একটা পিঁড়ির ওপর নেংটি পড়া পেছন। সেই পিঁড়ির সঙ্গে গোড়ালি লাগিয়ে দুটো হাঁটু খাড়া, সেই দুই খাঁড়া হাঁটুর মধ্যে মাথাটা নেমে এসেছে, দুই পায়ের পাতার মাঝখানে ভাতের থালা। ডান হাতটা হাঁটুর ভিতর দিয়ে থালায় আর বাঁ হাতটা হাঁটুর ওপর ঝোলে। যারা একটু খাটো তারা, মনে হয় থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। যারা একটু খাড়া তারা যেন এটা মেনে নিতে চাইছে না— ভাতের থালার সাথে মুখের দুরত্ব কেন থাকবে। ঘাড়টা দুই হাঁটুর মধ্যে এতই ঢুকে থাকে যে সে আবছায়ায়, বা কখনো একটু অন্ধকারেই, থালা থেকে ভাত তুলে মুখে ঢোকানো হচ্ছে, যে ডান হাতে, সেটাকে মুখ বিবরের সম্প্রসারণ মনে হতে পারে।"৬৪

ভাতের গন্ধের অনুষঙ্গ অনেক অতীত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। নতুন কোন পরিকল্পনা বা পরামর্শের

প্রেরণা হয়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠীর চলাফেরা, কথা বলা, বসা, খাওয়া, হাসা, দৌড়ানো, গল্পকরা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাদের নিজস্বতা লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে লেখক সেই সেই দিক গুলো অতি নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন।

বড় দাদার দৌড়ানোর ভঙ্গিটিও লক্ষ করার মত। "বড়দাদা দৌড়াচ্ছে, ঘামছে, হাঁপাচ্ছে। সে রোগা, লম্বা, গুয়াগাছের নাখান। তার গলাটা একটু বেশি লম্বা আর মাথার চুল একেবারে খুলি ঘেঁষে ছাঁটা। সে যখন দৌড়াচ্ছে, তখন যেন তার শরীরটা হাড়ে হাড়ে ধাক্কা লেগে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে যেতে চায়। সেই ভাঙন ঠেকিয়ে শরীরটা সোজাই আছে ও শরীরটাকে সোজা রাখতে রাখতেই ছোটে।" ৬৫

দৌড়ানোর ভঙ্গির মত হাঁটারও একটা নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। "তাদের জেঠাদাদার দু'পাশে তারা দু'জন হেঁটে চলে খঞ্জন আর ফড়িঙ্গা। খঞ্জনের বাঁ হাতে লাঠি, তার মাথা ছাড়িয়ে যায়। ফড়িঙ্গাও বাঁ হাতে লাঠিই নিয়েছিল, সেটা জেঠাদাদার ডান পায়ে লেগে যায় দেখে ডান হাতে নিয়েছে। তার লাঠি তার মাথার তুলনায় একটু বেশি লম্বা। দু'জনের পরনেই নেংটি, জেঠাদাদার নেংটি আলগা পত পত করে, তার পাছার গোল দুটো শুকিয়ে গেছে, চামড়াটা খসখসে, নেংটির দড়িটা কোমর থেকে অনেক নীচে নেমে গেছে। খঞ্জন আর ফরিঙ্গার তরুণ পাছার গোল দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, তাদের পা ফেলার ছন্দে। তাদের নেংটি শক্ত করে বাঁধা। তারা গ্রাম দেবতা গারাম-এর দিকে যাচ্ছে।" ৬৬

তাদের হাঁটে যাওয়ারও একটা নিজস্ব ধরন আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুড়িমার গোতের মানুষেরা গুহাপথে ধূপগুড়ি হাটে যাচ্ছে। যাত্রাপথে তাদের পোশাক-আশাক, পদক্ষেপ লক্ষ করার মতো—

"বাঙ্কুরাম আগে আগে যাচ্ছে। সে একটা খাটো ধুতি কাছা টেনে পড়েছে। কাছাটা সরু, তাই ধূতিটা হাঁটুর ওপর উরুর সঙ্গে লেপটে থাকে। গায়ে কিছু নেই, গামছা গলায় ঘের দিয়ে সামনে ফেলা। বাঙ্কুরাম খাটো শক্ত। যে যতটা খাটো তার কাঁধ সে তুলনায় অনেক চওড়া আর পায়ের বাটি দৃঢ়। তার পেছনেই ছোটদাদা। বাঙ্কুরামকে যদি দেখতে হত কে কে আসছে, তাহলে পেছনে তাকিয়েও, সে দেখতে পেত না। ছোটদাদার পেছনে নদিনী-অগুনের বৌ, বড় চিলার মা।"৬৭

নদী পার হওয়ার সময় জলে হেঁটে চলার আর এক রূপ দেখা যায় —

"জল পেরবার জন্যে দুই হাত আর পায়ের আক্ষেপে তারাও নিজেদের শরীরকে এই জলের মতই বহতা করে তোলে। পেশিময় পুরুষ শরীর গুলি আর অসমতল নারী শরীর গুলি জলের সঙ্গে খেলাতেও মাতে ।

কেউ একটু ভেসে যায়, কেউ স্রোতের একটু উল্টোদিকে যায়, কেউ বা স্রোতকে উছলে যেতে দেয় নিজেদের শরীরে। জলও যেন শরীরে পৌরুষ বা নারীত্ব বুঝে পুরুষ বা নারী হয়ে ওঠে। কেউ মাথা ডোবায় না— মাথাতেই তো কাপড় পেঁচানো। দুইহাত যেন সাঁতার কাটে না, পরস্পরের দিকে প্রসারিত হয়ে সমবেত এক নৃত্যের আবর্ত তৈরী করে তোলে। ফোতা আর নেংটি এই মানুষ জনের অনিবার্য পোশাক - তেমন পোশাক ছাড়া এই বনপথ, জলপথ, গিরিপথে শরীর মেলানো যায় না।" ৬৮

বন-নদী-মেঠো পথ অতিক্রমের সময় ওদের কোন আরষ্টতা ছিল না। কিন্তু ধূপগুড়ি হাটে আসার জন্য পাকা রাস্তায় উঠে গাড়ি চলাচল, লোকজনের ভিড়ে ওদের হাঁটার গতি ও ধরন একেবারে পাল্টে যায়।

অমনি এরা আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে জড়ো হয়ে গেছে। শাদুরী নদিনীর গায়ে হাত রাখছে। নদিনী আলগোছে বড় চিলার হাত ধরে আছে। বড়চিলা দোলানের পিঠে অকারণে হাত রেখেছে। পেছন থেকে ধাক্কা খেলে যেমন সামনের লোকের পিঠে হাত চলে যায়, ধানরাম আর বাঙ্কুরাম পাশাপাশি হাটে, ধানরাম সামনে না তাকিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

রাজবংশী সমাজের দৈনন্দিনে চাষবাস, খাওয়াপরার মতো হাট একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন যে হাট বসে তাতে কৃষি বা অন্যান্য পণ্য কেনাবেচা ছাড়াও গ্রামের মানুষরা সেখানে প্রতিদিনের কাজের এক ঘেয়েমি থেকে বিশ্রাম নেয়। বহু মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা হয়। আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর নেয়া হয়। রাজনৈতিক দাবি দাওয়া, প্রচার, মিটিং করে প্রয়োজনীয় কথা শোনানো, লেভি, খাজনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে জানাজানি হাটের মধ্যেই হয়। বুড়িমার গোতের লোকজন ধূপগুড়ির হাটে গিয়ে কেনাবেচার সঙ্গে লেভি সমস্যার সমাধান ও পরবর্তী সরকার বদলের প্রেরণা নিয়ে এসেছে।

হাট সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে, "হাটে তো যেতেই হয়-হাটে না গেলে মানুষজনের চলবে কী করে। হাটেই তো সবার সঙ্গে সবার দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়। সবাই সব জায়গার খোঁজ খবর পায়। ..... সেই মন কাঁদার খবর - সেই মেয়ের কাছে পৌঁছবে কী করে যদি হাটে যাওয়া না যায়? "

শুধু বড়রাই যে হাটে যায় তা নয়, মেয়ে বৌ, ছেলে-ছোকরারাও হাটে যায়। " হাটই হচ্ছে চ্যাংড়াদের বড় হওয়ার, শেয়ানা হওয়ার, জোয়ান হওয়ার প্রতিষ্ঠান।" ৬৯

এই হাট সম্পর্কে কত ছিলকা শোনা যায়—' কয় হাটের ছোয়াই, বাপক কয় বেয়াই'- কত গান শোনা যায়

— 'বাপো গেইসে হাট, মাও গেইসে হাট / মাও আনিবে মোলার নাড়ু, বাপ আনিবে খাট/ ঐ খাটত চরি যাম বিন্দাবনের হাট।' কিংবা — "হাটের মধ্যে বাউরিয়ার হাট, ভোটের মধ্যে পাসি/ সেই মতন দেখুঁ দাদা চেংড়ি মাইয়ার হাসি। / চেংড়ি মাইয়ার হাসি রে মোর টিয়া পাখির রাও/ অ্যানং জুড়াচ্ছে দাদা, ঘোর টেনাটার গাও।" ৭০

ঝুলে থাকা বানা আসছে ভেবে সাম-উরোন সামলানোর সময় বাড়ির মেয়েরা হাসাহাসি করে, সে হাসিরও একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে।

"কলকলী শনিয়াকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, হাসিবার ধইচে দেখোকেনে, ঝ্যান বানা আসিবার আগতই শ্বশুরবাড়ি যাবে। 'অতি বিয়াত্তির না হয় বিয়া, অতি ছোয়াত্তির না হয় ছোয়া।' শনিয়া নেকিকে ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে, ' মুই হাসো নাইরো, মুই হাসো নাই। এই মোটার ঘরখান হাসিবার ধরিছে।' শনিয়া আরও হেসে নেকীর ঘেমো পিঠে নিজের ঘেমো মুখ লুকানোর ভান করে।" ৭১

ভাদ্র মাসের তারা ভরা আকাশ। বুড়িমাকে নিরাপদ স্থানে ঢুকিয়ে দিয়ে এবার বাড়ির লোকের প্রতীক্ষা বানার জন্য। সবার জানা হয়ে গেছে, সন্ধ্যার মধ্যে যখন বানা এল না তখন সারা রাত জাগতে হবে। সেই একটি প্রতীক্ষার সন্ধ্যা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে বিশ্রামেরও একটি নিজস্ব ভঙ্গি লক্ষ করা যায়।

"খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ভাদুরা গরমে ভাতের গন্ধ কাটে না। বরং এগিনাতে লেগে থাকে। পার কুমলাইয়ের মেয়ে বলে যার নাম কুমালী, তার নাকে নোলক, তার শাশুড়ি জুলনী, একটা ধোকরা পেতেছিল গোলা ঘরের দাওয়ার নীচে। সেই ধোকরায় কুমালীও বসে ছিল। দাওয়ায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে, তার সেই ছড়ানো পায়ে, উরুতে ও নীচ কোলে পাঁচ খানা বাচ্চা শুয়েছিল, যাদের কারোর পরনে নেংটি নেই ও যাদের মধ্যে দু'জন এখনও বুকের দুধ ছাড়েনি। সেই দু'জনের একজন নিজের বুড়ো আঙুল চুষছিল, আর একজন নিজের নীচের ঠোঁট চুষছিল। তাতে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার আওয়াজ উঠছিল। যারা এখনও বুকের দুধ ছাড়েনি তারা নিজেদের মায়ের বুকে পিঠে বুকনিতে ঝুলছিল।" ৭২

এমন অবসন্ন প্রতীক্ষার রাতে স্বাভাবিক ভাবে কুমালীর কৈশোরের স্মৃতি মনে আসে। উত্তর স্রোতা কুমলাইয়ের জলে কুমালীর মা তাকে স্নান করাচ্ছিল। রসাল বুনো কচি জাম্বুরার মত তার স্তন দুটি। 'উতরা কুমলাইয়ের জল/তিস্তা বুড়ির মাটি মিশল/মোর মাই মোক সিনান করিবার ধরে।' এগিনার ভিতরের কোনো একদল কিশোরী আপনমনে খেলতে থাকে ' নোকটুরে নটুয়া...।'

প্রশ্ন করার ভঙ্গি ও উত্তর দেওয়ার ভঙ্গির মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য রাজবংশী সমাজে লক্ষ করা যায়। লেভির খবর নেওয়ার জন্য অগুন একটা প্রশ্ন করে, তার জন্য অনেকক্ষণ ধরে প্রস্তুতি চলে। গরম ভাত খেতে বসে ভাতের পাঁজার ওপর থেকে প্যালকাশাক একবার ডানে একবার বাঁ-য়ে রেখে একদলা ভাত মুখে তোলে। এরই মধ্যে থালায় ফের ভাত পড়ে। এবার গরম ভাত এক মুঠো হাতে তুলে নিতে নিতে থালার দিকে তাকিয়ে অগুন বলে ' কায়ও কুছু শুনেছেন লেভির বাদে?' ' প্রশ্ন করা হয় ও প্রশ্নটা ঝুলে থাকে। খাওয়ার মধ্যে এখনও উত্তর দেওয়ার ফাঁক তৈরী হয়নি। একটু পড়ে দোলান বলে 'লেভির বাদে। বড় চিলাক ছোটু মিয়া কহিছেন ময়নাতলির হাটত' — উত্তরটা সম্পূর্ণ নয়। হয়তো দোলান ওই টুকু জানে। এর মধ্যে বাড়ির ছেলে মেয়েদের হৈচৈ, বৌয়েদের কথাবার্তা নানা প্রসঙ্গ আসে। প্রশ্ন-উত্তর ওভাবেই ঝুলে থাকে।

"অগুন এতক্ষণ পরে ঝোলা কথার খেই ধরে, বড় চিলা গেছিল ময়নাতলির হাটত। উমরাক ডাকি - ছোটুমিয়া পুছিছে, তোমরালার ঘর লেভি দিবেন কি না দিবেন। বড় চিলা হাটত ফিরি কহিলো। তা ছোটু মিয়া তো আনসান কথার মানষি না, উমরায় পুছিল বড় চিলাক। তোমোরাঁ কায় কিছু শুনিছেন লেভির বাদে?"৭৩ — এ থেকে বোঝা যায় বড় চিলা মারফৎ উপরোক্ত কথা টুকুই অগুনের কাছে এসেছে। তাহলে এই কথা অগুন শুরুতেই বলতে পারত, প্রশ্ন করার কি দরকার ছিল। আসলে প্রশ্ন করে নিজের জানাটা জানিয়ে দিতেই চেয়েছে অগুন, অন্যের জানা জানার জন্য নয়। এও একটা রাজবংশী ধরন।

কৃষিই রাজবংশী সমাজের প্রধান জীবিকা হলেও আরও নানা রকম পেশার লোকও দেখা যায়। ঘাটোয়ালের গল্প প্রসঙ্গে সেইসব লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে —

"যেমন কলো বেচা থেকে—সে শুধু কলাই বিক্রি করে। যেমন পান বেচা থাকে—সে শুধু পান বিক্রি করে হাটে হাটে। যেমন শুটকা বেচা থাকে—সে শুধু শুটকি মাছই বেচে হাটে হাটে। যেমন কাপড়িয়া থাকে—সে শুধু কাপড় বিক্রি করে, সব হাটে নয়, যে সব হাটে কাপড় যারা কেনে তারা আসে, সেই সব হাটে। ..... যেমন মরুচ বেচা থাকে সে শুকনো লঙ্কার পাঁজা নিয়ে সেই সব হাটে বা চা বাগানের মদেশিয়ারা বেশি আসে, তারা ঝাল খায় বেশি, এদেশীয়দের মধ্যে এমন বোকা আর কে হবে যে মিষ্টি না খেয়ে ঝাল খাবে। যেমন বাঁশিয়াল থাকে, সে বাঁশি বাজায়। যেমন, গীতাল থাকে যে গান বানায়। যেমন গাছোয়াল থাকে যে গাছে চড়ে, যেমন গুয়ামানষি থাকে যে সুপারি গাছে চড়ে। .....যেমন নারকেলুয়া আছে, যে নারকেল গাছে চড়ে শুকনো ডাল ভেঙে দেয়, পিঁপড়ের বাসা ঝেড়ে দেয় আর নারকেল পেড়ে দেয়, ...যেমন ঢোলুয়া আছে বড়

বড় হাটে ঢোল বাজিয়ে তারা অনেক কিছু বলে। ময়না গুড়ি হাটে একবার এক ভ্যানিসুয়া এসেছিল— সে অন্যের পকেটে রুমাল গুজে পরে সেটা ভ্যানিস করে নিত, দুটো একটা হাটের পর সে ভ্যানিস হয়ে গেল।"

৭৪

নানা রকম ব্রত পার্বণ উদযাপন রাজবংশী জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কৃষি প্রধান রাজবংশী সমাজে গরুকে দেবতা হিসাবেই মান্য করা হয়। কার্তিক সংক্রান্তিতে তাই পালিত হয় গরুচুমানি। "সকাল বেলায় বড়চিলা, ছোটদাদা, কলিন, বুনুয়া— ছেলেরা সকলে মিলে গরু গুলিকে ডোবায় নামায়। জলে গরু গুলো ভেসে চলে, দেখতে দেখতে ডোবাটা গরু বলদে ভরে যায়।" ৭৫

গরুকে স্নান করানো হয়ে গেলে সব গরু গুলোকে লাইন করে রাখা হয়। "মেয়েরা আবার উলু দিয়ে এগিয়ে আসে। দু'একজনের হাতে মাটির থালার ওপরে পান, গুয়া, কাঁচা হলুদ বাটা, তেল সিঁদুর, ধানদুর্বা। ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির বৌরা-মেয়েরা গরুর শিঙে, কপালে, ক্ষুরে এই সব লাগিয়ে দেবে। রাখাল ছাড়া তো আর গরু হয় না। গরুচুমানি মানে রাখোয়ালচুমানি ব্রত। এই ব্রত অনুযায়ী যে যার স্বামীকে রাখাল হিসাবে ঐ সব মাখিয়ে রাখোয়ালচুমানি করে। .....ব্রতের শুরুতে বাড়ির সবচেয়ে বুড়ি বৌ সবচেয়ে বুড়ি গাই বা বলদকে চুমানি দেয়। তারপর বাড়ির সবচেয়ে ছোট রাখোয়াল, সে যদি কোলের বাচ্চাও হয়, তাকে চুমানি দেয়। তারপর বাড়ির সবচেয়ে নতুন বৌ সবচেয়ে নতুন গাইকে বা বলদকে চুমানি দেয়, আর বাড়ির সবচেয়ে পুরানো রাখোয়ালকে চুমানি দেয়, সে যদি গলগলা বুড়া হয়, তাকেই।"৭৬ গরু চুমানি ছাড়া আর একটি ব্রত একই সঙ্গে পালিত হয় — বাখর খাওয়ানো। গরুকে খাওয়ানোর প্রতিদিনের জাবের সঙ্গে লাউ ও পেঁয়াজ কেটে, অনেক সময় তাতে একটু গুড় মিশিয়ে বাখর তৈরি করা হয়। গরু চুমানির পর বাখর খাওয়ানো ব্রতেরই একটা অঙ্গ। গরুচুমানি ব্রতের দিন শিকারে যাওয়াও রাজবংশীদের আরএকটি পালনীয় বিধি। কোন কোন অঞ্চলে শিকারে গিয়ে বরা (শুয়োর) শিকার করে আনে।

জন্ম-মৃত্যু - সংস্কারের নিখুঁত ছবিও উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

বুড়িমার গোতে, রাজবংশী সমাজে সন্তান ধারন, প্রসব হওয়ায় বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে—

"সেই যখন বোঝা গেল বর্ষা শেষ হয়ে ফিরে এল আর ফিরে এসে শেষ হচ্ছে না, যখন বোঝা গেল এক অঘ্রায়নের ধান মাঠে দাঁড়িয়ে পচে গেল আর কত ভাদই বা হেউতি ছিটনো গেল না, রোয়াগাড়াও হল না, তখন থেকেই বুড়িমার গাওয়ের বৌরা পেটেলী হতে শুরু করেছিল। .....একদিন দেখা গেল দুখারু-টুলটুলির

বড় বেটা শানুর বড় বেটা দেরুর বৌ ডাউকী পেটেলী হয়ে ঘুরছে। আর একদিন দেখা গেল ভাসার বৌ চোপীও পেটেলী হয়েছে। কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতেই ভাদইয়ের বৌ পেটেলী হয়ে গেল। কে কে পেটেলি হয়েছে সে কথা মনে রাখতে রাখতেই সানঝুর বৌ পেটেলী হয়ে বেরয়।"৭৭

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয়ে ওঠা বৌরা যথা সময়ে একে একে প্রসব করাও শুরু করল।

"ঠিক হিশেব করে বলা যাবে না, কবে থেকে সেই বর্ষায় এই বৌরা প্রসব শুরু করল। তখন ক্ষেতবাড়ি জল বাড়ি হয়ে গেছে। হালের মাথায় মরচে ধরেছে। তার মধ্যে ডাউকীর ব্যথা উঠলো। ক্ষেতবাড়ি, ঘরবাড়ি কাজ কিছু না থাকায় ডাউকীও মনের সুখে ব্যথা দিতে লাগল, ব্যথা চাপতেও থাকলো। .....সোন্দনীও সেই রাত দিনের বর্ষার মধ্যে যেন ডাউকীর প্রসব যত বেশি দিন ধরে করানো যায়, ততই বেশি দিন ধরে করাচ্ছিল। তবে সব প্রসব ব্যথা খাওয়ানোরই তো একটা শেষ আছে। ডাউকীর ছেলে হল। ডাউকীর ছেলে হওয়া শেষ হতে না হতেই চোপীর ব্যথা শুরু হল। সোন্দনী চোপীকে বলল, ' অত আলসিয়া করি খালাস হওয়া না যায়। খাট কেনে খাট' চোপী বলে কি খাটিম? কোটত খাটিম? চারি পুখে তো জল।' সোন্দনী বলে 'তোর প্যাটের জলতও তো ডিম পাড়িছে।' তবে চোপী বিশেষ ঝামেলা করেনি। সে একে বারেই প্রসব ব্যথা তুলে ছেলে বের করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার পেটেলী হল।"৭৮

জন্মের মত মৃত্যুও বুড়িমার গোতে এক স্বাভাবিক ও নিয়মিত ঘটনা। তবে জন্মের মত মৃত্যু তো অত ঘন ঘন আসে না। এবং মৃত্যু নিয়ে অত মাথা ব্যথা নেই কারও।

"বুড়িমার বাড়িতে কে কেন মরল এটা কখনও কেউ জানতে চাইত না তখন, সেই যখন সোন্দনীর স্বামী মারা গিয়েছিল। মানষি আর বেটিছোয়ারা বুড়ো হয়ে গেলে আধবসাহয়, আধবসা থেকে শোয়াবসা হয়, শোয়া বসা থেকে একদিন মরে যায়। এগুলো তো বসা মরা। মানষি বুড়ো হলে কাজ থেকে বসে যায় আর কাজ থেকে বসে গেলে মরে যায়। বুড়ো না হলেও মানুষ মারা যায় কত রকম ভাবে— কারও পেট ফুলে দম আটকে যায়, কারও মাথার গোলমাল হয়ে শ্বাস আটকে যায়, কারো সারা শরীরে ঘা বেড়িয়ে দম আটকে যায়। আবার 'বান' মেরেও দেয় কেউ। কখনো কখনো হঠাৎ হঠাৎ এক আধজন মরে যায় বটে তবে সাধারণত বুড়িমার বাড়ির মত এতবড় বাড়িতে এত মানুষ জনের মধ্যে সবাই টের পেয়ে যায় একজন মরণের দিকে চলে যাচ্ছে। তখন তাকে আর কেউ সংসারের কাজে ডাকে না। মানষিটা নিজেকে নিয়েই তখন এত জড়িয়ে থাকে যে তাকে আর সংসারে কেউ জড়াতে চায় না। আর মরণের দিকে চলে যাচ্ছে যে মরণের মানুষ, তাকে তো

কেউ কিছু করতে পারে না। ..... মানুষ যখন মরণের দিকে চলে গেছে তখন আর বুড়িমার বাড়িতে কেউ তাকে ঠেকনো দিত না। তেমন ঠেকনো যে আছে তা জানতও না।" ৭৯

এভাবেই একদিন বুড়িমার গোতের ঢেমনা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তামাক ক্ষেতে কাজ করতে করতেই ক্ষেতের পাশে পাঁজা করে রাখা পাটকাঠির দঙ্গলে শুয়ে মারা যায়। তিন চারদিন পরে আকাশে শকুন দেখে তার খোঁজ পড়ে। তার মুখাগ্নি করে বড়বাপা, ছোটদাদার আগের বাপের ছেলে।

জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি ইত্যাদি যেমন গোতের লোকের স্বাভাবিক জীবন যাপনের সঙ্গে যুক্ত তেমনি প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয় যেমন খরা, বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা ইত্যাদিও স্বাভাবিক ঘটনা। বুড়িমার গোত তথা রাজবংশী জীবনে তাই এ সবের প্রভাবও প্রচুর।

"তিনবর্ষা বৃষ্টি নাই। রাত্রিভর বৃষ্টির জল সকালে ক্ষেত থেকে বের করে দেয়ার এমনই অভ্যাস যে বৃষ্টি যে শেষ পর্যন্ত হল না তা বুঝতে বুঝতেই পুবের বাতাস ফিরে যায় আর পাহাড় থেকে বাতাস এসে গায়ে কাঁটা জাগিয়ে দেয়। .....হিম শিশিরে যে মাটির শপশপ থাকার কথা, স্যাও হাল দিয়ে মাটিতে ওস খোয়াবার কথা, সেই মাটি সরু-মোটা এত ফাটলে ফাটা ও জাজ যেন মনে হয় এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পিঁপড়ে ওই ফাটল দিয়ে উঠে আসছে। প্রায় সব ধান তুষ হয়ে গেছে।"৮০

তবু চাষির একটু আশা সব শিসের ভেতর সব সময় তুষ থাকে না। কিছু যদি ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া, "আরও আরও একটা কারণ এক পৌরাণিক অভ্যাস, হালুয়া নিজে তার নির্ধারিত কাজ থেকে নিবৃত্ত হবে না, তাকে রোয়াগাড়ার সময় রোয়া গাড়তেই হবে, তাকে ক্ষেত নিড়ানোর সময় নিড়তেই হবে।"৮১

খরার সময় বুঝে শুনে চাষীকে ধান খরচ করতে হয়। কারণ ওই খরা কতদিন চলবে তা তো জানা নেই। 'এই খরার পাকে পরা বুড়িমার গোতে দু'দুটো বছর এই টাড়িতে কোনো নতুন বাচ্চার কান্না ওঠেনি।'

কারণ —" ধান ভেজানো বাতাস, ধান সেদ্ধর ধোঁয়া আর ধান ভুখাবার ধুলো শ্বাসের সঙ্গে যার ভেতরে যায়নি, তার পেটে ছোয়া আসে কোত্থেকে।"৮২ খরার মতো বর্ষার পাকেও পড়েছে বুড়িমার গোত। 'কোন কোন সময় এমন আসে যখন বর্ষার হিশেব দিয়ে আর বছরের হিশেব মেলানো যায় না। পাছত বর্ষা বললে যে যে বর্ষা ফেলে আসা হল সেটাই বোঝাবে তা হয় না। কারণ, সেই আগের বছরের বর্ষা, হয়তো তখনও চলছেই, তখনও শেষ হয়নি।' এই লাগাতার বর্ষায় সব হিশেব গোলমাল হয়ে যায়। "সেই বৃষ্টি কোথায় কবে, কখন ধরবে তার আভাস নেয়াও যখন অভ্যাসের বাইরে চলে গেল, তখন পরের ফলনের হিশেব, বর্ষার

হিশেব, বছরের হিশেবও গোলমাল হয়ে গেল। " ৮৩

খরা ও বর্ষার মত একবার শীত এসে আর যেতে চাইছিল না বুড়িমার গাঁও থেকে। "..... একবার নাকী শীত আর শেষ হয়নি, শেষই হয়নি, এখনো শেষ হয়নি। সে নাকী একবছর, দু'বছর ধরে শীত চলছে তো চলছেই, চলছে তো চলছেই। শীত যদি শেষই না হয় তাহলে বছর এক গেল, বছর দুই গেল বোঝা গেল কী করে? .....শীতের নিয়মটাই এই যত থাকে, তত বাড়ে। তাই শীত যত চলছিল, তত বাড়ছিল।"৮৪ এমন শীত হাঁস, কবুতর, গরু, বাছুর সব কাতর হয়ে পড়েছিল— নিজেদের আবাস ছেড়ে কেউ বেরত না। আর মানুষ গুলো " 'পারো', পুইয়ে শীতের প্রথম রাত তো সবাই কাটায়। যাদের মাঝ রাতেও শীত ধরে তারা এসে মাঝরাতেও 'পারো' পোয়ায়। সেবার শীত নাকী এমনই হয়েছিল যে দুই সারি আগুনের মাঝখানে মানুষ লাইন বেঁধে বসে থাকতো। ফরেস্টের বাঘ গুলো তো আগুন দেখে ভয় পায়, সেই দুই-তিন বছর জোড়া শীতে বাঘগুলোর নাকী আগুনের ভয় কেটে গিয়েছিল। তারাও এসে নাকী সেই দুই সারি আগুনের মধ্যে মানুষের সঙ্গে বসে বা শুয়ে আগুন পোয়াত। তখন থেকেই তো কথা থেকে গেছে— সেবারের ঠাণ্ডায় বাঘের আগুনের ভয় কেটে গেল।" ৮৫

এই সব ঋতু বিপর্যয় বুড়িমার গোতে চাষবাসে বদল নিয়ে এল। পূর্ববঙ্গাগত ভাটিয়াদের কাছে — ওরা শিখল 'জলচাষ', ভাটিয়া চাষ। ব্লক অফিস থেকে শিখল হাইইল্ড ধানের চাষ। উঁচু ডাঙ্গা জমিতে টমেটো, আলু, বেগুন চাষ শুরু হলো। কোথাও সরিষা চাষও হলো। গতানুগতিক চাষবাস থেকে ওরা বেরিয়ে এলো।

মহাকাব্যে যেমন হয়, এক একটা কাহিনি বলা হয়, আর সেই প্রসঙ্গে কখনও কখনও এক একটা উপদেশ, নীতিকথা, তত্ত্ব মেশানো হয়। দেবেশ রায়ের তিস্তাপুরাণে সে রকম তত্ত্ব কথার সন্ধান মেলে বহু স্থানে। যেন লেখক কিছুক্ষণের জন্য গল্পটা থামিয়ে দিয়ে তত্ত্ব কথাগুলো সেরে নেন। অথবা কথা বলতে বলতে মাঝখানে কোন তত্ত্বের অবতারণা করেন। পাঠকও মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শোনে। অপেক্ষা করে পরবর্তী গল্প বা কথার জন্য। যেমন 'পরজন্ম থেকে' অধ্যায়ে একই গল্প সময়ের ব্যবধানে ও পাত্রের ব্যবধানে নতুন নতুন আকার ধারণ করে। নতুন সোলংগার জন্য নতুন গাছ খোঁজার গল্প, ঘাটোয়ালের বুড়ো বয়সের গল্প। অথচ নতুন গাছ খোঁজার গল্প বলতে গিয়ে পুরনো সোলংগার নদী খোঁজার গল্প শুরু হয়ে গেল, তবে শেষ হলো না। এমনতর হওয়ার কারন বলতেই এসে পড়ল সময়ের তত্ত্ব।

"সময় হল তোমার দরকার মত একটা হিসেব। সে তুমি যদি সময় দিয়ে পাটা ওজন করতে চাও, তাহলে

সময়টাকে সেই মত বদলে বদলে নিতে হবে। তুমি যদি তোমার বড় নাতির প্রথম হাল ধরা থেকে একটা বৃত্তান্ত বের করতে চাও, তা হলে কাঁচা বাঁশ গাছ থেকে কঞ্চি পাতা ডাল কেটে ছেঁটে যেমন ধোয়া পাটা ঝোলাবার বাঁশ বানাতে হয়, তেমনি তোমার বড় নাতির প্রথম হাল ধরা থেকে কত সব ঘটনা তোমাকে কাটছাঁট করতে হবে। সময় মানে কোন মাপ নয়— অন্ততঃ বুড়িমার এই গাওটায়, সাত গোতের এই ভিটায়, দশনদী-বিশনদীর এই দেশে, ছয় হাট, দুই ঝারের এই পৃথিবীতে। সময় মানে তুমি মাটির তলায় কী গেড়ে রেখেছ তার জন্যে অপেক্ষা। যে সব গল্পে ইহজন্ম-পরজন্ম সব একাকার হয়ে যায় সে সব গল্পে সময়ের কোনো পরম্পরা থাকে না, যেন, একের পরে দুই সব সময় আসে না, যেন সব বছর জেঠাইয়ের পর আষোঢ় আসে না যেন, গরমের পর বৃষ্টি হবেই - এমন কথা নেই। " ৮৬

বৃহস্পতিবারে ঠিক হয়েছিল বুড়িমার গোত ধূপগুড়ির শনিবারের হাটে যাবে। শুক্রবার টাকু পাইকারকে এ কথাটা ধানরাম জানিয়েছে কিনা কে জানে। কারণ সবাই এখন ক্ষেতবাড়ির কাজে ব্যস্ত। এক এক জন এক একটা কাজ খুঁজে করে, শেষ হয়। কাজের এই বের হওয়া ও শেষ হওয়া প্রসঙ্গে এক তত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে। " কাজ বের করাই প্রধান কাজ। বের করা মানেই কাজ হয়ে যাওয়া। শুধু সময় মত কাজটা চোখে পড়েনি বলে কত ছোট ক্ষতি থেকে বড় সর্বনাশ পর্যন্ত হয়ে যায়।"৮৭ — কাজ সম্পর্কে এমন এক সর্বজনীন তত্ত্ব— শুধু বুড়িমার গোতের মানুষের জন্য নয়—সবার জন্য—চিরকালীন।

'সময়' অধ্যায়ে ঝুলে থাকা বানার নেমে আসা প্রসঙ্গে - লেখক সময়ের কথা তুলেছেন। তিনি সময় ও টাইম দুটোকে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'টাইম হল দশটা পাঁচটার হিশেব। যেমন —অফিস খোলার টাইম থাকে, অফিস বন্ধের টাইম থাকে, ইশকুল বসার টাইম থাকে, ইশকুল ওঠার টাইম থাকে। এমন টাইমের হিশেব দিয়ে কি আর সময় মাপা যায়, এমন সময়, যা চলছে তো চলছেই, যার ভিতর কখনো মানুষ ঢুকছে, কখনো মানুষ সে সময় থেকে খসে যাচ্ছে। জন্ম জন্মান্তরের হিশেবের কোনো টাইম নেই।"৮৮

'ধূপগুড়ি হাট' অধ্যায়ে বুড়িমার গোতের লোকজন ধূপগুড়ি হাটে আসার জন্য বনপথ, নদী পথ পেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় উঠেছে। পিচ ঢালা রাস্তায় হাটতে হাটতে কেন যেন তারা দলা পাকিয়ে যায় - সাবলিল ভাবে হাটতে পারে না। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন — "এ বোধহয় গ্রামের মানুষের শহরে এসে পড়ার বিহ্বলতা নয়। এ বোধহয় গ্রাম-নগরের কোন দ্বন্দ্বও নয়। এ বোধহয় উৎপাদন আর পণ্য, বা বিনিময় আর বাণিজ্য, বা কৃষি আর শিল্পের ভিতরের কোনো বিরোধও নয়। এ হয়তো সভ্যতারই মৌলিক বিহ্বলতা।" ৮৯

এ বিহ্বলতা সহজে উৎপাদিত হবার নয়। গল্পের শেষে শহর থেকে দশনদী-বিশনদী দূরের গ্রামে নাগরিক ছোঁয়ায় উৎপাদিত হলেও লেখকের কথায় ' তখনো অন্যত্র চারানো থাকবে।'

'মিরাকল' অধ্যায়ে বুড়িমাকে এক মিরাকল হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক কিছু শাশ্বত কথা বলেছেন —

"প্রতিদিনের বেঁচে থাকার জন্যে, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার মধ্যেই হয়তো মানুষের এক অদৃশ্যের বড় দরকার। সে অদৃশ্য কখনো কখনো অশ্রুতও বটে। স্পর্শাতীতও বটে। তবে মানুষ সেই সেই অশ্রোতব্যতা ও অস্পর্শনীয়তা অতিক্রম করতে চায়। আর আশ্চর্য, দৃশ্যতাও অতিক্রম করতে চায়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ দেখছে এমন কিছুকে মানুষ অদৃশ্য কিছুতে বদলে নেয়। অথচ সেই পরিবর্তন থেকে সে আবার কিছু শুনতে চায়, সে আবার কিছুর স্পর্শ চায়। মিরাকল ছাড়া মানুষ বাঁচে না।" ৯০

মানুষ তার বাঁচার প্রয়োজনেই শ্রোতব্য, দৃশ্য কিছুর মধ্যেই অশ্রোতব্য, অদৃশ্য কিছু যা অলৌকিকও বলা যেতে পারে, তা আরোপ করে।

'কথোয়াল' অধ্যায়ে কাছুয়া মোহম্মদ ঘোষণা করে যে সে আর ডাঙ্গির মাঠের ধানের ভাগ নেবে না — কারণ ওটা খাশ জমি। পাঁচ কম কুড়ি বছর আগেই তা খাশ হয়ে ছিল। তখন সে সেকথা জানায়নি। আজ পনের বছর পর সেই ঘোষণা কী অর্থ বহন করে! কথা যথা সময়ে না বললে যে তা ক্রমশঃ জটিল আকার নিতে পারে সে প্রসঙ্গে এক কথার তত্ত্ব লেখক উপস্থাপন করেছেন। কখনো কথাকে বৃক্ষ বলা হয়েছে।

"কথা তো স্যালায় একখান গোটা বৃক্ষ। যতখান সময় ফেলি রাখিবেন, ততখান সময় মাথা তুলিবে, পা চালাবে, ডালপালা মেলিবে, শ্বাস দিবে, শ্বাস নিবে, ছায়া দিবে, রোদ দিবে। কথা তো কহি দিবার নয় । কথা তো গাড়ি রাখিবার, বৃক্ষের নাখান গাড়ি রাখিবার।" ৯১

'গোত্রনারী' অধ্যায়ে গোত্রনারী বুড়িমার জন্ম জন্মান্তর ধরে বেঁচে থাকা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক জন্মান্তর সম্পর্কে - এক তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছেন— "জন্মান্তর যা ঘটে সে তো জন্মেরই ভিতর। জন্মও যে চলতে থাকে সেও তো জন্মান্তরেরই সঙ্গে সঙ্গে।" ৯২

'মানুষের একটা আত্মপরিচয় না থাকলে মানুষ জন্মান্তর ধরে বাঁচবে কী করে।' বুড়িমার গোতের মানুষদের বিশেষত যারা বয়সে ছোট তাদের বাঁচার, জন্মান্তর ধরে বাঁচার উপায় বলতে গিয়ে উক্ত মন্তব্যটি লেখক করেছেন। এই আত্মপরিচয় জমির দাগ নম্বর দিয়ে হয় না, পঞ্চায়েতের সীমানা দিয়েও হয় না। এর জন্য চাই

গোতের পরিচয়।

'যাত্রা' অধ্যায়ে বুড়িমা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে গোতের লোকেরা তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়ার পথে যাত্রা করে হাতিকে সেবা দিতে। যাত্রার উদ্দেশ্য জানা থাকলেও পথ জানা নেই। এই যাত্রা ও ফিরে আসা প্রসঙ্গেই লেখকের এক চিরন্তন উক্তি—

"প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোনো যাত্রার শেষ নেই, সব যাত্রাই প্রত্যাবর্তনের দিকে যাত্রা। নিজের অক্ষদণ্ড ঘিরে প্রত্যাবর্তনের দিকে যাত্রা।" ৯৩

এত বয়সী এত বিস্তৃত একটা গোত তাতে রাজনীতি আসবে না তা হতে পারে না। জীবনের স্বাভাবিক ছন্দেই রাজনীতিও বুড়িমার গোতে ঢুকে পড়েছে। ৬৪, ৬৫, ৬৬ সালে খরার বছরের আগে থেকে প্রথম ৬৭-তে, দ্বিতীয় ৬৯-তে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার। মাঝে ৬৮-তে বড় বানা, তারপর ৭৭-তে এ বামফ্রন্টের শাসনকাল পর্যন্ত উপন্যাসের ঘটনাকালের বিস্তার। এরমধ্যে কংগ্রেস সরকার আমলের খরার কথা আছে। খরার কবলে পতিত বুড়িমার গোত তথা উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ওপর লেভি চাপানোর কথা আছে। লেভি যাতে না দিতে হয় সেজন্য ধূপগুড়িহাটের গদিয়ালের গদিতে বিভিন্ন অঞ্চলের জোতদাররা মিটিং করলেও গদিয়াল লেভির এজেন্টের চক্রান্তে বিডিও সাহেব এসে সবাইকে লেভি দেওয়ার পরামর্শই দেন। বুড়িমার গোতও সেই মত লেভি দিতে বাধ্য হয়। এমনকি লেভি দিতে গিয়ে এজেন্ট গদিয়ালের ফাঁদে পড়ে।

উত্তরবঙ্গে জোতদারি প্রথার রেশ তখনও চলছে। শশঙ্গি জোতদার, ছোটুমিয়া, ভোলারাম জোতদার, মোটাশিলা জোতদার, নাউধিয়া জোতদার, টাকু পাইকার, কাছুয়া মহম্মদ, গান্ধারু জোতদার, দিনু মাষ্টার, হরিবোল জোতদার প্রমুখদের উপস্থিতিতে লেভি সম্পর্কে আলোচনা হয় গদিয়ালের গদিতে। বেনামীতে খাশ জমি লুকিয়ে রাখা, আধিয়ার উচ্ছেদের মতো কিছু কথা উপন্যাসে উল্লেখ থাকলেও এদের ভয়ঙ্কর রকমের শোষক মূর্ত্তি আঁকা হয়নি। বরং লেখক জোতদার আধিয়ার সম্পর্ক বুঝিয়েছেন এভাবে— "জোতদার আধিয়ার একই সঙ্গে বাঘ-সাপ-হাতি-বন্যা-শীতে নিজেরা বেঁচেছে, মরেছে, জমির ফলন বাঁচিয়েছে আবার বাঁচাতে পারেনিও হয়তো। জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স - কৃষিতে সরকারী ব্যবস্থায় এসেছে বড়জোর সোয়া'শ বছর । তাই এখানকার জোতদারও নিজেকে 'হালুয়া' বলে বা এখানকার হালুয়াকে তার বৌ ভালোবাসার ঠাট্টায় 'রে দেউনিয়া' বলে ডাকে। এই প্রায় নির্বাক রাজবংশী কৃষকের মজ্জায় এক স্বাধীনতার পরাক্রান্তবোধ মিশে আছে। সে বোধ কারো কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে যেতে দেয় না।"৯৪

ধূপগুড়িহাটে একদিকে জোতদারদের লেভির মিটিং চললেও এবং মিটিংয়ে লেভি দেওয়ার সপক্ষে সিদ্ধান্ত হলেও ঐ হাটেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল লেভি বিরোধী শ্লোগান ও মিটিং করে। বিশেষত বাংলা কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টিকে এই আন্দোলনে দেখা যায়। কমিউনিস্টরা শ্লোগান দেয় 'লেভি নোটিশ-নাহি চলে গা, নাহি চলে গা।' লুকিয়ে রাখা খাশ জমি বের করারও দাবি জানায়, 'ছুপা খাশ জমি বাহার করো, বাহার করো।' ' আধিয়ারের লেভি নাই, লেভি নাই। বাধ্য হয়ে বুড়িমার গোত লেভি দিয়ে দিলেও এই সব মিটিং ও শ্লোগান তাদের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তোলে। 'দে দে সরকারক পাল্টি দে' মনোভাব তৈরি হওয়ার ফল হল ৬৭ সালে সরকার বদল, প্রথম অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা।

১৯৬৮-তে জলপাইগুড়ির বড় বন্যা। ৬৯-এ ফের ভোট। পুনরায় আরও বেশি ক্ষমতা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসা। এবার শুরু হয় খাশ জমি দখল, বেনামী জমি উদ্ধার, ভূমিহীন কৃষকদের খাশ জমি বন্টন, আধিয়ারি পাট্টাবিলি ইত্যাদির কাজ। সেই সুবাদে ধরনী জোতদারনীর জমি দখল করতে চায় তারই এক আধিয়ার, শিলিগুড়ি থেকে আসা এক আত্মীয়ের পরামর্শে। জোতদারনীর প্রতিরোধে ও বুড়িমার গোতের লোকেরা তাদের নিজেদের জমি দখল হয়েছে ভেবে দলবল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ায়, সেই আধিয়ার দখলের চেষ্টা থেকে বিরত হয়। দলহীন ঝাণ্ডা দখল নিতে পারে না। আধিয়ার হার মানে।

কিন্তু আধিয়ারের এই হার ছোটদাদার মনে ভাবান্তর আনে। এই লালঝাণ্ডা, এই দখল তাকে ভাবায়। একদিন পাছাড়াঙ্গায় হাল সেরে তার মনে হয়, ' মুই আছো তো ক্ষেতবাড়ি আছো, হাল আছো, ফলন আছো। মুই না তো ক্ষেতবাড়ি নাই, ফলন নাই, হাল নাই। মোর এই হাল খান আর আকাশের মেঘখানের মধ্যি খানত কোটত আছে জোতদার? জোতদার কায় হয়? কায় জোতদার?' নিজের শ্রমের মূল্য, অধিকার সম্পর্কে ছোটদাদা সচেতন হতে থাকে। জোতদার যে বিনাশ্রমেই জমির ফসল ভোগ করে এ প্রশ্ন ছোটদাদার মনে উঁকি দেয়।

দলগাঁও চা-বাগানে গিয়ে ছোটদাদা স্বচক্ষে চা বাগানের পতিত জমি দখলরত কৃষকদের ভূমিকর্ষণ দেখে। প্রত্যেকের হালের মাথায় লালঝাণ্ডা লাগানো। এখানে শ্রমিক নেতা কাপুর কালী কমরেড ও কৃষক নেতা হরিমোহনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়। কালী কমরেড ছোটদাদাকে বোঝায় সে যেন তার নিজের গ্রামে, পাশের গ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষজনের কাছে জোতদারের বিরুদ্ধে ' সারা বছর চাষ করো অথচ সারা বছরের খাওয়ার ধান পাও না। করজা ধানের সুদ দিতে তোমার ভাগ খালি হয়ে যায়।' এই সব অত্যাচারের কথা

বলাবলি করে। কাপুরের গান, কথা, কালী কমরেডের কথা, ছোটদাদাকে ভাবায়—

'মুই না খাউয়াইয়া না হই, মুই ধান করজা নেয়ার আধিয়ার না হই, মোর কুনো জোতদার নাই, মুইও জোতদার না হই, মুই কার নখত লড়াই করিম।' বরং তার বিশ্বাস চা বাগানের দখলই জমিতে জোতদারি হবে। 'বাবু এইটে তো এ্যালায় জোতদারি হবে', তার ধারণা—'আধিছাড়া হাল নাই'।

কিন্তু কমরেডরা তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করে, তার ভেতর বঞ্চনা, ক্ষোভ তৈরি করার চেষ্টা করে — অধিকার অর্জনের দাবিতে লড়াকু কমরেড বানানোর চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফল লক্ষ করা যায়— 'জন্মান্তর' অধ্যায়ের শেষে ছোটদাদা ডাঙ্গির মাঠের জমি যা কাছুয়া মহম্মদের খাশ জমি দখল করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেজন্য লালঝাণ্ডা দরকার। চা-বাগানের জমি দখলকারী চাষীদের বাড়িতেও যায় কিন্তু ঝান্ডা না পেয়ে ওকসি পাতার ঘর বানিয়ে জমি দখল নিতে চায়।

ডাঙ্গির মাঠের এক টুকরো জমি দখল নেওয়ার সময় অগুনদের সঙ্গে আলাপে তাকে আধি জমি দিতে চাওয়া হলে সে বলে, ' তোমরা তো দিবারই পারেন। মোর আপন জমি মোকই বানিবার লাগিবে'। সে আধি চায় না। জমির পুরোপুরি অধিকার চায়। ঝাণ্ডাহীন এক দখল সে রাখতে পারেনি জোতদারনীর আধিয়ারের মত। অগুনদের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাকে নির্বাসনে যেতে হয়।

লেখক দেখিয়েছেন চা বাগানের পতিত জমি কিন্তু সমবেত প্রয়াসে দখলে আসে। ঝাণ্ডা, শ্লোগান, একতা দখল নিতে সাহায্য করে। এমনকি এফিডেবিট করে ভিক্টোর ঘারোয়া ওরাওঁ শাম্মী কাপুর হলে বাগানের বাবুরা আপত্তি করেও ব্যর্থ হয়েছে—একতার জোরে।

৬৭ ও ৬৯ -র যুক্তফ্রন্ট সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো অপারেশন বর্গা। 'অপারেশন বর্গা' অধ্যায়ে এ ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। অপারেশন বর্গার বাধা এসেছিল আধিয়ার ও জোতদার উভয় দিক থেকেই। আধিয়ার চাইল না আধিয়ার লিস্টে তাদের নাম নথিভুক্ত করাতে, বর্গাদার হিসাবে নিজের নাম রেকর্ড করাতে। ''সরকার কি মোকে জমি দিবে আধিকরিবার তানে? স্যালায় মুই কেনে লিখিদিম—মুই এই জমিখানর আধিয়ার?'' ৯৫ আবার 'জোতদারের ভয়—একবার রেকর্ড হয়ে গেলে আধিয়ারকে সে শাসাতেও পারে না, উচ্ছেদও নিতে পারবে না। আধিয়ার মালিক হয়ে যাবে।'

এরকম এক পরিস্থিতিতে সরকারকে অপারেশন বর্গায় নামতে হল। তবে '৮০ থেকে জলপাইগুড়ির চাষে আবার সুদিন ফিরে এসেছে। জোতদার আধিয়ার দুইয়ের ঘরেই একটু ধান ও পয়সা এসেছে। খাবার ধানের

জন্যে আধিয়ার কে জোতদারের কাছে হাত পাততে হয় না। এবার আধিয়াররা ভাবতে শুরু করেছে—' সরকার কী রেকর্ড করিবার কহছে? দে, করি দে রেকর্ড আধিখান।'

শশঙ্গী জোতদার চায় সাকোয়াঝারের জমির আধিয়ার হিসেবে দুদুয়ার ভাটিয়াদের নাম রেকর্ড করাতে। তাতে রাজবংশী আধিয়াররা ক্ষেপে উঠল। সমাধান করল ভাটিয়ারাই—নাম রেকর্ড থেকে বিরত থেকে।

সরকার পরিবর্তনের সুফল শুধু বর্গারেকর্ড বা অপারেশন বর্গা, খাশ জমি উদ্ধার ইত্যাদি কাজেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামগঞ্জ গুলিতে নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তা পাকা করা, চাষে আধুনিকীকরণ, আইআরএইট, তাই চুং ইত্যাদি হাইইল্ড ধানের চাষ জলসেচের জন্য সেলো পাম্প, এক একটি বড় জোত ভেঙে অল্প জমিতে অধিকবার, অধিকফসল শুরু হল। বুড়িমার গোতের লোকেরা এই ব্যবস্থা মেনে নিল। গ্রামস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে দেবার লক্ষে বুড়িমার গ্রামেও 'বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়' স্থাপিত হল। ভ্যানে করে ছাত্রছাত্রী এল। শাড়ি পড়া দিদিমণি এলো। সেই দিদিমণিকে দেখে বুড়িমার গোতের মেয়েরা, পরে বৌয়েরা শাড়ি পরা শিখল। কৃষিনির্ভর বুড়িমার গোত নতুন কৃষি ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হল, শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবর্তন সূচিত হল।

'শেষ' অধ্যায়ে বুড়িমার, বিসর্জন। বুড়িমা যার অমরতা এতদিন পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে তাকেও তো একসময় চলে যেতে হবে। যে গোত্রনারী বানা ঝোলা দেখে, হাতির ডুবে যাওয়া দেখে তার অলৌকিক শক্তিতে বাস্তবে পরিবর্তন আসে, কালের নিয়মে তাকেও একবার বিসর্জনে চলে যেতে হয়। এই বির্সজনের ভার পড়ে একজন প্রকৃত সর্বহারার ওপর—যার জোত নেই, গোত নেই, জন্ম পরিচয় নেই, যে জোতদার নয়, আধিয়ার নয় — শুধু শ্রমসর্বস্ব এক সর্বরিক্ত মানুষ। তার হাত দিয়েই বুড়িমার বিসর্জন হবে - বুড়িমার নির্দেশেই।

এখানে লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও গভীর জীবনদৃষ্টি পরিস্ফুট হয়েছে। বামপন্থী সরকারের ভূমিনীতি, জোতদারি বিলোপ, খাশজমি উদ্ধার, অপারেশন বর্গা ইত্যাদি কাজের ফলে যে উন্নয়ন যেখানে বিঘা প্রতি ১৫/২০ মন ধান ফলে সেখানে মানুষের আর অভাব নেই। কিন্তু লেখক এই উন্নয়নকেও যথার্থ উন্নয়ন বলতে চাননি। এ ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন। এতে ধান বিক্রি করে টাকা আসবে কিন্তু মানুষের প্রকৃত ক্ষুধা মিটবে না। তাই ছোটদাদা জোত-জমির অধিকার পেয়েও ক্ষুধার দিকেই চলে যায়। ফিরবে সেদিন, যেদিন পাহাড়ে ঝুলে থাকা বানা নামবে, যে দিন নদী খোঁজা মানষি ফিরে আসবে আর ডুবে যাওয়া হাতি পাখা মেলে উড়বে, সেদিন

'মানষির হাতের ফলন মানষির পেটের ক্ষিধার মুখত নিগিবার তানে ফিরবে। ফিরবে যে নদী পথে গেছে সেই নদী পথেই নদী ধরে ধরে।

লেখকের কমিউনিস্ট বিশ্বাস এখানে পৌরাণিক বিশ্বাসে রূপ নেয়। কমিউনিজমের উৎপাদন বন্টনের সাধারণ নিয়মেও মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই। তবে মানুষের ক্ষুধা একদিন মিটবে। তাতে কয়েকজন্ম অপেক্ষা করতে হতে পারে। সেই পৌরাণিক পথ বড়বাঁক, কুলজুয়া,দুদুয়া গরাতি, নোমাই, গোলুন্দি, আংরাভাসা— গোলন্দি, নোমাই, গরাতি, দুদুয়া, কুলজুয়া হয়ে বড়বাঁক।

চরিত্র ঃ ছোটদাদা

তিস্তাপুরাণের একটি বিশিষ্ট চরিত্র ছোটদাদা। উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে তার উপস্থিতি। গোতহীন, জোতহীন, জারুয়া, ঢেমনাপুত্র ছোটদাদা যথার্থ অর্থেই সর্বহারা। তার একটা নাম পর্যন্ত নেই। ছোটদাদার মা অগুনের দিদি, ধাপগঞ্জে যার বিয়ে হয়েছিল, কোন কারণে বুড়িমার গোতে ফিরে আসে এবং ঢেমনার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়, সেই ছোটদাদা। ধাপগঞ্জের স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বড়দাদা। বড়দাদার একমায়ের পেটের সন্তান বলে ছোটদাদা।

ঢেমনা, বুড়িমার গোতের কেউ নয়। কোন এক নিশিডাকা মানুষ বুড়িমার গোতে এসে আর ফিরে যায়নি, থেকেই গেছে। তারই সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে অগুনের ধাপগঞ্জের দিদির। তারই পেটে ছোটদাদার জন্ম। বুড়িমার গোতের সঙ্গে ছোটদাদার যে ক্ষীণ সম্পর্ক তা ঐ মায়ের সূত্রে।

এই ছোটদাদা ক্রমে উপন্যাসের অন্যতম নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাকেই পাঠানো হয়েছে ধূপগুড়ি ব্লক অফিসে লেভির খবর আনার জন্য। গরুচুমানির দিন অসতর্কভাবে হলেও তারই কপালে গোত্রপ্রধানা বুড়িমা তিলক পরিয়ে দিয়েছে। তাকেই ডেকে বুড়িমা অর্পণ করেছে তার বিসর্জনের ভার। এই অবস্থায় পৌঁছতে তাকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হতে হয়েছে। একটি জোতদার শাসিত পরিবেশে, কোন জোতদারের বাড়িতে, ঢেমনা, ছোটদাদা, ছোটদাদার মা'র মতো নরনারী শুধু খেয়ে পরে কাটিয়ে দেয়। এদের পৃথক কোন অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেই না। ছোটদাদার মধ্যেও প্রথম দিকে সেরকমই স্বাতন্ত্র্য হীনতা লক্ষ করা যায়। সে যে ধূপগুড়ি ব্লক অফিসে লেভির খবর আনতে গেছে তা বুড়িমার গোতের নিজস্ব লোক নয় বলে। একটু আলগা ভাবে খবর নিয়ে আসা।

পাছাডাঙ্গায় বর্ষার নতুন জলে সে প্রায় সারাদিন চাষ করেছে। ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরে কোন অধিকার নিয়ে

খাবার চাইতে পারেনি। একটু আলগা ভাবেই, কাউকে নির্দিষ্ট না করে 'খোয়া দিবেন কায়' বলে হেঁকেছে। অবশ্য এই সংকোচকে লেখক রাজবংশী সমাজেরই 'নীরবতা চর্চ্চার সমবায়িক অভ্যাস' বলেছেন।

দলগাঁও চা বাগানের পতিত জমি দখল দেখতে গিয়ে চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা, কাপুর কালী কমরেড এবং কৃষক নেতা হরিমোহন এর সঙ্গে ছোটদাদার আলাপ হলে এবং তারা তাকে অধিকার সচেতন প্রকৃত জমির মালিক তৈরি করতে চাইলে প্রথমে তার অর্থ সে বোঝেনি। তার পুরনো অবস্থাই তার কাছে সঠিক অবস্থা—এরকমই প্রতিক্রিয়া জানায়। চা বাগানের জমি দখলকে বড়জোর সে আধি বোঝে। ' জমি যদি বাগানই আধি দিয়ে থাকে, ওই বাবুকে, আর ওই বাবুই যদি ওদের আধি দিয়ে থাকে তাহলে এত ঝাণ্ডা ঝুণ্ডি পাট্টি পুট্টি কেন'? কাপুর, ছোটদাদাকে কিষাণ কমরেড বলে সম্বোধন করে কিষাণ মজদুর একাই গড়ে তুলতে বলে এবং পুঁজিবাদ সম্পর্কে অবহিত করে। "ই দুনিয়াকো দুশমন হ্যায় মালিক লোক, পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ নাহি মাংতা, কিষাণ মজদুর কো জানে, মজদুর কিষাণ কো জানে। ই হামারা বাগানকো মালিক, ঔর তোমরা মনকো ক্ষেতি জমিকো মালিক, সব হ্যায় পুঁজিবাদ। কিষাণ ঔর মজদুর কো একাই হোনেসে পুঁজিবাদ খতম হো যায়গা।"৯৬ পুঁজিবাদ সারা জীবন শ্রমিক কৃষককে আলাদা করে রেখেছে, তাদের এক হওয়া দরকার কাপুর এই শিক্ষাই দেয় ছোটদাদাকে। সংগ্রামের গানও শোনায় ' হাম ভুগসে মরণে ওয়ালে'— কিন্তু তবুও ছোটদাদা বলে 'মোর তো কুনো লড়াই নাই। কার নখত লড়াই করিম? কী লড়াই করিম?' কাপুর ছোট দাদাকে যে জায়গাটাতে নিয়ে যেতে চাইছে সেখানে কিছুতেই নিতে পারছে না, কিছুতেই বোঝাতে পারছে না - সে বঞ্চিত, শোষিত। এবার কালী কমরেড ছোটদাদাকে বোঝাতে লেগে যায়। কালী কমরেড জোতদারি শোষণের কথা বলে। তাকে আধিয়ার জোতদার সুদের কথা বলে।

কিন্তু ছোটদাদা জানায় যে তাকে জমি চাষ করে কাউকে কোন সুদ দিতে হয় না। "মুই না খাওয়াইয়া না হই, মুই ধান করজা নেওয়ার আধিয়ার না হই, মোর কুনো জোতদার নাই, মুই জোতদার না হই, মুই কার নখত লড়াই করিম?"৯৭

ছোটদাদার লড়াইটা ঠিক কার বিরুদ্ধে বুঝে উঠতে পারেনা। বরং সে জানে আধি ছাড়া চাষ নাই। কিন্তু কালী কমরেড তাকে পুরাচাষ পুরা জমির তত্ত্ব বোঝায়। সেই বুঝ নিয়ে সে গোতে ফেরে। কালী কমরেড, হরিমোহন কাপুরদের কথা গুলো তার মনে গেঁথে যায়। সে ভেতর থেকে প্রস্তুত হতে থাকে।

শিকার শেষে ঘরে ফেরার সময় একান্তেই সেই কথা গুলি প্রশ্নের আকার নেয়। "মোর কেনে ধান কাটা

থাকিবে। মোর কেনে ক্ষেতবাড়ি থাকিবে? মুই কার এই ক্ষেতবাড়ির, মুই কায় হম এই ধান কাটার? ছোটদাদার অনন্য নির্ভর স্বয়ম্ভরতা চুর চুর ভেঙে পড়ছিল।" ৯৮

ছোটদাদার মনে পড়ছিল কাছুয়া মহম্মদের ডাঙ্গির মাঠের জমির কথা। সে জমি খাশ হওয়া সত্ত্বেও বুড়িমার গোতে আধিয়ারী রেখে কাছুয়া মহম্মদ তা এতদিন ভোগ করে চলছিল। ছোটদাদার মনে যা এতদিন প্রশ্ন ছিল, আজ তা হ্যাঁ বোধক ভাবনায় আকার পায়। সে বলে — 'এই জমিখান এই ডাঙ্গির মাঠখান খুলা পড়ি আছে। দখল নিম'।

এতদিন যে ডাঙ্গির মাঠ কাছুয়া মহম্মদ মিছা করে রেখে ভোগ করছিল, ছোটদাদা তাকে তাকে সাচ্চা বানাতে চায়। "মোর কি কুনো গোত আছে? মোর গোতও নাই, জোতও নাই। মোর একখান সাচা আছে। মুই নিজে সাচা হম। মুই ডাঙ্গির মাঠটাক সাচা বানাম।"৯৯

যে ছোটদাদার মনে এতোদিন কোন অধিকার সচেতনতা ছিল না, সত্য মিথ্যা ধারণা ছিল না, বঞ্চনা কাকে বলে জানত না। তার মনে আজ ডাঙ্গির মাঠ সাচা করার, দখল করার ইচ্ছা জেগেছে।

ক্রমশ সে ইচ্ছা প্রবলতর হলে দখল সফল করতে হাল, ঝাণ্ডা জোগাড় করার জন্য চা বাগানের দিকে যায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। তখন একা একাই জমির ওপর ওকসি পাতার ঘর বানিয়ে দখল ঘোষণা করে। কিন্তু গোতের লোকেরা তার দখল অস্বীকার করে, তাকে তাড়া করে ; পাঠিয়ে দেয় নির্বাসনে।

ছোটদাদা বুঝতে পারে ঝাণ্ডাহীন, দলহীন, হালহীন দখল সফল হয়না। যে শিক্ষা সে কালী কমরেডদের কাছ থেকে পেয়েছে তার পুরোপুরি প্রয়োগ সে করতে পারেনি। তাই এই ব্যর্থতা।

"ছোটদাদা স্বাধীন হতে চেয়েছিল। কোন অধীনতা থেকে স্বাধীন তা জানে না.....ছোটদাদা জানে না স্বাধীন হওয়ার পরের ক্ষিধে কী করে মেটানো যায়। .....সে এমন একা দখল ঘোষণা করে দিয়েছে যা আধি থেকে ছাড় নয়, রোজগিরি থেকে ছাড় নয় অথচ সে দখলের পরও ক্ষিদে তেষ্টা পায়।"১০০ অর্থাৎ এই দখল শুধুই দখল। দখল করে স্বাধীন হয়ে, স্বাধীন উপার্জনের ব্যবস্থা এতে নেই। 'এতে আত্ম প্রতিষ্ঠার বাসনা আছে, চেষ্টা আছে কিন্তু সফলতা নাই।'

তাই একক প্রচেষ্টার দখল বুড়িমার গোতের সমবেত আক্রমণের কাছে মাথা তুলতে পারে না। তাকে পালিয়ে যেতে হয় — নির্বাসনে।

সে নির্বাসনে গিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ইউ পি, পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, আসাম, বাংলার বর্ধমান,

নদীয়া বিভিন্ন জায়গায় ঘোরে। দেখে নতুন চাষবাস, নতুন নামের ধান, রাসায়নিক সার, অধিক ফলন। উন্নয়ন। কিন্তু এ অভিজ্ঞতাও হয় — তার মত মানুষের বউ ছেলে পুলে নিয়ে মাসিক আয় দু'হাজার টাকা। 'খোয়া আছে , অসুখ আছে, রেলের টিকিট আছে, কামের তিন চারিমাসে দেখিবেন হাতত আর অ্যানং টাকা নাই যে অকাজের চারি মাস পারি দিবেন।'

প্রায় ত্রিশ বছর বাইরে কাটিয়ে সে এই অভিজ্ঞতা গুলো সঞ্চয় করে। সে বার্নেশের হাতি ডোবা হয়ে গোতে ফেরে। দেখে এখানেও উন্নয়নের ঢেউ। পঞ্চায়েতের রাস্তা, হাইইল্ড ধানের চাষ, পাম্পের জল, বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাড়ি পরা মেয়ে বউ। কিন্তু এসব কিছু যেন তাকে উৎসাহিত করতে পারেনা। কারণ এসব তো তার চেনা।

এবার বুড়িমার গোতের বিসারুরা তাকে স্বেচ্ছায় ডাঙ্গির মাঠের অধিকার দিতে চায়।

বিসারু যে এখন গোত্রপুরুষ, বুড়িমার পরেই যার স্থান। সে ছোটদাদাকে লক্ষ করে বলে - "তো মুই কহো কি—ঢেমনাক মোর জোয়াই বলি স্বীকার করিবার লাগে। ঢেমনা ঢেমনা না হয়। মোর বুড়িমার গোতের এক বিয়াতী মাইয়ার বিয়ার পরের ভালবাসার মানষি। আর মোর ছোটদাদা ঢেমনা বেটা না হয়, জারুয়া না হয়, গোতছুট না হয়। মোর বেটির ঘরের ছোয়া, ছোটদাদা। .....ছোটদাদা মোর গোতের মানষি।..... তোমরাক সগাক কহি, হামরালা ডাঙ্গির মাঠের ঢেমনার ক্ষেতবাড়িখান ছোটদাদার নামে লিখি দেই। মোর গোতের মানষি হইয়া ছোটদাদা এইটে জোত বানাউক।" ১০১

এভাবে ছোটদাদা তার অধিকার ফিরে পায়—পায় স্বীকৃতি। কিন্তু — সে নইদারিঘরে বড় দাদার পাশে শুয়ে স্বপ্ন দেখে — প্রতিধ্বনিতে শুনতে পায় ছোটদাদা। "এক খান বেলায় তোর জোত হইল। তোর গোত হইল। অ্যালায় তুই জোতদার গোতদার হবু?.....আবার শোনে ছোটদাদা তোর জোত নাইরে, তোর গোত নাই। তুই চলি যা, তুই চুলি যা। ঢেমনার বেটা, জারুয়া, বনুয়া, তোর নি-জোতে, নি-গোতে চলি যা। সেইটে তোর তোক নাখান মানষি থিক্যা আলগ করি চিনা না যায়। সেই সব পৃথিবীর ভিতরত চলি যা, চলি যা। মানষির ক্ষিধার পাকে চলি যা।"১০২ যখন নদী খোঁজা মানুষ ফিরবে, ডুবে যাওয়া হাতি পাখা মেলে উড়বে তখন সেদিন যেন সে ফিরে আসে—অর্থাৎ সত্যকে জানা হবে, পুরাণ বাস্তব রূপে দেখা দেবে তখন যেন সে ফেরে ' মানষির হাতের ফলন মানষির পেটের ক্ষিধার মুখত নিগিবার তানে।' ক্ষুধার নেতৃত্ব দেবার জন্য।

ছোটদাদা এও শুনতে পেয়েছিল যে এক মনের জায়গায় বিশমন ধান হচ্ছে, 'এতখান ফসল মানষির

ক্ষিধার তানে না, টাকার তানে।' আধুনিক চাষবাস, পরিবর্তন ক্ষিধার তানে না, টাকার তানে। 'ফলনে মানষির ক্ষিদা মেটে নাই। বরং অর্থের আকাঙ্খা বেড়েছে'।

মার্কসবাদে বিশ্বাসী লেখক এই পরিবর্তনকে ধনতান্ত্রিক পরিবর্তন রূপে দেখেছেন। অধিক ফলন হলেই শুধু চলবে না—চাই সুষম বন্টন। তা না হলে অধিক ফলনেও মানুষের ক্ষুধা মিটবে না। মানুষ অধিক ফসল বিক্রি করে অর্থোপার্জন করবে। টাকা জমাবে। তাই ছোটদাদাকে পাঠিয়ে দিতে চান ক্ষিধার দিকে। মানুষের ক্ষেতের ফলন মানুষের মুখে তুলে দিতে সে আবার ফিরে আসবে। আসবেই বলে লেখক বিশ্বাস করেন। তাতে তিন চার মানব জন্ম লাগলে লাগবে। ঝটিতি কোন বিপ্লব বা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নয়, তিন চার জন্মের পৌরাণিক পথে সেই শুভক্ষণের আসার ইঙ্গিত দিয়ে লেখক উপন্যাস শেষ করেছেন।

বুড়িমার কি হল! বুড়িমা গমনোন্মুখ ছোটদাদাকে ডেকে বলল—'মোক নিগি যা পিঠত বুকুনি বান্ধি। তিস্তার জলত মোর বিসর্জন দে। মোক তিস্তাত ভাসি দে।'

গোত্র প্রধান গোত্রনারী প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক বুড়িমার প্রস্থানের সময়কাল উপস্থিত। বানাঝোলা দেখা, হাতি ডোবা দেখা, এরকম অজানা, অদৃশ্য অনাগত কালকে দেখা বুড়িমার বিদায় নিয়ে নতুনের হাতে নতুন ব্যবস্থা আনয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে। এক পুরাণ শেষ হয়, আর এক পুরাণ শুরু হয়। যে নদী পথ ধরে বুড়িমাকে বিসর্জনের নিয়ে যাওয়া হয়, সেই নদীপথে ছোটদাদা ফিরবে তিন চার মানব জন্ম পর ক্ষেতের ফলন পেটের ক্ষিধের কাছে তুলতে তুলতে। লেখক আগামী নতুন পৃথিবীর ভার দিয়েছেন এই ছোটদাদার হাতেই।

চরিত্র ঃ বুড়িমা

বুড়িমা তিস্তাপুরাণ-র কেন্দ্রিয় চরিত্র। তাঁর বেঁচে থাকা ও অলৌকিকত্ব নিয়ে উপন্যাসের বিস্তার। তিস্তাপুরাণ একটি আধুনিক পুরাণ। এর ঘটনাবলি আধুনিক। -এর ভাষা আধুনিক। সামাজিকতা, অর্থনীতি আধুনিক। কিন্তু এই আধুনিকতার ভেতর যে পুরাণ, চোরাস্রোতের মতো উপন্যাস খানিকে পুষ্ট করেছে এবং যা মূলত ঘটেছে যাকে কেন্দ্র করে সেই হল বুড়িমা। বুড়িমার বেঁচে থাকা, চলন-বলন, ক্রিয়াকাণ্ড উপন্যাসে এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যা তিস্তাপুরাণের পৌরাণিক আবহ তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতেই বুড়িমাকে দেখানো হয়েছে এক অথর্ব, অতি বয়সী, নিষ্কর্মা, বৃদ্ধা। এককালে সবার খেয়াল সেই রাখত এখন আর কারও খেয়াল রাখে না। এমন ভাবে থাকে যে বাড়িতে যে বুড়িমা আছে তার আলাদা করে কারও খেয়াল থাকে না। 'তার মানে যে বুড়িমা সবার বে খেয়ালে চলে গেছে, তা নয়। খেয়ালেরও

তো একটা ভিতর আছে। সেই ভিতরেরও একটা ভিতর আছে। তারও কোন ভিতর আছে।' বুড়িমা চলে গেছে সেখানে। তাই বুড়িমা টাড়ি বাড়ির — "এই বেটা-বৌ-নাতি-নাতনি-নাতবৌ-নাতজামাই-পুতি, পোতাবৌ, পোতজামাই-বেয়াইয়ের নাতিপুতি—এই জঙ্গলবাড়ি, জলবাড়ি, হাটবাড়ি, রাস্তাবাড়ি, চরবাড়ি, মেঘবাড়ি এই সব কিছুরই মধ্যে মিশে আছে। মিশে আছে, মিশে বেঁচে আছে।" ১০৩

'একেক সময় মনে হয় বুড়িমা সারাটা জীবন একই সঙ্গে বাঁচছে।' বাড়ির কারও জানাই নেই যে বুড়িমার চোখ আছে কিনা, চোখে দেখতে পায় কিনা। এগিনার বাচ্চা প্রহরায় বুড়িমার বদলে কুকুর ভেউলা বেশি বিশ্বাস যোগ্য। বুড়িমা যেন সিন্‌ঝা কাঠির ঠাকুর, কিছু না দেখলেও, কিছু না করলেও যেন সবই সে দেখে, শোনে। বুড়িমার জীবনটা তো উত্তরের ওই পাহাড়ের মতো— গোটাটাই একটা জীবন। কী করে কবে এরকম একটা বিশাল জীবন হয়েছে তা হিসেব করে বলা যায় না। 'বুড়িমার জীবনকেও গোটা একটা নদীও বলা যায়।'

এই বুড়িমা একদিন হারিয়ে যায়। খোঁজার ধুম পড়ে যায়। অবশেষে বড়চিলার বড়ছেলে বড় মুতুরার বৌ, কান্টি, সানঝুর বড় ছেলের ঘরের ঝাঁপের আঁড়াল থেকে বুড়িমাকে বের করে। 'এক ভাদ্রের প্রথম দু-চার দিনের দুপুর নাগাদ, বুড়িমা পাছত-এগিনায় দুখারুর ভিটের সামনে গড়িয়ে এসেছিল। সেখানে দুখারুর পুত বৌ ঢলানি পাড় হচ্ছিল নতুন এগিনা এবং অভ্যাস মত বুড়িমার দিকে তাকাতেই বুড়িমা দুটো আঙুল তুলে তাকে ডাকে। সে ছুটে এসে বুড়িমাকে জড়িয়ে ধরতেই বুড়িমা ফিস ফিসিয়ে বলে—'পাহাড়ের ধসে বান আটকি আছে, পাহাড়ত, উচা পাহাড়ত, বড় বান, বড় বান'। যে বুড়িমা কিছুই দেখে না, সে বহু দূর থেকে অদৃশ্য চোখে কী করে বানা ঝুলে থাকা দেখতে পায়? এ কী অলৌকিকত্ব নয়। কিন্তু এই অলৌকিকতা ডেকে আনে বাস্তবে এক কর্মচঞ্চলতার। বন্যা আসার আশঙ্কায় গোতের লোকজন তাদের বিষয়আশয় রক্ষা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। শুরু হয় গোলাঘর রক্ষা, গোহালিয়া ঘর রক্ষা, পাটাঘর রক্ষা, শোয়াঘর রক্ষা এবং বুড়িমাকে রক্ষার কাজ। চলে বন্যার জন্য প্রতীক্ষা।

মনে করা হয় বন্যা নেমে গেছে ধান ক্ষেতে, সেখানে সে মাটিতে গোহি, হলরেখা এখনো মিশে যায় নি। 'সে হলরেখা থেকে এই বানা জাগা প্রহরে সেই পুরাণ কন্যা উঠে আসতে পারে।'

"বুড়িমা যখন দেখেছে পাহাড়ে বানা ঝুলে আছে, তখনই তো জানা হয়ে গেছে, বানা নেমেছে, বানা ভেসেছে। তার আবার সাক্ষী সাবুদ কী? বানা ঝোলা দেখা যেমন অলৌকিক ব্যাপার। তেমনি দেখেছিলই যে তারও কোন প্রমাণ নেই। কোন দিন দেখবে হয়তো।"১০৪ 'কেউ কি জানে কোনটা এই জন্মে ঘটেছে। কোনটা

জন্মান্তরে ঘটেছে বা ঘটবে।' সময়ের এই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত একাকার করে দেওয়া পৌরাণিক আবহ তৈরিতে সহায়তা করে।

এখন তো বুড়িমার কত জন্ম বাঁচা চলছে তারই কোন হিসেব নেই, সেই হিসেব কেউ খোঁজেও না। সে হিসেব খুঁজতে পারে এমন লোকজনও নেই। বুড়িমা বাঁচে একটা ফরেষ্টের মত। তার বাঁচার মধ্যে কত জন্ম মৃত্যু মিলে আছে। এই দীর্ঘ বাঁচায় তার ছেলে মেয়ে কত তারও কে হিসেব করবে! 'বুড়িমার যে দশ-বিশ ছেলেমেয়ে সে কি কেউ গুণে গুণে দেখেছে?' নাম দিয়ে, ঢক দিয়েও তো চেনা সম্ভব নয় ছেলে মেয়ে। বুড়িমা কবে থেকে বুড়িমা হয়েছে এটাও হিসেবের মধ্যে পড়ে না। বুড়িমা তার সন্তান জন্মের হিসাবটা নষ্ট করে দিয়ে তার 'গোত', 'সাতগোত' তৈরি করেছে। তাঁর গোতের বিশালতা, বাস্তবতা একমাত্র প্রবাদ দিয়েই বিশ্বাসযোগ্য করা যায়—

"যাক কহিছেন পরের বেটা
উমরা মোর জাতের খোঁটা।
এই বেটাখান মোর, ঐ বেটাখান তোর
সব বেটারই একোখান পেটের ভিতর ঘর।" ১০৫

এভাবেই বাস্তব সম্মত ভাবেই বুড়িমা তার গোতের বৃদ্ধি সম্ভব করে তুলেছে। এই বাস্তবতাই অলৌকিক।

যতদিন যায় সবাই ভাবে বুড়িমা যখন তখন মরে যাবে। কিন্তু যত দিন যায় যত বর্ষা যায়, চাষ যায়, শীত যায় বুড়িমা ততই অমর হয়। ততই সবার ভয় বাড়ে এই বুঝি বুড়িমার অমরতা থেমে যায়। 'যে অমরতা প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু লাঞ্ছিত সে অমরতা টুকুই তো সবাই বাঁচিয়ে রাখতে চায়।' সবার ভয় বুড়িমা একদিন গোত ছেড়ে চলে যেতে পারে। কারণ পূর্ব কোন পুরুষের শিকড় থেকে তো সে আসেনি বা পরের সব পুরুষে বুড়িমা তার শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে তাও নয়। বুড়িমার বেঁচে থাকা বা অমরতা খানিক প্রথম বিয়োনীর মত। জাতকের প্রতিটি কাজ, শ্বাস নেওয়া, দুধের বোঁটা টেনে শ্বাস আটকে হাঁস ফাঁস করা যেন অলৌকিক। বুড়িমাও সেই অলৌকিক।

বুড়িমার বাঁচাকে সবাই অনুভব করে একটু খানি ছোঁয়া দিয়ে। বুড়িমা যেন পুরাণের সাইটোন। মিল ও অমিল দুই নিয়েই বুড়িমার সঙ্গে সাইটোন তুল্য। সাইটোন ছিল জন্মবাঁজা। তার শাশুড়ি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বনবাসে পাঠায়। মা মনসার বর পেয়ে সে স্বামীর ঘরে ফিরে আসে। স্বামীকে তার গোয়ালঘরে নিয়ে

গিয়ে গর্ভসঞ্চার করায়। জন্ম নেয় লবকুশ। একটা বিশাল গোত তৈরি হয়।

বুড়িমা বাঁজা নয়, তাকে বনবাসে পাঠানো হয়নি। এগুলি অমিল। কিন্তু মিলও প্রচুর — সাইটোন দেবীর মতো বুড়িমাও একটি মহাগোত তৈরি করেছে। 'বাঁজা থেকে সাইটোন হওয়া যেমন দেবতার এক কাজ, বুড়িমা থেকে বাঁজা হওয়া তো দেবতার আর এক কাজ। বাঁজা থেকে সাইটোন হওয়ায় তো আনন্দ — স্বামীর সঙ্গে মিলনে আনন্দ, গর্ভধারণের আনন্দ, গর্ভ রাখার আনন্দ, প্রসবের আনন্দ, ছোয়াক দুধ খাওয়ানোর আনন্দ। বুড়িমা থেকে বাঁজা হওয়া তো লজ্জা— স্বামীর সঙ্গে মিলনের লজ্জা, গর্ভধারণের লজ্জা, গর্ভরাখার লজ্জা, প্রসবের লজ্জা, ছোয়াক দুধ খাওয়ানোর লজ্জা। বুড়িমা যাতে লজ্জা না পায়, বনবাসে না যায়, বাঁজা হয়ে না যায় সেই বুড়িমার গায়ে নিজের তাপ ছড়িয়ে দেয়া, তাকে ছোঁয়া, বাতাসের আওয়াজকে বুড়িমার ডাক বলে ভুল করা। বুড়িমাকে বাঁচিয়ে রাখা।' এভাবেই বুড়িমার বাঁচা — আর গোতের বাঁচা এক হয়ে যায়। এভাবেই প্রায় মৃত বুড়িমা সবার হাতের ছোঁয়ায় আরও বেশি করে বাঁচছে।

জন্ম জন্মান্তরের বুড়িমা। জন্মান্তরে যা ঘটে সে তো জন্মেরই ভিতর। জন্মও যে চলতে থাকে সেও তো জন্মান্তরেরই সঙ্গে সঙ্গে। 'বুড়িমা সেই জন্মটা ধরে রেখেছে। তার স্বামী সংসারে জন্ম, ছোয়াপোয়ার জন্ম, ছেয়াছোটর জন্ম, এই গাও-ক্ষেতবাড়ি, দশনদী-বিশনদী, তিস্তানদীর পার, ফরেস্ট ঘেরা কত গাঁওয়ের জন্ম। তার গোতের বড় ছোট সবাই বুড়িমার জন্ম ও জন্মান্তরের সঙ্গে যুক্ত। বুড়িমা বুড়ি হয়েছে বলে বুড়িমা নয়। 'বুড়িমা তার বেঁচে থাকাটাকে এক জন্মান্তরের বেঁচে থাকার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে যে বুড়িমা থেকেই একটা গোত তৈরি হয়ে গেছে।' সাধারণত গোত তৈরি হয় পরে, অনেক পরে। কারণ তাকে নিয়ে কল্পনা করা যায়, সেই কল্পনায় অন্যদের বিশ্বাস করানো যায়। বুড়িমার বেলায় কিন্তু তেমন হয়নি। বুড়িমা জানেই না তাকে নিয়ে গোত তৈরি হয়েছে। যারা বুড়িমাকে কম দেখেছে, কম চিনেছে, তাদের কাছে বুড়িমা বেশি সত্য। মানুষের বাঁচার জন্য একটা আত্মপরিচয় দরকার। বুড়িমা সেই আত্মপরিচয়। শুধু কি মানুষ, জমির দাগ নম্বর, আর পঞ্চায়েতের সীমানা নিয়ে বাঁচতে পারে? বুড়িমার পরিচয়ে একটা গোতের কল্পনায় বুড়িমা হয়ে উঠেছে গোত্রনারী।

বিস্মরণ বুড়িমার বুড়িমা হয়ে ওঠার আর এক ধাপ। কারণ, 'বিস্মরণে সবই স্মরণ'। গোতের সবাই বুঝে নিয়েছিল - এমন বিস্মরণ যাত্রায় বাধা দিতে নেই। 'বিসারু ও ভুলে গেছে — সে বুড়িমার ছেলে কী না।' বুড়িমা নিজে ভুলে গিয়ে তার ছেলেকেও ভুলিয়েছে। তেমন বিস্মরণ ব্রত থেকেই তো গোত্র জেগে ওঠে,

তিস্তার জল থেকে চরের মত।'

'বুড়িমার মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু গোতের লোকেরা বুড়িমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় নিজেদের উৎকণ্ঠা দিয়ে, আকাঙ্খা দিয়ে, নিজেদের শরীরের তাপ বুড়িমার শরীরে সঞ্চারিত করে।' বুড়িমা মরল না, বেঁচেও থাকল না —কোথাও উধাও হয়ে গেল বা হাওয়ায় মিশে গেল, সেই ভয় সেই বুড়িমার গোতকে সব সময় তাড়া করে। বুড়িমার মৃত্যু নেই কিন্তু প্রস্থান থাকতে পারে। সে এমন প্রস্থান যা পাহারা দেয়া যায় না।

বুড়িমার গোতে যখন নানা পরিবর্তন এসেছে - নতুন পিচের রাস্তা হয়েছে, বুড়িমাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে, বাড়ির মেয়েরা এমনকি বৌয়েরাও শহুরে দিদিমণির মত শাড়ি পড়া শুরু করেছে - তখন এক ভাদ্রের প্রথমে দু'একদিনের দুপুর নাগাদ যখন দুখারুর পুতবৌ ঢলানী নতুন এগিনা পার হচ্ছিল এবং অভ্যেস মত বুড়িমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিল তখন সে দেখতে পায় বুড়িমা বাঁ হাতটা তুলে ঢলানীকে ডাকছে। ঢলানী, আয়ী, আয়ী শব্দ করে বুড়িমার কাছে ছুটে গিয়ে বসলে বুড়িমা যেন ফিস ফিসিয়ে বলে 'তিস্তার চরত হাতি ডুবি যাওয়ার ধরিছে। সেবা দে, সেবা দে।' বলেই বুড়িমা আবার স্থবির হয়ে যায়।

বুড়ি যেমন অদৃশ্য চোখে বানা ঝোলা দেখে, তেমন তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়াও দেখতে পায়। তিস্তার জলে হাতি ভেসে যাওয়াটা, অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বুড়িমা তো তিস্তায় বলে নি, বলেছে তিস্তার চরে। ভেসে যাওয়ার কথাও বলেনি, বলেছে ডুবে যাচ্ছে। বুড়িমার কথা নানা ব্যাখ্যা করতে চাইলেও অবশেষে তার কথাতেই ফিরে আসে। 'বুড়িমা যখন বলেছে তখন হাতি নিশ্চয় ডুবছে। বুড়িমা যদি বলত, তাহলে হাতি উড়ত।' এমন বিশ্বাস বুড়িমা অর্জন করেছে।

বুড়িমার গোতে যখন সবদিক থেকে উন্নয়নের ঢেউ, পরিবর্তনের পরিবেশ, তখন বুড়িমার তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়া দেখা কোন অর্থ বহন করে। এরকম একটা হাতি সত্যি সত্যি তিস্তার চোরাবালিতে ডুবে যাওয়ার ঘটনা লেখক জানেন। একান্ত আলোচনায় তিনি তা সন্দর্ভকারকে বলেছেন। সে দিক থেকে ঘটনাটির একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। কিন্তু উপন্যাসে সেই হাতি ডোবার ঘটনা এনে বুড়িমার গোতের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার পেছনে মনে হয় এই নব উন্নয়ন ডুবে যাওয়ার ইঙ্গিত— যা পরে ছোটদাদাও অস্বীকার করে সত্যিকারের সমাজ পরিবর্তনের জন্য 'ক্ষিধার পাকে' চলে গেছে।

সত্যকে অনেক সময় অস্পষ্ট ও অলৌকিক বলে মনে হয়। কিন্তু সময়, সত্যের সেই অস্পষ্টতা, অলৌকিকতা মুছে দিয়ে বাস্তবের আলোয় ভাস্বর করে তোলে। বুড়িমার দেখা তিনটি অলৌকিক ঘটনার পেছনে আসলে

বাস্তব সত্য নিহীত আছে।

বুড়িমার শেষ অলৌকিকতা হলো - যখন ছোটদাদা বুড়িমার গোতে নইদারিঘরে শুয়ে স্বপ্নের ঘোরে আদিষ্ট হয়- 'ক্ষিধার পাকে' চলে যেতে এবং সেই দিন ফিরে আসবে যেদিন ' মানষির হাতের ফলন মানষির পেটের ক্ষিধা মুখত নিগিবার' দরকার হবে, এবং যখন পাহাড়ে ঝুলে থাকা বানা এবং তিস্তার চরে ডুবে যাওয়া হাতি পাতাল ফুঁড়ে পাখা মেলে উড়ে আসবে। একথা জানার পর পুরনো বাহির এগিনায় ছোটদাদা পা দিতে গেলেই বুড়িমা কোন একটা আঙুল তুলে তাকে ডাকে, "মোক নিগি যা পিঠত বুকুনি বান্ধি। তিস্তার জলত মোর বিসর্জন দে, মোর তিস্তাত ভাসি দে।" ১০৬ ছোটদাদা নিয়ে চলে। ডানে ঘোরে বাঁয়ে ঘোরে। ভেউলা তার পশু-অনুভবে কী যেন টের পায়। ছোটদাদা বড়বাঁক, কুলজুয়া, দুদুয়া, গরাতি, নোমাই, গোলুন্দি, আংরাভাসা, জলঢাকা করে অবশেষে তিস্তায় চলে যায় ক্ষেতের ফলন মানুষের ক্ষিধের কাছে তুলতে তুলতে। ছোটদাদা যে পথে গেছে সেই পথেই তিস্তা, জলঢাকা ইত্যাদি করে শেষে বড়বাঁকে বুড়িমার গোতে ফিরবে। হয়তো ফেরার পথের সময় হতে পারে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, তিন চার মানবজন্মও হতে পারে।

বিসর্জন—এক পুরাণের শেষ, আর এক পুরাণের শুরু। পুরোনো ব্যবস্থা, জোত, গোত, বিশ্বাস-বিসর্জিত হয়ে—ছোটদাদার পুনর্বাসনে নতুন ব্যবস্থা আসবে। তাতে তথা কথিত উন্নয়ন নয়, সত্যিকারের ক্ষুধার নিবৃত্তির বা মানবমুক্তির আশ্বাস থাকবে। বুড়িমা নিজেকে তিস্তার জলে বিসর্জিত করে তিস্তা সংলগ্ন জীবনের নব উত্থানের ঘোষণা করে গেল।

তিস্তাপুরাণের স্বরূপ বিচার করে দেখা গেল এই উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ ভাবেই মহাকাব্য লক্ষণ যুক্ত। এখানেও একটি বিশেষ অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের নানা দিক নিখুঁত ও নিপুণ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানেও একটি বিশেষ অঞ্চলের কথা বলা হলেও বক্তব্য, অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করে সর্বমানবের কথা হয়ে উঠেছে। এখানেও রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস — উপন্যাস খানিকে বিভিন্ন শ্রেণির লক্ষাভিমুখী করতে চাইছে। কিন্তু তিস্তাপুরাণ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র মতোই এক মহাকাব্য ।

পুরাণের মত এ উপন্যাসেও আছে একটি সম্প্রদায় বা জাতির বংশ পরিচয়, নামকরণ, জন্মমৃত্যু সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতি, পূজাপার্বণ চাষবাস, জমিদখল, উচ্ছেদ, নির্বাসন, অলৌকিকতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ধ্বংস আবার নব সৃষ্টির উদ্যম ও উল্লাস, একটি জনগোষ্ঠী কীভাবে এক বুড়িমা থেকে বিশাল গোতে পরিণত হল,

কীভাবে তাদের দৈনন্দিন অতিবাহিত হল, ক্রমে জরা, ব্যধি আক্রান্ত হয়ে কেউ কেউ মরণের দিকে চলে গেল, কী করে চাষ আবাদে, জীবন যাপনে, শিক্ষা সংস্কৃতিতে পুরাতন সরে গিয়ে নতুন জায়গা করে নিল, অবশেষে পুরাতন কীভাবে নতুনের কাঁধে চেপে বিসর্জনে চলে গেল। এক পুরাণ শেষ হয়ে আর এক পুরাণ জন্ম লাভ করল এত সব ব্যাপার যে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তাকে মহাকাব্য ছাড়া কী বলা যায়।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ' এর মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে দেবেশ রায় তিস্তাপুরাণের ভূমিকায় বলেছেন- ' একটি কথা স্পষ্ট করে রাখায় দায় বোধ করছি। এই উপন্যাসটি কোন ভাবেই আমার 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র পরবর্তী কোন অংশ নয়— ঘটনায় ও মানুষজনে তো নয়ই, গল্পের গড়ন পেটন বা হদিশ নিশানাতেও নয়। সহজ করে নেয়ার কোন ত্বরিত সুবিধেয় বা কঠিন করে তোলার কোন সামর্থে ও রকম ভেবে নিলে দুটি লেখারই স্বায়ত্ব স্বাতন্ত্রের হয়তো ক্ষতি ঘটতে পারে।'

লেখকের এই কথা গুলো মনে রেখেই দুটি উপন্যাসের একটি তুলনা মূলক আলোচনা সংক্ষেপে করা গেল।

- তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ উভয়ই এপিসোডিক উপন্যাস।
- তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ম্যাপ ও তিস্তাপুরাণে বংশ তালিকা আছে।
- তিস্তাপারের বৃত্তান্ত মূলত রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর আধারিত।

'তিস্তাপুরাণ' - এ রাজনীতি এসেছে সমাজ মানুষের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে।

- উভয় উপন্যাসের বহু চরিত্রের সমাবেশ। নারী চরিত্র তিস্তাপারের বৃত্তান্তে প্রধানত একটি - মাদারির মা। শ্রীদেবী, ধর্ষিতা মেয়েটি এবং বাঘারুর মা, গয়ানাথের স্ত্রী ও মেয়ে এবং বন্যার আশঙ্কায় বাঁধে অবস্থানকারী কিছু নারী যাদের ভূমিকা উপন্যাসে একেবারেই নগণ্য।

কিন্তু তিস্তাপুরাণ-এ বুড়িমা ছাড়াও অসংখ্য নারী চরিত্র যারা উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

- তিস্তাপারের বৃত্তান্তের বাঘারু ও তিস্তাপুরাণের ছোটদাদা উভয়েই সর্বহারা, বাঘারুর কোন পিতৃপরিচয় নেই, ছোটদাদা ঢেমনার ছেলে। এক অর্থে দু'জনেই জারুয়া বা জারজ। বাঘারু গয়ানাথের মানষি, ছোটদাদা বুড়িমার গোতে পেটে ভাতে চাকর তুল্য। উভয়েই নির্বাসিত হয়েছে। নির্বাসনের কারণ উভয়েরই জমির অধিকার চাওয়া। বাঘারুর ক্ষেত্রে এটা মিথ্যা আরোপ। বরং বাঘারু আপলচাঁদে স্বেচ্ছায় তার জমির স্বত্ব

ছেড়ে দিয়েছে। ছোটদাদা নিজে জমির দখল নিতে গেছে, পরে অবশ্য ছোটদাদাও তাকে দেওয়া স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছে।

বাঘারুর কোন মানসিক বিকাশ নেই। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানসিকতায় একই রকম। সে কংগ্রেস নয়, কমিউনিস্ট নয়, উত্তরখণ্ডী নয়, রাজবংশী নয়, ভাটিয়া নয় — শুধুই বাঘারু। কিন্তু ছোটদাদা প্রথম দিকে কিছুটা উদাসীন হলেও ধীরে ধীরে সে কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অধিকার সচেতন ও দায়িত্ব পরায়ণ হয়ে উঠেছে। উভয়েই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাঘারু করেছে ব্যারেজ নির্মিত তিস্তার রূপ দেখে, উন্নয়নের ছোঁয়া লাগা বন দেখে। সেখানে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না বলে, আর ছোটদাদা করেছে এ উন্নয়নে ধনতন্ত্রের ছায়া দেখতে পেয়েছে- যা মানব মুক্তির অন্তরায়।

■ উভয় উপন্যাসে বন্যার কথা আছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বন্যা ভয়ঙ্করী রূপে আর তিস্তাপুরাণে বন্যা পাহাড়ে ঝুলে থাকা অবস্থায়। এক জায়গায় বন্যা বাস্তবে, আর এক জায়গায় বন্যা কল্পনায়।

■ উভয় উপন্যাসেই কুকুর একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ভোখা, আর তিস্তাপুরাণে 'ভেউলা'। বাঘারুর ডায়না চরে নির্বাসনে যাওয়ার পথে সঙ্গী ভোখা এবং বুড়িমার অন্তিম যাত্রায় সঙ্গী ভেউলা যেন মহাভারতের পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথের কুকুররূপী ধর্ম।

■ উভয় উপন্যাসেই নদী — তিস্তা। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তিস্তা ছাড়াও ডায়না, তোর্সা, গয়েরকাটা ও অন্যান্য নদীর কথা আছে। তিস্তাপুরাণেও তিস্তা ছাড়া বড়বাঁক, নোমাই, গড়াতি, আংরাভাসা, দুদুয়া ইত্যাদি অসংখ্য নদী।

■ উভয় উপন্যাসে নদীতে নৌকা আছে — তবে কোথাও খেয়া পারাপার বা মাছধরার জন্য নয়। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে — নৌকা বাঘারু উদ্ধারের কাজে লেগেছে, আর তিস্তাপুরাণে ঘাটোয়াল নদী চেনার জন্য নৌকায় করে এ নদী সে নদীতে ভেসে অবশেষে তিস্তায় নেমেছে।

■ উভয় উপন্যাসেই প্রেমের কোনো উল্লেখ নেই।

উল্লেখপঞ্জি

১। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৪০।

২। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০১, কলকাতা, পৃঃ ১৫।

৩। তদেব পৃঃ ১৪-১৫

৪। তদেব পৃঃ ১৫১

৫। তদেব পৃঃ ১৮৭

৬। তদেব পৃঃ ৬৮-৬৯

৭। তদেব পৃঃ ৩৬৬

৮। তদেব পৃঃ ২৯

৯। তদেব পৃঃ ৩৪-৩৫

১০। তদেব পৃঃ ৮১

১১। তদেব পৃঃ ১৩১

১২। তদেব পৃঃ ১৪৮

১৩। তদেব পৃঃ ২৩৪

১৪। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৫২

১৫। A Glossary of Contemporary Literary Theory, Jeremy Hawthorn, Fourth edition, 2000. P.266-67

১৬। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮৮, পৃঃ ৩৯

১৭। তদেব পৃঃ ২০৯-২১০

১৮। তদেব পৃঃ ২৮৯-৯০

১৯। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ১৬৩

২০। তদেব পৃঃ ১৯

২১। তদেব পৃঃ ১৮৯

২২। তদেব পৃঃ ১৫৭

২৩। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ১৯৫-৯৬

২৪। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ১৮৩

২৫। তদেব পৃঃ ১৮৪

২৬। তদেব পৃঃ ১৮৪

২৭। তবেদ পৃঃ ১৮৪

২৮। তদেব পৃঃ ১৮৪

২৯। তদেব পৃঃ ১৮৫

৩০। তদেব পৃঃ ১৮৫

৩১। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ১২৭

৩২। উপন্যাস জিজ্ঞাসা, রবীন্দ্রগুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, ১৯৯৫, পৃঃ ৮

৩৩। A Dictionary of Literary Terms, J.A.Cuddon, Double day and Company Inc, Gardencity, Newyork 1976, P-560

৩৪। সাহিত্য কোষ কথা সাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্য লোক, ২০০২, পৃঃ ৩

৩৫। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃঃ ২০০।

৩৬। তদেব পৃঃ ৯৫

৩৭। তদেব পৃঃ ১২১

৩৮। তদেব পৃঃ ১৫৮

৩৯। তদেব পৃঃ ৪৮

৪০। তদেব পৃঃ ১৫১

৪১। তদেব পৃঃ ২০০

৪২। তদেব পৃঃ ৪৩৩

৪৩। তদেব পৃঃ ৪৩৫

৪৪। তদেব পৃঃ ৪৪৯

৪৫। তদেব পৃঃ ৪৭৮

৪৬। বাংলা উপন্যাস ঃ দ্বান্দ্বিক দর্পণ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০মে ১৯৯৬, পৃঃ ১০৫

৪৭। তদেব পৃঃ ১০৫

৪৮। তদেব পৃঃ ৩৪৮

৪৯। বঙ্গীয় শব্দ কোষ দ্বিতীয় খন্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি ১৯৬৬, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, পৃঃ ১৩৪৫

৫০। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, গুণবাজ খান, মালাধর বসু বিরচিত-সম্পাদনা অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গলা রানা, রত্নাবলী প্রকাশনা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৩৩-৩৪

৫১। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃঃ ৬৯৬

৫২। তদেব পৃঃ ৬৩৮

৫৩। তদেব পৃঃ ২৭৯

৫৪। তদেব পৃঃ ৩০৩

৫৫। তদেব পৃঃ ২৭৯

৫৬। তদেব পৃঃ ১৭৪

৫৭। তদেব পৃঃ ৩০

৫৮। তদেব পৃঃ ৩০-৩১

৫৯। তদেব পৃঃ ৩৩

৬০। তদেব পৃঃ ৫২

৬১। তদেব পৃঃ ৬১

৬২। তদেব পৃঃ ২৯

৬৩। তদেব পৃঃ ১৯২

৬৪। তদেব পৃঃ ১৯৩

৬৫। তদেব পৃঃ ৫২

৬৬। তদেব পৃঃ ৭০

৬৭। তদেব পৃঃ ২৩৮-৩৯

৬৮। তদেব পৃঃ ২৪২

৬৯। তদেব পৃঃ ২২৮

৭০। তদেব পৃঃ ২৩০

৭১। তদেব পৃঃ ৬৩

৭২। তদেব পৃঃ ৭৫

৭৩। তদেব পৃঃ ১৯৩

৭৪। তদেব পৃঃ ৮৬

৭৫। তদেব পৃঃ ৪০২

৭৬। তদেব পৃঃ ৪০৬

৭৭। তদেব পৃঃ ৪৮৪

৭৮। তদেব পৃঃ ৪৮৫

৭৯। তদেব পৃঃ ৫৩৩-৩৪

৮০। তদেব পৃঃ ১৮৬

৮১। তদেব পৃঃ ১৮৭

৮২। তদেব পৃঃ ১৮৮

৮৩। তদেব পৃঃ ৪৭৩

৮৪। তদেব পৃঃ ৪৭৩

৮৫। তদেব পৃঃ ৪৭৪

৮৬। তদেব পৃঃ ১৫৬

৮৭। তদেব পৃঃ ২৩৩

৮৮। তদেব পৃঃ ৮৩-৮৪

৮৯। তদেব পৃঃ ২৪৪

৯০। তদেব পৃঃ ২৮৯

৯১। তদেব পৃঃ ৪৪৩

৯২। তদেব পৃঃ ৫৬৩

৯৩। তদেব পৃঃ ৬১১

৯৪। তদেব পৃঃ ১৮৫

৯৫। তদেব পৃঃ ৪৯৪

৯৬। তদেব পৃঃ ৩৭৩

৯৭। তদেব পৃঃ ৩৮৪

৯৮। তদেব পৃঃ ৪২৭

৯৯। তদেব পৃঃ ৪৪৪

১০০। তদেব পৃঃ ৪৬১

১০১। তদেব পৃঃ ৬৯২

১০২। তদেব পৃঃ ৬৯৬

১০৩। তদেব পৃঃ ২৩

১০৪। তদেব পৃঃ ৮১

১০৫। তদেব পৃঃ ১৭৭

১০৬। তবেদ পৃঃ ৬৯৬

ঃ চতুর্থ অধ্যায় ঃ

ভাষা ঃ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ-এর ভাষা, রাজবংশী ভাষাব্যবহারে বিশেষত্ব

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা ঃ রাজবংশী ভাষা ব্যবহারে বিশেষত্ব

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' দুটি উপন্যাসই বাংলা ও রাজবংশী বা কামরূপী উপভাষায় লেখা। বর্ণনার ভাষা বাংলা, কিন্তু কথোপকথনের ভাষা বাংলা, প্রধানত রাজবংশী। কেন লেখক রাজবংশী ভাষা ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে যাওয়ার আগে রাজবংশী ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী রাজবংশীরা। রাজবংশীদের উদ্ভব সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছেন, "The history of the origin of the Rajbansis is a mystery. It is said that they belong to the great Bodo family that entered India in 10th century B.C, from the east & settled on banks of the Brahmaputra and gradually spread over Assam and whole of North East Bengal" ১ এ প্রসঙ্গে সুখবিলাস বর্মাও উল্লেখ করেছেন "....তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তির উপরে ভিত্তি করে রাজবংশী জাতির উদ্ভব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আপত্তি থাকা উচিত নয় যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে পৌন্ড্রবর্ধন থেকে দ্রাবিড় বা পৌন্ড্রক্ষত্রিয়দের একটি অংশ তৎকালীন কামরূপ, সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গে বসবাস শুরু করে। এর কিছুকাল পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তিব্বত চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বৃহৎবোড়ো শাখার তিব্বত-ব্রহ্মভাষী কোচ, মেচ, বোড়ো, কাছারি, রাভা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এই উপজাতিগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল অংশটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সমন্বিত জন গঠন করে। এই সমন্বিত জনগণই রাজবংশী সমাজ, যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে আর্যদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা যায়।" ২

এই রাজবংশীদের কথ্য ভাষা-ই হল রাজবংশী ভাষা। এরই নামান্তর 'কামরূপী উপভাষা'। কামরূপী উপভাষা বা রাজবংশী ভাষা বাংলাভাষারই একটি উপভাষা।

"উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রথম ভাষাটি শুধু প্রশাসনিক—'জলপাইগুড়ি বিভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রশাসনিক সীমানা পেরিয়ে ভারতের প্রদেশান্তরে (যেমন, আসামের গোয়ালপাড়া জেলা, বিহারের পূর্ণিয়া জেলা) এবং ভারত রাষ্ট্রের বাইরেও (বাংলা দেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলা) এর বিস্তার।" ৩

এত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই উপভাষার বিস্তার হেতু স্বাভাবিক ভাবে এর উচ্চারণে, রূপে কিছু কিছু পার্থক্য এসে গেছে, ব্যাকরণের ভাষায় যাকে বলে বি-ভাষা। রাজবংশী ভাষাভাষী মূল অঞ্চলটি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনিশ শ পঞ্চাশ পর্যন্ত কোচবিহারের শাসনাধীন ছিল। এজন্য রাজবংশীভাষার Standard ধরা হয় কোচবিহারের রাজবংশী ভাষাকে।

কামরূপী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) শিষ্ট বাংলার আদিতে 'ল' যুক্ত শব্দে কোচবিহার ও রংপুর-এ 'ল'- এর পরিবর্তে 'ন' হয়। অন্যান্য অঞ্চলে ব্যতিক্রম দেখা যায়।

শিষ্ট বাংলা	কোচবিহার/রংপুর	অন্যান্য অঞ্চলে
ললিত	নলিত	নলিত
লাজ	নাজ	লাজ
লাল	নাল	লাল

(২) শব্দের আদি অবস্থানে 'র' 'অ' হয়ে যায়, কোনো কোনো অঞ্চলে র'ই থাকে —

রক্ত	অক্ত	অক্ত
রহ (থাকা)	অ	রহ
রঙিলা	অঙ্গিলা	রঙিলা

(৩) শব্দের আদিতে 'ও' থাকলে কোচবিহার ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে 'ও', 'অ' হয়ে যায়।

বোকা	বোকা	বকা
পোকা	পোকা	পকা
দোহলা (নিচু জমি)	দোলা	দহলা

(৪) কোচবিহার ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন, মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে পরিণত হয়।

আঠিয়া	আটিয়া	আঠিয়া
এই ঠাঁই	এইটে	এইঠে
লাঠি	নাটি	লাঠি

(৫) মহাপ্রাণ প্রবণতার জন্য কোচবিহার ব্যতীত অন্যান্য স্থানে কোথাও কোথাও মহাপ্রাণে পরিণত হওয়ার

পরিবর্তে ব্যঞ্জনের পরে একটা 'হ্' ধ্বনির আগম ঘটে।

চা	চা	চাহা
ওরা	উমা	অম্হা
তোমার	তোমার	তোম্হার

(৬) কোচবিহারে শব্দের মধ্যবর্তী নাসিক্যব্যঞ্জন মহাপ্রাণতার দিকে ঝোঁক থাকার ফলে অন্যান্য অঞ্চলের উচ্চারণে অনেক সময় মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনে পরিণত হয়।

সাঁতার অর্থে	পঙোর	পহর
বামন	বামোন	বাভোন

(৭) 'চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলি উষ্মীভূত হয়। 'জ' হয়ে যায় জ় (Z)

জল	জল	জল
চল	চল	চল
ঝাড়ু	ঝারু	ঝারু

(৮) এই উপভাষার ড় এ ঢ় সর্বত্রই যথাক্রমে 'র' কোনো কোনো স্থানে (কোচবিহার ব্যতীত) 'রহ' হয়।

বাড়ি	বারি	বার্হি
বড়	বর	বর্হ্
আষাঢ়	আশার	আশারহ্

(৯) কামরূপীতে শ, য, স, প্রায়শই বঙালির মতো 'হ্' এর ঝোক দেখা যায়। শালা—শাহ্লা, বিষ—বিহ্ষ, সংগ্রাম—সহংগ্রাম।

(১০) পদ মধ্যে অ-কারের উ-কার প্রবনতা লক্ষ করা যায়

এমন	এমুন	এমুন
তখন	তখুন/সেখুন	সেখুন

(১১) রাঢ়ী বা বঙালিতে ব্যবহৃত 'স' কামরূপীতে 'শ' হয়।

সকাল	শাকাল	শাকাল
রস	অশ	রশ

সন্ধ্যা	সইঞ্ঝা	শাইঞ্ঝা

(১২) পদাদিতে এ-কারের অ্য-কার প্রবনতা লক্ষ করা যায়

দেবেশ	দ্যাবেশ	দ্যাবেশ
মেঘ	ম্যাঘ	ম্যাঘ
দেশ	দ্যাশ	দ্যাশ

(১৩) স্বর সংগতির ফলে কামরূপীতে কখনও 'এ'-কার হয়ে যায় 'ই'-কার এবং 'ও'-কার হয়ে যায় 'উ' কার।

শিবেন	শিবিন	শিবিন
নৃপেন	নিপিন/নিরপিন	নিপিন/নিরপিন
কোকিল	কুকিলা	কুকিলা

(১৪) স্বরধ্বনির বিবর্তন বঙালী বা রাঢ়ির মতো কামরূপীতে অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি। যেমন—

কল্য—কল্লি—কালি—কাইল—কাল্

অদ্য—আজি—আজি—আইজ—আজ

কামরূপীতে যথাক্রমে 'কালি' ও 'আজি' ব্যবহৃত হয়।

(১৫) ধ্বনি রূপান্তরের আরও কতগুলি রূপ নিচে দেওয়া হলো।

ক) সমীভবন : বাক্য—বাইক্কো, ভর্ত্তি—ভত্তি, খরচা—খচ্চা

খ) বিষমীভবন : শরীর—শরীল, লালসা—নালোচ

গ) ধ্বনি বিপর্যাস : জ্যোৎস্না—জোনাক, মাংস—মশোং, গোবিষ্টা—ঘইশা

ঘ) ঘোষীভবন : শকুন—শগুন,

ঙ) মহাপ্রাণীভবন : বাসা—ভাসা, যত—ঝতো স্তবক—থোকা

চ) অল্পপ্রাণীভবন : মাথা—মাতা, মেঝে—মাজিয়া, দুধ—দুদ

ছ) নাসিক্যীভবন : প্রকৃত পক্ষে রাজবংশীতে নাসিক্য ধ্বনি নেই।

জ) মূর্ধন্যীভবন : তির্যক—ট্যারা, দাড়িম্ব—ডালিম,

কামরূপী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ—

শব্দ, প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি, পদ, লিঙ্গ, বচন ইত্যাদি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। সর্বপ্রথম 'শব্দ' নিয়ে কামরূপী উপভাষার স্বরূপ আলোচনা করা যাক।

শব্দ ঃ

ক) মৌলিক শব্দ : মাও, বাপো, ভাতার, চ্যাংড়া, মাইয়া (স্ত্রী) ইত্যাদি।

খ) সাধিত বা প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ :

১) কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ : আই — ঝার + আই = ঝারাই, আরু—ডুব + আরু = ডুবারু, উরা—হাগ্ + উরা= হাগুরা, তি—উঠ্ +তি = উঠতি

২) তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ : আর—বাদি + আর = বাদিয়ার, ওয়াল—ঘাট + ওয়াল = ঘাটোয়াল, আরু—বাঘ = বাঘারু।

তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাম ধাতু গঠন করে।

আ— ভাটি+আ=ভাটিয়া, হলদি+আ=হলদিয়া

আনি—ঠ্যাঙা+আনি=ঠ্যাঙানি, নাক+আনি=নাকানি

৩) দেশী প্রত্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কামরূপীতে লক্ষ করা যায়। কাটা—চ্যাদেরা + কাটা = চ্যাদেরা কাটা, বারি—ধান +বারি, পাটা+বারি পাটাবারি, নাগা—শ্যাপ্টা + নাগা = শ্যাপ্টানাগা; হাটি—গুয়া + হাটি = গুয়াহাটি, চাউল + হাটি = চাউলহাটি।

গ) সমাসবদ্ধ শব্দ : আজু-আবো, চ্যাংড়া-চ্যাংড়ি, ভুলা-মাসান, আংসাঙ-বাউদিয়া ইত্যাদি।

উপসর্গ : নি + লাজ = নিলাজ, বি-ধুয়া = বিধুয়া, হা-ভাতিয়া = হাভাতিয়া

অনুসর্গ : বাদে — তোরবাদে, দিয়া — চুনদিয়া ইত্যাদি।

পদ ঃ

১) বিশেষ্য : কামরূপীতে কারক বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ ভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ দেখা যায়। যেমন—

ক) কারক — কর্তৃকারকে 'শূণ্য', 'এ' বিভক্তি—

গরু ধান খাইচে। ঠ্যালাৎ বাগে ঘাস খায়।

খ) কর্মকারক ও সম্প্রদানকারকে স্বরান্ত পদে 'ক' এবং ব্যাঞ্জনান্ত পদে 'ওক' বিভক্তি—নরেনোক খবর দ্যাও। আবোক চাউটালি করা যায়।

কখনও কর্মকারকে শূণ্য বিভক্তি হয়। যেমন—মুই ভাত খাঙ্

গ) করণকারকে 'দ্বারা' 'দিয়া' যোগে— মোর দ্বারা হবার নয়। মোক দিয়া করেবার না পাবু।

ঘ) অপাদানকারকে 'হাতে' 'থাকি' যোগে—ধানবাড়ি হাতে মানষিটাক্ ডেকাও। কোটে থাকি আসিলেন?

ঙ) সম্বন্ধ পদ—'র', 'এর' যোগে—

গরুর বাছুর হইছে। ঘরের পাছিলাৎ ঢোলা ব্যাঙ।

চ) অধিকরণকারকে 'ত্', ওত্, টে, ঠে যোগে—

ঘরোত থাকোঙ। নদীত্ জল নাই। সত্যেনেরটে বইখান আছে। হামারঠে কহদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'ঘরোত্', 'নদীত্', স্থানার্থে এরকম ব্যবহার হলেও জিজ্ঞাসা সূচক কোথায় র ক্ষেত্রে 'কোটত্' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে কোনটে, কোটে, কোন্ঠে হয়।

২) সর্বনাম পদে 'বচন'—'লার' 'গুলা', 'লা' যোগে বহুবচন হয়—

সর্বনাম	একবচন	বহুবচন
মুই (আমি)	মুই	আমরা/হামরা
তুই (তুমি)	তুই	তোমরা/তম্রা
উয়ায় (সে)	উয়ায়/উমায়/তায়—	উমরা/অম্রা
অর (ওর)	অর/ওর	উমরালার
তোমরা (আপনি)	তোমরা/তমরা	তোমরালা/তমরালা

'তুই' সর্বনামটির কারক, বিভক্তি, বচন-এর রূপ ঃ

কারক	একবচন	বহুবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
কর্তৃ	তুই	তোমরা	তোমরালা/তোমরাগুলা
কর্ম	তোক	তোমার/তমাক	তোমরালাক /তোমরাগুলাক
করণ	তোকদিয়া/তোর দ্বারা	তোমার দিয়া/তোমরালাক দিয়া	তোমরাগুলাক দিয়া/দ্বারা
সম্প্রদান	তোক্	তোমাক/তমাক	তোমরালাক/ তোমরাগুলাক
অপদান	তোমরাটে হ্যাতে/থাকি	তোমারটে হ্যাতে/থাকি	তোমরালারটে হ্যাতে/থাকি

সম্বন্ধ	তোর	তোমরা/তমার	তোমরালার/ তোমরাগুলার
অধিকরণ	তোরটে	তোমরাটে	তোমরালারটে/ তোমরাগুলারটে

৩) বিশেষণ পদের বিন্যাস ঃ

গুণবাচক : ভাল্, বেহা/ বেয়া, বর্হ ছোট/ছট্, ডাঙ্গর,

সংখ্যাবাচক : একটা, দুকনা, দোকলা, চাইরটা, সগিলা, তামান

পরিমাণবাচক : ব্যাশি, ভাইল্লা, অ্যাতুলা, এত্তোকোনা

কালসূচক : অ্যালায়/অ্যালা, শ্যালায়/শ্যালা, স্যাখন/জ্যাখন

স্থানবাচক : এটে/এইটে, ওটে/ওইটে/ওইঠে, কোটে/কোনটে/কোন্ঠে/কুন্ঠে

পদ্ধতিজ্ঞাপক : অ্যাঙ্করি, ক্যাঙ্করি, অঙ্করি, ত্যাঙ্করি।

সম্মতি-অসম্মতি সূচক : হয়, হয় হয়, নোয়ায়/ নোমায়/ নোহায়, নহয়, উহ।

হেতুবাচক : কি, ক্যানে, কিবাদে, সেইবাদে।

যৌগিক-ক্রিয়া বিশেষণ : জ্যালায়-শ্যালায়, হিত্তি-হুত্তি, জিদি-সিদি

৪) ক্রিয়া ও ক্রিয়ার কাল ঃ

কামরূপীতে সংস্কৃত ও বাংলা ধাতুজাত ক্রিয়াপদই ব্যবহার করা হয়। শুধু কালগত প্রয়োগে এদের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

'ধর' ক্রিয়ার কালগত রূপ

(বর্তমান কাল)

পুরুষ	সাধারণ বর্তমান		ঘটমান বর্তমান		পুরাঘটিত বর্তমান	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম	(মুই) ধরঙ	(হামরা) ধরি	ধইরবার-ধরছঙ	ধইরবার ধরছি	ধইরছুঙ	ধইরছি
মধ্যম	(তুই) ধরিস	(তোমরা) ধরেন	ধইরবার ধরছিস	ধইরবার ধইরছেন	ধইরছিস	ধইরছেন
প্রথম	(উয়ায়) ধরে	(উমরা) ধরে	ধইরবার ধইরছে	ধইরবার ধইরছে	ধইরছে	ধইরছে

(অতীত কাল)

পুরুষ	সাধারণ অতীত		ঘটমান অতীত		পুরাঘটিত অতীত	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম	ধরনু/ধরলুঙ/ধরিনু	ধইরলোঙ/ধরিলি	ধরিবার ধইরছুলুঙ	ধরিবার ধইরছিলোঙ	ধরিছিলুঙ	ধরিছিলোঙ
মধ্যম	ধরলু/ধরিলু	ধইরলেন/ধরিলেন	ধরিবার ধইরছিলু	ধরিবার ধইরছিলেন	ধরিছিলু	ধরিছিলেন
প্রথম	ধইরলেক/ ধরিলেক	ধইরলেক/ধরিল ধরিলেক	ধরিবার ধইরছিলো	ধরিবার ধইরছিলো	ধরিছিলো	ধরিছিলো

(ভবিষ্যত কাল)

পুরুষ	সাধারণ ভবিষ্যত		ঘটমান ভবিষ্যত	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উত্তম	ধরিম	ধরিম	ধরিবার ধরিম	ধরিবার ধরিম
মধ্যম	ধরবু/ধরিবু	ধইরবেন	ধরিবার ধরিবু	ধরিবার ধরিবেন
প্রথম	ধরিবে/ ধইরবে	ধরিবে	ধরিবার ধরিবে	ধরিবার ধরিবে।

(বর্তমান অনুজ্ঞা)

পুরুষ	সাধারণ		ঘটমান		পুরাঘটিত	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
মধ্যম	ধর	ধরেন	ধরির ধরিস	ধরির ধরেন/ ধরির ধরিবেন	ধরিস/ ধরিবু	ধরেন/ ধরিবেন
প্রথম	ধরুক	ধরুক				

(ভবিষ্যত অনুজ্ঞা)

পুরুষ	সাধারণ	
	একবচন	বহুবচন

মধ্যম	ধরিস/ধরেন	ধরেন/ধইরবেন
প্রথম	ধইরবে/ ধরিবে	ধইরবে/ধরিবে

ভবিষ্যৎ 'ধরতে হবে'-এর রূপ ঃ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	মোর ধরা খাইবে/নাইগ্‌বে	আমরাগুলার ধরা খাইবে/নাইগ্‌বে
মধ্যম	তোমার ধরা খাইবে/নাইগ্‌বে	তোমরাগুলার ধরা খাইবে/নাইগ্‌বে
প্রথম	উমার ধরা খাইবে/নাইগ্‌বে	উমারগুলার ধরা খাইবে/নাইগ্‌বে।

শিষ্টবাংলায় বচন ক্রিয়াররূপকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু কামরূপীতে বচন ভেদে ক্রিয়াররূপ ভেদ ঘটে।

শিষ্টবাংলা	কামরূপী
আমি খাই	মুই খাঙ/খাওঁ
আমরা খাই	আমরা/হামরা খাই
তুমি খাও	তুই খাইস/খা
তোমরা খাও/ আপনারা খান	তোমরা খান

শিষ্ট বাংলায় যে পরিবেশে সম্বন্ধবাচক কর্তা ব্যবহৃত হয়, কামরূপীতে সেই পরিবেশে কর্মবাচক কর্তা ব্যবহৃত হয়।

শিষ্টবাংলা	কামরূপী
আমার খিদে পেয়েছে	মোক ভোক্ ধরিচে/নাগিচে
আমার ঘুম পেয়েছে	মোক নিন ধরিচে
এগুলি আপনাদের দেবো	এ্যাইলা তোমাক দিমু/দিম

পদ বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য

১) শিষ্ট বাংলায় বহুবচনাত্মক ও নির্দেশক প্রত্যয় বাক্যে সব সময়েই বিশেষ্যের পরে বসে। কিন্তু কামরূপীতে কখনো এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

শিষ্ট বাংলা	কামরূপী
এই জিনিসগুলো ভালো	ইল্লা জিনিশ ভাল
এই বইটা কার?	এটা কার বই।

২) শিষ্ট বাংলায় নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু কামরূপীতে সাধারণত নঞর্থক অব্যয়টিকে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসতে দেখা যায়। যেমন

আমি ভাত খাব না	মুই ভাত না খাঙ্
তুমি হাটে যাবে না।	তুই হাটোত্ না যাবু

লিঙ্গ পরিবর্তন

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
আ-	ই	উ	ই	অ/আ	নি/আনি
ব্যাটা	ব্যাটি	কালটু	কালটি	নাউয়া	নাউয়ানি
বুরা	বুরি	মুতারু	মুতুরি	নালচিয়া	নালচিয়ানি

কামরূপী শব্দ ভাণ্ডার

শিষ্ট বাংলার মতো কামরূপীতেও শব্দ এসেছে প্রধানত তিনটি উৎস থেকে। সংস্কৃত, দেশী বিদেশী (ইংরেজী, আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ) এবং অন্যান্য যেমন বোড়ো, কোচ, রাভা ইত্যাদি।

সংস্কৃত ঃ

তৎসম : ধ্যান, দান, নিশা, বৈরাগি, ভান্ডো (ভাণ্ড)

তদ্ভব : আই (মা), আগিনা/এগিনা (উঠোন), গাভিন (গর্ভবতী)

অর্দ্ধতৎসম : অক্‌তো, থান, পরবাশ, বইশটোম, কেশটো।

দেশী : আচা (শুঁয়োপোকা), কশ্‌টিয়া (কৃপণ), টিকা (নিতম্ব) ঢাঙা (লম্বা), শাঙ্না (উপপতি)

বিদেশী ঃ

ইংরেজি—ডবোল, গিলাশ, পেছিডেন, এডিও, পিনচুল, ছিলোট

আরবী—জবাই, দুনিয়া, ফাজিল, আক্‌কেল।

ফারসী—আওয়াজ, আশকারা, কম্‌বক্‌তা, কাকা, জমি

পর্তুগীজ—মিশ্‌তিরি, বালটিঙ, আনারস, বয়াম

অন্যান্য ঃ

বোড়ো—আউ আউ (নানা), দলোঙ্‌ (সেতু), গ্যাদেরা (অপরিষ্কার), হাঙ্‌রা (বাঁশের বেড়া), হাফা (বনবিড়াল)

কোচ-রাভা—আঙশাঙ (উল্টোপাল্‌টা), দাগিলা (কাঁথা), কামিছাম (উদুখল), গাইন (মুষল, প্রহারক)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : ঠাঙাউ ঠাঙাউ (ধাতব আওয়াজ), টিকিস টিকিস (ব্যাথা অনুভব), হারাঙ হিরিঙ (পতনের আওয়াজ), চাটাউ চাটাউ (খড়ম বা তজ্জাতীয় শক্ত চপ্পলের আওয়াজ), ভকর ভকর (কথা বলার আওয়াজ), খম্‌খম্‌া (জমাট বাঁধা)

কামরূপী উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বাংলাভাষার বিবর্তন ধারায় কামরূপীর অবস্থান মধ্য বাংলাস্তরে) "যেমন : সংস্কৃত অদ্য—প্রাকৃত অজ্জ—প্রাচীন ও মধ্যবাংলা আজি (কামরূপীতে রক্ষিত)—আইজ (অপিনিহিতি : বঙ্গালী)—আজ (রাঢ়ী); দৃক্ষিত—প্রা দেক্‌খিঅ—প্রা. বা. দেখিঅ—মঃ বা. দেখিআ, দেখি (কামরূপীতে রক্ষিত)— দেইখ্যা—(বঙ্গালী)— দেখে (রাঢ়ী) ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাঢ়ীর চেয়ে বঙ্গালীতে এবং বঙ্গালীর চেয়ে কামরূপীতেই প্রাচীনতর বাংলার বৈশিষ্ট্য-বেশি সংরক্ষিত হয়েছে।" ৪

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণে' ব্যবহৃত রাজবংশী ভাষা আসলে তিস্তাপারের ভাষা। অর্থাৎ পুবে ডায়না পশ্চিমে আপলচাঁদ মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র ঘটনার কেন্দ্রস্থল গাজোলডোবা। ব্যাপ্তি সারা জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুর এমন কি নীলফামারী পর্যন্ত। তিস্তাপুরাণের ঘটনার কেন্দ্রস্থল ধূপগুড়ি ব্লকের দলগাঁও-সরুগাঁও। এর বিস্তার-জলপাইগুড়ি জেলা—উত্তরবঙ্গ। উভয় উপন্যাসেই লেখক জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী ভাষাকেই প্রধানত আদল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

রাজনীতি করার সুবাদে জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রাম গ্রামান্তরে বহুদিন ঘুরে বেড়ানোর তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন। সেজন্য রাজবংশী-জীবনের আদ্যন্ত-খুব কাছে থেকে, বলা ভালো মিশে গিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাই উভয়গ্রন্থে রাজবংশী জীবনের খুঁটিনাটি যেমন তিনি অনুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেছেন তেমনি তার মধ্যে দেখা যায় ভাষারও অনুপুঙ্খতা। অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ শব্দ, বাক্যও তার দৃষ্টি এড়ায় নি। সময়ের প্রবাহে যেসব শব্দ রাজবংশী জীবন থেকেও হারিয়ে যাচ্ছে, সেই শব্দগুলিকেও তিনি খুঁজে বের করে সার্থক

প্রায়োগ করেছেন। আবার রাজবংশী ভাষায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইংরেজি শব্দ, শিষ্ট বাংলা শব্দ। চরিত্র বুঝে ভাষার পার্থক্যও রক্ষিত হয়েছে। বাঘারুর বাচন ও রাজবংশী এম.এল.এ-র বাচন এক রকম রাজবংশী ভাষা নয়। গয়ানাথ ও পঞ্চানন মল্লিকের বক্তব্যের মধ্যেও তফাৎ আছে। তিস্তাপুরাণে রাজবংশী চরিত্রগুলি প্রায় সমগোত্রীয় তাই তাদের বাচনে তেমন কোনো তফাৎ পরিলক্ষিত হয় না। তবে ছোটদাদা দীর্ঘদিন বাইরে নির্বাসনে থেকে বা বুড়িমার গোত হাতি ডোবা দেখার জন্য বার্ণেশ এলাকায় কয়েকদিন থাকার ফলে বহু মানুষের সঙ্গে মেশার ফলে কিছু নতুন শব্দ ব্যবহার করতে শিখেছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে রাজবংশী ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনের সময় দেবেশ রায় বলেছেন—

" আমি রাজবংশী ভাষা রাজনীতির প্রয়োজনে শিখেছি। যখন শিখলাম একবারও ইচ্ছে হয়নি ঐ রাজবংশী ভাষায় আঞ্চলিক গল্প লিখব। আমার মনে হয়েছিল ঐ রকম আঞ্চলিক লেখালেখির দরকার নেই। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, স্বাভাবিক গদ্যে একটা গল্প এগোচ্ছে হঠাৎ একটা রাজবংশী সংলাপ এসে গেল, সেখানে গল্পটার আখ্যান ভাগ একটা অন্য অর্থের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। সেখান থেকে আবার বর্ণনার ভাষায় চলে আসতে পারছি। আখ্যানটাকে দু-তিনটে স্তরে কাজ করানো যাচ্ছে।.....'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' পুজোর জন্য লেখা শুরু করি এবং গল্পটা ক্রমশ বড় হতে থাকে, বড় হতে থাকে, আমি বাধা দিই না। এখানে একটা রাজবংশী চরিত্র এলো, অথচ এটা রাজবংশী জীবনের গল্প নয়। সেই বৃদ্ধের সংলাপে বুঝতে পারলাম গল্পটা দু-তিনটে স্তরে ঘোরাফেরা করতে পারছে।' 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' লিখতে গিয়ে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার আধুনিক উপন্যাসে আখ্যানকে কীভাবে বদলে দিতে পারে এইটি হাতে কলমে জানতে পারলাম ঐ ভাষা ব্যবহারের পর। লেখার পর মনে হল—এখানেই আঞ্চলিক ভাষার আধুনিক প্রয়োগ ঘটতে পারে ও আঞ্চলিক ভাষা তার বাচনের অশ্রুতপূর্বতা ও অজ্ঞাত পূর্বতার মোহ ভেঙ্গে ফেলে আখ্যানের অপরিহার্য অংশ হতে পারে। গল্প লেখার বাংলা আর আঞ্চলিক বাংলা পরিপূরক হতে পারে।.....এর আগে পর্যন্ত যে সব উপন্যাস লিখেছি; 'মানুষ খুন করে কেন'; 'যযাতি'; তাতে আখ্যানের এই অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। সেখানে বাঁধা ছকের ভেতরই কাজ করেছি। কিন্তু আখ্যানের ধরন যে বদলে যেতে পারে, দু-তিনটি স্তরে আখ্যানকে ছড়িয়ে দেখা যায় এটা আমি শিখেছি রাজবংশী ভাষা শেখার পর, রাজবংশীদের মধ্যে পার্টির কাজ করতে করতে; রাজবংশী বাচন থেকে।" ৫

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে রাজবংশী ভাষার ব্যবহার নিয়ে কয়েকটি বিষয় আমরা জানতে পারছি—

ক) আঞ্চলিক গল্প লেখার উদ্দেশ্যে রাজবংশী ভাষার ব্যবহার নয়।

খ) আধুনিক উপন্যাসের আখ্যানকে বদলে দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার।

গ) স্বাভাবিক গদ্যে লিখিত গল্পে রাজবংশী সংলাপ প্রয়োগে গল্পটা দু-তিনটি স্তরে ঘোরাফেরা করতে পারে।

(ঘ) আঞ্চলিক ভাষার আধুনিক প্রয়োগে আঞ্চলিক ভাষা তার অশ্রুতপূর্বতা ও অজ্ঞাত পূর্বতার মোহ ভেঙ্গে ফেলে আখ্যানের অপরিহার্য অংশ হতে পারে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' এর গঠনরীতি ও ভাষারীতি অনুধাবন করলে লেখকের এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রথমেই বলা যায় যে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' বাংলা ভাষায় রচিত অন্যান্য আঞ্চলিক উপন্যাস পদ্মানদীর মাঝি, তিতাস একটি নদীর নাম, গঙ্গা, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ইত্যাদি'র মতো আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। পটভূমি হিসেবে তিস্তাপার, ভাষা হিসেবে রাজবংশীভাষা, এবং জনগোষ্ঠী হিসেবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবন বৃত্তান্ত হয়েও এর সর্বজনীন রূপ ও রীতির জন্য এ 'মহাকাব্যোপম আধুনিক উপন্যাস।

স্বাভাবিক গদ্যে একটা গল্প চলছে তাতে রাজবংশী চরিত্রের প্রবেশ, তাদের সংলাপ কী ভাবে গল্প বা আখ্যানটিকে দু-তিনস্তরে ছড়াতে পারে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হলো—

'তখন কি জোতদারনী জানে যে ওর পেটে পেটে এত বুদ্ধি। তবে ও এতটা সাহস করত না যদি তার স্বামীর মৃত্যুর পর পাশাপাশি যেসব জোতদার-জোতদারনীর জমি নিতে চেয়েছিল দেখা শোনার অছিলায়, তারা তাকে উশ্‌কে না থাকে। ওর যদি দল থাকত তা হলে তারা তো আসত। তারা কেউ আসে নি।

' সেইখান গেইছে কোটত?' বিসারু জিজ্ঞাসা করে।

'ঘরত বসি আছে।' ধোলীই জবাব দেয়।

একটু অবাক হয়েই দুখারু বলে, 'কার ঘরত?'

'ওর নিজের ঘরত'। কলেশ্বরী বলে

'ঝান্ডাখান টাঙি দিয়া ঘরত বসি বসি জমি দখল? স্যালায় অ্যানং গোলমাল য্যান রাজ্যপাট যাবা বসিছে, ধানক্ষেতত আগুন?' দুখারু নিজের বিরক্তি জানিয়ে দেয়, 'আসিবার কও কেনে।'

ধোলী ও কলেশ্বরী জলের ঘটি দুটো নিয়ে চলে যাওয়ার পরও তার শালাকে নিয়ে আধিয়ার আসার আগে

বিসারু বলে- 'মনত খায় কী ঐ শিলশিলা জোতদার উমরাক কহিছে, 'তুই ঝান্ডা গাড়ি দে, পাছত যাম। হামরালা আসি গেছি বাদে আর না আসে।' এই যুক্তিটাই ঠিক মনে হয় লোকটিকে কেউ তাতিয়েছে ও তারা সময় মত আসে নি। বুড়িমার গোত না এলে ও বেলা আর একটু বাড়লে, তারা আসত। বিসারুই আবার বলে, 'চারি পুখে জমি দখল। কে জানে বাপো কায় কাক তাতাছে? জমি চুরি য্যানং আছে, দখল চুরিও স্যানং হচ্ছে।' .....এই নতুন আধিয়ারের পেছনে পেছনে আরো চারজন এসে একটু আলাদা হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটি বাচ্চা তাদের পেছনে।

তাদেরই একজনকে দুখারু বলে, ' ই ক্যানং কথা টটেশ্বর। তোমরালা অ্যানং পুরানা মানষি, জোতদারের কালঠে আধিয়ার, তোমরালার জমিত এ্যানং গোলমাল?' টটেশ্বর বলে ওঠে। 'হামরালা এই সবের পাকে নাই। হামরালা গিরিনিক-কহিছু, হামরালা ওর পাকে নাই। উমরায় যা বোঝে গিরিনীর নখত বুঝুক।'

নতুন আধিয়ারকে বিসারু বলে, 'যা কেনে, তোর ঝান্ডা খুলি তোর-ঘরঠে-রাখি দে।' সে যেন এই কথাটুকুর জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। একা একা গিয়ে কঞ্চি সহ ঝান্ডাটা তুলে আনে, দাঁড়াবে কীনা বুঝতে পারে না। তার শালা সবে বলতে শুরু করেছে, 'ওর কথাখান শুনিলেন না আপনোঁ। জমি যদি খাস হয় তো উমরার তো একখানি দখল নতুন সরকারের আইনে থাকিবারই কথা।'

বিসারু বলে, "তোমরালা সাগাই আসিছেন, সাগাইখান। মোর এইঠে ঝামেলা পাকিবেন না।" ৬

এই অংশে গল্পটি হলো—ধরণী জোতদারনীর নতুন আধিয়ার জোতদারনীর জমিতে লালঝান্ডা পুঁতে দখল নিয়েছে তার শিলিগুড়ি থেকে আসা এক শালার পরামর্শে। এদিকে বুড়িমার জোতের লোকজন তাদের জমি দখল হয়েছে ভেবে ছুটে এসেছে। অনুমান করা হয় শিলশিলা জোতদার এর পেছনে রয়েছে। সব ভুল বোঝাবুঝি ও ঝামেলার পর—নতুন আধিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এবার সেই ঝান্ডা গাড়া নিয়েই বুড়িমার জোতের লোকজন, নতুন আধিয়ার, তার শালা, নতুন আধিয়ারের সঙ্গের লোকজন এদের মধ্যে কথোপকথন। কথোপকথনের ভাষা রাজবংশী। চরিত্রগুলো সবাই রাজবংশী। এই কথোপকথনের মাধ্যমে রাজবংশী মানুষের অনুভূতি সঠিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কথোপকথনের রাজবংশী ভাষা লেখকের বাংলা বাচনের অনুবাদ নয়, চরিত্রগুলির নিজেদেরই অনুভবের কথা। যেমন—'বিসারু বলে—মনতখায় কী ঐ শিলশিলা জোতদার উমরাক কহিছে, তুই ঝান্ডা গাড়ি দে, পাছত যাম। হামরালা আসি গেছি বাদে আর না আসে।' শিলশিলা জোতদার সম্পর্কে বিসারুর এই বিশ্বাসযোগ্য অনুমান রাজবংশী ভাষা ছাড়া ফুটে উঠত না।

শালা সবে বলতে শুরু করেছে। 'ওর কথাখান শুনিলেন না আপনোঁ। জমি যদি খাশ হয় তো উমরার তো একখান দখল নতুন সরকারের আইনে থাকিবারই কথা।' শালার এই উক্তি বহুস্বরিক। শালার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এখানে আমরা লেখকের কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছি।

রাজবংশী বাচনের সংলাপগুলি এতটাই বাস্তব সম্মত যে বক্তব্য শুধু শ্রুতিগ্রাহ্যই থাকে নি, হয়েছে দৃশ্যও

'টটেশ্বর বলে ওঠে, 'হামরালা এই সবের পাকে নাই। হামরালা গিরিনিক কহিছু, হামরালা ওর পাকে নাই। উমরায় যা বোঝে গিরিনিক নখত বুঝুক।'

নতুন আধিয়ারের সঙ্গী টটেশ্বর অবস্থা বুঝে তার সুর পাল্টে ফেলে। তার রাজবংশী বাচনে আছে নাটকীয়তা। সুতরাং বক্তব্যের বাস্তবতা, স্পষ্টতা, বহুস্বরিক ও নাটকীয়তা এসব বহু স্তরে বিষয়কে বিন্যস্ত করা গেল রাজবংশী বাচনের জন্যই। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তো এরকম উদাহরণের ছড়াছড়ি। বর্ণনার স্বাভাবিক গদ্যে রাজবংশী শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের ব্যবহার বাচনে অশ্রুতপূর্বতা নিয়ে এসেছে। বক্তব্যের অর্থ অধিকতর স্পষ্ট ও তাৎপর্য পূর্ণ হয়েছে। যেমন (১) "বাঘারু যখন নিশ্চিন্ত হয় যে তার দুই হাতের মুঠোর ভেতর বাছুরের ঐ একটুখানি মাথা পুরো সেঁটে আছে সে তখন ধীরে ধীরে শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে বাছুরটাকে টানে। বাঘারুর যেন হিসেব আছে, কখন, কতধীরে, আর কখন, কত তাড়াতাড়ি টানলে, পেটের ভেতরের আস্ত একখান বাছুর জলে রক্তে ভিজি বাহির হয়্যা আসি দুই ঠ্যাঙত খাড়া হবার পারে।" ৭

(২) "বুড়িমা তাহলে এই বুড়িমার জোতের কারো আবোর আবোর আবো, কারো হয়ত মাও, হয়েও, সকলেরই সব বেটাছোয়া-বেটিছোয়ার, সব বুড়ার সব ছোয়ার, পেটের ভিতরের সন্তান? সে-সন্তানটাকে দেখোঁ নাই কিন্তু সেই সন্তানখান প্যাটের ভিতরত্ গুঁতা মারে, ঘোরে, চক্কর দেয়।" ৮

রাজবংশী ভাষা, বর্ণনার ভাষা হিসেবেও ব্যবহার করার উদাহরণ উপন্যাস দুখানিতে পাওয়া যায়। যেমন—

(১) "কুন অং(রং) কুখন ফুটে উঠে আর মিলি যায়, না দেখা যায়, না বোঝা যায়। চক্ষুর পলকখান একবারে ফেলিবার মধ্যে আকাশখান আর এক ঝলক বদলি গিছে।' আগুনের নাখান অংটা দূরত-দূরত চলি যাচ্ছে, দু-ই পছিম পাখত তিস্তা নদীর পারত, তার পচিমে জলপাইগুড়ি সদরত, তার পচিমে কোটত কোটত আজ গঞ্জ—সবখানের আকাশ নাল (লাল) টকটকা হবা ধরিছে হে। এ্যালায় কুমলাইয়ের পুবত অংখান পাতলা হবা ধরিছে। কায় য্যান ঐ লাল অংটা ধুইবার-ধইচচে। আর-হু-ই তিস্তাপারের পচিম পাখ তক পাতলা হয়্যা যাছে। কোটত আলো কোটত যায়।" ৯

(২) "নাই রো, নাই রো। এইখান কি তোমার ফৌজদারি মামলা যে সাক্ষীক জেরা করিবেন? সব জিনিষের কি প্রমাণ হয়? সাক্ষী হয়? না হয়, না হয়। এইলা ভাদুরা রোদত পাহাড়ের কুন একখাড়ির মাথাত্ যে এক মহাবানা ঝুলি আছে, তার কি কুনো সাক্ষী থাকিবা পারে? প্রমাণ থাকিবা পারে? না পারো, না পারো। বুড়িমাক চোখের পাতা খুলিবার কেহ দেখো নাই। চক্ষুমুদি যে-বানা দেখিবার নাগে আর যে-বানা এক বুড়িমাই দেখিবার পারে। সে বানার সাক্ষী হয়? প্রমাণ হয়? বুড়িমা যখন কহি দিছে, স্যালায় বুড়িমা দেখিবা পাছে।" ১০

উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু রাজবংশী শব্দের বাংলা অর্থ সহ তালিকা দেওয়া হলো।

তিস্তাপুরাণ ঃ অ্যালং প্যালং (আজেবাজে), গলগলা (অধিক বয়সী), গুলগুলা (গলগলার সমার্থক), তাংকু (তামাক), ধোকর (পাতান বা সম্পর্কিত), ঢ্যানা (অবিবাহিত পুরুষ), ফিচকিলি (ধাঁধা জাতীয়), গিলাপ (চাদর বা কম্বল), ধকরা (চটের তৈরি মোটা ফরাস), ঢক (সৌন্দর্য), আয়ী (মা), গোঠো (একত্রিত, ছইনচা (দু'ঘরের মাঝখানের সরু জায়গা), এগিনা (উঠান), সোলংগা (ছোট নৌকা)।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ঃ হলহলা (সবুজ বা সতেজ), হায় হায় পাথার (ধু ধু মাঠ), সলসল (সোজা-লম্বা), সানজি (দু'আঙুলের মাঝখানের ফাঁক), নিদুয়া (ঘুমকাতুরে), কাছারপাড়ি (বিরাট স্ত্রী মোষ), ওই কিয়া (একা), ওয়ালিপাড়া (মরদ মোষ), অরনা (বুনো মরদ মোষ), দোমচা (অরনার ঔরসজাত মোষশাবক), কোশল (হরতকি), গর্জালবাড়ি (বর্ষার ঘাস জঙ্গল), খোপ (ঘন ঘাসের জঙ্গল), কিলকানি (কনুই)।

"তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর রাজবংশী বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। সুখবিলাস বর্মা 'তিস্তাপারের অস্থির (?) বৃত্তান্ত' প্রবন্ধে— 'রাজবংশী ভাষার ডায়লগের কী অবস্থা', বলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সংলাপ উদ্ধৃত করে ভাষা ব্যবহারের নানা ত্রুটি উল্লেখ করেছেন।

'কিন্তু কথাটা হইল, মোদের এই ক্রান্তি হাটত কুনো বাইরের পার্টি, সে সরকারের হবা পারে আবার ধরেন কেনে প্রাইভেট পার্টিও হবা পারে, যে কুনোদিন এমন হয় নাই যে তারা নিজেরা রান্না করিবার ধরিসে। এতো মোদের একখানা সুনাম দুর্নামের বিষয়।'

"রাজবংশী কথ্য ভাষার নিরিখে বিচার করলে এই ডায়ালগে যে ভুলগুলো জ্বলজ্বল করছে তাহল—কিন্তু, আবার, তারা, নিজেরা, একখানা, বিষয় যে কথাগুলো হওয়া উচিত যথাক্রমে কিন্তুক, আর, উমরা, নিজে নিজে, অ্যাখ্যান বা অ্যাকটা, ব্যাপার। এই কথাগুলি ঐ ভাবে না বললে রাজবংশী ডায়ালগ হয় না। কিন্তু

গুরুচন্ডালী দোষের ভুল রয়েছে মোদের কথাটির ব্যবহারে। 'আমাদের সর্বনামের রাজবংশী কথা 'আমার/হামার/আমারলার/আমারগুলার ইত্যাদি।.....উমরাক এবং কোটত এই দুটি শব্দ উপন্যাসে বহুল ব্যবহৃত যা দেখিয়ে দেয় যে এই ভাষার ব্যাকরণ ও কথ্যরূপ সম্পর্কে লেখকের প্রাথমিক জ্ঞান নেই। 'তিনি/উনি' এই সর্বনামের রাজবংশী কথা 'উমরা', কিন্তু তাকের রাজবংশী রূপ 'উমরাক' নয় 'উমাক'। 'কোথায়' এই স্থান সূচক অধিকরণের রাজবংশী শব্দ 'কোটে'/ কোন্ঠে/ কোঠে/ কুঠে ইত্যাদি 'কোটত' নয়। রাজবংশী ব্যাকরণে অধিকরণে সপ্তমীর 'এ' স্থানে 'ত' হয় এই সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেই বোধ হয় তিনি 'কোটত' ব্যবহার করেছেন। হায়রে অদৃষ্ট।"১১ শব্দ প্রয়োগের এমন ভুলের কথা ধরলে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে এরকম অসংখ্য ভুলের সন্ধান পাওয়া যাবে। যেমন-তিস্তাপুরাণে—

(১) 'তিস্তা স্যানং বড়-অ্যানং চওড়া।'

শুদ্ধ রাজবংশীতে হবে—'তিস্তা য্যানং বড় স্যানং চওড়া।'

(২) 'আরো পশ্চিমত ডায়না নদীখান দিয়া নামিবার নিতাম'

এখানে নিতামের স্থানে হবে—'ধরনু হয়/ধরনুং হয়/ ধইন্য হয়।'

(৩) 'আর জল ঢাকা থিক্যা পুবে।'

এখানে 'থিক্যা' স্থানে হবে 'থাকি'।

(৪) মোরা সোলংগাখান করি-নদীখান নদীখান দিয়া তিস্তা যাই।

এখানে 'মোরা' না হয়ে হবে 'আমরা'/হামরা'।

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে—

(১) উমরার শুকনা মালগাড়ি ত এখন মালস্টেশনে আসে।

এখানে 'উমরার' না হয়ে হবে উমার/ওমার।

(২) 'না, এমনিই ধরেন, হামরালা ত তিস্তার পুব পাখে খাড়ি আছি, আমাদের পাছত, মানে ধরেন কিনা আরো উত্তরে আর পুবে চালসা, হায় হায় পাথার।' এখানে 'আমাদের' না হয়ে হবে আমরালার/হামরালার।

(৩) 'তুই থাকি যা না আজিকার রাতটা, এইঠে, বাথান নিয়ে, কাঠ পাহারা দিবু। পাইসা পাবু।'

এখানে 'রাতটা' স্থানে হবে 'রাতিটা'/'আতিটা'। 'নিয়ে' স্থানে হবে 'নিয়া'

(৪) দেখিবার নাগে ঐঠে কি সত্যিই একখান নতুন নদী বানিবার ধরিছে, নাকি; ময়নাগুড়ির ঐ

বেটিছোয়াখানের নাখান নাচানাচি নাগাবার ধরিছে।'

এখানে 'সত্যিই' না হয়ে হবে 'সচায়'/হাচায়।

(৫) 'আচ্ছা, আচ্ছা·মুই এইঠে আসিছু, যাবি ত মাই?

এখানে 'যাবি' না হয়ে হবে 'যাবু'।

'কোথায়' অর্থে 'কোটত' শব্দটি নিয়ে বড় আপত্তি তোলা হয়েছে। 'কোটত' শব্দটি তিস্তাপারের বৃত্তান্তে মোট ৫৫বার এবং তিস্তাপুরাণে মোট ১৪৪ বার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে—

(১) তোমাক কোটত হাল দিবার কহিবে?

(২) কোটত স্যায় শেয়ালখাগের বেটা, শালো ছাগির ছোয়া।

(৩) কোটত, কোটত, ভুরুর ওপর হাতের ঢাকা দিয়ে অনেকে চেষ্টা করে।

(৪) কোটত মাথা আর কোটত ল্যাজ।

(৫) তার আগত মোর নামখান আর আসিবে কোটত? ইত্যাদি—

তিস্তাপুরাণে—

(১) কোটত তোর ইংজারি?

(২) কোটত, আগুন জুটিবে কোটত?

(৩) মা-জননী কোটত আসিলেন, কোটত যাছেন.....তিস্তা বুড়িমা কোটত আসিলেন, কোটত যাছেন?

(৪) তিস্তাকে কি জিজ্ঞাসা করা যায় কোটত আসিলেন আর কোটত যাছেন?

(৫) রো রো রো, মোক ছাড়ি কোটত যাছেন? ইত্যাদি।

রাজবংশী বাচনে 'কোটত' শব্দটির ব্যবহার উত্তরবঙ্গের কোনো অঞ্চলেই নেই। সুতরাং বলা যেতে পারে শব্দটি লেখক তৈরি করেছেন ঘরোত, বাড়িত, ঘাটোত, বগলত ইত্যাদি অধিকরণে 'ত' বিভক্তি যোগে গঠিত শব্দগুলির অনুকরণে। 'কোথায়' অর্থে রাজবংশীতে 'কোটে', কোনঠে, কুনঠে শব্দগুলি অঞ্চল ভেদে ব্যবহার করা হয়। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণেও কয়েকটি স্থানে তিনি শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।

যেমন — তিস্তাপারের বৃত্তান্তে—

(১) না, না এখানে শুকনা লঙ্কা হয় কোটে?

(২) মানষিলা তো মোক বাঘারু নাম দিয়াই খালাস, কিন্তু মুই লাগাম কুনঠে?

(৩) তা তোর নামখান শেষ হইল কুনঠে?

(৪) মা না থাকিলে মুই আসিম কুন্‌ঠে?

(৫) গয়ানাথ এই ফ্লাডের নদীর ভেতর কোনঠে মোক খুঁজিবার পাবে হে?

'কোটে' একবার, 'কুনঠে' তিনবার ও কোন্‌ঠে একবার ব্যবহৃত হয়েছে।

তিস্তাপুরাণে—

(১) কোটে রাখিবেন ঐলা বস্তা?

(২)হাঁচিবার ধরিছেন আর কোন্‌ঠে কুন নদীতে একোখান সোলংগা দেখিলেন কী দেখিলেন না, স্যালায় ঘাটোয়াল, ঘাটোয়াল বলি ডাক পাড়িবার ধরিছেন?

(৩) ঘাটোয়াল লগিটা জলে ফেলতে ফেলতে, নিজেকেই বা পাইকারকে জিজ্ঞাসা করে যাম কোন্‌ঠে?

(৪) দোলানই একবার বলে ওঠে 'বেটিছোয়াগিলা কুনঠে গেইল?

এখানে একবার 'কোটে', দু'বার 'কোন্‌ঠে' ও একবার 'কুনঠে' ব্যবহার করা হয়েছে।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণের আগে রচিত 'মফস্বলি বৃত্তান্তেও 'কোন্‌টে' ও 'কোন্‌ঠে' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

(১) বৈশাখু সোজা হয়, 'চল কেনে, একদম মাছ নাই, আর কোন্‌টে পোয়া যায়?

(২) বেঙ্গু চিলের মতন চিৎকার করে ওঠে 'মা কুনঠে চাউল পাবে?

(৩) ধুত্ আর দেরি কুন্‌ঠে, অ্যালায় বেলা দুপ্‌পর হসে এর বাদে বেলা নামিবার ধরিবে।

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে দেবেশ রায় - 'কোথায়' অর্থে কোটে, কোন্‌ঠে, কোন্‌টে বা কুন্‌ঠে'র ব্যবহার জানেন না বলে 'কোটত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা ঠিক নয়।

আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি আঞ্চলিক ভাষায় একটি আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যে লেখক 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' বা 'তিস্তাপুরাণ' লেখেননি। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার—আখ্যানকে নানাস্তরে নানা অর্থে পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে। সেজন্য রাজবংশী ভাষার চলিষ্ণুতার দিকে তাঁর যত লক্ষ বিশুদ্ধতার দিকে তত নয়। এ প্রসঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতটি প্রণিধান যোগ্য। "কিন্তু তিস্তাপারের বৃত্তান্তে ভাষা

আদৌ নিরেট বা নিশ্চল নয়, নেহাত অলংকরণ নয়। তেমন ঘটলে উত্তরবাংলার এলাকাটি পরিণত হত স্থানু জগতে, আর পাঠক, সেই ভূখন্ডের শৌখিন পর্যটকে; ..... কিন্তু এ উপন্যাস তার কাছ থেকে দাবি করে সক্রিয় শরিকানা, টেনে আনে উদ্দিষ্ট পাঠককে ইতিহাসের মধ্যে। সে ইতিহাসের টানেই তিস্তাপারের কোনো ভাষার, বাংলা হোক বা রাজবংশী, সুস্থিত আদলই নেই।" ১২

আঞ্চলিক ইতিহাস ধরবার জন্য, অঞ্চলের মানুষের জীবনালেখ্য চিত্রনের জন্য লেখককে প্রয়োজন মত ভাষার অদলবদল বা নবরূপ নির্মাণও করতে হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার নিয়ে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেছেন—"ডায়ালগ নতুন করে তৈরি করতে হয়। আমি সেই ডায়ালগটাই দেব যাতে মনে হবে যেন একটা লোকাল কালার আছে; কিন্তু কোনো লোকালিটি নয়— সেটা সর্বজন বোধ্য হবে।" ১৩

আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মতো তিস্তাপুরাণের ক্ষেত্রেও খাটে। সেখানেও রাজবংশী ভাষার চলিষ্ণু দিকটির প্রতিই লেখকের নজর। সেখানেও আঞ্চলিক ভাষার 'খরশান', লোকায়তিক 'পৌরুষ'। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'-এর ভাষা রীতি আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে তাঁর রচনা রীতি যেমন বিচিত্র ও অভিনব, ভাষা-রীতিও তেমনি অভিনবত্ব দাবি করে। ভাষা যেমন বিষয়ানুগ তেমনি যেন নিজেই একটা বিষয় হিসেবে হাজির হয়েছে। পদ বিন্যাসের নানা ধরন ভাষায় শুধু বৈচিত্র্যই আনেনি এনেছে বাক সুষমা, বাক্য গঠনের নতুন ভঙ্গি। ঘটমান অতীতকালের 'করছিল' 'দেখছিল' নিত্যবৃত্ত অতীতের 'করতেন', 'দেখত' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন বাক্যগুলিতে অতীতের ঘটে যাওয়া কাজের বিবরণ দেওয়ার সুবিধা যেমন তিনি নিয়েছেন তেমনি ঘটমান ভবিষ্যতের দেখতে থাকার, করতে থাকার সুবিধাও নিয়েছেন। অনুজ্ঞাবাচক বর্তমান-এ 'হাটুক, হাটুক, হাটুক' ক্রিয়াপদের ব্যবহার বৃত্তান্তের চলমানতার ইঙ্গিতবাহী। কথা বিস্তারে, কথান্তরে ও অনুপুঙ্খ বর্ণনায় অতীত ও ভবিষ্যতকালের ব্যবহার দুটি উপন্যাসকেই মহাকাব্যিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

"আর্টিস্টের সামনে উপকরণ আছে বিস্তর— সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মত। তার কোনোটাকে বাড়াতে হবে কোনোটাকে কমাতে; কোনোটাকে সামনে রাখতে হবে কোনোটাকে পিছনে। বাস্তবে যা বাহুল্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ত তাকে এমন করে সংহত করতে হবে যাতে আমাদের মন তাকে সহজে গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।" ১৪

উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন, গ্রহণ, বর্জন, বাড়ানো, কমানো সব কাজটাই নির্ভর করে ভাষার ওপর। দেবেশ

রায় তাঁর নিজস্ব ভাষার ভঙ্গিতে বা ভাষারীতিতে সে কাজ সম্পন্ন করেছেন। এভাবেই তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে লেখকের বর্ণনায় চরিত্রের সংলাপে, বহু মানুষের আঞ্চলিক কথোপকথনে হয়ে উঠেছে বহুস্বরিক দুই নব পুরাণ।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র ভাষারীতি

সময়ের দিক থেকে বিচার করলে উপন্যাস সাহিত্য শাখায় একেবারেই অবাচীন। এই অর্বাচীনতার কারণে উপন্যাস সাহিত্যের অন্যান্য শাখা — কবিতা, নাটক ইত্যাদির চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন এবং সর্বাধিক শোষণ ক্ষমতাযুক্ত। অন্যান্য শাখা গুলি যেমন নানা বিধি নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, উপন্যাস তা নয়। সে অনায়াসে সকল সাহিত্য শাখার বিবিধ উপকরণ, আত্মস্যাৎ করে নিজের রূপ তৈরি করে নিতে পারে। সে জন্য আজ পর্যন্ত উপন্যাসের তেমন কোন আর্টফরম গড়ে উঠতে পারেনি। উপন্যাসের আবেদন সম্পর্কে মার্ক স্কোরার বলেছেন—" as Though it were not at all but an immediate transcript of life, a journalistic form of history,"১৫ চারপাশের পরিচিত জীবন যেমন উপন্যাসের আবেদন অনেকটা তারই অনুরূপ।

বহু বিচিত্র জীবনের কথা বলা উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষারীতিও বহু বিচিত্র হবে এটাই স্বাভাবিক। উপন্যাসের ভাষা গদ্য। কিন্তু কাব্য, নাটক, ও অন্যান্য আঙ্গিকের ভাষা রীতিও উপন্যাসের ভাষার লক্ষ হয়ে যায়। সুতরাং উপন্যাসের মত উপন্যাসের ভাষারীতিরও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপন করা সম্ভব নয়। বরং বলা যেতে পারে উপন্যাসের গদ্যরীতির সঙ্গে এ এক বেগবান প্রবাহ।

উপন্যাসের যে বিভিন্ন প্রকরণগত উপাদান আছে যেমন কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশ, ভাষা ইত্যাদি — এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভাষা। কারণ সব উপাদানই সরব ও সজীব হয়ে ওঠে ভাষার মাধ্যমে। উপন্যাসের কেবল বহিরঙ্গ নির্মাণই ভাষার কাজ নয়, তার অতিরিক্ত আরও গভীর তাৎপর্য পূর্ণ কোনো কিছুর সংযোজন ঘটে এই ভাষার মাধ্যমে। সে জন্য বলা হয়েছে—" Language like clay or print, is a transfiguring material, not a lens, through which the artist projects his vision" ১৬

ভাষারীতি সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক অনিল কুমার সেনগুপ্ত প্রায় অনুরূপ একটি মন্তব্য করেছেন। "প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসের প্রকাশ ভঙ্গি বা ভাষারীতির মধ্যে স্রষ্টা-শিল্পীর ব্যক্তিত্বই পরিস্ফুট

হয়ে ওঠে। .....শিল্পীর যে বিশিষ্ট 'মুড' থেকে সেই উপন্যাসের জন্ম, সেই বিশিষ্ট মুডের সঙ্গে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর যেমন নিবিড় সম্বন্ধ, তার প্রকাশ ভঙ্গির সঙ্গে সমন্বয়ের নিবিড়তা ততখানি। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে বর্ণনার ভাষা বিষয়বস্তুর 'অনুগত' নয় 'সহগামী'। বর্ণনা, বিশ্লেষণ, বাক্য প্রয়োগ, শব্দ নির্বাচন, চিত্রকল্প রচনা সকল কিছুই সে ক্ষেত্রে শিল্পী মানসের সেই মুডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বর্ণনীয় বিষয়ের রস সার্থকতা সম্পাদনা করে। তার ফলে প্রত্যেকটি সার্থক সৃষ্ট উপন্যাসের ক্ষেত্রেই ভাষারীতির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে।" ১৭

এ উপন্যাসের ভাষা শুধু বক্তব্য প্রকাশের বাহন নয়, স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত। উপন্যাসটি যুগপৎ বাংলা ও রাজবংশী ভাষায় রচিত। বাংলার মধ্যেও মাঝে মধ্যে এসেছে ওপার বাংলার বাচন রীতি। লেখকের বর্ণনার ভাষা, চরিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাষা ও সংলাপের ভাষা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে।

বর্ণনার শিষ্ট বাংলায় কখনো অনায়াসে ঢুকে পড়েছে রাজবংশী শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ। আবার রাজবংশী বাচনে শিষ্ট শব্দের ব্যবহার। যেমন বর্ণনার শিষ্ট বাংলায় রাজবংশী শব্দ —"বাসে হাইওয়েতে নেমে, বাসের মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে রিক্সায়— রিক্সায় কয়েক মাইল দূরের হাটে যাওয়ার সুবিধে। কিন্তু যারা দক্ষিণে চক মৌলানি বা উত্তরে সেই হায় হায় পাথার থেকে টাড়িবাড়ি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, নদীনালা পেরিয়ে বাঁকে বা মাথায় বোঝা নিয়ে, গরু ছাগল তাড়িয়ে তাড়িয়ে রাস্তা ছোট করতে করতে আসে। তাদের আর এই পাকা রাস্তা টুকুতে রিক্সার দরকারটা কী?" ১৮

'হায় হায় পাথার' ও ' টাড়ি বাড়ি' শব্দ দুটি রাজবংশী শব্দ। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'র ভাষারীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ভাষার প্রবাহমানতা। তিস্তার জল প্রবাহের মতোই এর ভাষা গতিশীল। সে জন্য কোথাও কোথাও একের পর এক সরল বাক্য কোনো সংযোজক অব্যয় ছাড়াই বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাতে বাক্য হয়েছে আকারে বড়। কিন্তু ',' কমা দিয়ে দিয়ে সরল বাক্য গুলির সংযুক্তি ভাষায় এনেছে প্রবাহমানতা।

"সেই তরুণ শালতরুর শেকড়ের ওপর পা রেখে গয়ানাথ তার জামাইকে আদেশ দেয় — ' ভটভটি খান নিগি যা, টর্চ আনিবু, তোর বড় টর্চ খান, বাঘারুক আনিবু, ভাল একখান কুড়ালিয়া আনিবু, নাইলনের দড়ি আনিবু, এক বান্ডিল কি দুই বাণ্ডিল, মোটা নাইলন,' — তিস্তার দিকে তাকিয়ে গয়ানাথ তার একটা আন্দাজ দেয়, দুই হাতের আঙ্গুল গুলো দিয়েই আন্দাজ দেয়।" ১৯

এরকম প্রবাহমানতার আর একটি কৌশল ছোট ছোট সরল বাক্য দ্বারা বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা। সেরকম

দৃষ্টান্তও তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বিস্তর।

ক) " হলকা ক্যাম্প। সেটেলমেন্টের। এই জমি জমা মাপা মাপি হবে। কোন জমি কার এই সব। তার ওপর কোন জমিতে কে চাষ করছে সে সব রেকর্ড হবে।" ২০

খ) "বাঘারু নদীতে নামে। পায়ের গোড়ালি ছাপিয়ে জল ওঠে। স্রোত পা বেয়েও খানিকটা উঠতে চায়। বাঘারু পা টা জলে ফেলেই স্রোতের টান বুঝতে পারে। বাঘারুর পা-টা পেয়েই স্রোতটা একটু সঙ্কুল হয়ে ওঠে। আওয়াজ একটু বদলায়। জলের সারা রাতের উষ্ণতা বাঘারুর পা বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। বাঘারু পা ফেলে। পায়ে লেগে নুড়ি গুলো ছিটকে যায়। নদীর মাঝামাঝি একটা চওড়া পাথরের ওপর বাঘারু দাঁড়ায়।" ২১

গ) "গয়ানাথ মোক এইঠে পাঠাছে। বাথান করিবার। মুই আধি চাহ নাই। মোক বাথান দিছে, এইটে মোক কায়ও খুঁজি পাবেন না। মুইও কাক পাম না। মুই এইঠে আগত আসি নাই রো। মুই এইঠেকার বন চিনি না রো। গয়ানাথ মোক এইটে পাঠাছে। মোর অচিনা জায়গাটাত পাঠাছে। মোক উদাস করিবার তানে পাঠাছে।"

প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে অবগত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবাচক বাক্যের ব্যবহার তিস্তাপারের বৃত্তান্তে লক্ষ করা যায়।

ক) "বাঘারুর কাজের পরিচয়টাতেই সে নিজে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে সেই পরিচয় ছাড়া এই একজনের সম্মুখীন হতেও তার সঙ্কোচ হয়"? ২২

খ) "এতক্ষণ বাঘারু আর তার মোষ ছাড়া এই কাঠ সরানো চলছিল কী করে?" ২৩

গ) "কিন্তু কিছু একটা ঘটেছে, ভোখা বোবা বনি গেইছে, তয়? তয়? হঠাৎ বাঘারুর সন্দেহ জাগে 'পোয়াতির বাচ্চা হওয়া ধরিল: নাকি? এল্যায়?'" ২৪

বাক্য গঠনে দেবেশ রায় নানা বৈচিত্র এনেছেন। যেমন —

১) ব্যাকারণের গঠন রীতি না মেনে —

ক) "বাঘারু লোহার পাতের একটা বাণ্ডিল: ছোট দেখতে পায়।" ২৫

খ) "সে বোঝার চাইতেও বেশি বাঘারুকে গত দশ বার বছরে মাত্র এই তৃতীয়বার আত্ম পরিচয় সংক্রান্ত সংলাপে বাধ্যত অংশ নিতে হল"। ২৬

গ) "যেন এই খবর, এই খবর জানার আনুষঙ্গিক ছিল— অন্তত এমন কিছু নৌকো, যা সারারাত ধরে এই

চরের মানুষের সংসারকে ডাঙ্গায় নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে।" ২৭

২) রাজবংশী জটিল বাক্য— 'আমরা যেই টাইমে ওই সব আলোচনা করিবার ধইচছি, আলোচনা আর কথাবার্তা চলিছে, আর আমাদের কুনো মানষি যখন জমিতে নাই, সগায় গেইসে সার্ভের জায়গায়, রিশিকেশ গান গাহিবার ধরিছে, স্যালায় এই বীরেনবাবুর ঘর, এই কোম্পানীর ঘর, আমাদের পাছত দিয়া, লুকাইয়া আমিনবাবুকে দিয়া এইঠে আমাদের জমিতে চেইন ফেলিছে।" ২৮

৩) বর্ণনার ভাষায় শিষ্ট বাংলায় জটিল বাক্য —

ক) "চারিদিকে বালিরডাঙার মাঝখানে একটুখানি কাল জল টলটল করত — বাচ্চারা সাঁতার কাটতে পারে এই রকমই জল- এই ক'দিনের বাতাসে সে পুকুর ভরে গেছে, তার ফলে জায়গাটিই হয়ে গেছে ফুটবল মাঠের মতন সমান।" ২৯

খ) "শুনতে পাচ্ছে— তিস্তার ভূখন্ড বদলানো যে বন্যা পাহাড় থেকে নামছে এই চর, ও এই রকম আরও অনেক চর, বা গ্রাম, বন, ভাসিয়ে নতুন রকমে ভূখণ্ডটাকে সাজাতে, সেটা পৌঁছবার আগেই চরের প্রথম উদ্বাস্তুর পাল অনভ্যস্ত সময়ে চার পায়ে পথে নেমে প্রায় অন্ধের মত এই নদী তীরে ছুটে আসছে।"৩০

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে বড় জটিল বাক্য যেমন আছে তেমনি আছে ছোট বাক্য, দু'তিনটি শব্দে, এমন কি একটি শব্দেও। 'চৌদ্দ' অধ্যায়ে সুহাসের সঙ্গে আলাপচারিতায় বাঘারুর কথা গুলি ছোট ছোট বাক্যে।

'এইটে ত অনেক ফরেস্টার। অনেক বর্মন।.....। হুজুর। দেখি নেন।..... ত দেখাও।.....। তুলো হে তুলো।'

'একশ সাতাশি' অধ্যায়ে বাঘারুর তৃতীয় সংলাপের ভাষাতেও বাক্যের ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম রূপ —

'ত গয়ানাথ তোমাক ছাড়ি আর কাহাকও কহে না?'

'না জানো।'

' গয়ানাথ কহিলে সব মানুষ মিছিল ধরিবে হাটত?

'ধরিবে।'

.....।

'এর বাদে কুন হাট বড় হাট?

ক্রান্তির হাট।'

'মুই কম গয়ানাথক ঐ হাটত থাকিবার?

'কহেন।'

এতে সংলাপের ভাষার বহু স্বরিক রূপটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বক্তব্য বিষয়কে সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় নিবদ্ধ করার জন্য জটিল বাক্যের ব্যবহার তিস্তাপারের বৃত্তান্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য। "কিন্তু এখন এমন সব ঋতু বিপর্যয়, যখন পাহাড় থেকে ঢল নেমে নদীকে ক্রমেই করে তুলেছে যে কোনো আয়তনের পক্ষেই অনেক বড়, যখন জলের রং চেনা বদলে গেছে, জলের ওপর হুমড়ি খেয়ে তার একেবারে ঘোলাটে মেঘের মত সাদা রং, ফেনা, আর ফেনা কেটে গেলে আচমকা কাদাগোলা জল চিনতে হয়, যখন জল যেন নদী বয়ে আসছে না— নদীময় পাতাল থেকে উথলে উঠছে, তখন বাঁধের ঠিক নীচেই নদীর গভীর ভেতর থেকে ভাদই চিৎকার করে ধমকে ওঠে বাঁধের ওপর মহেশ্বর জোতদারকে — বাবা গে, বাঁশ ফেলিদাও, বাঁশ ফেলিদাও।" ৩১

শিষ্ট বাংলায় রাজবংশী বাক্য —

" বাঘারু ও রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ঘিরে ছেলেদের নাচ ভেদ করে মঞ্চে শ্রীদেবীকেই যেন শুধু দেখে। দেখে, বেটি ছোয়াখান ক্যানং তলপেটখান উঠাছে নামাছে, উঠাছে নামাছে।" ৩২

বর্ণনার ভাষা পুরোপুরি রাজবংশী —

"বাঘারুর ত এই পাতা গুলান নাগে। যেইটে যাছে বাঘারু, ঐঠে যদি এইলা বড় বড় তরিকা পাতা সাইজের পাতা গিলা, এ, ধর কেনে একখান হবা ধরিবে সিকিখান দশফুটি টিন। তা ধর, কেনে, চারখান পাতা জোড়া লাগিলে—একখান টিন হয়্যা যাবে। আর দুইখান টিন পাঁশত দিবে—ব্যাস, বাঘারুর এই ঠাং দুটা বাদ দিয়া বাকি শরীরখানের উপরে চালা উঠি যাবে।" ৩৩

রাজবংশী বাচনে শিষ্ট বাংলা —

"আচ্ছা ধরেন কেনে, কংগ্রেসই সম্মিলন করিছে, শ্রীদেবীকও নাচাচ্ছে। স্যালায় ত তোমরালা কিছুই করিতেন না। এই হেমেন দা, একখান বুদ্ধি করো।" ৩৪

রাজবংশী যুবক সুস্থিরের বক্তব্যে শিষ্ট বাংলার সঙ্গে রাজবংশী মিশ্রন পাওয়া যায়—

"হেমেনবাবু এম এল একে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর কথাই বলি দিছেন।" ৩৫

রাজবংশী বাচনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার —

'না, না, এখানে শুকনো লঙ্কা হয় কোটে? এইঠে ত শুকনা লঙ্কা না হয়। ধরেন, এই ক্রান্তির হাটতও বছর খানিক আগতও শুকনা লঙ্কা না আছিল। তখন নারায়ণ প্রসাদের গোডাউন ছিল শিলিগুড়ি।'

"সে ত এই বছর খানেক আগে খুলি গেইছে। ত ফ্যাকটরি ত আর চলে না। গ্রিনটি বেচা হয়া যায়।" ৩৬

রাজবংশী বাক্যে বিকৃত উচ্চারণে ইংরাজি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—" খাড়াও হে হুজুর। তোমার টর্চখান আর চোখত না ফেলো। হ্যা, রেডি, ওয়ান-টু- থিরি।" ৩৭

তিস্তাপারে ঐতিহাসিক কারণে, দেশ ভাগের পরিণতি হিসেবে পূর্ববঙ্গাগত 'ভাটিয়া' দের বাস । বিশেষ করে চর এলাকা গুলো পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র মানুষদের দ্বারা অধিকৃত। ওদের মুখের ভাষায় এসেছে পূর্ববঙ্গের বাচনরীতি, উচ্চারণ, শব্দ, বাক্য, প্রবাদ, গান, ইত্যাদি। আবার কখনো রাজবংশী মিশ্রনও ঘটেছে

"কেডায় কইছে ব্রিজ হব, অ্যাঁ, কেডায় কইছে? নে, বাবা, আমরা ত পইড়লাম গিয়া, সাত হাত জলের তলায় ত ধরেন গিয়া, ঐ ফুল ঝোরার ব্রিজ নিয়্যা ত গত ত্রিশ বছর ধইর‍্যাই কত কাণ্ড। আমি যখন ধরেন বিশ বছরের জুয়ান তখন খগেন দাশগুপ্ত মন্ত্রী। আর সেই কী কয়, আরে তখুন মাল বাজার জেনারেল সিট, কী নাম সেই এমএলএ তারে তখুন কইলেই কয়, হয়্যা গেল গা, এই ধর সামনের বর্ষার আগেই হয়্যা যাবে নে, একবার ত কাণ্ড—"৩৮

উত্তরবঙ্গের চা বাগান গুলিতে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা পুরুষানুক্রমিক ভাবে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছে। তাদেরকে মদেশিয়া বলা হয়। এদের কথাও উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ফলে মদেশিয়া ভাষা, রাজবংশী-ইংরেজি মিশ্রণে মদেশিয়া ভাষা নানা ঘটনা বা প্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে। তাতে চরিত্র ও ঘটনা অধিকতর বাস্তব সম্মত হয়েছে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মদেশিয়া জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানের দিকটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"সাথিমন, চা বাগান কো লেবার লোক অউর কিষাণ লোক দুষমন নালে। ভাই ভাই হ্যায়। সাথি সাথি হায়। এককো দুখ অউর কো বুঝনা পড়লেক। নাহি বুঝলে তঁ মালিকমন মজুরকো অউর কিষাণকো খতম করনে পড়ে।" ৩৯

মদেশিয়া ভাষায় এরকম বক্তৃতা বা আলাপ চারিতায় অনায়াসে ঢুকে পড়ে ইংরেজি শব্দ। চা বাগান এলাকা বলে — বাঙালীবাবু, শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে থেকে এসব ইংরেজি শব্দের আমদানি।

"লেকিন সাথিমন, হামার এই ক্ষেতিপর এক খারাপি কাম হলেক, কী না, চিয়া বাগান কো ভেস্ট ল্যাণ্ড

পর কিষাণ লোকোঁ জবর দখল কায়েম করতা থে। এতনা জবর দখল যে ই গবমেন্টকো সেটলমেন্ট ভি উ হোনা নাহি দেগা। .....হামনি মনকো ই ডিম্যাণ্ড হ্যায় কি যো ই ভেস্ট জামিন কো পুরা মাপ করনে হো গা, অউর কোন কো পাশ কেতনা জামিন হ্যায় ইসকো লিস্ট বাহার করনে হোগা।" ৪০

কিন্তু মদেশিয়া আলবিশ যখন বাগানের বাঙালীবাবু বীরেনবাবুদের সঙ্গে কথা বলে তখন বাংলা রাজবংশী মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষা তৈরি করে ফেলে— 'তোহার মাল কি কার (মালিকেরা) এতনা ঠিকা মজদুরকো কামমে লেতা রোজ, লেকিন কোইকো পার্মানেন করনে সে ত বুঝ আতা হ্যায়, কিয়া, না — ই বাগানপর কাম হ্যায় বহুত, ইসকো অউর জমিকো জরুরত হ্যায়।" ৪১

রাধাবল্লভ পূর্ববঙ্গের লোক হলেও তার বক্তব্যে কেমন আনায়াসে রাজবংশী শব্দ এসে পড়েছে "এই আলবিশ চলেন, এদের সঙ্গে আর কী কথা হবে। ঠিক আছে, আপনারা যা করার করেন। এখন হাটে হাটে ঢোলাই দেন রাধাবল্লভ সাহা ভাটিয়া, ও কেন রাজবংশীদের নিয়ে জমি দখল করে। তারপর চাঁদা দিয়া মানষি দিয়া একটা উত্তরখন্ড পার্টি খাড়া করেন।" ৪২

দেবেশ রায় ভাষা নির্মাণে অত্যন্ত সচেতন। শব্দ ব্যবহারের কুশলতাতেই চেনা যায় উপন্যাসের স্থান, কাল ও পাত্র-পাত্রীদের। উপন্যাসের স্থান উত্তরবঙ্গ, তিস্তাপার। জায়গার নাম গুলি চিহ্নিত করে দেয় এই অঞ্চলটিকে— গাজোলডোবা, ওদলাবাড়ি, লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পদমতী, রংধামালি, দোমোহনি, কাশিয়াবাড়ি, সিদাবাড়ি, চর দুই নম্বর, শিলিগুড়ি, নকশাল বাড়ি, ধূপগুড়ি, জটেশ্বর, ফালাকাটা, মাদারিরহাট, ডায়নার চর, সাকোয়াঝার ইত্যাদি।

সময় বামফ্রন্টের আমল। তাই কিছু রাজনৈতিক শব্দ আমলটিকে চিনিয়ে দেয়। জোতদার, জরিপ, আধিয়ার, খাশ, জোত, পাট্টা, পার্টি, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, নকশাল, উত্তরখণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড, বিচ্ছিন্নতাবাদী, কমরেড, দখল, উচ্ছেদ, বামফ্রন্ট, শ্রেণিসংগ্রাম, ডিমাণ্ড-ব্যুরোক্রোসি, এম এল এ, হাকিম, স্লোগান ইত্যাদি।

কথকের বর্ণনার ভাষায় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, রাজবংশী, ভাটিয়া, মদেশিয়া, চাষি, মজুর, রাজনৈতিক, আন্দোলনকারী, প্রত্যেকের মুখে পরিস্থিতি অনুযায়ী কমবেশি ইংরেজি শব্দ বসানো হয়েছে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় এক বা একাধিক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন — সাইনবোর্ড, ক্যাম্প, সিজন, ইনজাংশান, কালচারাল ফাংশান, আর্টিস্ট, রেকর্ড, ম্যানেজ, অ্যালাউন্স, টেনশন, ট্রাইবেল, পপুলেশন, কনট্রাক্টর, ইন্টার প্রভিনশিয়াল, গ্রিনটি, গেজেটিয়ার, সেনস্যাস রিপোর্ট, বুর‍্যোক্রাসি, সিগারেট, সাউথ ইষ্টার্ন

বর্ডার, একসেলিরেটর, টি এস্টেট, এনলার্জড আউটলাইন, ম্যাপ, ক্রশ, ডিমার্কেশন,, ডিক্লিয়ার, স্পিল এরিয়া, টাইম, এমার্জেন্সি, রেসকিউ, কম্যাণ্ড্যান্ট, ডিসপার্স, এটেনশান, ডিস মিস, আরগু, সার্কিট হাউস, এনট্রেপ্রানিয়ুর, এ্যাকমোডেশন, স্লুইসগেট, ব্যারেজ, ইউনিয়ন, মিনিষ্টার, ইত্যাদি। জমি জরিপ, চা বাগানের ঘটনা, বন্যায় বাঘারুর উদ্ধারের ঘটনা, সীমান্ত বাহিনীর কার্যকলাপ এসব নানা ঘটনা ও কাজের জন্য ইংরাজি শব্দের এত প্রাচুর্য।

কিছু ইংরাজি শব্দ বিকৃত উচ্চারণে কিছু অশিক্ষিত চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়ে ভাষায় একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। যেমন — ইংজেরি (ইংরেজি), এমেলিয়া (এম এল এ), এলাউন্স (এনাউন্স), প্যারিড (প্যারেড) , থিরি (থ্রি), পেরাকটিস (প্র্যাকটিস), ওর্নিং (ওয়ার্নিং), প্যাকিট (প্যাকেট), সিগিরেট (সিগারেট), ট্যানেসফার (ট্রান্সফার), এডিও (রেডিও), এসকু (রেসকিউ), রিকুয়েস্ট (রিকোয়েস্ট), ফন্ট (ফ্রন্ট) ইত্যাদি।

কিছু পূর্ববঙ্গীয় "ভাটিয়া" শব্দ উপন্যাসের শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে — যেমন — নকুইল্যা, কওয়ন, শ্যাষ, সুদ্ধা, কইলকাত্তা, সক্কল, খানতক, নরেইশ্যা, হ্যায়ন, হউগ্যা, অহন ইত্যাদি।

সঠিক উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ বক্তব্যকে যেমন অতি স্পষ্ট করে, নির্দিষ্ট করে, তেমনি ভাষা সৌন্দর্যও সৃষ্টি করে। তিস্তাপারের বৃত্তান্তের উপমা অলঙ্কার রাজবংশী, মদেশিয়া, ভাটিয়া জীবন ও তিস্তাপারের নিসর্গ থেকে নেয়া।

১) "বটগাছের গুঁড়ির মত ভুয়োদর্শী মোঙ্গলয়েড মুখ চামড়ার অসংখ্য কুঞ্চনে নদীর চরের মত জেগে থাকে"। ৪৩

২) "কোন নদী বা সোঁতা তার বহু দিনের খাত থেকে উঠে আসে যেন মাটির সঙ্গে লেপটে থাকা হাতি হঠাৎ তার শুঁড়টা প্রথমে আকাশে নাচিয়ে তারপর দুই তিন ধাক্কায় এক ঘুর্ণিঝড় তুলে, জেগে উঠল, আর নিজের এতক্ষণের ঘুমের ক্ষতি পোষাতে, যে দিকেই চোখ যায় সে দিকেই, খানিকটা ছুটে আবার ফিরে আসে, তার পায়ের চাপে ধুলোর ঝড় ওঠে, তার গা থেকে ধুলোর ঝড় ঝরে, তার শুঁড়ের ঝাপটা শুকনো ঝড় মাটি থেকে আকাশে লাফিয়ে ওঠে হঠাৎ।" ৪৪

৩) "সে স্রোত নয়, স্রোতে বাহিত— তিস্তার স্রোতের টানে যেমন ওপড়ানো শালগাছ ছোটে" ৪৫

প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার তিস্তাপারের বৃত্তান্তের ভাষাকে অধিকতর বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত করে তুলেছে। যেমন

১) "কুত্তা আস্তা (রাস্তা) হারায় না।" ৪৬

২) "কুত্তা আর গাই যা কওয়াবেন তাই।" ৪৭

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে কোন কোন চরিত্র বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গান গেয়েছে। গানের বাণী বা ভাষাও বিষয়ানুগ। তাতে গায়ক চরিত্রের ব্যক্তিগত রূপটি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি সামগ্রিক পরিবেশটিও শ্রীমন্ডিত হয়েছে।

কৃষক সমিতির হৃষিকেশ চরুয়াদের উদ্দেশ্যে খানিকটা ঠাট্টা করে গান ধরে—

"ও-ও আমার চরুয়া হালুয়া ভাই

তোর গুণের সীমা নাই

তোর এতখান জমিতে ভোখো না মেটে

তোর প্যাটের সীমা নাই।" ৪৮

'পঞ্চান্ন', অধ্যায়ে নির্বাসন ভূমি ডায়নার চরের দিকে যাওয়ার পথে — বার ঘরিয়ার মাঠ ছেড়ে নিপুছাপুরের দিকে যেতে বাঘারু আপন মনে গান ধরে — সূর্য তখন উঠছে—

"উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর চিক চিকানি দিয়্যা

উঠেন উঠেন বেলা ঠাকুর আগুন টকটক হয়্যা

খুলি দিছু দেহবাড়ি ছ্যাঁকা দিয়া যান

জল যাউক, হিম যাউক, খাড়াউক শরীল খান।" ৪৯

'চুয়াত্তর' অধ্যায়ে 'দুধের ট্রাকের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে বাঘারুর মুখে কোথা থেকে বিরহের গান বেরিয়ে আসে —

"বাথান বাথান করিসেন মইষাল রে-এ-এ-এ-এ

(অ-তোর) বাথান করিলেন ঘর

বাথান হইলেন আউলা ঝাউলা রে-এ-এ-এ-এ

(অ-তোর) বাথান ভরা গোবর।

অ-মোর মইষাল বন্ধু রে-এ-এ-এ-এ" ৫০

'একশ চুরাশি' অধ্যায়ে জল্পেশ অভিযানকারী মহিলারা জল্পেশ মন্দিরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে তিস্তাবুড়ির গান গায় —

"সগ্‌গ হতে নামিল তিস্তা বুড়ি

মনচে দিয়া পাও

মনচ হতে নামিল তিস্তাবুড়ি

চ্যাতন করিল গাও

কাচা দুধ আলোয়া ক্যালো

ভইক্ষণ করো।" ৫১

'দুশ দশ' অধ্যায়ে দেবপাড়া চা বাগানের চা শ্রমিক মেয়েরা ট্রাকে করে তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে একে অন্যের পিঠে বা ঘাড়ে মাথা রেখে ট্রাকের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে কান্নার সুরে গান ধরে —

"মাসি, তুই আর ভাল কম্বল খুঁজিস না,

সব কম্বলে একই লোম,

সব লোমে একই উকুন

সারা রাত জেগে থাকি আর উকুন কুটুস কুটুস করে কামড়ায়

নাকি উকুন কামড়ায় বলেই সারা রাত জেগে থাকি।" ৫২

সমবেত গানটা একসময় বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আর একটি মেয়ে তার মায়ের কোলে মাথা রেখে গান ধরে —

"আকাশ ত পরিষ্কার হয়ে গেল,

কাল মুরগিটা সাদা হয়ে গেল,

নাকি কাল মুরগিটাকে ঢাকা দিয়ে

শাদা মোরগটা তার পাখনা মেলে দিল

আর ঝুটিটা ফোলাল। এ

আর সারা রাতের পর তোর সময় হল রে বিদেশীয়া বন্ধু

পান সুপুরি নিয়ে আমার গোসা ভাঙানোর?"৫৩

রাজবংশী কৃষক, চা বাগানের শ্রমিক, চরুয়া, সীমান্ত বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবন যাপনে রস রসিকতা স্বভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে। তাই রসিকতা পূর্ণ বাক্যের

ছড়াছড়ি তিস্তাপারের বৃত্তান্তে। কখনো সে রস শ্লেষাত্মক ও আদিরসাত্মকও হয়েছে।

গয়ানাথ তার জামাই আশিন্দিরকে বলেছে- "শালো জোয়াই, তোর পাছাত বাংকুয়া (বাঁক) সিদ্ধাম"৫৪

নদীতে গয়ানাথের জমি কতটুকু বোঝাতে বাঘারুকে জলে নামিয়ে গয়ানাথ সিদাডোবা, হাতিডোবা, নামকরলে পূর্ববঙ্গের লোকেরা রসিকতা করে বলে — "এইটে শুরু হইল স্যার সিদাডোবা, হাতিডোবা, বাঘাডোবা।" ৫৫

উত্তরে গয়ানাথ রেগে বলে — "শ্যালো তোর বাপাডোবা" ৫৬

গয়ানাথ সুহাসকে দাগ নম্বর দেখাতে চাইলে ফের রসিকতা করে পূর্ববঙ্গের লোকেরা বলে "কুঁচকি পর্যন্ত দেখাইয়া ছাড়ছেন ত।" ৫৭

উত্তরে ফের গয়ানাথ বলে — "তোর ধোকর বাপের ঘরখান বাকি আছে রে।" ৫৮

বাঘারু গাছ সহ ভেসে এসে নিতাইদের ডুবন্ত চরে অশ্বিনী রায়ের চালে আটকে গেলে — বাঁধ থেকে কেউ তাকে দেখে। এনিয়ে পরস্পরে কথা হয়। জগদীশ জিজ্ঞেস করে "কয়ডা মানুষ? বেটা ছেলে না মেয়ে ছেলে'? তখন জগদীশের কথায় কেউ কেউ হেসে উঠে বলে — আরে আপনার সেই মানা বাড়ির মাগিটাই তো ভাইস্যা আইসছে। এহন সামলান গিয়া।" ৫৯

বাঘারু উদ্ধারের জন্য শহর থেকে জিপে করে অফিসাররা এসে বাঁধের লোকের কাছে নৌকা খোঁজ করে। নেই বললে অভিযোগের সুরে কারণ জানতে চায়, কাছাকাছি কারও আছে কিনা জানতে চায়। তখন জগদীশ বারুই পেছন থেকে বলে ওঠে — "হয়, আইপনারা নৌকা রাখবেন, আলকাতরা মাখাইবেন, গাব ঘষাইবেন আর উনারা আইস্যা বছরে একবার জিপে কইর‍্যা নৌকাবিলাস করিবেন।" ৬০

বাঘারু উদ্ধারের পর টিভি, খবরের কাগজের ফটোগ্রাফাররা এসে নানা পোজে বাঘারুর ফটো তুলতে থাকে। নেংটি পরা বাঘারুর ছবি নিতে গিয়ে ফটোগ্রাফাররা রসিকতা করে, কেউ বলে— লোয়ারপার্টে টেলিফেলো না। কেউ বলে — "দেখিস, আবার নেংটির ভেতরের লোম সুদ্ধু তুলে ফেলিস না।" ৬১

ময়নাগুড়ির মরণচাঁদের দোকানে গয়ানাথ ও আসিন্দির একসাথে চা-মিস্টি খেতে খেতে আসিন্দির গয়ানাথকে উত্তরখণ্ডে যোগ দিতে বলে। 'তোমাক কহিলাম জয়েন দেন। বোম্বাইটে সিনেমার বেটিছোয়া আনিবার ধরিছে।'

গয়ানাথও কম যায় না, বলে —"মোক কি বেটিছোয়ার মত নাচিবার নাগিবে এলায়?" ৬২ তাঁর বর্ণনার

ভাষা যুক্তি নির্ভর, নির্দিষ্ট, আবেগহীন। কিন্তু রসহীন নয়। তবে কোথাও কোথাও আবেগময় কাব্য ভাষার সন্ধানও পাওয়া যায়।

'বাহান্ন' অধ্যায়ে নির্বাসন ভূমিতে যাওয়ার পথে বাঘারু শেষ রাতের চাঁদ দেখে—"বাঘারু ফরেষ্টের মাথার ফাঁক দিয়ে চাঁদটাকে দেখে। ফরেষ্টের ভেতরটায় এখনো অন্ধকার—শেষরাত্রি। সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আকাশটা আরও সবুজ ও চাঁদটা আরও স্পষ্ট দেখায়। সকালের শাদা চাঁদ নয়, রাত্রির জ্বলজ্বলে চাঁদ। এখন এই হাতির রাস্তাটা ছেড়ে ফরেস্টের ভেতরে ঢুকলে চাঁদের সেই আলো পাওয়া যাবে। ফরেস্টের ভেতরের এই রাত্রির আড়ালে আড়ালে চাঁদটা আরও অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে। মাঝখানে একখান আগুন লাইনের সড়ক— ফরেস্টটাকে দু'ভাগ করেছে। বাঘারু বাঁয়ে ঘুরে, দাঁড়িয়ে পড়ে। ফরেস্টের ভেতরের রাত্রির ওপরে চাঁদটা ডাইনে লেগে আছে। কিছু দূর গিয়েই সে আলো আবার আবছা। এখনো আকাশে দিনের আলো এত জমে নি যে এই আগুন লাইনটা পুরো দেখা যাবে। মাঝখানের সেই অন্ধকারের পরে ঐ আগুন লাইনের শেষের আভাস দেখা যায়— আকাশের সবুজ আর নদীর বালির শাদায়। মনে হয়, সেখানে আরও বেশি সকাল হয়ে আছে।' ৬৩

'একাত্তর' অধ্যায়ে ডায়নার চরে বাথানে থাকাকালীন - বাঘারু দেখে —"কোন কোন পাখি পাখা নেড়ে ঘুম কাড়ে, গাছের পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি ওঠে, সে ধ্বনি গাছ থেকে গাছে গাছে চলে যায়। কোন কোন পাখি ডেকে ওঠার অপেক্ষায় গলায় একটা স্বগত ধ্বনি তুলতে থাকে — গলায় উঠে সে ধ্বনি গলার ভেতরে চলে যায়। মহিষের বাথানের এক দিক থেকে আর এক দিকে কান আর লেজ ঝাপটানোর আওয়াজ ওঠে। ঘাস বনে সির সির আওয়াজ থেকে থেকে থেমে গিয়ে সেই নৈঃশব্দ্যকে আরও নিঃশব্দ করে তোলে।"৬৪

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত-র নাট্যরূপ দিয়েছেন একালের প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক ও পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়। ছ'টি পর্ব, একটি পরিশিষ্ট, দু'শ উনিশটি অধ্যায়-এ সম্পূর্ণ পাঁচশ চার পৃষ্ঠার একটি উপন্যাসকে নাটকের আকারে নিয়ে আসা তাতে সংলাপ সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক কাজ। প্রথম অভিনয় — রবীন্দ্রসদন, ৪ জুন, ২০০০। নাট্যগঠনের অন্যান্য দিক গুলোর কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু সংলাপের ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলতেহয় সুমন নিজেই স্বীকার করেছেন যে উপন্যাসে উপস্থিত সব পাত্র-পাত্রীর সংলাপ তিনি উপন্যাস থেকেই নিয়েছেন।

"মূলে যা আছে— সেই সংলাপ না বদলে আমি কাজটা করে যাচ্ছি, চেষ্টা করছি নাট্যের একটা চূড়ান্ত

শৃঙ্খলায় পৌঁছতে।" ৬৫

নাট্যকার, নাট্যসমালোচক ও অভিনেতা বিভাস চক্রবর্তী ও বলেছেন "প্রায় কোন সংলাপই তিনি (সুমন) যোগ করেননি বা কোন ঘটনা নতুন করে আনেননি— যা উপন্যাসে নেই।" ৬৬

এ কথার সমর্থনে বিভাস চক্রবর্তীর আর একটি মন্তব্য লক্ষ করা যায়। "এইসব সাত পাঁচ যখন ভাবছি হঠাৎই চোখে পড়ল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'উপন্যাসটির লেখক দেবেশ রায়ের একটি রচনা— 'মঞ্চের উপন্যাস পাঠ'। তাতে দেবেশবাবু বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে সুমন মঞ্চের জন্য তাঁর উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেবার প্রথাগত চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছেন, উপন্যাসটি মঞ্চে পাঠ করেছেন তিনি।' এরপর দেবেশ রায়ের বক্তব্যটি হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে —" মঞ্চের উপন্যাস পাঠের স্বরলিপি উদ্ধার করতে করতে যদি আমরা এ নাটক না দেখি তাহলে হয়তো আমরা এ নাটকের কাছে নাটক চেয়ে বসব, নাটকের যে গড়ন বহু বিচিত্রতায় আমাদের চেনা। এমনকি এমনও মনে হতে পারে কী আছে এ নাটকে। আর তাতে হয়তো সুমন মুখোপাধ্যায় সত্যি করেই জবাব দিতে পারেন, এটা তো নাটক নয়, মঞ্চে উপন্যাস। তাহলে এ নাটক দেখতে কি উপন্যাস পড়ে আসতে হবে? না, তা কেন, মঞ্চই তো উপন্যাস পড়বে।" তারপরই অবশ্য বলেন , " মঞ্চ উপন্যাসটি যে পড়েছে তাতে খুব গোপনে স্বরাঘাত বদলে যাচ্ছে যেন একটা নিঃসংশয় রাখতে, দ্বিধাহীন রাখতে, যে উপন্যাসটি মঞ্চই পড়ছে, দর্শকদের সামনেই পড়ছে, মঞ্চের শর্ত মেনেই পড়ছে।"৬৭

হুবহু সংলাপ বজায় রেখে নাটকের শর্ত মেনে তিস্তাপারের নাট্যরূপ ও বহুবার মঞ্চ সফলতা প্রমাণ করে— এর সংলাপের নাটকীয়তা। যেমন —

"ঘোষ একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করে, ক্যাম্পে তোমার কে আছে?

'কায়না কায় তো থাকিবে বাবু।'

'তোমার তো বাড়ির কেউ নেই বললে?'

'না বাবু মোর বাড়ির কেউ নাই রো।'

'ইণ্ডিয়া বাংলাদেশও নেই?'

'না, বাবু মোর ঐলা কিছু নাই রো।'

'তোমার দেশ নেই? একটা?'

'না বাবু মোর দেশ নাই রো।'

তাহলে ক্যাম্পে আর তোমার কে থাকবে?

'মানষিলা ত থাকিবে বাবু, বানভাসি মানষিলা।'

উপন্যাসে ভাষা তো কথক ও চরিত্রের মুখ দিয়েই উচ্চরিত হয়। উপরোক্ত আলোচনায় তা লক্ষ করা গেল। আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র পঞ্চানন মল্লিকের ভাষায় — সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে। বক্তৃতার সময় তিনি শুরুই করেছেন গীতার একটি সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে।

'হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং

জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীং'

বক্তৃতায় এসেছে গুরুগম্ভীর তৎসম বহুল বাংলা ভাষা—

"ভারতবর্ষ মাতৃভূমি। ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতি রক্ষা করায় প্রতিটি ভারতবাসীর মত আমরাও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছি।' তারপরেই যোগ করেন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাংশের মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আজ পর্যন্ত যা করার দরকার ছিল তা করেননি। ..... সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছেন এখনকার বসবাসকারী সংখ্যা গরিষ্ঠ রাজবংশী, সংখ্যালঘু মুসলমান, বাস্তুহারা নমশূদ্র, বহু উপজাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ।" ৬৮

'তিস্তাপুরাণ'-এর ভাষা রীতি

তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মতো তিস্তাপুরাণও একটি মহাকাব্যোপম.. বৃহৎ উপন্যাস। এর-রচনা রীতিও 'এপিসোডিক'। বিষয়- তিস্তা পারের তিস্তা ও বড়বাঁক, আংরাভাসা, নোমাই, গরাতি, গুলুন্দি, জলঢাকা, কুলজুয়া, দুদুয়া ইত্যাদি ছোট বড় নদী বেষ্টিত ভুবনে বুড়িমার গোত নামে পরিচিত একটি রাজবংশী বৃহৎ পরিবারকে ঘিরে বিশেষত রাজবংশী সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনীতিক প্রসঙ্গে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক পরিচিতি—লেখকের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিমত। বিষয় বিন্যস্ত হয়েছে গোত্রনারী বুড়িমার অলৌকিক 'বানা ঝোলা দর্শন'কে উপলক্ষ করে। সমগ্র উপন্যাসে বয়ে গেছে পৌরাণিক আবহ সুতরাং স্বাভাবিকভাবে তিস্তাপারের বৃত্তান্তের সমুদয় ভাষা বৈশিষ্ট্য তো এতে আছেই, আছে আরও অন্য অনেক কিছু।

তিস্তাপুরাণও যুগপৎ বাংলা ও রাজবংশী ভাষায় লিখিত। কথকের বর্ণনার ভাষা বাংলা। কিন্তু এখানেও বাংলার সঙ্গে কোথাও কোথাও অনায়াসেই মিলে গেছে রাজবংশী শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ। আবার কখনও বর্ণনার ভাষা সম্পূর্ণ রাজবংশীতে। এখানেও উত্তরবঙ্গের মদেশিয়া-বাংলা মিশ্রিত ভাষাও রয়েছে। উপন্যাস

খানি পৌরাণিক আবহে নির্মিত বলে কিছু পৌরাণিক শব্দ ও বাক্য এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আর এজন্যই তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মতো কথায় কথায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এতে নেই। আছে, তুলনায় কম।

পুরাণ বলেই এতে -দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা প্রচুর, যা তিস্তাপারের বৃত্তান্তে দেখা যায়নি। তবে একটি শব্দে একটি বাক্যের ব্যবহারও আছে।

বাক্যের প্রচলিত নিয়ম ভাঙার প্রবণতা এখানেও লক্ষ করা যায়। কিছু অপ্রচলিত শব্দ, এমনকি লেখকের নিজের তৈরি শব্দও সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণনার ভাষায় কোথাও কথকতার ভঙ্গি, সহজ-সরল-মেদহীন, কিন্তু বিষয়গুণে ভারি। তিস্তাপুরাণের ভাষা প্রসঙ্গে অভিরূপ দাস বলেছেন।

"তিস্তাপুরাণ, আসলে মহাকাব্য। মহাকাব্যের মত উপন্যাস কেউ কি কখনো পড়েছে? সেই বিপুল উপন্যাসে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, ব্যক্তি সম্পর্ক ভেঙ্গে নিজের সুবিধে মত ব্যবহার করে, প্রয়োজন মিটে গেলেই আবর্জনায় ফেলে দেয়ার কোনো তুলনা নেই। স্রষ্টার নিরাসক্ত নিষ্ঠুরতা তিস্তাপুরাণে চোরা স্রোতের মত বয়ে আসছে—সে নিষ্ঠুরতা তুলনাহীন। এই মহাকাব্যিক নিষ্ঠুরতা তিস্তাপুরাণে চোরা স্রোতের মতো বয়ে গিয়েছে। দেবেশ রায়ের গদ্য আমাদের পাঠ্যাভ্যাসে প্রোথিত আছে। .....এখানে নিরাসক্তির ভাষা, আমাদের অচেনা। সরলবাক্যের কুটতা আমরা জানিনা। আতিশয্য নেই। আবেগ নেই। আত্মমগ্নতা নেই। নিজেকে আড়ালে রেখে এক এক ভাষার কৌতুক এর আগে ওঁর কোনো লেখায় দেখিনি। এই ভাষাই পুরাণের ভাষা হতে পারে। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত বা মফস্বলি বৃত্তান্ত, সময় অসময়ের বৃত্তান্ত-এ ভাষায় লেখা যায় না।" ৬৯ তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মতো তিস্তাপুরাণেও দেখা যায় ভাষার প্রবাহমানতা। সেজন্য এখানেও সংযোজক অব্যয় বিহীন, কমা দিয়ে সরলবাক্যের পরপর বিন্যাসে দীর্ঘ বাক্য গঠন লক্ষ করা যায়।

"বেটি ছোয়ার ঘরই তো দেশ থেকে দেশে, পৃথিবী থেকে পৃথিবীতে, ঘর থেকে ঘরে ঠোঁটের কথা নিয়ে যায়, গলার গান নিয়ে যায়, মুখের ঢক নিয়ে যায়, জিভের স্বাদ নিয়ে যায়, চোখের চাহন নিয়ে যায়, ওঠা-বসা নিয়ে যায়, আঙ্গুলের বোনা নিয়ে যায়।" ৭০

ছোট ছোট সরল বাক্য পর পর বসিয়েও ভাষার প্রবাহমানতার দৃষ্টান্ত তিস্তাপুরাণে প্রচুর।

কাঁওক পাঠা কেনে। দুই চারি জনক। সিনঝাকাঠি গিলা ঠিক করি দিক। পাখি না ঢুকে। আর কিছু করিবার থাকিলে করি চলি আসুক। কালি আবার যাবে।' ৭১

দীর্ঘ সরল, জটিল, যৌগিক বা মিশ্র বাক্যে বক্তব্যকে সুসংহত করার দৃষ্টান্তও তিস্তাপুরাণে দেখা যায়। জটিল যৌগিক, বাক্যের ব্যবহার তিস্তাপুরাণের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়। পুরাণের কথা তো এভাবেই বলতে হয়।

(ক) 'ঢেমনার মৃতদেহ ঠাকুরাণীর ঘরের কাছে শোয়ানোর পর, বাহির এগিনার দুই দিকের ভিড় ভাঙানোর আগে, যারা তাকে জীবিত ও চলন্ত দেখেছে সারা জীবন তারা তার মৃত মুখের ও দেহের দিকে এক পলক নিবিড় চাইবারও আগে, তার মৃত দেহের সৎকারের জন্যে অনিবার্য কাজগুলি শুরু হওয়ারও আগে, বুড়িমার গোতের দুই বড় হালুয়া চলে যায় ঢেমনার তামাক ক্ষেতের দিকে।' ৭২

(খ) 'ফলে, পাঁচটি মেয়ে ফিরে ছুটে আসা পথে আবার ছুটে গেলে যেটুকু জায়গা লাগার কথা, তার চাইতে কম জায়গা লাগছিল আর ঐ উড়ন্ত চুলের জন্যেই, এমনও মনে হচ্ছিল— ঐ কাল চুলের রাশি ধরে রেখে তারা কোনো ব্রত পালনের মুদ্রায় ছুটছে।' ৭৩

'তিস্তাপুরাণ', একটি আধুনিক পুরাণ। পুরাণ কথা শুরু করলে তো কথা শেষ হতে চায় না। তাই এখানে স্বাভাবিক ভাবেই বাক্য হয়েছে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম।

(ক) দীর্ঘবাক্য—"যারা গরুর পালের দেখাশোনা করে, তাদের চড়ায়, ছাড়ে, যাদের গলা গরুদের চেনা হয়ে যায়, যারা গরু গুলিকে গোহালিয়ায় ঢুকিয়ে দেয়, আবার কখনো কখনো বেরও করে, তারা ফরেস্টের একটা সুবিধা মত জায়গায় বসে, তেমন লাগসই একটা গাছ পেলে, গাছের মোটা ফ্যাকরার ওপর চিত হয়ে শুয়ে, কাত হয়ে শুয়ে, উপুড় হয়ে শুয়ে মাঝে মধ্যেই ডেকে যায়, 'হা—আ—স্বা গে—এ—এ"। ৭৪

(খ) দীর্ঘতর বাক্য—"সেখানে না-ফেরা গরুগুলো ফিরে এলে, সেগুলো নিয়ে তার তিন মানব জন্মের ফরেস্ট, তার জন্ম জন্মান্তরের দুটো নদী, হয়তো আরো নদী, তার জন্মের আগের চা-বাগান আর রেল লাইন— সে তো এ বাড়ির বৌ, আর এসেছে সেই তিস্তার এ পারেরই গাঁও থেকে, তিস্তা সেখানে পুবে এমন বাঁক নিয়েছে যে পশ্চিম দিকটা যেন, আকাশ যেখানে মাটি ছোঁয় সেইখানটাও ছাড়িয়ে গেছে, মেখলিগঞ্জ পর্যন্ত বাস যায়, তারপর আধ বেলার হাঁটা, সে একটা রেল লাইন দেখেছে, সে অন্য রেল লাইন— তারপর তোর্সার মত বড় নদী তার জন্ম জন্মান্তর আগে যেখানে বইত, সেই বালুবাড়ি পাথর বাড়ি পার হয়ে গরুর পালটাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে নাম্বু-ঝাটো-আন্ধারুর সঙ্গে নদীবাড়ি পাহাড় বাড়ি জঙ্গলবাড়ি ধরে ধরে তাকে হাঁটতে হবে।" ৭৫

(গ) দীর্ঘতম বাক্য—"কোন ক্ষেতে কী রোয়া হবে, কোন ক্ষেতে কতটা করে পচা সার খাওয়াতে হবে, শীতকালের হিম আর সাত-সকালের পাতলা হাল দিয়ে কবে থেকে মাটিকে খাওয়াতে হবে, ভাদই চাষের জন্যে কোন কোন ক্ষেত আগে তৈরি করতে হবে, গেল বছর বৃষ্টি না হওয়ায় এ বছর যদি আগে বৃষ্টি হয় সেজন্য বিত্‌রি ধানের জমিই বেশি করে তৈরি হচ্ছে, এত জমিতে ছিটনোর মত বিত্‌রির বীজ এক বাড়িতে থাকে না, সেজন্যে অন্য সব হাউলিয়ার বাড়িতে খোঁজ করতে হয়, কেউ ধার দিতে রাজি আছে কীনা, ফাগুন-চৈত্র-বৈশাখে বীজ ছিটিয়ে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণে ধান কাটা যায় এমন হিসেব করে জমি খুঁজতে হয়, বৃষ্টি যদি আগুরি হয় তাহলে আষাঢ়-শ্রাবণের ঢলে মাঠের পাকা ধান পচে যাবে— ঢালের জমি চাই, জল যাতে না দাঁড়ায়, চালের দাম যখন এত বেড়ে গেছে তখন বড়ি-বাংলা, লুধিয়ান বা ধৌলির মত দামি পাতলা চাল কম করতে হবে—দামি চালের দাম আর কত বাড়বে, তার বদলে জমিরা, কালশনি, আর কাশিয়াপাঞ্জা বেশি করে লাগাতে হবে— টাউনের মানষি সে চাল পছন্দ করবে, বাতাই চাষের খাউ-বিছনবাড়ি তৈরি করতে ফাল্গুন-চৈত্র থেকে ক্ষেত বানানো শুরু, খাউ-বিছন মাটি ছেড়ে উঠতে না উঠতেই পোতা-বিছন বাড়ি— তৈরি করতে হয়, বিত্‌রি ধান খোয়ার আর বাতাই ধান বেচিবার তার ওপর গত বছরের খরার ক্ষতি এ বছর উশুল করতে হবে— ধানের ক্ষতি পয়সায় ধান বেচে উশুল হয় না, ধানের ক্ষতি উশুল হয় ধানে, বেচো আর খাও ধান গোলা যেন এক বস্তাও খালি না দেখায়— তাকে বলে চাষ বাস, তার মধ্যে জোতদার গিরিকে ভাগ দিতে হবে, আধিয়ার মানষিকে খাওয়াতে হবে, সোদর কুটুম আসা-যাওয়া আছে, বেটা বেটির বিয়ে শাদি আছে, তার ওপর গত সনের খরা গত শনেই শেষ নাকী খরার চক্কর শুরু এই অনিশ্চয়তা আছে এতসব হিসেব নিকেশ তত্ত্ব-তালাসের মধ্যে সরকারের হুকুম লেভির ধান জমা দিতে হবে, তখন তো মনে হল ভুটান পাহাড় যদি পাহাড়েও থাকে, তাহলে মরাঘাট ফরেস্টে আগুন লেগেছে।" ৭৬ এমন অতিদীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নেই। কারণ সেখানে ঘটনাবলি মূলত রাজনৈতিক। খণ্ড খণ্ড বিষয়। তিস্তাপুরাণের গোতের সামগ্রিক জীবন বর্ণনার দীর্ঘায়িত ছবি সেখানে অনুপস্থিত।

বর্ণনার ভাষা শিষ্ট বাংলা—'বুড়িমা' অধ্যায়ে—'বুড়িমা যে বাড়িতে আছে, এটা কারো সব সময় আলাদা করে খেয়াল থাকে না। বুড়িমা কখন, কবে যে সবার এমন বেখেয়ালে চলে গেছে তা বের করা এখন প্রায় অসম্ভবই। কোনো একদিন নিশ্চয়ই ছিল যখন বুড়িমাই সবার খেয়াল রাখত, আর সে কারণেই বুড়িমাকেও সবার খেয়ালে রাখতে হত। কবে যে এমন ছিল তা মাপার সব হিসেব এখন তামাদি হয়ে গেছে। এবারের ধান

গতবারের ধানের সমান হল নাকী কম হল, নাকি বেশি হল, সে তো শুধু স্মৃতি দিয়ে মাপা হয় না, শরীরের স্মৃতি দিয়ে মাপা হয়।' ৭৭

বর্ণনার শিষ্ট বাংলায় রাজবংশী বাক্য—'গুহাপথ' অধ্যায়ে- ''নদিনী আর শাদুরী যে হাটে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, তা এমনকী অগুন বা ধান রামের ও জানা ছিল না। জানা থাকার কথাও নয়। হাটোয়ালদের সঙ্গে ওদের খেতে বসতে দেখেও আন্দাজের কথা নয়। অসময়ে গরম ভাত নেমেছে। খাচ্ছে। ভাত খাওয়ার আবার কোনো কারণ থাকে নাকী। সবাই যখন বেরচ্ছে, তখনই দেখা গেল, নদিনী শাদুরীও বেরচ্ছে। সবাই যখন ঐ ডান দিকের পথে ঘুরেছে, তখনই দেখা গেল, নদিনী শাদুরীও ঘুরেছে। ততক্ষণে অবশ্য ওদের সাজ গোছ থেকে বোঝা যায় হাটোয়ালী হবার ধরিছে। তো ধরুক। কায়ও যদি হাটত যোয়া মনে করে তো সে চলুক ঢেলে কেনে হাটত। দূরের হাটত। ধূপগুড়ির হাটত।'' ৭৮

অনুপুঙ্খ বর্ণনার ভাষায় তৈরি হয় চিত্রকল্প। 'গোবর নেথা', অধ্যায়ে - এগিনা ঝাঁট দেওয়া, মোছার দৃশ্য বর্ণনা অনুপুঙ্খ ও চিত্রল।

''কলেশ্বরীর অনুমান খুব ভুল নয়, এত সকালে যখন পুরোরোদই ছড়ায় নি, তখন বাহির এগিনা তো শিশিরে ভেজা থাকারই কথা। ক্ষেতবাড়ির দিকে তাকালে তো ক্ষেত আর দেখা যায় না, অঘ্রাণের পাতলা কুয়াশায় ক্ষেত বাড়ি ডুবে আছে। কলেশ্বরীর অবিশ্যি অনুমানেও এমন ভুল হওয়ার কথা নয়। আর ভুল যদি হয়ও, তা হলে লম্বা পাতলা বাঁশের খররা বারুনে দু-তিন ঝাঁট দিতেই তো ধুলো দেখে বোঝা উচিত শিশিরে মাটি তত ভেজা নেই। সেটাও যে কলেশ্বরী ধরতে পারেনি, তার কারণ, সে প্রথমে ঝাঁট দিয়ে আনছিল ডোবা পাড়ের ঘাসে পড়ে থাকা শুকনো পাতা আর কুটো। সেগুলো কাঁঠাল গাছের তলায় জড়ো করে রেখে সেখান থেকেই এগিনার মাটি ঝাঁটাতে শুরু করে। তাতেই এই ধুলো। পাথারনী ততক্ষণে একটা বড় কলসীতে জলভরে এনেছে ডোবা থেকে। বা কাঁখে সেই কলসী নিয়ে, কলসীটা একটু কাত করে জল ঢালে আর ডান হাতের সেই জল উঠোনে ছিটতে থাকে। পাথারনীর কব্জিতে পরা ছিল চোরা খারু। বাঁ-হাতে মাটির কলসী বের দেয়ায় সেই বালার সঙ্গে কলসীর ঘষায় একটা আওয়াজ ওঠে।' ৭৯

বর্ণনায় কাব্যভাষা—'সংলাপ আনালাপ' অধ্যায়ে এক বুনো নদীর বর্ণনা— যেন কবিতা। এ বর্ণনাতেও ফুটেছে চিত্রকল্প।

'দুই পার থেকেই ফরেস্ট একেবারে জলের ভিতর পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই পাড় মানুষজন কিংবা গোরু-

মোষ বা এমনকী কুকুরও, ব্যবহার করে না। বনশেয়াল করতে পারে। নদীর ভিতর থেকে গাছ এত উঁচুতে উঠে গেছে যে কোথা থেকে ডালপালার ফাঁড়া ফাঁড়ি তা দেখতে ঘাড় হেলাতে হয়। আবার দুই পাড়ের অনেক গাছ নদীর ওপরের আকাশে বেঁকে গেছে। নদীর জলে, রেতি নদীর জলে ফরেস্টের সবুজ, খয়েরি, হলদে, কাল ও আকাশের নীল ছায়া এত ঘন হয়ে পড়েছে যেন মনে হয় তারা সোলংগা চড়ে যাচ্ছে না, ফরেস্টের মধ্যদিয়ে ভেসে যাচ্ছে। নদীর একেবারে ভিতর থেকে যে গাছগুলো সিধে ওপরে উঠে গেছে, সেগুলোতে যাতে ঢাকা না লাগে, সেজন্যে ঘাটোয়ালকে লগি মেরে সোলংগার মুখ একটু সরিয়ে দিতে হয়। খুব কান পেতে শুনলে ফরেস্টের ভেতরের ঝিঁঝির আওয়াজ আর নদীর জলের আওয়াজ আলাদা করা যায়, তবে কান পেতে না রাখলে মনে হয় জলেই এমন প্রবল ঝিঁঝির রব উঠছে। সাধারণত আকাশ দেখলে ফরেস্টের ভিতরের নদী আন্দাজ করা যায়। আকাশটা ফাঁকা থাকে। এমন ছোট নদীতে আকাশ অমন ফাঁকা থাকে না। সেখানেও ফরেস্ট। আকাশ তো আকাশ, নদীই দেখা যায় না।" ৮০

বিভিন্ন চরিত্রের মুখে তার স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর ভাষা বলতে শোনা যায়। রাজবংশী চরিত্রের মুখে শোনা যায় রাজবংশী ভাষা। মদেশিয়া চরিত্রের মুখে মদেশিয়া ভাষা।

"ধোলী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে যায়, 'মদেশিয়া মানষিলা বস্তির মানষিলা মিলি তামান বাগান খান দখল নিবার ধরিছে। ঝাণ্ডা উড়িছে। চোঙা ফুঁকিছে। হাল চলাছে। সগায় তো বাগান দখল দেখিবার গিছে।" ৮১

অনুরূপ মদেশিয়া চরিত্রের মুখেও মদেশিয়া ভাষা—

"লোকটি কাপুর, বাবুর চেয়ারের কাছে গিয়ে বাবুকে বলে—

'এক কিষাণভাই বোলতা হ্যায়, রাতমে বারিষ হোনেসে মাটি ধু যাবে। হামমন পুঁছ করলেক, কৌন সে বারিষ হ্যায় যে মজদুর ঔর কিষাণ কো একাই ধু দেনে শেকতা?'" ৮২

মদেশিয়া ভাষায় ইংরেজি শব্দ যুক্ত হয়ে ভাষায় অন্যরকম স্বাদ নিয়ে আসে। "ছোট দাদাকে চুপ করে থাকতে দেখে কাপুর বলে ওঠে, 'বোলো কমরেড বোলো যো বাত হ্যায় বোলো। কিষাণ ঔর মজদুর কো একোহি বাত হ্যায়—ইন্ কিলাব জিন্দাবাদ। ই-হামারা .. মজদুর ইউনিয়নকো সেক্রেটারি কমরেড কালী। সারে জিলা কোঁ সেক্রেটারি কমরেড কালী। বোলো।" ৮৩

মদেশিয়া ভাষার মত পূর্ব বঙ্গীয় ভাটিয়া ভাষা উচ্চারিত হয়েছে ভাটিয়া চাষীদের মুখে— (১) "এইডা তো

আমাদের মহাভাগ্য যে আপনারা ডাইকছেন। কী কামে আইসব, জানি না। আমরা তো কুনো কামের না। তো যাব। নিশ্চয়ই যাব। বুড়া সাইজ্যাই যাব।' তারপর অগুনকে দেখিয়ে বলেছে, 'আমাদের বুড়াগুলা' তো অ্যামন জুয়ান না। দিন রাইত জলে ডুইব্যা আমাগো জোয়ান গুলাই বুড়া হইয়া যায়। আর সত্যিকারের বুড়াগুলা তো আর জলে ডুইবতে পারে না, রোদে বসিবসি শুকাইয়া শুকাইয়া খেজুর গাছের লাখান হইয়া যায়। আমাগো সাদা চুলে ভুইলবেন না বাবু। ভাটিয়াগো কাঁচা পাকার বোধ নাই।" ৮৪

(২) "দুদুয়ার পারের ভাটিয়ারা বুড়িমার গাঁওয়ে পৌঁছে বলে, 'ফরেস্টের এতখান ভিতরে তো এর আগে আসি না। এই সিধা গেলে কি পাহাড়ত ধাক্কা খাইব নাকী?'" ৮৫ ভাটিয়াদের ভাষায় এই রকম রাজবংশী ভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

এখানে বসি বসি রাজবংশী শব্দ। সুতরাং ভাটিয়া ভাষায় রাজবংশী শব্দও মিশে গেছে দুদুয়ার পারে বসবাসের ফলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ভাটিয়া ভাষায় এরকম রাজবংশী শব্দের প্রবেশ ঘটলেও রাজবংশী ভাষায় ভাটিয়া শব্দের প্রবেশ ঘটেনি। রাজবংশী ভাষায় দু একটি বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার থাকলেও প্রকৃত ইংরেজি শব্দের ব্যবহার খুবই কম। বিশেষত বর্ণনার ভাষায়।

কিন্তু উপন্যাসে বহু ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন— ফরেস্ট, টাইম, বডি, প্লাস্টার, রেঞ্জ অফিস, লাইসেন্স, ব্রিজ, সিমেন্ট, ভ্যান, ক্যামিকেল, ভ্যানিস, বোল্ডার, কোর্ট, এফিডেবিট, পি. ডব্লিউ. ডি, রেকর্ড, ডিপার্টমেন্ট, ন্যাশন্যাল হাইওয়ে, নোটিশ, ম্যানেজার, কাপডিস, ক্যানেল, ডিপ-টিউবওয়েল, স্যালো, রিভার লিফট্, রেট, মিরাকল, ইণ্ডিয়া, ইউনিয়ন, পাওয়ার ক্যাপচার, স্ট্র্যাটেজি ট্যাকটিজ, ডিউটি, ইন্টারন্যাশনাল, প্লান, হেড কোয়ার্টার্স, চার্চ, অফিসার, ব্রেকডাউন ইত্যাদি।

বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ: ইংজেরি (ইংরেজি), হাইল (হাই ইল্ড), রেজিস্টারি (রেজিস্ট্রি), কনটাকটার (কনট্রাকটার), নুটিশ (নোটিশ), রিটান(রিটার্ন), পাট্টি (পার্টি), কমুনিস (কমিউনিষ্ট), গবমেন্ট (গভর্নমেন্ট), বি.ডি-অফিস (বি.ডি.ও. অফিস) বোড্ (বোর্ড) ইত্যাদি।

তিস্তাপুরাণে উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকার-প্রয়োগ তার ভাষায় বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। বর্ণনার ভাষা— সরস ও সতেজ হয়েছে। ভাষা একটা নতুন অবয়ব পেয়েছে।

ক) "তারা যেন এই কথাটা থেকে সরে যাচ্ছে। তারা জানে, তারা আবার— এই কথাটাতে ফিরে ফিরে আসবে। আবার সরে যাবে। ডোবার জলে হাঁসের মত।" ৮৬

খ) 'ঢেমনার মৃতদেহ থেকে জন্ম জন্মান্তরের আবেগ কেমন বৈশাখের বাতাসে আমের বোল যেমন, তেমন আলগা ঘুরছিল।' ৮৭

গ) "তার গলায় যে সর্বনাশের ডাক ছিল, সে ডাক শুনে, যারাই সে ডাক শোনে, তারাই ডাকের কাছে ছুটে আসে, ভয়ে বাচ্চা নিয়ে বানরীর গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে যাওয়ার মত ছুটে আসে, জল প্রান্তরের পার থেকে মুহূর্তে শূণ্যতায় বগার উড়াল দেয়ার বেগে ছুটে আসে।" ৮৮

ঘ) "ছোট দাদার গল্প যখন তার পরের রাত্রির ভিতর ঢুকে যায় বা তারও পরের রাত্রির ভিতর তখন স্পষ্ট হতে থাকে, একটু একটু করে স্পষ্ট হতে থাকে, পৌষমাসের নদীর জল থেকে সব কাদা ধুয়ে গেলে টলটলে জলে যেমন নদীর তলার লতাপাতা নানা রকম ভাসে, তেমনি ভেসে উঠতে থাকে—এই সব বিছনের নাম, সারের নাম, জলের নাম যে ছোট দাদা বলছে, তার ভিতর বুড়িমার গোতের কোনো স্মৃতি নেই, বুড়িমার ক্ষেত বাড়ির কোনো কথা নেই।" ৮৯

প্রচুর প্রবাদ প্রবচন তিস্তা পুরাণের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রবাদ বাক্যগুলি আপ্ত বাক্যের মত ব্যবহৃত হয়ে উপন্যাসের পৌরাণিক আবহকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। প্রবাদ-প্রবচন গুলি রাজবংশী ভাষায়—।

(১) 'অতি বিয়াত্তীর না-হয় বিয়া, অতি-ছোয়াত্তীর না-হয় ছোয়া।' ৯০

(২) 'ঘেগী না পারে ঘেগ ঢাকিবার, পেটেলী না পারে প্যাট ঢাকিবার।' ৯১

(৩) 'কুমড়ার চালাত কুমড়া নাই, কুমড়া ফলিছেন গুয়াগাছের মাথাত।' ৯২

(৪) 'ন্যাংটার নাই বাট পাড়ের ভয়। হালুয়ার নাই হারিবার ভয়।' ৯৩

(৫) 'গোহালিয়া মুখা বলদা আর ঘরমুখা হালুয়া আর বৌমুখা ঘরুয়ার দুইখান চোখ একখান করি কমি যায়।' ৯৪

(৬)'দিনের আলোয় বিলাই কানা, জমির আইলে হালুয়া কানা।' ৯৫

(৭) 'আসিলে বসিলে গুতিয়া, ডাকিলে ডুকিলে ছোয়া।' ৯৬

প্রবাদ প্রবচন গুলির মতো রাজবংশী ছিল্কা, ছড়া ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। বক্তব্যকে আরো অধিক অর্থবহ করে তুলেছে।

ছিলকা: (১) 'যে হাটে নাই যাই, স্নে হাটের শেষ নাই।'৯৭

(২) 'কয় হাটের ছোয়াই', কাকাক ডাকে বিয়াই।' ৯৮

(৩) 'জাই গেল ক্ষেতবাড়ি, মধ্যে হইল পথ

জাই গেলেন গিরির বৌ, নিত্য যাছে হাটত।' ৯৯

(৪) 'আই আই, আই ঘর আছে তার দুয়ার নাই।' ১০০

(৫) 'হিতি গেনু, উতি গেনু, গেনু মরা ঘাট

অ্যাকো গাছ দেখিবার ধইরছু ফলের উপর পাত।' ১০১

(৬) 'মোর কপালের গুণে মুই হছি বেটি ছোয়া

না-হইলে কোটত পাইতাম অ্যানং ছোয়া পোয়া।' ১০২

(৭) 'সকালের খোয়া খোক্সা ভাত

দুপহরের খোয়া মুড়ি

বিকালের খোয়া চা আর চুড়া

সনঝার খোয়া ভারী।' ১০৩

(৮) 'সময়ে শুইলে মাইয়া, অসময়ে শুইলে ছাইয়া।' ১০৪ ইত্যাদি

ছড়া: (১) 'নামি আসিছেন তিস্তার বুড়ি-।

উঠি আসিছেন তিস্তাবুড়ি।

.....'১০৫

(২) ' উতরা কুমলাইয়ের জল

তিস্তা বুড়ির মাটি মিশল

.....' ১০৬

(৩) 'নোকটুরে নটুয়া

বলদখানের খটুয়া

.....' ১০৭

গান: (১) 'ও পরাণ সাধুরে

বড় নদীর তালাস করিবেনা না।' ১০৮

(২) 'হাম ভুখসে মরলেওয়ালে, কিয়া মৌতসে ডরনেওয়ালে?

আমাদিকা ডাঙ্কা বাজাও, উধাও অগ্নিধ্বজা,

আব কোমর বান্ধো, তৈয়ার হও, লাখো কোটি ভাইয়োঁ।' ১০৯

(৩) 'ও মোর দাঁতাল হাতির মাহুত রে'। ১১০

'পুরাণ' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'পুরাতন' বা প্রাচীন। কিন্তু 'পুরাণ' বলতে বোঝায় 'ব্যাসাদি রচিত সর্গাদি পঞ্চ লক্ষণ শাস্ত্র বিশেষ।' 'সর্গশ্চ প্রতি সর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ। বংশানু চরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।' (অথর্ব্বেদ ১১.৭.২৮। শত পথ ব্রাহ্মণ ১১.৫৯.৮।) ১১১

পুরাকালের অলৌকিক নীতি কথামূলক আখ্যান কাহিনিই সাধারণভাবে পুরাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। দেবেশ রায়ের পুরাণ সে পুরাণ নয়, এ কালেরই মানুষের পুরাণ। কিন্তু এ পুরাণের পরিবেশ ঐ পুরাণের আবহ মণ্ডিত। ভাষাতেও তার লক্ষণ নিহিত আছে। যেমন পুরাণে ঘটে থাকে তেমন আবহ সূচক কথা—

"বুড়িমা কি উড্ডীয়মান ভুটান পাহাড়ের পাখা কেটে দিয়েছিল, যেমন পুরাণে ঘটেছিল কখনো? অথবা, বুড়িমা বাধ্য করেছিল ভুটান পাহাড়কে অন্য কোনো দিকে উড়ে যেতে আর ভুটান পাহাড় সেদিকেই উড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সেদিকে এখন ভুটান পাহাড়, যেমন পুরাণে ঘটতে পারত কখনো? অথবা বুড়িমা কি তার দুই পায়ের কোনো এক পায়ের বুড়ো আঙুল মাটিতে টিপে থামিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর কম্পন, আর সে কম্পন পৃথিবীর ভিতর দিকেই বয়ে গিয়েছিল, যেমন পুরাণে ঘটেছিল কখনো? অথবা বুড়িমা বাধ্য করেছিল যে মরুদেশ জল শুধু শুষেই নেয় অথচ ফিরিয়ে দেয় না একবিন্দু, সেই মরুদেশকে দশ নদী বিশ নদী থেকে অন্য এক দূরত্বে চলে যেতে, মরুদেশের সে পুরাণ দেখে এসেছিল হাজুয়া মোহম্মদ? অথবা, বুড়িমা সেই ভাষা হর বাতাসের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল, যেমন পুরাণে প্রায়ই ঘটে থাকে?" ১১২

পুরাণ দ্যোতক বাক্য: "বাপার বাপার বাপার বাপা একটি জঙ্গলবাড়িতে শ' খানেক গাছের চারা লাগাতে দেখেছিল—সেই বাপার বাপার বাপার বাপা যখন ফরেস্ট ধরে যাতায়াত শুরু করেছে সেই বয়সে। তারপর বাপার বাপার বাপার বাপা আরো জোয়ান হয়েছে, তার বিয়া বসিছেন, তার একখানের জায়গায় দুইখান, দুইখানের জায়গায় তিনখান বিয়া হবা পারে, একখান বনুস মরি যাবার পর আর একখান বনুস হবা পারে,

একবারে তিনখান বনুসও হবা পারে, স্যালায় বাপোর বাপোর বাপোর টাইমত কী চিন্তাখান করি ছিলেন সেই কথা কায় জানিবে?" ১১৩

পুরাণ বোধক শব্দ: মানব জন্ম, ত্রিভুবন জোড়া, জন্ম জন্মান্তর, ইহজন্ম-পরজন্ম, এক জন্ম, দেশ-দেশান্তর, অলৌকিক, পৌরাণিক, দার্শনিক, সাইটোন দেবী, জল্পেশ্বর ইত্যাদি।

তিস্তা পুরাণে কিছু অপ্রচলিত ও অল্প প্রচলিত শব্দ পাওয়া যায় যা তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নেই। কাপোড়িয়া, ভ্যানিসুয়া, নারিকেলুয়া, বাজুনিয়া, হাটুয়ানী, এককুড়ি এগার, হাটোয়াল, গদিয়াল, ক্ষোতোয়াল, বিয়াত্তি, জুয়াত্তি, বেমাসিয়া, শিকস্তি-পয়োস্তি, বে-মালিক, মাথোয়াল, গুতিয়া, টিমুল, অনালাপ, শিউরোনি, না-ছাড়ানি, স্বাস্থল, ব্লকবাবু, হাইলজুর, ভ্যানোয়াল, টিকিটোয়াল, ছিটিয়াল প্রভৃতি—

তিস্তাপুরাণেও রাজনীতির কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আছে। বিশেষত 'আরম্ভ', 'আরম্ভের পর', ও 'আর এক আরম্ভ' পর্বের বৃহদংশ জুড়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকান্ড। লেভি, বা বাগানের জমিদখল, অপারেশন বর্গা ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। সেই সূত্রে বেশ কিছু রাজনৈতিক শব্দ এর ভাষাকে পুষ্ট করেছে। যেমন— লেভি, ব্লক অফিস, মিটিং, মিছিল, লালঝান্ডা, কমিউনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস (আই), বাংলা কংগ্রেস, উচ্ছেদ, দখল, অপারেশন বর্গা, ডিমান্ড, ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত, গিরি, জিন্দাবাদ, ভোট, মন্ত্রী, আধিয়ার, স্লোগান, যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট, কমরেড, পাওয়ার ক্যাপচার, লিডার, মজদুর কিষাণ, স্ট্র্যাটেজি ট্যাকটিস ইত্যাদি।

রসরসিকতা ঃ

রসবোধ রাজবংশী জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সব কাজ ও কথার মধ্যে রসাত্মক শব্দ, বাক্য প্রয়োগ করে বিষয়কে হৃদয় গ্রাহী করে তোলা রাজবংশী জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐ জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে লেখক উপন্যাসে অনাবিল রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কখনও প্রবাদ, কখনও ছড়া-ছিলকা-গান আবার কখনও সাধারণ কথার মধ্যে রস-রসিকতার অবতারণা করা হয়েছে। কৌতুকপূর্ণ কথা কখনও আদিরসের সীমা স্পর্শ করেছে। অদিরস রাজবংশী জীবনবোধে একটি স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশ।

'সবকিছুর পেছনে' অধ্যায়ে, বুড়িমার গোতের জংলু তার বৌকে সঙ্গে করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে যায়, সন্তান না হওয়ার জন্য তলপেটের ভেতর একটা পরিয়ে নেওয়ার জন্য। সে আগে থেকে বৌকে কিছু বলেও নি। হাসপাতালে একটা ফাঁকা ঘরে বৌকে একা চিৎ করে শুইয়ে যখন সেটা পরানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয় বৌ তাড়াক করে উঠে একেবারে বাইরে চলে এসে চিৎকার শুরু করে সবাইকে অপ্রস্তুত করে দেয়। বাড়িতে এসে

স্বামীকে জব্দ করার জন্য অভিযোগের সুরে বলে "ঐ উমরায় মোরকম দেখিছে যে হাসপাতালত মোর ভিতর এগিনায় যন্তর ঢুকাবার নিগায়?' কয়েকদিন কাটারপর সমবয়সী অন্য বৌরা এই বৌকে বোঝাতে থাকে, 'ঐ ঠে যে কিছু পিন্ধিস নাই তো অ্যালায় কিছু সিন্ধা কেনে।" ১১৪

'খোঁজ খবর' ধানরামের খাওয়ার নিপুণতা টুলটুলীর বক্তব্যে রসবোধের পরিচয় বহন করে এনেছে। ধানরাম তার পাতে ভাত দেওয়ামাত্র চেটে পুটে খেয়ে নিচ্ছে। তা দেখে টুলটুলী বলে 'চাটিচাটি' আঙ্গুল খান সরু করি ফেলালেন হালুয়া, হাল ধরিবেন— ক্যানং করি—?'

'শলাপরামর্শ' অধ্যায়ে লেভি ব্যাপারে ধানরামকে জানার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সে ফিরে এলে তাকে দোলান জিজ্ঞাসা করে কী হলো! ধানরাম কিছু উত্তর দেয় না। তখন তাকে খোঁচাবার জন্য বলে 'তোর তো আবার ভাত খোয়ার বাদে আঙ্গুল খোয়া লাগিবে।' ধানরাম তো এবার সত্যি সত্যি আঙ্গুল চুষতে চুষতে বলে "সগাকই আঙ্গুল খোবার লাগিবে। হাতের আঙ্গুল। পাওয়ের আঙ্গুল। গোলাঘরত ধান যা আছে সরকার আসি নি যাবে। টাকু পাইকার কহিল।" ১১৫ লেভিদিলে যে সবার আঙ্গুল চুষতে হবে অর্থাৎ অনাহারে মরতে হবে— সে কথাই রসচ্ছলে বলা হল।

'গুহাপথে' যখন বুড়িমার বাড়ির লোকেরা লাইন বেঁধে হাটে যাচ্ছে, ঝোপঝার লতাপাতার পথ; ছোটদাদার মাথার খাড়া চুলে লতাপাতা আটকে থাকে। তা দেখে ধানরাম রসিকতা করে বলে—"ছোট দাদা তোর মাথাত তো গাছ গজাবার ধরিসে। চুল ঝাড়ি দে। কাউয়া ছৌ মারিবে।" ১১৬ ছোটদাদা আশঙ্কায় সত্যি চুলে একবার হাত বুলিয়ে নেয়।

'জোতদার' অধ্যায়ে গদিয়াল বাবুর গদিতে মিটিং এ সবাই বসেছে। ভোলা জোতদার এসে জুতো কোথায় রাখবে বলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তা দেখে গদিয়ালবাবু বলে—'গদির নীচে রাখুন না। কেউ নেবেনা।' এর উত্তরে ভোলা জোতদারের সহজ রসিকতা—"ঐঠে রাখিলে তো পায়ের ধাক্কাত ভিতরত্ চলি যাবে। স্যালায় যাওয়ার তানে পুরা গদিখান উল্টিবার লাগিবে"১১৭ 'উপদেষ্টা খোঁজা' অধ্যায়ে নিছাড়ানি বর্ষার পর শীত আসে, শীতও যায় যায় করে এখন যে ঠিক কোন ঋতু, কী চাষ করা যাবে বুড়িমার গোতের লোকেরা সেই পরামর্শ করার জন্য দুদুয়ার পারের ভাটিয়াদের পরামর্শ চায়। ভাটিয়ারা আসে। তাদের মধ্যে একজন গোঁফ-দাড়ি, লম্বা চুলওয়ালা লোকছিল। তাকে দেখে বাঙ্কুরাম হেসে কুটি কুটি। মস্করা করে বলে 'এই গোঁফ আর চুল কোটত ভাড়া করি আনিলেন টানি দেখিম?' দুদুয়া পারের এক ছোড়করার প্রত্যুত্তরও রসবোধ পূর্ণ। বলে

" টাইন্যা দেইখবেন ক্যান? ঘরে রাইখ্যা দ্যান। আমরাও তো আনছি এই দ্রব্য এইখানে জমা কইর‍্যা যাব। ঐখানে তো এই দ্রব্য আমরা আর পুষাইতে পারিনা। সকালে দুই পোয়া সরষ্যার তেল লাগে শুধু চুলে আর গোঁফে। গাওখান তো দেইখতেছেনই। প্যাটখানও দেখেন। রাইখ্যা দেন। দেইখ্যা দেইখ্যা সুখ পাবেন।" ১১৮

দুদুয়ার পারের ভাটিয়ারা এখন কী ফসল ফলানো যায় সেজন্য মাটি পরীক্ষা করছিল কোদালে মাটি কোপ মেরে। এদের মধ্যে একজন আন্ডারওয়ার পরা, একজন তিলক কাটা ও একজন লুঙ্গিকাছা লোক ছিল। লুঙ্গি কাছা লোকটার একটা কথার উত্তরে আন্ডাওয়ার একেবারে আদিরসের অবতারণা করে তার কথা নস্যাৎ করে দিল। বলল 'আইলেন আমার নবদ্বীপের মা-গোঁসাই। টকর টকর কথা। ধানের শিকড় পইচবে! আরে একখান-হালের জায়গায় দুইখান হাল একহাত কইর‍্যা ঢুকাইয়া মাটি তুইল্যা আটদশদিন ফেইল্যা রাইখলে মাটি শুকাইব না? মাইয়া ছেলের পাছা দেইখবার ধরছে। শালো, পোলাপান কি মাইয়া ছেলের পাছা দিয়া হয় না তলপ্যাট দিয়া হয়? না বাবু, হালদিয়া ফালাইয়া রাখেন। শুকাইয়া যাবে মাটি!' ১১৯

'হাওয়াবদল' অধ্যায়ে নিছাড়নি বর্ষার পরের শীত কাটার পর নানা ঘটনার পর একটি বড় ঘটনা হলো সাগাই বা কুটুম আসা। একের পর এক সাবাইয়ের আগমন এমনি যে কেউ কাউকে যেন চিনছেইনা। একদিন রাতে খাওয়ার সময় ডাইকী তার স্বামী দেরুকে পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে 'বসেন বিয়াই বসেন।' শুনে দেরু যে সে পিঁড়ি দিয়ে বউকে প্রায় মারার উপক্রম। রসিকতা করে বৌকে বলে "একোখান বেটার বৌ ঘরত আনি কি দিনোরাত বেয়াইয়ের কথা ভাবা ধরিছেন? ভাতারক কছেন বেয়াই।" ১২০

'আওয়াজবদল' অধ্যায়ে বুড়িমার গোতে নানা আওয়াজের মধ্যে জলের পাম্পের ভট ভট আওয়াজ দিনরাত হয়ে চলেছে। সে আওয়াজ প্রসঙ্গে পাথারনীর নাতি ভাদইয়ের বেটার বউ সোমারী বলে "মোর তো পাম্পেরভট ভট শুনিলে বিয়া বিয়া মন খায়।' তার জবাবে পাথারনী-ই তার নাত বৌয়ের বেটার বৌয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করে বলে 'অনং বিয়া বিয়া করিস কেনে। ঐ শুনিলে মোর ডর ধরিবার ধরে, প্যাটের ভিতর আর একখান কায় ধক ধক করিবার ধরিছে। সেই খরার পাকের লেভীর নাখাল। আবার পেটেলী হবার ধরিম না তো?' একথা শুনে ধাত্রী সোন্দনী বলে—'শুনিম কেনে? মুই তো আওয়াজ খান কানত না তুলি।' মননী বলে 'মোর তো শুনিবার মন লাগে রে—। মানষিলার গন্ধ পাই। কাল্টি মস্করা করে বলে ' মানষিকই তো ভয়।'"১২১ ঢেকী বলে ওঠে 'মানষিক ভয় পাইস এতখান, মানষির গাওয়ত পা তুলি না দিলে তো ঘুম আসে না এক রাতিত। মানষি তোক কবে ডরাইছেরে কাল্টি?'

'শাড়ি' অধ্যায়ে, দিদিমনির দেখা দেখি মেয়েরা, মেয়েদের দেখাদেখি বাড়ির বৌরাও শাড়ি পরা শুরু করেছে। কিন্তু ফোতা ছেড়ে শাড়ি পরতে গিয়ে অনভ্যাসে একদিন মননী কুয়োপাড়ে কয়েকটা বাটি ধুতে গিয়ে উল্টে পড়ে যায়। কাপ্টা ধরে ফেলে। এরপর মননী কোনো শাড়ি পড়তে গেলেই অনেকে রসিকতা করে বলে—'আগত তোর পাছাখান ঠিক কর, তার বাদে পাছা ঢাকিবার ধরিস।'

বুড়িমার বাড়ির মেয়ে বৌদের শাড়ি পরার হিড়িক ক্রমশ বেড়ে চলছিল। এটা দেখে সোন্দনী একদিন মেয়েদের বৌদের রসিকতা করে বলে উঠেছিল " অ্যানং শক্ত করি দুধ বান্ধিবার ধইরছিস, ছোয়া খোয়ার বুকের দুধ আসিবে ক্যানং করি?" ১২২

'কথান্তর' পর্বে - 'বুড়িমা' অধ্যায়ে ছোটদাদার ফিরে আসায় বুড়িমার গোতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বিসারু বলে— "ছোট দাদাখান ফিরি আসিছে আর মোর মনতখাছে কী মোর এই বুড়িমার গোতত্ এককেরে এক শেয়ান ছোয়ার জন্ম হইল।' একথা শুনে সোন্দনী রসচ্ছলে বলে 'ঐলা একখান ছোয়া প্যাট থিক্যা বাহির করিবার তানে তো দশখান মাও লাগিবে। একখান মাওত্ না হয়।" ১২৩

হারিয়ে যাওয়া বুড়িমাকে অবশেষে পাওয়া গেল সানঝুর বড় ছেলের বৌ দেবারীর ঘরে। রাতে সেখানেই ছিল কেউ দেখতে পায়নি। এতে দেবারী লজ্জাপায়—"দেবারী ডান গালে ডান হাতের চার আঙ্গুল দিয়ে গর্ত করে বলে ওঠে —'মা-ই গে, কালি সারারাত মোর ঠে ছিল, শাসের আওয়াজ খানও তো পাই নাই।' এতে দুখারুর মাইঝন বেটার বৌ ঝারী বলে ওঠে 'দিদিগে দিদি, তোর মুখ ক্যানং রাঙ্গা। ভয় খাছিস ক্যানে? বুড়িমা তো কিছু দেখিবার পায় না। আর, রাতিত তো ঘর আন্ধার থাকে।" ১২৪ দেবারীর যা আশঙ্কা তাতে জলঢেলে দিয়ে ঝারীর উক্তি অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ও রসাত্মক।

'হারানো প্রাপ্তি' অধ্যায়ে ধানরাম শাদুরীর বেটার বৌ বাঙ্গারী নাত বৌ এসে গেলেও এখনও কানে মাকড়ি পরে; সে মাকরি দোলে।—তার এই মাকড়ি পরা নিয়ে তার শাশুড়ি রসিকতা করে বলে— "উমরার এতখান বাবু, মাকড়ি না পরিলে উমরার মাথাক্ সগায় পাছা ভাবিবে।' বাঙারি এতো বেঁটে যে তার মাথার চুল পাছা পর্যন্ত ঠেকে। বাতাসে দোলে, ছড়ায়। অন্যান্য শাশুড়িরা বলে—"বেটিছোয়ার পাছাত কি চুল গজায়! এই রসিকতার জের টেনে অন্য বৌরা বলে ওঠে—'গেইল রে, গেইল রে বাওয়ের টানে পাছার চুলের ভারে ঘাড়খান মট্‌কি গেইল রে।" ১২৫

উল্লেখপঞ্জি

১। The Rajbansis of North Bengal, Charuchandra Sanyal, The Asiatic Society, Kol-60, 1st Published in 1965, reprinted in 2002, Page-10

২। ভাওয়াইয়া, সুখবিলাস বর্মা, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৪

৩। উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, নির্মল দাশ, সাহিত্য বিহার, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০০১, পৃঃ ১৩

৪। তদেব পৃঃ ২৫

৫। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ১৯৬

৬। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ৩১৯-২০

৭। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃঃ ১৮৪

৮। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ২৮৯

৯। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১ পৃঃ ১২৭

১০। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০০০, পৃঃ ৬৬

১১। অনুষ্টুপ, শারদীয় ১৪০৭, অক্টোবর ২০০০, তিস্তাপারের অস্থির (?) বৃত্তান্ত, পৃঃ ৩২৪

১২। বাংলা উপন্যাসে 'ওরা', শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃঃ ১১৫

১৩। শৈলী চিন্তা চর্চা, সংকলন ও সম্পাদনা বিপ্লব চক্রবর্তী, রত্নাবলী, জুলাই ২০০৩, পৃঃ ৩২৩

১৪। সাহিত্যের পথে (সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধ) রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২, দ্বাদশখন্ড, পৃঃ ৪৮৮।

১৫। The craff of fiction (percy lubbock, 1947) P-25.

১৬। Jane Austen's Novels-Andrew H. Wright (1957), P-195

১৭। সাহিত্য কোষ ঃ কথা সাহিত্য, সম্পাদনা, অলোক রায়, সাহিত্য লোক ২০০২, পৃঃ ২২০

১৮। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃঃ ১৩

১৯। তদেব পৃঃ ২৭৮

২০। তদেব পৃঃ ২২০

২১। তদেব পৃঃ ১৬৪

২২। তদেব পৃঃ ১৭৯

২৩। তদেব পৃঃ ১৮১

২৪। তদেব পৃঃ ১৮৩

২৫। তদেব পৃঃ ১৪১

২৬। তদেব পৃঃ ৪২৯

২৭। তদেব পৃঃ ২০৭

২৮। তদেব পৃঃ ৮১

২৯। তদেব পৃঃ ২১১

৩০। তদেব পৃঃ ২২০

৩১। তদেব পৃঃ ২৩২

৩২। তদেব পৃঃ ৪১৬

৩৩। তদেব পৃঃ ১৩৮

৩৪। তদেব পৃঃ ৩৭৪

৩৫। তদেব পৃঃ ৩৮১

৩৬। তদেব পৃঃ ৩৩

৩৭। তদেব পৃঃ ৩৯

৩৮। তদেব পৃঃ ১১৩

৩৯। তদেব পৃঃ ৮৩

৪০। তদেব পৃঃ ৮৩

৪১। তদেব পৃঃ ৭৬

৪২। তদেব পৃঃ ৭৭

৪৩। তদেব পৃঃ ৩৯

৪৪। তদেব পৃঃ ১৯৮

৪৫। তদেব পৃঃ ১৩৩

৪৬। তদেব পৃঃ ১৪৬

৪৭। তদেব পৃঃ ১৪৭

৪৮। তদেব পৃঃ ৭৪-৭৫

৪৯। তদেব পৃঃ ১২৯

৫০। তদেব পৃঃ ১৬৭

৫১। তদেব পৃঃ ৪২৫

৫২। তদেব পৃঃ ৪৭৪

৫৩। তদেব পৃঃ ৪৭৫

৫৪। তদেব পৃঃ ৪৫

৫৫। তদেব পৃঃ ৬৬

৫৬। তদেব পৃঃ ৬৬

৫৭। তদেব পৃঃ ৬৬

৫৮। তদেব পৃঃ ৬৬

৫৯। তদেব পৃঃ ৩০২

৬০। তদেব পৃঃ ৩১৬

৬১। তদেব পৃঃ ৩৪৮

৬২। তদেব পৃঃ ৩৫২

৬৩। তদেব পৃঃ ১২৪

৬৪। তদেব পৃঃ ১৫৯

৬৫। নাট্যপত্র ঘরে বাইরে, প্রথম বার্ষিকী সংখ্যা, জুলাই ২০০১, পৃঃ ২২১

৬৬। তদেব পৃঃ ২২১

৬৭। তদেব পৃঃ২২১

৬৮। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা একাদশ সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ৩৮৭

৬৯। 'প্রতিবিম্ব' ২য় পর্যায়, তিস্তাপুরাণ প্রসঙ্গে, ২ সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃঃ ১

৭০। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ৯৯

৭১। তদেব পৃঃ ৫৫৭

৭২। তদেব পৃঃ ৫৫৭

৭৩। তদেব পৃঃ ৩৭

৭৪। তদেব পৃঃ ৫৫

৭৫। তদেব পৃঃ ৬০

৭৬। তদেব পৃঃ ১৯০

৭৭। তদেব পৃঃ ১৯

৭৮। তদেব পৃঃ ২৩৯

৭৯। তদেব পৃঃ ৪২৯

৮০। তদেব পৃঃ ১১৪

৮১। তদেব পৃঃ ৩৪৭

৮২। তদেব পৃঃ ৩৬৬

৮৩। তদেব পৃঃ ৩৬৬

৮৪। তদেব পৃঃ ৫০৪

৮৫। তদেব পৃঃ ৫০৭

৮৬। তদেব পৃঃ ৫৫৫

৮৭। তদেব পৃঃ৫৫৮

৮৮। তদেব পৃঃ ৬০৬

৮৯। তদেব পৃঃ ৩৪৬

৯০। তদেব পৃঃ ৬৩

৯১। তদেব পৃঃ ২৯৬

৯২। তদেব পৃঃ ২৯৬

৯৩। তদেব পৃঃ ৩২৮

৯৪। তদেব পৃঃ ৩৭৫

৯৫। তদেব পৃঃ ৩৩০

৯৬। তদেব পৃঃ ৪৮৮

৯৭। তদেব পৃঃ ২২৬

৯৮। তদেব পৃঃ ২২৮

৯৯। তদেব পৃঃ ২২৯

১০০। তদেব পৃঃ ৭৮

১০১। তদেব পৃঃ ৭৮

১০২। তদেব পৃঃ ১৭৭

১০৩। তদেব পৃঃ ১৯১

১০৪। তদেব পৃঃ ৪৮৬

১০৫। তদেব পৃঃ ৬৮২

১০৬। তদেব পৃঃ ৭৫

১০৭। তদেব পৃঃ ৭৫

১০৮। তদেব পৃঃ ৯৯

১০৯। তদেব পৃঃ ৩৭৮

১১০। তদেব পৃঃ ৬৪৯

১১১। বঙ্গীয় শব্দ কোষ, দ্বিতীয় খন্ড, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি ১৯৬৬, নতুন দিল্লী, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, পৃঃ ১৩৪৫

১১২। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ২৮৮

১১৩। তদেব পৃঃ ২১

১১৪। তদেব পৃঃ ১৮৩

১১৫। তদেব পৃঃ ২১৩

১১৬। তদেব পৃঃ ২৪১

১১৭। তদেব পৃঃ ২৫৯

১১৮। তদেব পৃঃ ৫০৭

১১৯। তদেব পৃঃ ৫১১

১২০। তদেব পৃঃ ৫৬৯

১২১। তদেব পৃঃ ৫৮১

১২২। তদেব পৃঃ ৬০০

১২৩। তদেব পৃঃ ৬৯০

১২৪। তদেব পৃঃ ৩৯

১২৫। তদেব পৃঃ ৩৫

ঃ পঞ্চম অধ্যায় ঃ

নদী তিস্তা ঃ অন্যান্য বাংলা নদী-উপন্যাস ঃ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে নদী

নদী তিস্তা ঃ অন্যান্য বাংলা নদী-উপন্যাস ঃ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ-এ নদী

মানব সভ্যতার বিকাশে নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ করা যায়। চৈনিক সভ্যতায় হোয়াং-হো, ইয়াংসিকিয়াং, মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, মিশরীয় সভ্যতায় নীল-নদ এবং ভারতীয় সভ্যতায় গঙ্গা, সিন্ধুনদের দান সর্বজন স্বীকৃত।

পৃথিবীর প্রাচীন ও বর্তমান প্রধান প্রধান শহর গুলি বিভিন্ন নদী তীরে অবস্থিত। যেমন - লণ্ডন-টেমস, রোম-টাইবার, প্যারিস-মিন, বন-রাইন, ভিয়েনা-ডানিয়ুব, সেন্টলুইস-মিসিসিপি, বাগদাদ-টাইগ্রিস, বেজিং-হোয়াংহো, নানজিং-ইয়াংসিকিয়াং, লাসা- সাংপো, তাসখণ্ড-শিরদরিয়া, কায়রো-নীলনদের তীরে গড়ে উঠেছে।

ভারতের দিল্লি-যমুনা নদীতীরে, কলকাতা হুগলী নদীর তীরে, কটক-মহানদীর তীরে, পাটনা গঙ্গা তীরে, বারানসী-গঙ্গা তীরে, গুয়াহাটি-ব্রহ্মপুত্রের তীরে, বিজয়ওয়ারা-কৃষ্ণা নদীর তীরে, এবং তিরুচিরাপল্লী-কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। সুপ্রচীন কাল থেকেই নদী কৃষিকার্যের প্রধান সহায়, পানীয় জলের প্রধান উৎস, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য'র প্রধান মাধ্যম। যোগাযোগ ব্যবস্থার মুখ্য উপায়।

প্রাচীন ভারতে ঋকবেদে 'সপ্ত সিন্ধু' বলে সাতটি নদীর নাম পাওয়া যায়। ওই সাতটি নদী হল সিন্ধু-বিতস্তা-আসিক্লী-পুরুষ্ণী-শতুদ্রী-বিপাশ-সরস্বতী। নদীগুলির বর্তমান নাম সিন্ধু-সিন্ধু, বিতস্তা-ঝিলম, আসিক্লী-চেনাব বা চন্দ্রভাগা, পুরুষ্ণী-ইরাবতী, শতুদ্রী-শতদ্রু, বিপাশা-বিয়াশ। সরস্বতী বর্তমানে নেই। বর্তমানে এই ছটি নদীই ভারত-পাকিস্তানের উত্তর অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

পৌরাণিক যুগে ভারতের পরিচয় হত জম্বুদ্বীপ হিসেবে, ঋকবেদে যেমন ব্রহ্মাবর্ত, পুরাণে তেমনি জম্বুদ্বীপ। বৃত্তাকার জম্বুদ্বীপ চতুর্দিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা, হিমালয় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী ভূভাগকে ভারত বলা হত। পুরাণ অনুসারে মেরু নামক সুউচ্চ কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে নদী গুলি সমভূমির দিকে প্রবাহিত হত। এবং সমগ্র জম্বুদ্বীপকে করত সুজলা-সুফলা।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল, আবহমানকাল ধরেই ভারত-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নদনদীর জলে পুষ্ট হয়ে মাটিকে করেছে শস্যশালিনী, নগরকে করেছে বাণিজ্যবতী। আর শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে স্থান থেকে স্থানান্তরে।

বাংলা নদীমাতৃক দেশ। পশ্চিমবাংলার দক্ষিণাঞ্চলে দামোদর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, কাসাই,

সুবর্ণরেখা, কেলেঘাই ইত্যাদি নদী, মধ্য অঞ্চলে ভাগীরথী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, প্রভৃতি ও উত্তরাঞ্চলে তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা, পুনর্ভবা, নাগর, আত্রেয়ী, রায়ডাক, কালজানি, করতোয়া, করলা, ধরলা, মানসাই ইত্যাদি নদী। বাংলাদেশের বিখ্যাত নদী গুলি হল পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, তিতাস, ফেনী প্রভৃতি।

'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে আচার্য নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন "বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। এই নদী গুলোই বাংলার প্রাণ, এরাই যুগে যুগে বাংলাকে গড়েছে। বাংলার আকৃতি প্রকৃতি নির্ণয় করেছে।" এত নদীর সমাবেশ যে ভূ-খণ্ডে, সে মাটি উর্বর, কৃষিযোগ্য হবে সে তো স্বাভাবিক। তাই বাংলা সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা। বাঙালীর জীবন মূলতঃ কৃষি নির্ভর, আবার নদীকেই জীবিকা করে বহু মানুষ জীবন ধারণ করে। নদী পথে ব্যবসা বাণিজ্যও চালু ছিল প্রাচীন বাংলায়। এখনও চালু আছে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গলে চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগর, ও শ্রীমন্ত সদাগরের নদী পথে ব্যবসা বাণিজ্যে যাওয়ার কাহিনি বর্ণিত আছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজরা উত্তরবঙ্গ, আসাম, পূর্ববঙ্গ জয়ের জন্য নদী পথেই এসেছিলেন। উত্তরবঙ্গে প্রথম নদী জরিপ করে চার্ট তৈরির কাজ করেছিলেন ইংরেজরা। উত্তরবঙ্গের নদী গুলি নিয়ে বহু লোক কাহিনি, উপকথা ছড়িয়ে আছে গ্রামে গ্রামান্তরে।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ নদীরই উৎপত্তি স্থল উত্তরের ভূটান পাহাড়। আর সে জন্যই খরস্রোতা, বন্যাপ্রবন, ফলে অপেক্ষাকৃত কম নাব্য। এই ভূ-খণ্ডের প্রধান নদী তিস্তা, দেবভাষায় 'ত্রিস্রোতা'। কালিকা পুরাণে তিস্তা ত্রিস্রোতা নামে পরিচিত। এবং ত্রিস্রোতা নাম হওয়ার পেছনে একটা কাহিনিও আছে। সেই পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে একবার পার্বতী এক ভীষণ দানবের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধ করতে করতে দানব প্রবল তৃষ্ণাতুর হয়ে পড়ে। এবং মহাদেবের শরণাপন্ন হয়। তখন মহাদেব পার্বতীকে জলপ্রদানের অনুরোধ জানান। মহাদেবের অনুরোধে পার্বতী নিজ বক্ষ হতে তিনটি ধারা নির্গত করেন। সেই তিন ধারাই ত্রিস্রোতা বা তিস্তা। সুতরাং পুরাণানুসারে তিস্তার উৎপত্তি পার্বতীর বক্ষস্থল থেকে। কথিত আছে সতীর দক্ষিণ জানু পড়েছিল এই নদীতে। দেবী এখানে চণ্ডিকা। জানা যায় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে তিস্তা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ডে শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য পৃথু রাজা এক গড়বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। আজও সেই ধ্বংসাবশেষ পৃথুরাজার গড় নামে পরিচয় বহন করে আসছে।

তিস্তা একটি আন্তর্জাতিক নদী। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল সিকিমের চরটেন লাইমা পাহাড়ের বাইশ হাজার চার'শ ফুট উঁচু শিখর থেকে উৎসারিত হয়ে সিকিম, দার্জিলিং জেলার মধ্যদিয়ে তরাই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে

জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করেছে। এই জেলায় নদীটি দক্ষিণ পূর্ব বাহিনী। এর আরও তিনটি স্রোত করতোয়া, আত্রেয়ী ও পুনর্ভবা দক্ষিণ বাহিনী। দক্ষিণ বাহিনী মধ্যবর্তী স্রোতটি আত্রাই বা আত্রেয়ী, আর দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী স্রোতটি হল পুনর্ভবা। তিস্তা থেকে উৎসারিত এই স্রোত তিনটি পরে পৃথক তিনটি নদী রূপে মহিমা অর্জন করেছে।

লেপচা ভাষায় তিস্তার নাম রং-ন্যু। যার অর্থ সোজা পথে প্রবাহিত নদী। তিব্বতীরা আদর করে এর নাম দিয়েছে 'ৎসাং- ছু' অর্থাৎ বিশুদ্ধজল।

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা কবি ভবানী দাসের 'ময়নামতি' পুঁথিতে তিস্তার উল্লেখ আছে। এই নদীর তীরে রানী ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দ চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ধর্মপালের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তিস্তার বন্যা এবং ভাঙন একটা চিরকেলে ঘটনা। তার এপাড় ভাঙা ওপাড় গড়া স্বভাবকে তিস্তার 'দস্যুবৃত্তি' বলে অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ১৮০৩ সালে কোল ব্রুক বলেছিলেন —'তিস্তার খাড়ি বড় অদ্ভুত ভাবে নড়াচড়া করে। যেখানে স্থির নিশ্চিত যে চর সৃষ্টি হয়ে গভীরতা কমে যাবে, সেখানে দেখা গেল নদী ৬০ ফুট গভীর হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে দু'বছরের মধ্যে মূল খাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে চর জেগেছে।' এই নদীর এমন অস্থিরতা দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে বাঙালী এর নাম দিয়েছে 'কীর্তিনাশা'। আবার এই তিস্তার পারেই মানুষের ঘনবসতি, ফসলের শোভা, মানুষের ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, ধর্ম সংস্কৃতির স্বর্ণ দেউল।

তিস্তা উত্তরবঙ্গের লোক বিশ্বাসে 'তিস্তা বুড়ি'। 'বুড়ি' প্রাচীনা, মাতৃস্বরূপা, অভিভাবিকা। তিস্তার বন্যা, খরা, ভাঙন, চর সৃষ্টি, সব কিছুর মধ্যেই তিস্তাবুড়ির ইচ্ছা কাজ করছে। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পুজার প্রচলন। ' আজি কেন ধূপের বাস উঠেছে/ না জানি তিস্তা মাতা নামিছে/ পূজা খাওয়ার আশে।'

তিস্তার অসীম শক্তি, অপার মহিমার কথা লোক গল্পে নানা ভাবে উল্লেখ হয়েছে। তার মধ্যে একটি গল্প এরকম।

একবার জলপাইগুড়ির তিস্তার রেলব্রিজ তৈরির কাজে এক বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার আসেন। ব্রিজ তৈরির আগে তিস্তাবুড়ির পূজা দিতে বলে সেখানকার বাসিন্দারা। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সে কথা কানে তোলেন না। স্থানীয় লোকেরা তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়— পুজো না দিয়ে কাজ শুরু করতে গেলে তিস্তাবুড়ি নানা অনর্থ ঘটাবে। ইঞ্জিনিয়ার তাতেও ভয় পান না। বরং বন্দুক উঁচিয়ে তিস্তার বুকে গুলি ছুঁড়ে তিস্তাকেই

শায়েস্তা করতে চান। পরের দিন রাতেই তিস্তা দোমহনি ষ্টেশনকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেই সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকেও।

সেই জন্য কোন কাজ শুরুর আগে তিস্তাকে নিমন্ত্রণ করে মন্ত্র বলা হয় —'স্বর্গ হইতে নামিল তিস্তা বুড়ি / মন্‌চে দিয়া পাও/ মন্‌চে নামি তিস্তা বুড়ি / চেতন করিল গাও।'

তিস্তা ও রঙ্গিত নদীর প্রণয় কাহিনি নিয়ে লোক গান লেপচাদের বিয়েতে গীত হয়। সেখানে নব বধূকে তিস্তা রঙ্গিতের মত হও বলে আশির্বাদ করে। লেপচাদের বিশ্বাস বিয়ের সময় নব দম্পতির সামনে তিস্তা রঙ্গিতের মিলন গাঁথা গাইলে তাদের জীবনও তিস্তা রঙ্গিতের মতো প্রেমপূর্ণ, সুখী ও সাবলীল হয়।

তিস্তাপারের মানুষের প্রধান গান ভাওয়াইয়া। এই ভাওয়াইয়া গানেও তিস্তা নদীর কথা ফিরে ফিরে এসেছে বার বার। কখনও তিস্তার প্রকৃতি, কখনও তিস্তার বন্যা, কখনও নরনারীর প্রণয় ভাওয়াইয়ার সুরে তালে এসেছে। তিস্তাকে তিস্তা বুড়ি হিসেবে, মেচেনি হিসেবে ধরেও গান গাওয়া হয়ে থাকে। 'তিস্তা নদী খানের ধই ধই রে বালা / দূরের বন্ধুর মোর কিসের আশা।'

তিস্তা নদীর পারে গড়ে উঠেছে কত তীর্থস্থান, মন্দির। জল্পেশ -এর শিবমন্দির তার একটি বড় উদাহরণ। এই মন্দির ও তীর্থস্থান গুলিতে বছরের বিভিন্ন সময়ে মেলা বসে, সংস্কৃতির চর্চ্চা হয়।

জলপাইগুড়িতে এসে তিস্তার যে তিনটি স্রোতধারা করতোয়া, পুনর্ভবা ও আত্রেয়ী নামে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ও মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তারা এখন স্বতন্ত্র নদী রূপে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এদেরও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক মহিমা আছে।

করতোয়া — পুরাণে বারবার করতোয়ার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। আমাদের একটি মহাপীঠের নাম করতোয়া পীঠ। এখানে সতীর বামকর্ণ পড়েছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে - 'করতোয়া তটে পড়ে বামকর্ণ তার / বামেশ ভৈরব দেবী অর্পণা তাহার।' এখানে ভৈরব হলেন শিব বামেশ এবং দেবী এখানে অপর্ণা। মহাভারতের বনপথে করতোয়াকে 'পুণ্যতোয়া' বলা হয়েছে।

সপ্তম শতকের য়ুয়াং চোয়াঙ পুন্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ যাওয়ার পথে একটি বৃহৎ নদী অতিক্রম করেছিলেন। টাং-সু গ্রন্থে সেই নদীটির নাম ক-লো-তু অর্থাৎ করতোয়া। এই নদীটি সপ্তম শতকে কামরূপ ও পুণ্যবর্ধনের মধ্যবর্তী সীমা নির্দেশ করত। একদা বাংলার রাজধানী মহাস্থানগড় এই নদীর পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত ছিল। আধুনিক কালে রাজবংশী সমাজের এক সংস্কারক ঠাকুর পঞ্চানন রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় করণের জন্য করতোয়ার

তীরে বসেই তাদের উপবীত প্রদান করেন।

পুনর্ভবা ঃ মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে পুনর্ভবার নাম জড়িত হয়ে আছে। কথিত আছে মহারাজ বলির পুত্র অসুর রাজ বান প্রতিদিন এই নদীতে অবগাহন করে শিব মন্দিরে পুজো দিতেন। বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের কাছে বানগড় বানবাজার রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। লোকশ্রুতি, বানরাজ কন্যা ঊষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল বলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বানরাজের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বানরাজ নিহত হন। মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচারের জন্য এই নদীর ধারে কোটি বর্ষ নগরে এসেছিলেন। পাল আমলে দেবকোটে এসেছিলেন বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর। পুনর্ভবা তীরে দেবকোটে লেখা পড়া করে তিনি সেই নদী ধরেই মহাযান তন্ত্রের জ্ঞান নিয়ে তিব্বতের পথে গিয়েছিলেন। বঙ্গবিজেতা ইকতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজি কামরূপ যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে ফিরে এসে এই নদী তীরেই অবস্থিত পীরপাল গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। সন্ধ্যাকর নদীর 'রাম চরিতে' এই নদীকে 'অতিভঙ্করী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানীর আমলে দেবী সিং বজরায় চেপে এই নদী পথে ঘুরে ঘুরে রাজস্ব আদায় করতেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ভবা তিস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং একটি নতুন উৎস খুঁজে নেয়। নতুন উৎসটি হল বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁর ব্রাহ্মণপুকুর নামে একটি বিল।

আত্রেয়ী ঃ দেবীপুরাণে দুর্গোৎসবের মহাস্নান মন্ত্রে আত্রেয়ীর নাম সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় — 'আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।' মহাভারতের বনপর্বেও এই নদীর নাম উল্লেখ আছে। এই নদী তিস্তা থেকে বের হয়ে দক্ষিনবাহী হয়ে চলনবিলের ভেতর দিয়ে জাফরগঞ্জের কাছে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে বাংলাদেশ থেকে এসে কুমারগঞ্জ থানার মধ্যে দিয়ে পুনরায় দক্ষিনবাহী হয়ে ফের বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

'ইছামতী' নামে তার একটি উপনদী পতিরামের কাছে রাধানগরে আত্রেয়ীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আত্রেয়ী আকৃতিতে বিশাল ছিল বলে ভান-ডেন-ব্রোকের নক্সায় জানা যায়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিলি ট্রেন ডাকাতির বিপ্লবীরা আত্রেয়ীর বুকে বৃটিশ পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করেছিলেন। বালুরঘাটে ৪২ -এর আন্দোলনের সংগ্রামী বীরেরা এই নদী পার হয়েই ডাঙ্গির মাঠে জমায়েত হয়েছিলেন। আত্রেয়ীর অফুরন্ত জল ও পলিমাটি দু'পারের জমিকে সারা বছরই শস্য শ্যামলা করে রাখে।

বাংলা উপন্যাসে নদী ঃ

নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে কম নয়। কখনও নদী পটভূমি হিসাবে, কখনো নদী তীরবর্তী নদী অন্বিত মানুষজনের বিশাল বৃত্তান্ত হিসাবে, কখনো বা শুধুই উপমা, তুলনা হিসাবে নদী উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সরাসরি নদীর নামে উপন্যাস না লিখলেও তাদের কোন কোন উপন্যাসে নদী আসেনি এমন নয়। আর তিরিশের দশকের থেকে সত্তর দশকের মধ্যে পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), কালিন্দী (১৯৪০), ইছামতী (১৯৫০), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৬৩), হাঁসুলি বাঁকের উপকথা ইত্যাদির মত ক'খানা বিখ্যাত উপন্যাস রচিত হয়েছে। নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের সাম্প্রতিকতম সংযোজন দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) ও 'তিস্তাপুরাণ' (২০০০) বাংলা উপন্যাস প্রবন্ধে আক্ষেপ করে দেবেশ রায় দুটি মন্তব্য করেছেন এক) " সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলায় নাকী একমাত্র বা প্রধান নদী ব-দ্বীপ যেখানে এত মানুষ বাস করে, অথচ আমাদের উপন্যাসে সে বিবরণ লেখা হল না কত নদীর জল কত রঙের মাটি ভাঙে।" দুই) " আর, এই নদী, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই পাহাড়, এই সমতল আর এই সমুদ্রকে অন্বিত করে যে মানুষ তার নিজের বাঁচার কাহিনী নিয়ে আমাদের উপন্যাসে এল না।"১

প্রথম মন্তব্য অনুসারে 'নদী' নিজেই একটি বিষয়। দ্বিতীয় মন্তব্যে নদী অন্বিত মানুষের 'বাঁচার কাহিনী'। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে তিস্তানদী বা অন্য নদী কী ভাবে 'কত জল কত মাটি ভাঙে' ও নদী অন্বিত মানুষের বাঁচার কাহিনি কিভাবে বর্ণিত হয়েছে তা আলোচনা করা হল। অবশ্য তার আগে নদীকেন্দ্রিক তিন খানা বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা গেল।

পদ্মানদীর মাঝি

'পদ্মানদীর মাঝি' পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুর গ্রাম, বিশেষত এই গ্রামের জেলেপাড়া, তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুবেরের শ্বশুরবাড়ি চরডাঙ্গা, কপিলার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের জেলে জীবনের ছবি নিয়ে রচিত একটি উপন্যাস। 'পদ্মানদীর মাঝি' নামকরণের মধ্যেই পদ্মা অপেক্ষা পদ্মানদীর মাঝিদের অর্থাৎ জেলেদের জীবন কথাই যে এর মর্মবস্তু তা সহজেই বোঝা যায়। তবে এও ঠিক যে এ মাঝি কোথাকার? এ উপন্যাসে পদ্মা এসেছে পটভূমি হিসেবে। এখানকার বর্ণিত জীবন পদ্মাকে ছাড়া কল্পনা করা যায় না। এদের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বনই পদ্মায় মাছ ধরা। এই মাছ ধরার একটি সহজ সরল বর্ণনা—

"সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো। অনির্বাণ জোনাকির মত

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ও গুলি। সমস্ত রাত্রি আলো গুলি এমনি ভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মত সঞ্চালিত হয়। ..... নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত শাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিস্পলক চোখ গুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়।" ২

মাছ ধরার প্রসঙ্গে তো নদী আসবেই। এছাড়া জেলে মাঝিদের দৈনন্দিনের নানা কাজ, যেমন মেঘলা আকাশে ঝড়ের আশঙ্কা সত্বেও নদীর তীরে বাঁধা নৌকা নিয়ে শেষ রাতে বেরিয়ে পড়া, দিনের বেলায় রোগী নিয়ে পদ্মায় নৌকা বেয়ে আমিন বাড়ি যাওয়া। নৌকা চেয়ে 'বন্যায় ভেসে যাওয়া' শ্বশুরবাড়ি দেখতে যাওয়া ইত্যাদিতে নদী ও নৌকাই তো একমাত্র ভরসা।

'পদ্মা ও পদ্মার খাল গুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মত কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়ো জাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পারি জমায়, এগাঁয়ের মানুষকে ওগাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ।' ৩

আশ্বিনের ঝড়ে পদ্মার ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনার সুযোগ থাকা সত্বেও লেখক তা সম্বরণ করে তার ফল জেলে মাঝিদের কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে যে পদ্মা কুবেরদের জীবনের আবাল্য সাথী, তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার, সমুদ্র অভিযানে যাওয়ার সময় তার প্রতি ভালবাসায় মুগ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কুবের যেন এই প্রথমবার তার প্রিয় নদীকে প্রাণভরে দেখার সুযোগ পেল।

"নদীকে সে বড় ভালবাসে, নদীর বুকে ভাসিয়া চলার মত সুখ আর নাই। ..... কাউয়াচিলা পাখি গুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।..... ষ্টীমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে, তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে পিছনে। নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন ধরা তীরে শুভ্রকাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের স্পন্দন এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমূখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারা জীবন। মায়াবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চির যৌবনা। বৈচিত্র্য? কি তার প্রয়োজন? নতুন পৃথিবীকে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ?" ৪

বর্ষায় ইলিশ ধরার মরসুম ফুরিয়ে এলে 'বিপুলা পদ্মা কৃপণ' হয়ে যায়। তখন জেলে মাঝিদের জীবনে

নেমে আসে দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা। সংসারে দেখা দেয় নানা অশান্তি, হতাশা, অবিশ্বাস। কুবের মালারা নানা রকম লোভের জালে পড়ে। তবু জীবন থেমে থাকে না। বছর বছর সন্তান হয়। অসুখ বিসুখ থেকে বাঁচার জন্য লড়াই চলে। জীবনের স্বপ্ন ইন্ধন হিসেবে দেখা দেয়।

হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপ সেই স্বপ্ন দেখানোর দ্বীপ। সে স্বপ্ন এমন যে সেখানে স্ত্রী মালাকে ছেড়ে কুবের, আর স্বামীকে ছেড়ে কপিলা 'সমুন্দুর'-এ নাও ভাসায়। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপও তো নদীর সঙ্গেই অন্বিত। নদী পথেই তার আনা গোনা নদী পথেই ব্যবসা বাণিজ্য। আসলে পদ্মাকে ছেড়ে ময়নাদ্বীপে কুবেরদের যাত্রা-দ্বীপকে ভালবেসে নয়, দারিদ্র্য মোচনের তাগিদে। হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপ পত্তন, একদিক থেকে বাঙালীর আর একটি জনপদ আবিষ্কার—বাংলার সীমানা বিস্তার। এ দ্বীপ জয় সম্ভব করতে হোসেন মিঞা কুবেরদের নদী পথ সমুদ্র পথই ব্যবহার করতে হয়েছে। পদ্মা এখানে উপায়, সমুদ্র এখানে মুক্তি।

"কেতুপুরে পদ্মায় যে নৌকাকে অত্যন্ত বৃহৎ মনে হইয়াছিল, এখন সেটিকে কুবেরের মোচার খোলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরদিন অপরাহ্নে নোয়াখালি জেলার নারকেল বৃক্ষপূর্ণ তীরভূমিতে নৌকা বাঁধা হইল। এদিকে কুবের কখনো আসে নাই, বিস্ময়ের সঙ্গে সে হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কি সমুন্দুর? হোসেন একখানা ম্যাপ বাহির করিল। আঙুল দিয়া সে কুবেরকে চিনাইয়া দিতে লাগিল। মেঘনার মোহনার দিক গুলি—সিদ্ধি দ্বীপ, বিদৌদ্বীপ, সন্দ্বীপ, হাতিয়া প্রভৃতি। আরও পশ্চিমে নানপুর দ্বীপ, দক্ষিণ শাবাজপুর, বান্দোরাদ্বীপ।.....এই বিন্দুটির কিছু উত্তর পূর্বে ওই যে একটি সবুজ বিন্দু দেখা যায় ওর নাম ময়নাদ্বীপ।"৫

'পদ্মা' কুবের মাঝিদের জীবিকার স্থল। কিন্তু ইলিশের মরসুম শেষ হয়ে গেলে এই পদ্মাই আর একভাবে ওদের আশ্রয় দেয়।

"ইলিশের মরসুম শেষ হইয়া গেল। ধনঞ্জয়ের তিনটি নৌকো ইলিশের মাছ ধরার কাজে লাগানো হইয়া ছিল। একটিতে থাকিত সে নিজে। অন্যদুটিতে তার দুই ছেলে। আশ্বিণের ঝড়ে একটি নৌকো ভাঙিয়া গিয়াছে এবার একটি নৌকা সে রাখিল মাছ ধরার জন্য, অন্যটি রাখা হইল ভাড়া খাটিবার কাজে।" ৬

জীবনের এক ঘেয়েমির মত পদ্মা নদীও একঘেয়েমি রূপে দেখা দেয়। 'ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মায় ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে। পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়।' ৭

লেখক জলের প্রবাহের সঙ্গে জীবনে তুলনা করে বলেন —

'নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে স্থলে, মানুষের অবিরত জীবন প্রবাহ।'

সুতরাং পদ্মাবর্তী জেলে জীবন তো বটে 'পদ্মানদীর মাঝি' তে পদ্মার স্বতন্ত্র ভূমিকা লক্ষ করা গেল। পদ্মাকে পটভূমি করে লেখক এঁকে গেছেন একের পর এক কুবের ধনঞ্জয়, গণেশ, কপিলা, মালা, হোসেন মিঞাদের জীবন চিত্র।

তিতাস একটি নদীর নাম

পদ্মানদীর মাঝিতে লেখক পদ্মার পটভূমিতে জেলে মাঝিদের গল্প শুনিয়েছেন। সেখানে নদী তীরবর্তী মানুষের কথা বলতে গিয়ে নদীর কথা এসে পড়েছে। কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম' ঠিক এর বিপরীত। এখানে নদীর কথা আগে, তারপর নদী অন্বিত মালোদের কথা। একটা জিনিস দুটি ক্ষেত্রেই এক তা হল নদী ও নদী অন্বিত জীবন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস খানির গঠন গত দিকটি লক্ষ করলে দেখা যায় এর চারটি ভাগ। প্রতিটি ভাগে আবার দুটি করে অধ্যায়। মোট আটটি অধ্যায়। প্রথম ভাগে প্রথম অধ্যায়টির নামই তিতাস একটি নদীর নাম,। সেখানে গল্প নেই বললেও চলে। যা আছে তা' তিতাসের বর্ণনা নানা দিক থেকে।

'তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুক ভরা ঢেউ, প্রাণ ভরা উচ্ছ্বাস, স্বপ্নে ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে। দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়া ঘুম পাড়াইতে বসে। কিন্তু পারে না। মেঘনা পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নেই।..... তিতাস মাঝারি নদী।..... তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই, কৃপণের মত কুটিলতা নাই।..... তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী।..... ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই।'৮

মেঘনা থেকে বেড়িয়ে 'মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস।' তেমন কোন ইতিহাস তিতাসের না থাকলেও "কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বৌ, ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে।" ৯

'তিতাস একটি নদীর নাম' শিরোনামের প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের প্রায় ২০ পৃষ্টা শুধু তিতাসেরই কথা, আর মালোদের জীবনের 'মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম ও বৌ-ঝিদের দরদের ইতিহাসের আভাস। সেই সঙ্গে বাংলার নদীময় ভূগোলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত।

'বাংলার বুকে জটার মত নদীর প্যাঁচ। সাদা, ঢেউ তোলা জটা। কোন মহাস্থবিরের চুম্বন রস সিক্ত বাংলা।

তার জটা গুলি তার বুকের তারুণ্যের ওপর দিয়া সাপ খেলানো জটিলতা জাগাইয়া নিম্নাঙ্গের দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এসবই নদী।' ১০

প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় 'প্রবাস খণ্ড'। প্রকৃত পক্ষে গল্পের শুরু এখান থেকে । মাঘ মণ্ডলের ব্রত ও চৌয়ারি উৎসবকে কেন্দ্র করে কিশোর ও সুবলের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পরে কিশোর ও সুবলের প্রবাস যাত্রা। সুখদেবপুরের মোড়লের মেয়েকে বিয়ে করে ফেরার পথে, নদী পথে নৌকার ওপর ডাকাত পড়ে। কিশোরের স্ত্রীকে পাওয়া যায় না। পর দিন বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া যায়। বৌয়ের শোকে কিশোর পাগল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ভাগে দুটি খণ্ড। 'নয়াবসত' ও 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ'। নয়াবসতে কিশোরের বউ মরেনি। ফিরে এসে পাগল স্বামীর কাছেই একটি বাড়িতে থাকে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে এক দোলের দিন ওই পাগলকে রঙ লাগাতে গিয়ে অনন্তর মা পাগলের পাগলামিতে পড়ে। পাগল তাকে জড়িয়ে ধরে। তাকে ছাড়াতে গিয়ে লোকজন পাগলকে এমন ভাবে মারে যে পরের দিন পাগল মারা যায়। তার চারদিন পর অনন্তর মা-ও মারা যায়।

তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায় 'রামধনু'তে মালোপাড়ার সঙ্গে তেলিপাড়ার ঝগড়া বিবাদ। অনন্তর জীবনে আসে বাসন্তী, বনমালী ও বোন উদয়তারা। দ্বিতীয় অধ্যায় 'রাঙানাও' এর প্রথম অংশে নাও-এর প্রতিযোগিতা, শেষ অংশে অনন্তর অধিকার নিয়ে বাসন্তী ও উদয়তারার কলহ।

চতুর্থ ভাগের দুটি অধ্যায় 'দুরঙা প্রজাপতি' ও 'ভাসমান'। 'দুরঙা প্রজাজপতি'তে অনন্তর পড়াশুনা এক গোসাই বাবাজীর কাছে। অনন্ত বালার সঙ্গে বিয়ের কথা কিন্তু অনন্তর শহরে যাওয়ার বাসনা। মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভাঙন। 'ভাসমান' এ তিতাসের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। চর জাগছে মালোদের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে-তারই কাহিনি।

প্রতিটি ভাগের প্রতিটি অধ্যায়ে মালোদের জীবন বৃত্তান্ত রচিত হয়েছে। তার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে নদী। তিতাসের সঙ্গে মালোদের সম্পর্ক বৃত্তির সম্পর্ক। তারা পেশাগত ভাবে মৎস্যজীবী। তিতাসের জলই তাদের জীবিকার মূল উৎস। তাই নদীর সঙ্গে তাদের বাঁচা মরার সম্পর্ক। যতদিন নদীতে জলছিল তারা সেই জলে মাছ ধরেছে, নানা ব্রত, পার্বণ উদ্‌যাপন করেছে। যখন সেই জলে টান দেখা দিল, জল শুকিয়ে চর জেগে উঠলো তখন নেমে এল তাদের জীবনের হাহাকার।

"বড় বড় নদীতে এক তীর ভাঙে, এক তীরে চর পড়ে। ইহাই ধর্ম। কিন্তু তিতাসের ধর্ম তা নয়। এ নদীর

কোন তীর ভাঙে না।' এমন নদীর বুকে চর পড়লে সে চর আস্তে আস্তে বিশাল আকার নেয়। ' আয়তনে বাড়িয়া চৌড়া বুক চিতাইয়া।'

অবশ্য সুখদেবপুরের মালোরা কেবল নদীর ওপরই নির্ভরশীল নয়। তাদের চাষের জমিও আছে। নদীতে মাছের অভাব দেখা দিলে তাদের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে না।

'এখানে ঘরে ঘরে জাল যেমন আছে, তেমনই হালও আছে। প্রত্যেক বাড়িতেই এক পাশে জালের সরঞ্জাম, আর একপাশে হালের সরঞ্জাম।' এখানে নদী ও মাঠ উভয়েই ভর ভরান্ত 'একদিকে নদী মাছে ভর ভর আর একদিকে মাঠ ফসলে হাসা হাসি।' কোন কারণে নদী শুকিয়ে গেলেও এখানকার মালোরা মরবে না। 'কোন দিন কোন অদৃশ্য শয়তান যদি ইহাদের জালের গিঁটগুলি খুলিয়া দেয়। নৌকার লোহার পাত গুলি আলগা করিয়া ফেলে, আর নদীর জল চুমুক দিয়া শুষিয়া নেয়, ইহারা মরিবে না।'

কিন্তু তিতাসের জল যাদের ভরসা জল শুকিয়ে গেলে তাদের বাঁচার উপায় নেই। চরে চাষবাস হলে যে জীবন শুরু হবে, সে মালো জীবন নয়। অনন্তর লেখা পড়া শিখে মানুষ হওয়ায় জীবন ও মালো জীবন থেকে আলাদা। তিতাসের যা কিছু তা ওই মালোদের জীবনকে ঘিরে। পদ্মা নদীর মাঝিতে, কিংবা গঙ্গায় যেমন পদ্মা ও গঙ্গা সমুদ্রের সীমাহীনতায় মুক্তি পেতে চেয়েছে, এখানে তা নেই। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন —"তিতাসের নিজ ইতিহাস তার জলস্রোত, জলের রঙ, ঋতুতে ঋতুতে জোয়ার ভাঁটায় তার নানা রূপ সেভাবে আসে না। গতিপথ পাল্টানো, চর জেগে ওঠার যে অভিঘাত দেখানো হয়, তা মালো পাড়ার ওপর। তিতাসের কূলের মালোপাড়ার কি সর্বনাশ হল সেটাই বর্ণিত। কিন্তু ওই পরিবর্তন নদীর ইতিহাসে-ভূগোলে টাইম স্পেসে অর্থাৎ নদীর ডিসকোর্সে কি অভিঘাত পরিবর্তন নিয়ে এল তার বিবরণ নেই।"১১

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসকে 'নদীর পাঁচালী' বলেছেন। সেই সঙ্গে আমরা বলব এটি একটি অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন পাঁচালীও।

গঙ্গা

'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' -এ যেমন জেলে জীবনের কথা নদীর সঙ্গে অন্বিত হয়ে বিবৃত হয়েছে, গঙ্গায় মাছ মারাদের তো একেবারে নদীর ওপরেই বসবাস। ওদের তো তবু খানিকটা কৃষি নির্ভরতা ছিল। কিন্তু গঙ্গার জেলের দলের মাছ ধরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মাছের ও জলের মর্জির ওপর ভর করেই এদের বাঁচার লড়াই।

পাঁচুর মৃত্যুর দৃশ্য নদীর ভয়ঙ্করতা লক্ষ করবার মত—

'দেখতে দেখতে বিলাশের মাথা ছাড়িয়ে বানের ঢেউ এসে পড়ল। গলুই উঁচুতে উঠে খাড়া হয়ে উঠলো নৌকা। বিলাশ বসে চাপ দিল হালে। ঢেউয়ের মাথার সঙ্গে নেমে এল আবার।'

এই নদী, নদী অন্বিত মানুষদের লেখক কাছে থেকে দেখেছেন। তাদের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোত হয়ে তাদের কথা লিখেছেন। অধ্যাপক নিতাই বসুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে সমরেশ বসু একবার বলেছেন —

"আমি যখন আতপুরে থাকতাম তখন গঙ্গার ধারে মালোপাড়া বলে একটি পাড়া আছে, আমি সে পাড়াতে প্রায় যেতাম। সেখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। তাদের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা মারা এসব করতাম। এবং ওরা অনেকেই চটকলে কাজ করত। কিন্তু ওদের নৌকা-হাল এসবও ছিল।" ১২

গঙ্গার ওপর নির্ভরশীল একটি মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অন্তঃ ও বহির্জীবনের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

"একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার এরূপ নিখুত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণা বাংলা উপন্যাসে অন্যত্র দুর্লভ, লেখক শুধু উহাদের জীবনযাত্রার বর্হিঘটনাই চিত্রিত করেন নাই, উহাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট, চিন্তা ও আবেগের স্পন্দন, উহাদের জীবন বোধের সমস্ত প্রদোষান্ধকার অস্পষ্টতা ও রহস্যঘন নক্ষত্র দীপ্তি আমাদের নিকট অপূর্ব দক্ষতার সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।" ১৩

সমরেশ বসুর গঙ্গায় বর্ণিত মাছ মারাদের জীবন কেবল মূল গঙ্গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা গঙ্গার শাখা নদী গুলি থেকে বিভিন্ন কুতঘাট ও গেট পার হয়ে উত্তর দিকে চন্দননগর, শ্রীরামপুর অঞ্চলের গঙ্গা পর্যন্ত সীমায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষক শুভাশিস দত্ত লিখেছেন ঃ

" 'গঙ্গা' উপন্যাসটির সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা লেখক মানসের এই পরিচয়টিই (অর্থাৎ 'কঠিন সংগ্রামী জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা' লব্ধ বোধের পরিচয় — অ বি) লক্ষ করি। তাঁর বাসভূমি বারাকপুর, (উত্তর ২৪ পরগনা) মহকুমা শিল্পাঞ্চল, হাজিনগর, গৌরীপুর, নৈহাটি, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, গারুলিয়া এবং সমান্তরাল পুবদিকের গ্রামান্তর নিয়ে একটি বিশিষ্ট সামাজিক কাঠামো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যার বয়স প্রায় ১০০ বছর। ইংরেজদের উপনিবেশ ভারতবর্ষের এই এলাকায় প্রথম আধুনিক শিল্পায়ন। Industrialisation -এর বিকাশ ঘটে। মূলত পাট শিল্প, গৌণত কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কিছু রঙকল ও

উল্লেখযোগ্য হল সরকারি অস্ত্র কারখানা। শুধু বাংলার নয়, গোটা ভারতবর্ষেরই উৎপাদনে আধুনিক শিল্পের ভূমিকা নিয়ে এই অঞ্চলটি গুরুত্বপুর্ণ ভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটায়। গঙ্গা তীরের জেলে মালো সম্প্রদায়ের বসতি উৎখাত করে বিদেশী পুঁজি মালিকদের হাতে দেশীয় জমিদারেরা তুলে দেয়।" ১৪

গঙ্গা, গঙ্গার তলদেশ, জলের অতল গভীরে মাছের ঝাঁকের চলা ফেরা। যেমন লেখক সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন, তেমনই এঁকেছেন জেলে মালো জীবনের আর্থ সামাজিক ইতিহাসও।

এখানেই শেষ নয়, কেবল একটি জনগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত নয়। তার অতিরিক্ত আরও কিছু। বিলাসের সমুদ্র যাত্রার স্পৃহা গঙ্গাকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। বিলাস মুক্তি পেতে চেয়েছে সমুদ্রের নিঃসীমতায়।

আমাদের আলোচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস দুটিতে জলের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের চিত্র আমরা দেখেছি। পদ্মা নদীর মাঝিতে হোসেন মিঞাও বাঁচার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ময়নাদ্বীপে স্বপ্নোলোক গড়তে চেয়েছেন। তিতাসে অনন্তও লেখাপড়া শিখে মালোজীবনের বিকল্প খুঁজেছে। কিন্তু গঙ্গার বিলাস চেয়েছে মুক্তি। শরীর সর্বস্ব, জীবনের স্বাদ পেয়েও বিলাস সমুদ্রগামী। এখানেই অন্য দুই উপন্যাস থেকে গঙ্গার স্বতন্ত্রতা।

তিনটি নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের আলোচনায় আমরা দেখলাম তিনটিতেই নদী ও নদী তন্বিত মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে। কখনো নদী এসেছে পটভূমি হিসেবে, কখনো তুলনা হিসেবে, কখনো নিজেই একটা চরিত্র হিসেবেও। তিনটি উপন্যাসেই নদী তীরবর্তী মানুষের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। সে জন্য নদীর নিজস্ব রঙরূপের চেয়ে ওই মানুষ গুলোর বাঁচা-মরার কাহিনিই এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতটি প্রনিধান যোগ্য।

''অন্তত 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'গঙ্গা', 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস ত্রয়ে যে মানুষেরা এসেছে তারা তো নদী অন্বিতই। নদী ছাড়া তাদের অস্তিত্ব নেই, নদীতাদের বাঁচা মরার, তাদের সাফল্য ব্যর্থতা, তাদের লড়াই ও জয়পরাজয়ের অনিবার্য পটভূমি। লক্ষণীয় তিনটি উপন্যাসেই জেলে মালোর জীবনে নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতার স্বপ্নে কৃষি বিশ্ব, চাষের জীবন উঁকি মেরেছে। কিন্তু নদীর সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা এ জীবন নদীর বাইরে যেতে পারে না। এ মানুষ গুলির বাঁচার কাহিনীই উপন্যাস গুলিতে বিবৃত।" ১৫

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তিস্তা নদী ঃ

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' মূলত তিস্তাপারের মানুষের জীবন বৃত্তান্ত। কিন্তু এজীবন পদ্মাপারের, তিতাস পারের

বা গঙ্গা পারের জীবনের মত নয়। তবে তিস্তা নদীর বিচিত্র রূপ উপন্যাসে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এখানে নদী একটি স্বতন্ত্র বিষয়। আবার তিস্তাপারের মানুষের পটভূমি।

তিস্তার সঙ্গে তিস্তাপারের মানুষ বিশেষত রাজবংশী সমাজের সম্পর্ক প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, —"সেই অর্থে রাজবংশীদের সঙ্গে তিস্তার সম্পর্কই নেই কোনো, কারণ সম্পর্ক বলতেই তো দুটি আলাদা জিনিশের ভেতরকার এক সংযোগকে বোঝায়। রাজবংশী সমাজ আর তিস্তা তো দুটো আলাদা জিনিশই নয় যে সেখানে আবার একটা সংযোগের দরকার হবে। "১৬

যে তিস্তার সঙ্গে রাজবংশীদের এই একাত্মতা তার স্বরূপ বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন " তিস্তা তো কোন নদী নয়, এটা একটা ভূ-খণ্ড। শীতকালে এই ভূ-খণ্ডের মধ্যে পাথরের টিলা জেগে ওঠে, তাকে ঘিরে সরু কিছু স্থায়ী জলরেখা সোনারঙের বালিকে সবসময় ভিজিয়ে রাখে। আর ভেজা বালিকে সেই টিলার জীবন্ত ছায়া সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘুরে যায়। এই ভূ-খণ্ডের কোন অংশ জুড়ে নতুন কোন অরণ্য জেগে ওঠে। কাশফুলের মাইল মাইল বিস্তারকে দূর থেকে শরতের রোদে জল বলে বিভ্রম জাগে।.....

বর্ষায় এই সব আবার ধ্বংস হতে থাকে। তিস্তার কোন খাত দিয়ে কখন জল গড়াবে তা কেউই জানে না। কোন বর্ষায় ডাইনে, পশ্চিমপাড় ভাঙে তো, তার পরের বর্ষায়, বাঁয়ে পুব পাড় ভাঙে। এমন কি একই বর্ষার মাঝখানেও খাত বদলে যায়। বর্ষা জুড়ে জলের তলায় সেই অদল বদলের পর আবার শরৎ থেকে ধীরে ধীরে তিস্তার ভূ- খণ্ডের নতুন চেহারা দেখা যায়। যেখানে জল ছিল না, সেখানে স্থায়ী স্রোত ভেজা বালির মধ্যে দিয়ে বইছে। যেখানে অনেক দিনের নদী বইছিল, সেখানকার জল হঠাৎ সবুজ হয়ে ওঠে যেতে শুরু করে, কোথায় মূল নদীর স্রোতের সংযোগ তার আটকে গেছে, সহসা আবার জেগে উঠেছে পাথুরে টিলা— মাথার ওপরে বনের একটা ছোট টুকরো নিয়ে, সেই টুকরোর ওপরে প্রায় পঞ্চবটি বনের মত যেন বাছাইগাছ , কোথায় মাটির চর জেগে উঠেছে—হালে বলদে কলাগাছে আর ছনের ঘরে সেখানে দেখতে দেখতে একটা জনবসতি গড়ে ওঠে। তিস্তার বড় খাতটা অর্ধেক জলই আরেক খাত দিয়ে বইতে শুরু করে দেয়, নৌকা গুলো চরে আটকে যায়, তারপর নদী বদল করে, নদীর ভেতরেই নদী বদল করে। তিস্তা ত একটা নদী নয়— একটা নদীর ভেতরেই অনেক নদী।" ১৭

এই নদীর সঙ্গে একাত্ম রাজবংশী জীবন, পরে চারুয়া, ভাটিয়া, চা-বাগানের কুলি মজদুর এককথায় তিস্তাপারে বসবাসকারী মানুষের জীবন দৈনন্দিন জীবন চর্চ্চায়, পূজা-পার্বণ-ধর্ম বিশ্বাস, গান, ছিলকা,

লোককথা, উপকথার সুখ-দুঃখ, রসিকতায় অন্বিত। দেখা গেল শীতকালে তিস্তার একরূপ, সুতোর মত সরু, কিন্তু স্থায়ী জলরেখা সোনা রঙের বালিকে সবসময় ভিজিয়ে রাখে, শরৎকালে 'কাশফুলের মাইল মাইল বিস্তারকে দূর থেকে শরতের রোদে জলবলে বিভ্রম জাগে।' 'বর্ষায় এইরূপ আবার ধ্বংস হতে থাকে।' পারভাঙে, চর ভাঙে, শুধু জল আর জলের বিস্তার। 'বছর ছ'মাস প্রায় এই ভূ-খণ্ড জোড়া অনেক নদীর পারস্পারিক যোগ বিয়োগ ঘটতে থাকে।'

তিস্তার ভয়ঙ্কর রূপটা হল এর বন্যা। ১৯৬৮-র পর বিধ্বস্ত তিস্তাপারের গাজোল ডোবা অঞ্চলের জমি জরিপের কাজ দিয়েই উপন্যাসের সূচনা। উদ্দেশ্য, গাজোলডোবায় তিস্তার বুকে ব্যারেজ নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা। এ কাজের জন্যই ক্রান্তিহাটে হল্কা ক্যাম্প, সুহাস-প্রিয়নাথদের জরিপের কাজ, গয়ানাথের জোতজমি প্রসঙ্গ। তিস্তাপারের জমি জরিপ করতে সুহাসরা তিস্তাকে ম্যাপের সঙ্গে মেলাবার সময় "সেই ফাঁকে সুহাস দৃশ্য হিসাবেই দেখে তিস্তার দিগন্ত থেকে দিগন্ত , যেন জলস্রোত নয়, একটা কঠিন জলভূমির বিস্তার। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, তিস্তা চলছে না, এই পার ভূমিটাই চলছে। তখন আবার চোখ বুজে ভাসার বিভ্রমটা কাটাতে হয়। তিস্তার স্রোত এতই খর যে কোন আলোড়নও হয় না, ষ্টিলের পাতের মত একই তলে নদীটা বিস্তৃত হয়ে আছে।" ১৮

কোনটা বর্ষার জল আর কোনটা নদী, অথাৎ গয়ানাথের জমি কোনটা তা বোঝাবার জন্য গয়ানাথ বলে ' মোর কথাটা ত সিধা স্যার, আপনারা যেইটে নদী আঁকিলেন, ঐটে নদী নাই, এইটে বর্ষার জল।' এই প্রেক্ষিতে সুহাস নদীর দিকে তাকিয়ে তিস্তাকে অন্য এক রূপে দেখতে পায়। "সুহাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিস্তার দিকে একবার তাকায়। তার সামনে একটু-আধটু পাতলা ঝোঁপঝাড়। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিস্তা। দূর ঘোলাটে বিস্তারের ওপর আকাশের আর আলোর বিচিত্র সন্নিপাতে ছায়া আর রোদেরও কত অজস্র বিন্যাস। সেই বিন্যাসের মধ্যে কোথাও স্রোত নেই, ভাঙ্গন নেই, আক্রমণ নেই, আওয়াজ নেই। তিস্তা যেন আবার জল স্রোত থেকে ধ্বনি স্রোত হয়ে যায়। অবিরত ধ্বনি।" ১৯

এই দিগন্ত বিস্তৃত, জলস্রোত থেকে ধ্বনি স্রোত হয়ে যাওয়া তিস্তা গয়ানাথের জমি মাপার কৌশলে সুহাসের কাছে শুধু নদী না থেকে হয়ে ওঠে সার্ভের ঘটনাস্থল — " এই তিস্তাকে আজ সকাল থেকে কতবারই না দেখতে হচ্ছে সুহাসকে। মাঝে মধ্যে তো সে এমনিও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু তিস্তার পেটে গয়ানাথের জমিতে গয়ানাথ তার দখলের প্রমাণের কথা তুলেছে যখন থেকে যেন এই নদী আসলে নদী নয়, — গয়ানাথের

জোত, তখন থেকেই তিস্তা যেন আর দৃশ্য থাকছিল না, হয়ে উঠছিল তার এই সার্ভেরই ঘটনাস্থল।" ২০

তিস্তার আসল রূপ তার বন্যার রূপ। উপন্যাসের 'চর পর্ব' ও 'বৃক্ষপর্ব' দুটি পর্ব জুড়ে প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে সেই বন্যারই ছবি ফুটে উঠেছে। ১৯৬৮-র বন্যার দশ-পনের বছর পর কোন এক বন্যা কী ভাবে তিস্তার চর, সীমান্ত চৌকিকে তছনছ করে দিয়েছে সেই কাহিনি নিয়েই চরপর্ব। এখানে আছে প্রায় সপ্তাহ ধরে অবিরাম বর্ষণের ফলে তিস্তার বন্যার আশঙ্কায় চরবাসীদের প্রতীক্ষা, রেডিওতে বন্যা ঘোষণা ও বন্যার ভয়ঙ্কর রূপ।

গত তিনদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে জল বাড়ছে, ফুলে ফেঁপে উঠছে বন্যার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে— "ওপরে পাহাড়ে কোথায় বর্ষা শুরু হয়েছে, সেই বর্ষা যা মাটির তলায় ঢুকে যায়। তারপর সেখান থেকে মাটি ফুঁড়ে, গাছ উপড়ে, পাথর টলিয়ে নেমে আসে নদীকে একেবারে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চওড়া করতে করতে।" ২১

তিস্তার জলের এত প্রাবল্য, এতবাহুলের কারণ "এখানে না হয় এই একটা নদীকেই তিস্তা বলে, এখানে এই সমতলে। কিন্তু ওপরে, পাহাড়ে, তিস্তা ত আর একটা নদী নয়। কোথা থেকে কত ঝোরা, কত ছোট নদী নেমে এসে তিস্তায় মেলে। এত জায়গাই এত স্রোত তিস্তা দিয়ে যায় বলেই তিস্তাও যেন নিজেকে এমন ছড়িয়ে দেয়।" ২২ এই ভূগোলের তিস্তা কীভাবে ইতিহাসের তিস্তা হয়ে গেল, কী ভাবে পদ্মা মেঘনা পারের মানুষেরা তিস্তাপারের মানুষে পরিণত হল, কীভাবে এক ভিন্ন স্বভাবের নদীর সঙ্গে মিলে মিশে গেল সে সম্পর্কেও উপন্যাসে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। রাজবংশীদের সঙ্গে তিস্তার সংযোগের দরকার হল। কারণ তিস্তা ও রাজবংশীরা একাত্ম। কিন্তু দেশ ভাগের পর পুব বঙ্গাগত ভাটিয়াদের সঙ্গে তিস্তার সংযোগের দরকার হল না। কারণ, তারা যে নদী পদ্মা-মেঘনা দেখে এসেছে তাদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক হচ্ছে 'আক্রমণের, সংঘাতের, জয় পরাজয়ের, দখল-বেদখলের।' তারা যে নদীকে চেনে তার জলের রঙ কাল। মাটির রঙ কাল। সেই নদীর চৌহদ্দি চিহ্নিত। সেই চৌহদ্দির মধ্যে মানুষের সঙ্গে নদীর মরণ-বাঁচন লড়াই। তারা এখন যে নদীর কাছে এসেছে সে নদীর পরিচয় তাদের অজানা। ' এ নদীর জল রোদের মত ঝলকায়, বড় জোড় কাদামাটি গোলা, আর "এ নদীর কোন চৌহদ্দি নেই। কখনো গাছের মাথায় চড়ে, কখনো গাছ নদীতে মাথা ডুবিয়ে স্নান করে।" ২৩

'ভাটিয়ারা' ওদেশ থেকে এসেই ১৯৫০ সালে তিস্তার বন্যা দেখল। ' তিস্তার চরটর কোথায় উড়ে গেল। পারের ফরেস্টকে ফরেস্ট, স্রোতের সঙ্গে উধাও হয়ে গেল। সেই প্রথম জলপাইগুড়ি শহরের ভেতরে তিস্তার জল ঢুকলো।' এই ৫০-র বন্যার পরই জলপাইগুড়ি শহরে কিছু বাঁধ তৈরি হল। সেই বাঁধ লম্বা হতে হতে উত্তরে ওদলাবাড়ি থেকে দক্ষিণে কাশিয়াবাড়ি পর্যন্ত দু'পাড় বাঁধা হয়ে গেল। এই বাঁধ ছোট ছোট বন্যা বা

বৃষ্টির জলকে ঠেকাতে পারলেও ১৯৬৮-র সালের ভয়ঙ্করতা আটকাতে পারেনি। "১৯৬৮ সালে তিস্তার বন্যা এই ব্রিজের পাশের বাঁধ ভেঙে শহরে ঢুকল। তার আগে ওদলাবাড়ির বন উপড়েছে, ন্যাওড়া আর ধরলার মাঝখানের ত্রিভুজটাকে মাটি থেকে খুবলে নিয়েছে, মউয়ামারির চর থেকে বোয়ালমারির চর পর্যন্ত সমস্ত জায়গা তিস্তা তার পুরনো খাত বানে ভাসিয়ে দিয়েছে।"২৪

১৯৬৮ সালের বন্যায় এটা প্রমাণিত হল যে বাঁধ বাঁধার পরেও তিস্তার বন্যা কূলপ্লাবী ভয়ঙ্কর হতে পারে। হয়েছেও তাই। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেটা ১৯৬৮-র পনের-ষোল বছর পরের এক বন্যার কথা। বন্যার প্রতীক্ষায় বসে আছে চরের নিতাই, অমূল্য, রাবণ, গজেনরা। চর থেকে বাঁধের মধ্যবর্তী যে 'লেগুনে' র মত খাল আস্তে আস্তে স্ফীত হয়ে উঠেছে। কারও কারও গরুবাছুর বাঁধে নিয়ে যাওয়া হয়ে গেছে, "এই চর জুড়ে তিস্তার বন্যার ছোঁয়া লেগে গেছে, এখন বন্যাটা আসাটুকুই বাকি।" ২৫

বন্যা এলে তো শুধু নিতাইদের চরই ভাসবে না— ভাসবে জলপাইগুড়ি শহর থেকে মাইল বার ভাটিতে দুই নম্বর চর, ভাসবে 'মঞ্জুলি' তার নিচে প্রেমগঞ্জ বা বাসুসুবার চর, দোমোহনি বা পদমতীর চর বা তারও নিচে কোচবিহারের পূর্বে মেখলিগঞ্জ পশ্চিমে হলদিবাড়ির মাঝখানে নোয়াপাড়া থেকে দহগ্রামের বহু পুরানো চর। বা তার আগেই কাশিয়াবাড়ি, বোয়ালমারি, এমনকি কচুয়াও। 'তিস্তার মধ্যে নোয়াপাড়া, মেচিয়াপাড়া, সহেদপাড়া, দহগ্রাম— এই চারটি চর বা ছিটমহল।' বন্যায় এই চর গুলো প্লাবিত হয়ে সীমান্ত লোপাট করে দেয়। "যেমন সূর্যের আলো বা রাত্রির অন্ধকার সীমান্ত মেনে চলে না। তিস্তাও এখন সে রকম। আজ শনিবারের বিকেল। চার পাশ থেকে তিস্তা এই চর গুলোর উপর উঠে আসছে, কোন একটি চরের ওপর নয়, সেই নাউয়া পাড়া থেকে ঐ নীচের ছয় নম্বর দহগ্রাম পর্যন্ত সবগুলো চরের ওপর দিয়ে তিস্তা বয়ে গিয়ে ছিটমহল, চরমহলের আন্তর্জাতিক সমস্যা দূর করে দেবে। .....এখন এই শনিবারের বিকেলে ঘোলা আকাশ আর ঘোলা তিস্তা মিলে যেন একটা সুড়ঙ্গের মত হয়েছে।" ২৬

বন্যার আভাস পেয়ে বাংলাদেশের দূত ভারতে আসে। 'ইণ্ডিয়া-বাংলাদেশ' বার্তা বিনিময় হয়। ইণ্ডিয়া গোপন আলোচনা করে সীমান্তচৌকির সবাই আত্মরক্ষার জন্য বাংলাদেশের চৌকিতে যাওয়া স্থির করে। বাংলাদেশ চৌকি অভিমুখে মার্চ করে যাওয়ার পথে দেখে " নদীর খোলা বুকের ওপরে আকাশ আর নদী এখন আলাদা করা যায় না। বাতাস সেই অবকাশ দিয়ে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে নদীর মতই বেগে কিন্তু বিপরীত মুখে। সেই বাতাসে বৃষ্টির ধারাপাত আর মাটিতে মানছে না— বাতাসে কাত হয়ে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে,

আকাশেই আবর্ত তৈরী করছে। আর তাতে নদীর বুকের ওপর এমন কুয়াশা তৈরী হয়েছে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না।" ২৭

বৃক্ষপর্বে আপলচাঁদ ফরেস্টের পাশে দাঁড়িয়ে গয়ানাথ, আসিন্দির তিস্তার বন্যা দেখছিল। সঙ্গে বাঘারুও। বন্যা আপলচাঁদের ভেতরে একটা খাড়ির মত সৃষ্টি করে পাড়ের সঙ্গে গাছ ভেঙে নিচ্ছিল। তিনতিনটা গাছ ভেঙে পড়ার পর তার আড়াল থেকে গয়ানাথ ও আসিন্দির তিস্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল।

"গুম গুম আওয়াজ তুলে তিস্তার জল বয়ে যাচ্ছে — আওয়াজেই যেন বোঝা যায় পেছনে আরো নদী নদী জল চণ্ড বেগে এই জলটাকে ভাটিতে ঠেলছে। তিস্তার বন্যার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারাই জানে তিস্তার জল যখন জলের মত ছল ছল খল খল শব্দ না করে, বড় বড় বোল্ডারের সঙ্গে বোল্ডারের ঘর্ষণের মত গুম গুম আওয়াজ তোলে পাতাল থেকে তিস্তার জল উঠতে থাকে, সে জল সব ভাসিয়ে দেবে — গাঁ-গঞ্জ বাড়ি-টাড়ি সব।" ২৮

এই বন্যার তিস্তায় চার চারটি গাছ এক সঙ্গে বেঁধে বাঘারু আসিন্দিরের ভটভটি খানের মতো করে জলে ভটভটি চালিয়ে ছুটতে থাকে।

"গয়ানাথের বাঘারু মুই, গয়ানাথের গাছক ভাসি দিছি। গয়ানাথের বাঘারু মুই, গয়ানাথের গাছ নিগি ভাসিছু। তিস্তার এই বানত ভাসি যাছু। তিস্তার বানার নাখান এই ঝড় আর বৃষ্টির বানাত ভাসি যাছু।"২৯

বাঘারু যে গাছটার ডালে এতক্ষণ বসেছিল তা থেকে মাঝখানের শালগাছটাতে যেতে চায়, কিন্তু পারে না। কারণ — তিস্তার স্রোত যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় একই রকম ঘোলাটে। তাকালে মনে হয় না, এই বিরাট জলপ্রান্তরের কোন স্রোত আছে। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে স্রোতের সেই বেগে মাথা ঘোরে।

বৃহস্পতিবার থেকে ঝোড়ো বাতাস, বৃষ্টি দিয়ে তিস্তার বন্যার যে সূচনা 'রবিবার ভোর হতে না হতেই রংধামালি-রায়পুর চা-বাগানের বাঁধ থেকে দেখা যায় পুরপারে তিস্তা একের পর এক গাঁ ও বন্দর ছাড়িয়ে প্রায় ময়নাগুড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। দোমোহনি তিস্তার মাঝখানে, তিস্তাবার্নেশ বন্দর ছাড়িয়ে গেছে— বুড়ি তিস্তার খাতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু গত তিন দিনের বাড়া আর রবিবারের বাড়া এক নয়।

"তিস্তার এই জলপ্রান্তরে এখন কোনো কিছুই দাঁড়িয়ে নেই, নিজের দিক চিহ্ন গুলো উপড়ে-ফেলেছে তিস্তা, এখন সে সব তিস্তার জলের অংশ। ঘরের চাল, গাছ সব ভেসে যাচ্ছে। কচুরিপানার মত সবুজের আভাস দিয়ে ধূসর জলে চকিতে ভেসে যায় ফরেস্টের গাছ। ওপরে কোথাও তিস্তা কোনো ফরেস্টের মধ্যে

ঢুকে পড়েছে।" ৩০

তিস্তার প্লাবন, প্লাবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা অনেক সময় তিস্তাকে দৈবী করে তোলে। যেমন বাঘারুর ভেসে আসা, একটা ডুবন্ত চরে, একটা জেগে থাকা সুপারি গাছে চড়া ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যেন দৈবী ঘটনা। "কারণ এমন একটা ঘটনা মেনে নিলে বুঝতে হবে এই বন্যাটা স্বাভাবিক বন্যা নয়, এই তিস্তাও রোজকার তিস্তা নয় — কোনো দৈবী খেলা চলছে এই বন্যায়, জল আর হাওয়ায়।" ৩১

এই ঘটনা তিস্তার অসংখ্য কাহিনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। "তিস্তা যেন আর নদী মাত্র থাকে না — সে তার প্রাচীন অস্তিত্বে ফিরে যেতে চায় এই একটি মাত্র কাহিনীকে অবলম্বন করে। তিস্তার দুই পাড় দিয়ে বাঁধ বাধা হয়েছে। সেই বাঁধের ওপর সবাই দাঁড়িয়ে। একটা ট্রানজিস্টারের আওয়াজও মাঝে মাঝেই পাওয়া যায় — বোধ হয় বানভাসিদের ভেতর থেকে কিন্তু তিস্তা আর তিস্তা নদী না থেকে তিস্তাবুড়ি হয়ে ওঠে। সেই তিস্তাবুড়ির মূর্তি পাটকাঠি আর পাট দিয়ে বানিয়ে লোকে পুজো করে। সেই তিস্তাবুড়ি, এখনো পারে তার বুকে ভাসমান একটা লোককে আকাশে উধাও করে দিতে।

বন্যার উপকথা জন্মাচ্ছিল — নতুন।" ৩২

'মিছিল পর্বে' উত্তরখন্ড দল ময়নাগুড়ির সম্মিলন ও ফাংশান শেষ করে পরে জল্পেশ অভিযান করে। সে অভিযানে হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে বাঘারুও সামিল হয়। জল্পেশ মন্দিরে গিয়ে শপথ গ্রহণ ও তিস্তাবুড়ির পুজো হয়। তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য — তিস্তা বুড়ির পূজার মাধ্যমে কীভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা হয় তারই একটা বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তিস্তার দেবী রূপের ছবিও ফুটে উঠেছে যা আপামর রাজবংশীর চিরন্তন বিশ্বাস।

'বেটিছোয়ার দল ঘুরি ঘুরি গান গাবার ধরিছে।' একটু দাঁড়িয়ে শুনতেই বাঘারু বোঝে , তিস্তা বুড়ির পুজো হচ্ছে। ওখানে নিশ্চয় পাটকাঠি দিয়ে তিস্তা বুড়িও একটা বানানো হয়েছে। গান গুলো খুব মন দিয়ে যে শোনে বাঘারু তা নয়, কিন্তু জন্ম থেকে শুনতে শুনতে এ গান এতই জানা যে শুনতে না চাইলেও শোনা হয়ে যায়।'

'সগগ্ হতে নামিল তিস্তাবুড়ি

মনচে দিয়া পাও

মনচ হতে নামিল তিস্তাবুড়ি

চ্যাতন করিল গাও

কাচাদুধ আলোয়া ক্যালো

ভইক্ষণ করো।'

পূজা শেষ হয়ে গেলে ''পঞ্চানন মল্লিক উঠে বলেন—'তিস্তাবুড়ি আমাদের দেবতা হন। সেই তিস্তা বুড়িকে বান্ধা আমরা সহ্য করিব না। আর এক মাস পরে তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের দিন আমরা প্রতিবাদ মিছিল নিয়া ওই তিস্তা ব্যারেজের কাছে যাইব। আপনারা সব জায়গা হইতে সেদিন মিছিল লইয়া তিস্তা ব্যারেজে যাইবেন।'' ৩৩

গাজল ডোবার আপলচাঁদ ফরেস্টের কাছে তিস্তা ব্যারেজকে নিয়ে আর এক রূপে দাঁড়িয়ে আছে। এর আগের পর্ব গুলিতে মূলত তিস্তার রূপই নানা স্থানে, নানা অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানে তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের দিনে তিস্তাকে অন্যরূপে দেখা গেল। এখন তিস্তায় জল নেই। বর্ষা অতিক্রান্ত। তাই বর্ষার রূপ এখন নেই। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলাধারে সঞ্চিত জলে সারা বছর পারের জমিতে চাষাবাদ করার উদ্দেশ্যে এই ব্যারেজ নির্মাণ। ব্যারেজের চারটি স্লুইজ গেট মাত্র সম্পূর্ণ হয়েছে। সবগুলো গেট সম্পূর্ণ না হলে ব্যারেজের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তবে উদ্বোধন উপলক্ষে ব্যারেজের কার্যকারিতা বোঝানোর জন্য চারটি স্লুইজ গেটকেই বিশেষ ভাবে সাজানো হয়েছে।

''ব্যারেজের উত্তর দিকে তিস্তার জলকে কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে দিয়ে পুবপারের দিকে আপলচাঁদ ফরেস্টের দিকে সরিয়ে আনা হয়েছে। ..... সেজন্য গত প্রায় মাস খানেক, বিশেষত দিন বিশেক, ব্যারেজের সব কুলিকে এই বাঁধের কাজে লাগানো হয়েছে। একটু ওপর থেকেও কোনাকুনি এনে বাঁধের মুখটাকে ব্যারেজের প্রথম দুটি স্লুইজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারটি স্লুইস সম্পূর্ণ হলেও, স্লুইজ দিয়ে জলের প্রবাহ যদি দেখাতে হয় তাহলে দুটো স্লুইজ দিয়ে জল ছাড়তে হবে। চারটে স্লুইজ দিয়ে সমান তোড়ে ছুটে হারিয়ে যাবে — তিস্তায় এখন এত জল নেই।'' ৩৪

তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধন উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে তিস্তার পরিবেশের পরিবর্তন লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে —'' অনেকটা যেন দিগন্তের মেঘ গর্জনের মত। তার সঙ্গে প্রবল বাতাস তিস্তার জলময় বুক থেকে প্রবল উঠে এসে বয়ে যাচ্ছে। নদী স্রোতের সমান্তরালে এত বড় আকাশের নীচে সে যেন বাতাসের আর এক তিস্তা। '' ৩৫

স্লুইজ গেট খুলে উদ্বোধন হওয়ার পর স্বল্প পরিসরে হলেও তিস্তার প্রবলতা লক্ষ করা যায়। '' এর ভেতরে

প্রবল জয়ধ্বনির মধ্যে স্লুইজ গেটের অবকাশ দিয়ে কৃত্রিম বাঁধে বাঁধে প্রবাহিত তিস্তার জল তার স্বাভাবিক গতির চাইতে বহুতর গুণ বেগে নিজেরই খাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আকাশে ফেনা ছুঁড়ে, ছুঁটে যায় এই মিটিঙের হাজার হাজার মানুষের সামনে ভবিষ্যতের প্রতীক হয়ে।" ৩৬

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে মাদারি হারা মাদারির মা শ্যাওড়া ঝোরায় ফিরে একা তার পাতার ঘরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে লেখক বৃত্তান্ত শেষ করেন। বৃত্তান্ত শেষ হলেও তিস্তার কথা শেষ হয় না। লেখক তাই পরিশিষ্ট অংশ উপন্যাসে যোগ করে তিস্তা সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলেছেন।

সেই যে পাহাড় থেকে তিস্তার নেমে আসার পর সমতলে মাত্র কয়েক মাইল ভারত-বাংলাদেশে এর বিস্তার তারই মধ্যে উপন্যাসের জোত পর্ব, বনপর্ব, বৃক্ষপর্ব, মিছিলপর্ব, ব্যারেজ পর্ব রচিত হয়েছে। তাতে কখনো তিস্তাকে দেখা গেছে আপন মনে বয়ে যেতে — পাড়ে চলছে জমি জরিপের কাজ। কখনো দু'পারে নিসর্গের শোভা, বুকের ওপর চরের পর চর নিয়ে বয়ে চলা। কখনো বা উত্তাল বন্যায় বিভীষিকা ছড়িয়ে দিতে দু'পারে মানুষের তৈরি বাঁধের বাঁধন মেনে চলা তিস্তাকেও দেখতে পাওয়া যায়। আবার দেখা যায় মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে দু'পার এমন কি জলপাইগুড়ি শহরকেও প্লাবিত করতে (৬৮-র বন্যায়)।

তিস্তা মানেই যেন বন্যা, ভাঙন, চর থেকে হাজার হাজার মানুষের উৎখাত হয়ে বাঁধে অপেক্ষা করার ছবি। আর এই সব ঘটনাকে ঘিরে সেচ দপ্তর, সরকারি অফিসার, আমলা, ত্রিপাল, খাদ্য, ত্রাণ, সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও ইত্যাদির আনাগোনা। এমনই এক বন্যায় বাঘারুর গাছ সহ বন্যায় ভেসে আসা, চরের সুপুরি গাছে আটকে থাকা, বাঁধের মানুষের কাছে প্রথমে দৃশ্য হওয়া, পরে অদৃশ্য হওয়া, তিস্তা বুড়ির অলৌকিকতা, বাঘারু উদ্ধার, টিভি ক্যামেরার ছবি গ্রহণ সবই তিস্তার সুবাদেই।

অবশেষে তিস্তার বুকে ব্যারেজ নির্মিত হল। "ব্যারেজ উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এ বৃত্তান্তের তিস্তা ইতিহাস হয়ে গেল। এখন আর তিস্তা সেই পুরনো তিস্তা থাকলো না। এখন প্রকৃতির সেই নদীর পুর্নজন্ম ঘটবে মানুষের হাতে। হিমালয়ের তুষার গলা জল আর মৌসুমি মেঘে বৃষ্টি ধারায় তিস্তার জল যতই বেড়ে উঠুক, তা বয়ে যাবে মানুষের নির্দেশিত খাতে, নির্দেশিত গতিতে। তখন চর জেগে উঠবে মানুষের ইচ্ছায়। সে চরকে সবুজ করে দিয়ে নদী তার পাশ দিয়ে অনুগত হয়ে বয়ে যাবে মানুষের তৈরি নিসর্গে। তিস্তা নিয়ে কোন উপকথা পুরুষানুক্রমে বয়ে আসবে না। তিস্তা ব্যারেজের পর তিস্তার প্রাকৃতিক জীবন শেষ, এখন সে এক মানবিক নদী। তিস্তা তার মানবিক ইতিহাসের পর্বে ঢুকবে। তিস্তাবুড়ি কুমারী হয়ে উঠবে।" ৩৭

'এই তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' সেই প্রাকৃতিক তিস্তার সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতি নীতির বৃত্তান্ত।' তাই দেখা গেছে গয়ানাথ তিস্তার সঙ্গে একভাবে ব্যবহার করেছে। তার জমি বন্যায় প্লাবিত করলেও সে জমির স্বত্ব ছাড়েনি। বাঘারুকে জলে নামিয়ে নদীর মধ্যে তার কতটা জমি আছে তা জরিপবাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সরকারের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা করেছে। তিস্তা ব্যারেজের জন্য তার জমি অধিগৃহীত হলেও সমপরিমাণ জমি খাশ জমি থেকে পাবার আশায় উত্তরখণ্ডে পর্যন্ত যোগ দিয়েছে।

নিতাইদের মত অন্যান্য চরুয়াদের সঙ্গে তিস্তার সহবাস আর এক রকম। তারা পদ্মা-মেঘনা পারের লোক। এদেশে এসে তিস্তার রকম সকম বুঝে, সারা বছরে তার মতিগতি লক্ষ করে তিস্তারই চরে বাসস্থান নির্মাণ করেছে। তারা জানে নদীর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক পাতাতে হয়। তাই বর্ষা এলে তারা সতর্ক হয়। বন্যার আভাস পেলে গরুবাছুর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে নিকটবর্তী কোন বাঁধে আশ্রয় নেয়। তাদের ক্ষেত ভাসে, জমি ভাসে, ঘর ডুবে যায় জলে। যে ক'দিন বন্যা তাদের এভাবে রাখে সে ক'দিন থাকে। সরকারের কাছে ত্রাণ দাবি করে, আদায় করে, তারপর একদিন জল নেমে গেলে পুরোনো বাসায় ফিরে যায়। এ অবস্থাটা তাদের প্রায় প্রতিবছরের। এরই মধ্যে তাদের জীবন চলে, ঘর সংসার, আমোদআহ্লাদ, রাজনীতি, দখল সবই চলে। এভাবেই গড়ে উঠেছে দোমোহনি চর থেকে শুরু করে একেবারে সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত কতো চর, যেগুলি এখন আর চর বলে মনেই হয় না — কায়েমের সঙ্গে প্রায় মিলে মিশে গেছে।

ভারত-বাংলাদেশ দুই সীমান্ত বাহিনীর সীমান্ত চৌকি -তিস্তার বন্যায় ভাসে। যারা সর্বক্ষণ উভয়ে উভয়ের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে থাকে, তিস্তার বন্যা তাদের সে শত্রুতা ভুলিয়ে দেয়। বাংলাদেশ— একান্ত আত্মীয়তার সুরে ভারতকে ডাকে বন্যার ভয়ঙ্করতা থেকে তাদের চৌকিতে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে। টেলিফোন কাজ না করলেও দূত পাঠিয়ে খবর দেয়। তারপর অস্ত্রাগারের ছাদে কয়েকজনকে প্রহরায় রেখে পুরো বাহিনী বাংলাদেশের সীমান্ত চৌকিতে আশ্রয় নেয়, খানাপিনা চলে, গল্পগুজব চলে।

'বাঘারুর রাজনীতি বলে কিছু নেই।' তার তো নিজস্ব কোন মত নেই, নিজস্ব কোন প্রচেষ্টা নেই। 'তিস্তা তার নদী স্বভাবে প্রাকৃতিক, সে জল ছাড়া কিছু নয়। বাঘারু তার মানব স্বভাবে প্রাকৃতিক—সে কেবল মানুষ, একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়।' তাই সে খরস্রোতা তিস্তায় গয়ানাথের জমির সীমানা দেখাতে আদেশ মাত্র ভেসে চলে। গয়ানাথের নির্দেশে চার চারটি গাছ একত্রে বেঁধে গাছগুলোকে রক্ষা করার জন্য উত্তাল তিস্তার বুকে ভাসে। পাথর ভরা ডায়নার বুকে বাথান তৈরি করে দিনের পর দিন—মোষ, নদী, পাথর, পাখি, গাছ

পালার সঙ্গে সহবাস করে।

তিস্তার বন্যার ভয়ঙ্করতা, অনিশ্চিত যাত্রা, ক্ষুধা তৃষ্ণা কোনো দিকেই তার কোন দৃষ্টি নেই। নিতাইদের চরে আটকে থাকা অবস্থায় একবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে — তাও সেটা পাকা সুপারি খেয়ে নিবৃত্তির চেষ্টা পর্যন্ত। তিস্তার ওপর ব্যারেজ নির্মাণ মানেই প্রাকৃতিক তিস্তার মানবিক রূপ ধারণ। তার ফলে সমগ্র তিস্তা পারে ঘটবে নানা পরিবর্তন। নদীর আপন খেয়ালে বয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ব্যারেজ। এতে ব্যারেজ আটকানো জলে নতুন জমিতে চাষ হবে জল ছাড়ার ফলে নতুন জমি চাষের আওতায় আসবে। একেবারে ব্যারেজের কাছাকাছি হওয়ায়—নিতাইদের চর আর নাও থাকতে পারে। তাতে কি? তিস্তাকে ইচ্ছা মত ডানে বা বাঁয়ে সরিয়ে ওদের জন্য নতুন চর বানিয়ে দেওয়া হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শুধু স্থল ভাগের ওপর দিয়েই সীমান্ত চিহ্নিত হতে পারে।

তিস্তা ব্যারেজের ফলে গয়ানাথের তিস্তার সঙ্গে বসবাসের রীতিনীতির বদল হবে সবচেয়ে বেশি। গয়ানাথের জমি তিন ফসলী হবে। গয়ানাথ ট্রাক্টর কিনে, রাসায়নিক সারের ব্যবহার শিখে জমি থেকে প্রচুর ফলন পাবে, কারণ তার জমি সবটাই সেচ এলাকা হয়ে যাবে। তার ফলন বাড়বে, বিক্রি বাড়বে, লাভ বাড়বে, রাধাবল্লভদের সঙ্গে আর ঝগড়াঝাটির দরকার হবে না। কৃষক সমিতির সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি হবে। হয়তো ওরা একই সঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়েতে 'জেলভেরো' বা 'রাস্তা রোকো' আন্দোলন করবে।

ব্যারেজের ফলে তিস্তা পারের ফরেস্ট বদলে যাবে, আপলচাঁদ বদলে যাবে। প্রাকৃতিক বড় বড় গাছ শ শ বছর যাদের আয়ু - সেগুলো কাটা পড়বে। নতুন তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এরকম নরম গাছ লাগানো হবে— তাতে আশে পাশে শিল্পও স্থাপিত হবে।

বনের বদল হলে জীবজন্তুও বদলে যাবে। যে সব প্রাণী বনে আহার পাবে না, আড়াল পাবে না, তারা বন থেকে উধাও হয়ে যাবে। হাতি, হরিণ, মোষ, পাখি, গণ্ডার, সাপ ইত্যাদি পশুপাখি বন ছেড়ে চলে যাবে।

লেখক প্রশ্ন তুলেছেন— 'কিন্তু তিস্তাপারের বৃত্তান্ত যে এমন আমূল বদলে যাবে — তাতে বাঘারু, মাদারির মা ও মাদারির কী হবে?' উত্তরটাও দিয়েছেন নিজেই যে নৃতত্ব অনুসারে মানুষও প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে নিজেদের বদলে বদলে এসেছে। কেউ বা কোন একটা বিশেষ স্তরে এসে থমকে গেছে, বদলাতে পারেনি যেমন আন্দামানের উঙ্গী, জারোয়া, সেনটিনেল বা কেরালার গুহামানবেরা। "তেমনই নদী অরণ্য এই সব প্রাকৃতিক বিষয় বদলে দিয়ে যে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরী হচ্ছে, তার সঙ্গে বাঘারু, মাদারির মা ও মাদারি তাল

রাখতে পারেনি, তারা এই আদি একটা স্তরে আটকে গেছে।" ৩৮

এ বৃত্তান্তের যে কোন পাঠকই অনুমান করতে পারবেন যে এখন নদী যতই বদলাক, ফরেস্ট যতই বদলাক — বাঘারু, মাদারির মা ও মাদারি বদলাবে না।' কারণ 'মাদারির মা আর বাঘারু তো পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থারও কেউ ছিল না। তাই 'নতুন ব্যবস্থাতেও কোথাও থাকবে না।' তাহলে তাদের কী হবে? প্রাকৃতিক নদীকে মানবিক করে এত চোখ ধাঁধাঁনো যে উন্নয়ন তাতে এই সর্বহারাদের স্থান হবে না? লেখকের স্পষ্ট উত্তর — 'মাদারির মা যেখানে আছে, সেখানেই থাকতে থাকতে ঘাস পাতার সঙ্গে মিশে যাবে।' বাঘারু আর মাদারি — 'এরা দু'জনেই শেষ পর্যন্ত এই বৃত্তান্তে অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে।'

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তিস্তা ছাড়াও অন্যান্য কিছু নদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তিস্তাপারের জমি জরিপের কাজে ক্রান্তির হাটে হল্কা ক্যাম্প বসানোর জন্য সার্ভে অফিসার সুহাসবাবুর লোক প্রিয়নাথদের সাইনবোর্ড নিয়ে ন্যাওড়া নদীর খেয়াপার হয়ে ক্রান্তির হাটে যাওয়ার দৃশ্য দিয়ে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাসের আদি পর্বের শুরু।

তিস্তাপার শুধু তিস্তা নদীরই পার নয়। এই পারের ওপর দিয়ে আরও বহু ছোট বড় নদী বয়ে গেছে। পুবে ডায়না থেকে পশ্চিমে আপলচাঁদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তিস্তা পারের বৃত্তান্তে তাই তিস্তা ব্যতীত আরও অনেক নদীর কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে সেই ছোট ছোট নদী গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো— উপন্যাসের বর্ণনানুসারে।

গয়ানাথের নির্দেশে এম এল এ-কে ফুলবাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পথে একটি ব্রিজহীন নদীর কথা জানা যায়। "জঙ্গলটা শেষ করে ওরা সেই পাথারে পড়ে। নিধুয়া পাথার। উঁচুডাঙ্গা, বরমতল, পাথার, পাথারের পর, নদী, ব্রিজহীন নদী।" ৩৯

বিসর্জনের ঠাকুরের মত এম এল এ-কে বাঘারু জাপটে ধরে জলে নামে। " নদীর জলে ধীরে ধীরে বাঘারুর হাঁটু ডোবে, কোমর ডোবে, তখন এমএলএ-র পেছন আর জুতো-ব্রিফকেস জলে ছোঁয় ছোঁয়। যেন আর দু'এক পা গেলেই গভীর জল, যেখানে বাঘারু তলিয়ে যাবে — পর মুহূর্তে ভার মুক্ত ভেসে উঠতে। "৪০

বনপর্বে গয়ানাথ বাঘারুকে আদেশ দেয় তিস্তা পাড় ছেড়ে চলে যেতে ডায়নার চরে। ' হুই নাগরাকাটত ডায়না নদীর চরত মহিষের বাথান আছে, ঐঠে থাকিবু।' সেই ডায়না নদীর বর্ণনা তিস্তার সঙ্গে তুলনা করে দেওয়া হয়েছে—

"এই ডায়না নদীর কোন পাড় নেই, নীচে তিস্তার যেমন আছে। এই নদীর তিনদিক জুড়ে পাহাড় — আপলচাঁদের তিস্তার যেমন নেই। এই নদীর চাইতে আপলচাঁদের বুক বড়। এই ডায়নার খোলা বুকের মাত্র একটা অংশ দিয়ে পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে এই নদী এমনই বেগে ছুটছে — জল মাটি ছুঁতে পারে না। এত পাথরের ধাক্কা খেয়ে এত মুহুর্মুহু বাঁক নিয়ে এই ডায়না নদী নামে আর ছোটে যে মনে হয় নদীতে জল নেই শুধু বুঁদ বুঁদ আছে। বাঘারুর তিস্তায় ফেনা নেই বুঁদ বুঁদ নেই, মাটির কোন অতল পর্যন্ত জল, তিস্তার বুকের ভিতর জল আঁটে না, কেটে যায়। তিস্তার মত এপার-ওপার করে নয়, ডায়নাকে দেখতে হয় লম্বালম্বি , তলা থেকে ওপরে। পাহাড়ের মত এত এত পাথর, নুড়ির মত ছড়িয়ে আছে বলেই চট করে বোঝা যায় না, নদীর সারাটা বুক বোল্ডারে ঠাসা কেন, যেন বাঁধানো।" ৪১

'অন্তপর্বে মাদারি ও তার মা অন্যান্যদের সঙ্গে ট্রাকে করে তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় গয়ের কাটার কাছাকাছি এসে ডানদিকে মোড় নিয়ে চামুর্চির রাস্তায় চলার সময় রাস্তার দু'দিকে, সামনে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পায়। তার মধ্যে একটি নদীও দৃষ্টিগোচর হয়। "রাস্তার পাশ দিয়ে গয়ের কাটা নদী অনেকদূর পর্যন্ত চলে। নদী বলে বোঝা যায় না, তাছাড়া ঝোঁপঝাড়ে ঢাকাও থাকে অনেক খানি। হঠাৎ এক একটা জায়গায় ঝোঁপঝাড়হীন, খোলা, ছোট নালার মত নদীটাকে দেখা যায়, একটু উঁচু জায়গা থেকে বেশ মোটা ধারায় নীচে ঝড়ে পড়ছে, আর সেখান থেকে জল নিয়ে কেউ কেউ কোথাও কোথাও যাচ্ছে। খানিকটা এমন খোলা মেলা বয়ে গিয়ে নদীটা আবার ঝোঁপঝাড়ে ঢেকে যায়।" ৪২

ওদের গাড়ি তিস্তা ব্যারেজের কাছাকাছি চলে আসছে এরকম অনুমান করছে। এমন মনে হওয়ার কোন কারণ তারা একটার পর একটা নদী ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছে। তারা দেখতে পাচ্ছে "ডানদিকটাতে পাহাড় আর চড়াই, বাঁ দিকটাতে খাদ। ফলে একটু পর পরই দেখা যাচ্ছে ডানদিক থেকে শাদা ফেনা তোলা জল বড় বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠে এক একটা রঙিন ব্রিজের তলা দিয়ে বাঁদিকে খাদের মধ্যে পড়ে বয়ে যাচ্ছে। এতগুলো নদীর ঝর্ণা হয়ে ঝরা আর নদী হয়ে বওয়া দেখতে দেখতে এক একটা ব্রিজ সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যায় - লংতি, চুয়াপাথাং, ডায়না, জলঢাকা, মূর্তি, ন্যাওড়া, জুর্তি। মনে হয়, এই রাস্তা গিয়ে থমকে শেষ হবে যেখানে তিস্তা পাহাড় থেকে পাহাড় ভেঙে নামবে।" ৪৩

তিস্তাপুরাণে নদী তিস্তা ঃ

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে যেমন তিস্তার প্লাবন রূপ বেশি করে ধরা পড়েছে। তিস্তাপুরাণে ঠিক তেমনটা নয়। এখানেও বন্যার কথা আছে। কিন্তু সে বন্যা পাহাড়ে ঝুলে থাকা বন্যা। সে বন্যা কেউ দেখেনি একমাত্র বুড়িমা

ছাড়া। বুড়িমাও দেখেছে মনশ্চক্ষে, চামড়ার চোখে নয়। কিন্তু বুড়িমা যখন দেখেছে তখন সে বানাকে তো নামতেই হবে কোন একদিন, কোন এক সময়ে। আর সেই বিশ্বাসে ভর দিয়েই বুড়িমার গোতের লোকজনের ব্যস্ততা বেড়ে যায়, ঘর, গোলাঘর, পাটঘর, গোয়ালিয়া ঘর ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য। এমনকি বুড়িমাকেও তো উঁচু কোনো মাচানে রাখতে হবে নিরাপত্তার জন্য।

ঝুলে থাকা বন্যা আসার আশঙ্কায় সবাই যখন বন্যা থেকে বাঁচার কাজে ব্যাপৃত সেই অবকাশে তিস্তার গভীর জলের তলা থেকে, উজান ঠেলে ঠেলে, উঠে আসেন জননী কাউঠানী "আসিবা হয়, আসিবা হয়, আসিবা হয়, সেই একখান জননী কাউঠানী, তিস্তারও বাইরে আরো কোনো সমুদ্রের নাখান জল থেকে, সমুদ্রের নাখান সব জল ঠেলে ঠেলে, শুধু উজানে শুধু উজানে এই নদী সেই নদী করে করে, তিস্তায় ঢুকে পড়তে হয়, আর তিস্তার স্রোত ঠেলে ঠেলে স্রোতের ভিতরে ভিতরে পাহাড়ের দিকে উঠতে হয়, মাঝরাত্তিরে তারাদের দিকে জলের ভিতর থেকে গলাটা বাড়িয়ে দিতে হয়। কতগুলি নদীতে ঘোরাঘুরি করে জলঢাকায় ঢুকতে হয়। তারপর দুদুয়া নদীটা যেখানে উত্তরে কালজুয়া ছোটআংরাভাসা, গরাতি, নোমাই, গোলুন্দি এইসব টুকরো উজিয়ে ভুটান পাহাড়ের ওপরে উঠে গেছে, সেই নদী ফাঁড়াফেড়ি, নদী ছেঁড়াছিঁড়ি, নদী ছাড়াছাড়ির জায়গা, গোঁসাইয়ের হাট ফরেস্টের পারে, বালি-পাথর-গাছ-জঙ্গল মেশানো পারে, গর্ত খুঁড়ে, ডিম দিয়ে সেই ডিম বালি পাথর দিয়ে ঢেকে, বুক দিয়ে ঘষে ঘষে সমান করে আবার দুদুয়া নদীতে নেমে ভাটিতে জলঢাকা দিয়ে তিস্তায় পড়ে সেই কোন সমুদ্রের দিকে জলের তলায় তলায় ভেসে যেতে হয়।"৪৪

জননী কাউঠানী নানা নদী দিয়ে তিস্তায় আসা আবার সেখান থেকে জলঢাকা, ছোট আংরাভাসা গরাতি, নোমাই, গোলুন্দি, দুদুয়া ইত্যাদি নদী ও নদীর পারে যাওয়া আসার কথার মধ্য দিয়ে তিস্তাপারের ছোট ছোট নদী-পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটা জিনিসও এখানে স্পষ্ট যে এই সব নদী বাইরের দিকে থেকে পরস্পরে নিসম্পর্কিত হলেও লেখকের বৃহৎ দৃষ্টিতে আলাদা নয়,—অন্বিত। "এই পৃথিবীর কুনো নদী কি কুনো নদীঠে আলগ্ থাকিবা পারে? এই পৃথিবীর সলিগা নদীর জল সগিলা নদীতে বহিবার পারে। বহি যায়।" ৪৫ ভূবিজ্ঞানও তো সে কথাই বলে। একই জল, একই নদী, একই সাগর তো সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, বোঝার সুবিধা বা চেনার জন্য মানুষ নানা দেশে, কালে জলের বিভিন্ন নাম দিয়েছে মাত্র।

নদী তত্ত্বের একটা আঞ্চলিক, একটা বৈশ্বিক রূপ এখানে দেখানো হয়েছে।

এই নদীর ব্যাপকতায় নদী আর তার নাম পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে সৃষ্টির আদি রূপ। জননী কাউঠানী প্রতীকে কূর্মাবতার। উভয়ের সম্পর্ক তাই আদিম , অকৃত্রিম। তিস্তা তাই শুধু নদীই নয়, তিস্তা

বুড়ি। তিস্তাকে কি জিজ্ঞাসা করা যায় — কোটত আসিলেন, কোটত যাচ্ছেন? তিস্তা তো নদী নয়, তিস্তা দেবতা। ইচ্ছা করলে তিস্তা গঙ্গায় মিশে যেতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। 'দেবতারা তা করেন না। করতে নেই বলে করেন না।' রাজবংশীদের মধ্যে মেচেনি খেলাই তো তিস্তা বুড়ির পূজা। তিস্তাবুড়ি নেমে আসেন আকাশ থেকে, উঠে আসেন তিস্তা নদীর বুক থেকে —

" নামি আসিছেন তিস্তাবুড়ি।

উঠি আসিছেন তিস্তাবুড়ি।

হীরামন বাঁশিখান বাজিবার ধরে

মোর মন খানত নাগিবার ধরে।

আরে উড়িয়া গেইল মোর গায়ের পছোরা।" ৪৬

'শেষ' নামক প্রথম পর্বে এভাবে তিস্তাকে দেবতা জ্ঞান করে উপন্যাসের সূচনা হয়। খঞ্জনা ফরিঙ্গাও এক বুড়া লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়ে নদী খুঁজতে।, নদী মানষির সন্ধানে। "ঐ মরাঘাট ফরেস্টের ভিতরত একখান ছোট গাঁও আছে। ঐঠে একখান নদী মানষি আছে। সেই মানষি উত্তর পাখের নদীর জলের রঙ দেখি আর আকাশের ম্যাঘ দেখি কহি দিবার পারে, কোন নদীঠে কোন পাহাড়ের বানা নামিসে।" ৪৭ সেই নদী মানষির দেশ আর কোথাও নয় — বড়বাঁক, দুদুয়া, জমজমা, নদী যেখানে ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে বয়ে গেছে সেখানে। 'জমজমা যেখানে দুদুয়াত পড়িছে, ওইখানে থামি যাবু। নদী পার হবু না। তোক একখান বানভাসি মানষির নাখান নাগিবে পাছত নদী, সমুখত নদী, বাঁ পাখে নদী, ডাইন পাখে নদী।' এই নদীময় গ্রামটিই বুড়িমার গ্রাম। নদী মানষির ঠিকানা ঐ বুড়িমার গ্রামেই।

বন্যার জন্য অপেক্ষার মধ্যেও সেই নদীর কথায় আসে। কুমালীর মনে পড়ে তার কিশোর বয়সের কথা —

" উতরা কুমলাইয়ের জল

তিস্তা বুড়ির মাটি মিশল

মোর মাই মোক সিনাল করাবার ধরে

কুইমলাইয়ের গে উতরা বাঁক

জাম্বুরা দুই খান অ্যালায় না পাক

স্যালায় গন্ধায় মোক পাগল করিবার ধরে।" ৪৮

বন্যা এখনও আসেনি। তবে যে যার মতো করে কল্পনা করে কেউ ধানক্ষেতে, কেউ পাটক্ষেতে বন্যা এসেছে

বলে ধরে নেয়। আবার কেউ যে মাটিতে জল এখনও সম্পূর্ণ শুকোয়নি তার হল রেখা ছুঁয়ে মনে করে এখান থেকে এই বানা জাগা প্রহরে পুরাণকন্যা উঠে আসতে পারে।

আসন্ন বন্যার কল্পনা, নদীগুলোতে সে বন্যার প্রবাহ, চষা জমিতে হল কর্ষণের দাগে পুরাণকন্যার উঠে আসার আবহে উপন্যাসের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

'আর এক শেষ' নামক দ্বিতীয় পর্ব সেই ঝুলে থাকা বন্যা কোন কোন নদী দিয়ে হয়ে গেল কিংবা গেল না— এই কথা দিয়ে শুরু হয়। 'পাহাড় থেকে নামা বানা অনেক সময় এ নদী, ও নদী, সে নদীর ভিতর দিয়ে নামতে নামতে পথ হারিয়ে ফেলে।' সে জন্য হয় তো বড় আংরাভাসা, গোলুন্দি, নোমাই, গরাতি, ছোট আংরাভাসা, দুদুয়া, কুলজুয়া, বড়বাঁক এইসব নদী গুলি দিয়ে বা নদী গুলোর কোন একটি নদী দিয়ে বন্যাটা হারিয়ে গেছে। বন্যা যে সব সময় প্লাবন হয়েই দেখা দেবে তারও কোন মানে নেই।

"বুড়িমা যখন দেখেছে, পাহাড়ে বানা ঝুলে আছে, তখনই তো জানা হয়ে গেছে বানা নেমেছে, বানা ভেসেছে।" ৪৯

'সোলংগাদর্শন' অধ্যায়ে এসে লেখক এই বানা ঝুলে থাকার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন জন্মান্তরের প্রসঙ্গে। বুড়িমা হয়তো বানা ঝোলা দেখেইনি। "কে বলল দেখেছিলই। কোনো দিনই দেখেনি হয়তো। কোন একদিন দেখবে হয়তো। কেউ কি জানে কোনটা এ জন্মে ঘটেছে, কোনটা জন্মান্তরে ঘটেছে বা ঘটবে।" ৫০

'জন্মান্তরের' পৌরাণিকত্ব আরোপ করে বাস্তবের সম্ভাবনা গুলোকে লেখক ভিন্নমাত্রা দিয়েছেন। বাস্তবের নদী, বন্যা কেমন অলৌকিকত্বের ছোঁয়া পেয়ে যায়। আর এই অলৌকিকতা মেশানো নদীতেই দেখা দেয় নদী মানষি ঘাটোয়াল বা ঘাটিয়াল বা নাইয়া নদী চেনার অভিযানে।

এই অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয় সোলংগা দর্শন থেকে। আজ যাকে আমরা ঘাটোয়াল বলে জানি তার বাবা আর এক ঘাটোয়াল তার বাড়ির উঠোনে সাত ফেলেনে শিমুল গাছে একটা আস্ত নৌকো দেখেছিল। সে শুধু সোলংগা বা নৌকো দেখে, সেই গাছ কেটে, ডালপালা ছেটে নানা রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ওই গাছের ভেতর থেকে একখানা আস্ত নৌকো খুঁদে বরে করেছিল। তার শুধু একটাই বুলি — "ভিতরত একখান সোলংগা আছে। বাহির কইচছু।" ৫১

এবার নদীতে সোলংগা ভাসানোর পালা। নদী চিনতে হবে। পুরাণের ভগীরথের মতো গঙ্গা নদী চেনা তা না হলে সগর বংশের ষাট হাজার সন্তান সন্ততি মুক্তি পাবে কি করে। গঙ্গাবতরণের মতো করে গঙ্গার পূত পবিত্র জলস্পর্শে যেমন মৃতলোক থেকে সগর বংশীয়রা বেঁচে উঠেছিলেন, তেমনি এক পুরাণ পুরুষ জলঢাকা,

আংরাভাসা, নোমাতি, গড়াই, দুদুয়া, কুলজুয়া ইত্যাদি দশনদী-বিশনদী করে অবশেষে তিস্তায় গিয়ে পড়েছে। যেহেতু সব নদীই এক নদী - তাই এর যেকোন একটিতে একদিন ঘাটোয়ল পুত্র ঘাটোয়াল সোলংগা ভাসাতে যায়। "সেই জোয়ান বেটা, যে আর কতকদিন পরেই ঘাটোয়াল হয়ে যাবে, সে জানতো তার সোলংগার কোন একটি নদী দরকার, নদীর জল দরকার। তারপর সে সব জলই এক করে নিয়েছিল।" ৫২

'যে কোন নাম হতে পারে সে নদীটির, সে তার জলে সোলংগাটিকে বসাতেই নদী আর সোলংগা মিলে বয়ে যেতে থাকে একটু একটু কেঁপে ওঠে।'

'সে তার লগি নিয়ে সোলংগার ভিতর ওঠে। সোলংগা তাকে নিয়ে ভেসে চলে যেদিকে, তার মুখ তার — বিপরীতেই থাকে।' যে জনপদের সঙ্গে তার আজন্ম সম্পর্ক যে জন গোষ্ঠীর জন্যই তার নদী যাত্রা, নদী জানতে-নদী চিনতে যাত্রা— সেদিকেই তো মুখ থাকবে। সে নদীর সঙ্গে নদীর মতো করে ভেসে যায়। তার এই যাত্রা কতদিন ধরে কতবর্ষা, শীত পার করে তার কোন হিসেব নেই। যারা তাকে দেখে সেই দেখা 'একটা মানুষের জন্মেই কি শেষ হতে পারে?'

কয়েক দিনের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে যে নদীতে সোলংগা ভাসছে। সব নদীতেই ভাসছে। এই নদী গুলোতে পদ্মা বা মেঘনার মত নয়। এখানকার নৌকা ছোট, ছিপ ছিপে — একজন কি দু'জন বসার উপযোগী।

"এই নদী গুলি এত ছোট, এত নিরালা, এত দীর্ঘ যেন মনে হতে পারে, মানুষের পায়ে পায়ে চলছে, প্রান্তরের পথের মত। আসলে তো নদীর বাঁকে বাঁকে মানুষ চলছে। যখন বড় বড় বানা নামে, মানুষ তখন নদী পেরোয় না। ছোট বানার রঙ দেখে বোঝা যায়, কতক্ষণ পর আবার হেঁটেই পার হওয়া যাবে। বড় জোর একটু খানি ভেসে।" ৫৩

এখানে এক নদী থেকে বেরিয়ে অন্য নদী, সেখান থেকে আবার অন্য নদী এভাবে সব নদীতেই সোলংগা ভাসে প্রায় একই সময়, একই নাইয়া। মনে হয় অলৌকিক ঘটনা। বেটিছোয়াদের মুখে তাই এমন কথা — ' হামারালারঠে সোলংগা ভাসাছে।' 'হামরালারঠেও ভাসাছে।'

এই নদী সোলং গা, নাইয়ার কথা বলতে গিয়ে লেখক নারীই যে সংস্কৃতির বাহন তার উল্লেখ করেছেন। নারীর বুকের সঙ্গে তুলনা করেছেন নদীর বুকের।

"একখান বেটিছোয়ার দশ খান বুক— বড় নদীর বুকের চাইতেও চওড়া, কত জায়গা থেকে কত কিছু যে সেই বুকের পাড়ে পড়ে থাকে। বেটিছোয়ার ঘর তো দেশ থেকে দেশে, পৃথিবী থেকে পৃথিবীতে, ঘর থেকে ঘরে, ঠোঁটের কথা নিয়ে যায়। গলার গান নিয়ে যায়, মুখের ঢক নিয়ে যায়, জিভের স্বাদ নিয়ে যায়, চোখের

চাহন নিয়ে যায়, ওঠা-বসা নিয়ে যায়, আঙ্গুলের বোনা নিয়ে যায়।" ৫৪

নারী, নদীকে নিয়ে গান বাঁধে, তার ছোট নদীতে নৌকো বাঁধতে বলে, কারণ বড় নদীর মত প্রবল স্রোত নেই - যতক্ষণ ইচ্ছে এখানে থাকা যাবে এবং অনেক সময় ধরে সে তার মনের মানুষকে দেখে নিতে পারবে।

"ও পরান সাধুরে
বড় নদীর তালাস করিবেন না।
মোর নদীখান ছোট, সেইঠে কাশিয়ার হুলস্থুল
ঐঠে মোর তোমরালার সোলংগা বাঁধেন রে।
ও পরান সাধুরে।"

নদী কখনো উপমান, কখনো উপমেয় হিসেবে বর্ণিত হয়—"নাইয়া রে-আমার নাইয়া। যে নদী দেখিস নাই, সে নদীর সোঁতা খুব বুজরুখ। যে নারী দেখিস নাই, সে বড় সুন্দরী, তোর কানকে তোর চোখ বানাস না, নাইয়া, বরং তোর চোখকে তোর কান বানা।"৫৫ এসব কথার ভেতর দিয়েই রেতি, গোলুন্দি, দুদুয়া, মুজনাই-র কিছু বৈশিষ্ট্যর পরিচয়ও পাওয়া যায়।

'রেতি নদীর উত্তরে পাথর, গোলুন্দির উত্তরে জঙ্গল, দুদুয়া নদীতে বাঁকের পারে বাঁক, মুজনাই তো বাঁকে বাঁকে হারায়।' এইসব নদীতে সোলংগা ভাসালে তলা ফেঁসে যেতে পারে তাই নারী তার নাইয়াকে আহ্বান করে তার নিজের নদীতে।

"ওগে, মানষিলা মোক ভুলটুঙ্গি কয়—
মোর সব বুঝা য্যান সোলংগাত ভাসি যাবার হয়।
ওগে, মানষিলা মোক্ ভুলটুঙ্গি কয়।" ৫৬

'এক আশ্বিন মাসে, বড় পুজার আগে, জয়বীরপাড়া চা বাগানের নীচে ঐ চা বাগানের সীমানার বেড়ার তলায় যেখানে রেতি নদী দুভাগ হয়ে গেছে সেখানে এক মামলাবাজ মৈজুদ্দিন কী মৈনুদ্দিন পাইকার সোলংগা সহ নাইয়াকে পেয়ে যায়। এই সোলংগা করে নদী পথে সে জলপাইগুড়ি সদরে যাবে।'

সোলংগা খরস্রোতা রেতি নদীতে ঢুকেছে। নৌকা চালানোর দক্ষতা দেখে মইনুদ্দিন বোঝে 'এই বাউখান জল চিনে, সোত চিনে, এই বাউখানের চিনিবার ঢক আছে।' ৫৭ তারপর সে নাইয়া ও নদীর নৈসর্গিক বর্ণনায় বাঃ বাঃ করে ওঠে—

"এই আশ্বিন মাসে নদীর জল শুকোয়নি, বর্ষায় নদী দিয়ে যে জল নেমেছে তার নামা এখনো শেষ হয়নি।

এসব জল বর্ষার জল, বর্ষার পুরনো জল, স্রোতের ধাক্কায় এত ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে দেখায় যেন নতুন জল।" ৫৮

নদী পথে চলতে চলতে পাইকার নাইয়ার কাছে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে—তার বাবা কে, মা কে? কিন্তু নাইয়া 'জানো না' বলে উত্তর দেয়। একে ভুলামাসান ভেবে পাইকারের সন্দেহ হয়। এমন একটা গা ছমছম করা পরিবেশে আবার আমরা নদীর বর্ণনা পাই। "দুই পার থেকেই ফরেস্ট একেবারে জলের ভিতর পর্যন্ত নেমে এসেছে।"৫৯

'তিস্তা দর্শন' অধ্যায়ে পাইকার ও ঘাটোয়াল যখন সোলংগা ঘাড়ে নিয়ে তিস্তার বাঁধে গিয়ে ওঠে সামনে তাকিয়ে শূন্যতার দৃষ্টি ফেলে ঘাটোয়াল জিজ্ঞাসা করে'জলখান কোটত? কোটত নামিবার লাগে?' কথা শুনে পাইকার হো হো করে হেসে ওঠে।

"তিস্তা তো পৃথিবী! তিস্তা কি স্যালায় একোখান জল আর দুইখান পাড়? তিস্তা তো তোমারলা ভূটান পাহাড়ের কুখান একখান পুরা দিকধরি খাড়ি আছে। খুলা, খাড়া, সগায় দেখিবার পাছে, অষ্টপ্রহর, ডাকিবার ধরে নাই কাহোক, আছোঁ, খাড়া আছোঁ, খুলা আছোঁ, যেইলা চাহেন, আসেন, আইসেন, কুনো বাঁধা নাই। দেখহোঁ কেনে, তিস্তা খুলা, চওড়া, শ্যাষ নাই, শুরু নাই যেইলা পার আইসেন। তিস্তাত্ জল দেখিবার চাহোঁ? অ্যানং হবাও পারে, এইঠে সোলংগা খান ঘারত করি নামিলেন আর বালু বাড়ি-জলোবাড়ি-কাশিয়াবাড়ি-কাদোবাড়ি-পাথরবাড়ি করি করি জলপাইগুড়ির কাছাড়িত উঠিলেন। অ্যানং হবা পারে, সোলংগাখান ভাসিবার জলখানও না পালো। আবার এ্যানং হবা পারে, তোঁহোর সোলংগাখান ঘাড়ঠে জলত নামিবার টাইম না পালোঁ। তোঁহোর পায়ের তলাঠে একখান আস্ত গোটা নদী উঠি আসি তোক ভাসি নিগিলা।"৬০

এ বর্ণনায় তিস্তার বর্তমান অবস্থার ছবি পরিস্ফুট হয়েছে। এমন হতে পারে কখনো নৌকা ভাসানোর জল ও পাওয়া যায় না, আবার কখনো উত্তাল জল স্রোত এসে সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিস্তা শুধু দু পাড়ের বাঁধনে বদ্ধ তটিনী নয়—একটা খোলা বিশাল ভূখন্ডও বটে।

আবার তিস্তার "বালু বাড়ি, জলোবাড়ি-কাশিয়াবাড়ি, কাদো বাড়ি, পাথর বাড়ি অতিক্রম করে মূলজলে এসে দেখা যায় 'সামনে মেঘে কাল আকাশের সবটুকুজুড়ে ঘোলা একস্রোত এত বেগে বইছে যেন স্থির"৬১ অথবা "তিস্তার ওপরে যে আকাশ অন্য আকাশ থেকে অনেক বড়, সেই আকাশ কাল কুচকুচে মেঘে ছেয়ে আছে আর সেই মেঘের ছায়া পড়ায় তিস্তার ঘোলাজল, কাদাজল, ফেনাজল এমন অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে আছে যে ঘাটোয়াল হঠাৎ যেন একটা বিপ্লবের মধ্যে পড়ে যায় বা হঠাৎই যেন সে কিছু দেখতে পায় না।"৬২

'আরম্ভ' পর্বের 'গুহাপথ' অধ্যায়ে বুড়িমার গোতের অগুন, দোলান, ছোটদাদা, বড় চিলা, বাঙ্কুরাম, নদিনী শাশুড়িদের ধূপগুড়ি হাটে যাওয়ার পথে দুদুয়া নদী পার হতে হয়। নদীতে নামার আগে তারা যে যার পরিধেয় বস্ত্র সামলাতে থাকে। পুরুষরা জলে নামতে নামতে কাপড় খোলে, খুলতে খুলতে জলে নেমে সেগুলি মাথায় পেচিয়ে নেয়। নদিনী ও শাশুড়ির "জল তাদের কোমর পর্যন্ত ঢেকে দিলেই তারা ফোতা মাথার ওপরে তুলে একটানে খুলে ফেলে বুক দিয়ে জল ঢাকে আর ভেসে যেতে যেতে রঙিন ফোতা দুটো মাথায় পাক দিয়ে নেয়। বড় চিলা জলে ঝাঁপ দেয়। এতক্ষণ, বনের গুহাপথে যে আটজন একটা লাইন তৈরি করে আসছিল, তারা এখন লাইন ভেঙ্গে দুদুয়ার জলের স্রোতের রেখায় রেখায় নিজেদের শরীর মিলিয়ে দেয়। সেই বহতা জলরাশি আর সেই নিয়ত ভঙ্গুর রেখাপুঞ্জ এই শরীরগুলিকে যেন দীর্ঘ করে নেয়। জল পেরবার জন্যে দুই হাত আর পায়ের আক্ষেপে তারাও নিজেদের শরীরকে এই জলের মতই বহতা করে তোলে। পেশিময় পুরুষ শরীরগুলি আর অসমতল নারী শরীরগুলি জলের সঙ্গে খেলাতেও মাতে—কেউ একটু ভেসে যায়, কেউ স্রোতের একটু উল্টো দিকে যায় কেউ বা স্রোতকে উছলে যেতে দেয় নিজেদের শরীরে। যেন শরীরের পৌরুষ বা নারীত্ব বুঝে পুরুষ বা নারী হয়ে ওঠে।" ৬৩

এখানে নদী শুধু আপন বেগে বয়ে যায় না, মানুষকে পেয়ে মানুষের সঙ্গে খেলাতেও মেতে ওঠে।

'আর এক আরম্ভ' পর্বের 'নতুন চাষ' অধ্যায়ে হাইইল্ড চাষ প্রবর্তন হওয়ার পর দেখা গেল সেখানকার নদীগুলি আধুনিক চাষের জল সরবরাহে অক্ষম।

"নদীর জলের জমি বাছতে গিয়ে এই দশনদী-বিশনদীর দেশে বুড়িমার গোত প্রথম বোঝে—এত নদী আছে অথচ কোনো নদী নেই।" ৬৪

'শেষান্তর' এর 'আওয়াজ বদল' অধ্যায়ে নতুন চাষে জলের জন্য পাম্পের ব্যবস্থা হওয়ায় নদী সম্পর্কিত পুরোনো ফিচকিরির অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে। 'নদীর পারত নদী নাই, নদী গেইছেন কুন ঠাঁই'—পুরনো। আগে জবাব দিতে হত কোন নদী কোন নদীর সঙ্গে মিশেছে—' রেতি গেইছে দুদুয়ায়', 'আংরাভাসা গেইছে দুদুয়ায়' 'দুদুয়া গেইছে - তোরসায়'।' যে যত নতুন নদীর নাম বলতে পারত, সে তত নম্বর পেত। পাম্প বসার পর দুদিন কাটল কী তিনদিন কাটল এখন সেই পুরোনো ফিচকিরির নতুন উত্তর, যে যত অসম্ভব কথা বলতে পারবে সে তত জিতবে।—'বড়বাঁক গেইছে জমজমাত', 'জর্দা গেইছে ডায়নাত', কেমন করে যেতে পারে? 'পারে পারে পাম দিয়া পারে।'

'কানজি হাতি' অধ্যায়ে তিস্তার চরে হাতি ডুবে যাওয়ার সংবাদ বুড়িমার কাছে শুনে সেবা দেবার উদ্দেশ্যে

বুড়িমার গোতের লোকজন ঘটনাস্থলের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জায়গাটা কোথায় তা জানে না। পরে বাসে উঠে বাসের ছেলেটার মুখে জানতে পারে পুরনো বার্নেশ ঘাটের কাছে তিস্তার চরে। এই জায়গাটা বোঝাতে গিয়ে তিস্তা নদীপ্রসঙ্গ আসে—

"বড় নদী, তিস্তার মত দেবতানদী, তার বয়ে যাওয়ার পথে এমন কতকগুলি জায়গায় নদী ছাড় রেখে যায়। যে নদী বয়ে চলে যাচ্ছে, শুধু সে নদী তো তিস্তা বুড়ি নয়, শিবের মেচেনী নয়। যে নদী এই বহতা জলের ভিতর দিয়ে দিয়ে, যেন জননী কাউঠানী, ফিরে আসে, তারপর এই নদীছাড়গুলোর কোথাও বিশ্রাম নেয়, কোথাও বা কোনো নদী ছাড়ে কোনো এক মানব জন্মের একবেলা কাটিয়ে যায়, বা এমন দুটি তিনটি নদী ছাড় মেলানো বিস্তারে দেবতাদের চোখের পাতা ফেলার মত সময় অতিবাহন করে।

দেবতা নদী-কখনো নদী ছাড়ের ওপর তাঁর দখল ছাড়েন না।" ৬৫

এখানেও তিস্তাকে দেবতা নদী, মেচেনী, জননী কাউঠানী'র সঙ্গে তুলনা করে পৌরাণিক আবহ তৈরি করা হয়েছে। নদীর বহতা, তার চর তৈরি, লোকজীবনের সঙ্গে বসবাসের সঙ্গে পৌরাণিক ভাবকল্পনার মিশেল ঘটানো হয়েছে।

নদীছাড়, যেখানে জল দেখা যায় না, বালিময় চর, সেখানেই হাতিটা কেমন করে ডুবে যাচ্ছে এ বিস্ময়ের মীমাংসাতেও নদী ছাড়ের দখল নিয়েছে, সব প্রতিরোধ ভেঙ্গে। অথচ তিস্তার জল কিছু দেখাই যাচ্ছে না। ' "দেখিবেন ক্যানং করি? তিস্তা তো ঐখানত পাতালত, ঢুকি গেইছে। পাতালঠে গণশাক-টানি নিছে।" ৬৬ বাস্তবের হাতি এখানে 'পুরাণের গণশা'।

'হস্তিকন্যা' অধ্যায় যে বামন বামনী জয়নাথ ও জয়মালার গল্প বলা হয়েছে সেখানেও এসেছে নদীর কথা নানা ভাবে। "এই দশ নদী বিশ নদীর পৃথিবীতে যে কোনো এক নদীর পাড়ে ছোট একটা পাতার ঘরে থাকে এক বামুন আর তার বামনী।" ৬৭ বাধ্য হয়ে বামুন অন্য এক মরা বামুনের মেয়েকে বিয়ে করায় জয়মালা নদীর পাড়ে বসে কাঁদে। কানজি নদী থেকে ফেরা জয়মালার পথ আগলায়। জয়মালা তার দুঃখের কথা কানজিকে জানায়। কানজি জয়মালাকে তার শুঁড়ে বসিয়ে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। সাত রঙাঝর্ণার জলে তার অভিষেক হয়। অমনি সে হয়ে ওঠে এক হস্তিনী। 'কানজির মতই সুন্দর, কানজির সুরে তার শুঁড় জড়ানো।'— সেই হয়ে ওঠে হস্তি কন্যা। সমস্ত গল্পের পটভূমি, তিস্তা নদী। এ কোন মহিমান্বিত নদী, যে হাতির রাজা কানজিকে তার বালির চরে দশদিন-দশরাত্রি একটু করে ডুবিয়ে অবশেষে সমগ্রটাই ডুবিয়ে দিতে পারে এ কোন অন্তস্রাবী জলস্রোত যা চোরাবালির অভ্যন্তরে থেকে প্রবল হাতির দেহটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

তিস্তার এই এক অসম্ভব অথচ বাস্তব রূপটি কেবলই বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। "মাটির ভিতরের অদৃশ্য মাটির ঢেউ-ওঠা ঢেউ ভাঙ্গার আবর্তনে তার ঐ মাথা কখনো বা কান, কখনো ডানকান, কখনো কপাল তুলতে তুলতে ডুবে গিয়েছিল।" ৬৮

ছোট দাদা, যার অর্ধেকটা জীবনই কেটেছে 'পাঞ্জাব-ইউ পি-মহারাষ্ট্র-গুজরাত-বর্ধমান-নদীয়া-পুরুলিয়ার'—সেখানকার 'ধানক্ষেত' 'গমক্ষেত', 'আখক্ষেত' দেখে তাতে খেটে যে একদিন চিরকালের অচেনা নদী পেরিয়ে সড়ক পেরিয়ে কথা না বোঝা মানুষ জনের কথা বুঝেও নিজের কথা তাদের বুঝিয়ে একদিন ঘরে ফেরে। ফেরে বুড়িমার গোতে—আংরাভাসা, বড়বাঁক, নোমাই, গড়াতি, দুদুয়া, কুলজুয়া ইত্যাদি দশ নদী বিশ নদীর দেশে। গোতের লোকেরা তাকে গোত দেয়, জোত দেয়। কিন্তু সে ডাক শোনে ক্ষিধার পাকে যাবার, তিনচার জন্ম পর আবার ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বুড়িমাকে বিসর্জন দেবার ভারও তার ওপর। যে আধুনিক পুরাণ শুরু হয়েছিল বুড়িমার গোতে বুড়িমার পাহাড়ে বানা ঝুলে থাকার গল্প দিয়ে, যে বুড়িমা পুরাণের পুরাণ কন্যা, পুরাণ থেকে আধুনিকতার জননী এখন তো তাকে বিসর্জন দিতেই হয়। দিতে হয় নদী পথে গিয়ে নদীতেই। আবার ফিরেও আসতে হয় যে পথে যাবে সে পথেই। 'ছোটদাদা ডাইনে ঘোরে, বাঁয়ে ঘোরে বড় বাঁক, কুলজুয়া, দুদুয়া, গরাতি, নোমাই, গোলুন্দি, আংরাভাসা, জলঢাকা, তিস্তা।'

'সে তিনচার জন্মান্তর পরের সেই ফিরতি পথ আওড়াতে থাকে—তিস্তা, জলঢাকা, আংরাভাসা, গোলুন্দি, নোমাই, গরাতি, দুদুয়া, কুলজুয়া, বড়বাঁক।'

যে নদী, নদী সমূহের ভুবনে বিস্তৃত জনজীবন আবহমান কাল থেকে তাদের জীবন-মরণ-স্বপ্ন-চিন্তা, শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্মে নিজেদের ছড়িয়ে রেখেছে সেই ভুবনেই তাদের ফিরে আসতে হয়, আসতে হবে তিন-চার জন্মান্তর পরেও।

'তিস্তাপুরাণে'র ভূমিকাতে লেখক নিজেও সেই অনুভূতির কথা বলেছেন। 'নদী মানুষের একই ভুবনে যে এমন ঘুরছি সে হয়তো বেরিয়ে আসার পথ জানি না বলে। বা হয়ত বেরিয়ে আসার পথ চাই না বলেও। বা হয়তো বেরোনোর পথ নেই বলেই।'

দেখা গেল তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নদী নিজেই একটা চরিত্র। রাজবংশী জীবনের সঙ্গে একাত্ম এই চরিত্র কখনও বন্যারূপে ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করে। কত মাটি ভাঙে, কত জল ভাঙে, কত চর ভাসায় আবার নতুন চর তৈরি করে। প্রাকৃতিক নদীর ভয়ালরূপ, প্রশান্ত নৈসর্গিকরূপ দুই-ই আছে। আর প্রাকৃতিক রূপের পরিবর্তন মানুষের দ্বারা সাধিত হলে, তার জল চাষের কাজে, বিদ্যুৎ তৈরির কাজে লাগবে—এ আর এক রূপ। সাংস্কৃতিক

জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা তিস্তা শুধু নদীই থাকে না, হয়ে ওঠে বিশ্বাস, মিথ।

বিশেষ ভাবে লক্ষ করবার বিষয় যে তিস্তায় কেউ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে না। এখানে কোন জেলে মাঝির জীবন বৃত্তান্ত কীর্তিত হয়নি। হয়েছে নদী তীরবর্তী বসবাসকারী রাজবংশী, ভাটিয়া, চা বাগানের মদেশিয়া কুলিদের জীবন কথা। কিন্তু তারা নদীতে মাছ ধরে না। নদী তাদের মাছ দিয়ে জাল দিয়ে বাঁচায় না। নদী তাদের বাঁচায় প্লাবনে, বাঁধে, ব্যারেজে পূজাপার্বণ ও বিশ্বাসে।

তিস্তাপুরাণে এক তিস্তার সঙ্গে আরো নদীর কথা বলা হয়েছে। এখানেও মাছ ধরার দৃশ্য নেই, জাল ফেলার দৃশ্য নেই, যে খেয়া পারাপারের ছবি দেখানো হয়েছে সে তো এক পৌরাণিক কল্পনা। এখানে বানা ঝুলে থাকে পাহাড়ের খাদে। সে বন্যা আসে কিনা আসে না কেউ জানে না। নদী কখনও পৌরাণিক চরিত্রের মত, কখনও উপমা, কখনও দার্শনিকতার মিশ্রণে রাজবংশী জীবনকে প্রভাবিত করেছে। নদী একদিকে নদী হিসেবে বয়ে গেছে অন্য দিকে তাকে কেন্দ্র করে বয়ে চলেছে জীবন, নদীর প্রবাহের মতই এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে। এখানে যে নদী পথে বির্সজন হয় সেই নদী পথে হয় আবাহনও।

সুতরাং দুটি উপন্যাসেই নদীর যেমন পৃথক ভূমিকা নদী হিসেবে তেমনি নদী অন্বিত মানুষ নদীর মধ্যেই খুঁজে পায় তাদের বাঁচা মরার মন্ত্র। নদীর ভুবন থেকে সত্যি বের হওয়ার কোন উপায় নেই।

উল্লেখপঞ্জি

১। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৪১

২। পদ্মানদীর মাঝি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা সাইত্রিশতম মুদ্রণ, মার্চ ২০০৭, পৃঃ ৭

৩। তদেব পৃঃ ১৩

৪। তদেব পৃঃ ৭৫-৭৬

৫। পদ্মা নদীর মাঝি, মানিক গ্রন্থাবলী, প্রথম খন্ড, গ্রন্থালয়, প্রাঃ লিঃ কলকাতা, পৃঃ ৬৬

৬। তদেব পৃঃ ৫৪

৭। তদেব পৃঃ ১৩

৮। তিতাস একটি নদীর নাম, অদ্বৈত মল্ল বর্মণ, পুঁথিঘর, কলকাতা, উনবিংশ প্রকাশ কার্তিক, ১৪১৩, পৃঃ ১৩-১৪

৯। তদেব পৃঃ ২৬

১০। তদেব পৃঃ ২০

১১। পোষ্ট মডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাডিকেল ইমপ্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ১১৪

১২। আমার আয়নার মুখ, ডঃ নিমাই বসু, সমরেশ বসুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার, মৌসুমী প্রকাশনি, কলকাতা, ১৯৮৯।

১৩। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, পঞ্চম ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭২, পৃঃ ৭৭০।

১৪। সমরেশ বসুর গঙ্গা, আঞ্চলিকতা ও শিল্প মূল্য, শুভাশিস দত্ত, পৃঃ ৫১

১৫। পোষ্ট মডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাডিকেল ইমপ্রেশন, কলকাতা জানুয়ারী ২০০৭, পৃঃ ১১৪

১৬। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ২০০।

১৭। তদেব পৃঃ ১৯৮

১৮। তদেব পৃঃ ৫৬

১৯। তদেব পৃঃ ৫৮-৫৯

২০। তদেব পৃঃ ৬৪

২১। তদেব পৃঃ ১৯৮

২২। তদেব পৃঃ ১৯৮

২৩। তদেব পৃঃ ২০০

২৪। তদেব পৃঃ ২০১

২৫। তদেব পৃঃ ২২০

২৬। তদেব পৃঃ ২৪৭

২৭। তদেব পৃঃ ২৫৯

২৮। তদেব পৃঃ ২৭৬

২৯। তদেব পৃঃ ২৮৯

৩০। তদেব পৃঃ ৩০১

৩১। তদেব পৃঃ ৩০৫

৩২। তদেব পৃঃ ৩০৯

৩৩। তদেব পৃঃ ৪২৫

৩৪। তদেব পৃঃ ৪৮২

৩৫। তদেব পৃঃ ৪৮৬-৪৮৭

৩৬। তদেব পৃঃ ৪৮৯

৩৭। তদেব পৃঃ ৪৯৫

৩৮। তদেব পৃঃ ৪৯৭

৩৯। তদেব পৃঃ ৯৮

৪০। তদেব পৃঃ ৯৮

৪১। তদেব পৃঃ ১৫৮

৪২। তদেব পৃঃ ৪৭২

৪৩। তদেব পৃঃ ৪৭৯

৪৪। তিস্তাপুরাণ, দেবেশ রায়, দে'শ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃঃ ৬৬

৪৫। তদেব পৃঃ ৬৭

৪৬। তদেব পৃঃ ৬৮

৪৭। তদেব পৃঃ ৭২

৪৮। তদেব পৃঃ ৭৫

৪৯। তদেব পৃঃ ৮১

৫০। তদেব পৃঃ ৮৭

৫১। তদেব পৃঃ ৯০

৫২। তদেব পৃঃ ৯৪

৫৩। তদেব পৃঃ ৯৬-৯৭

৫৪। তদেব পৃঃ ৯৯

৫৫। তদেব পৃঃ ১০০

৫৬। তদেব পৃঃ ১০০

৫৭। তদেব পৃঃ ১০৬

৫৮। তদেব পৃঃ ১০৭

৫৯। তদেব পৃঃ ১১৪

৬০। তদেব পৃঃ ১৪৩

৬১। তদেব পৃঃ ১৫০

৬২। তদেব পৃঃ ১৫৪

৬৩। তদেব পৃঃ ২৪২

৬৪। তদেব পৃঃ ৫২১

৬৫। তদেব পৃঃ ৬১৯

৬৬। তদেব পৃঃ ৬২৫

৬৭। তদেব পৃঃ ৬৫১

৬৮। তদেব পৃঃ ৬৬৫

উপসংহার

দেবেশ রায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস বিষয়ক গ্রন্থ 'উপন্যাস নিয়ে'র 'বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধের শেষ পৃষ্ঠায় বিগত সোয়াশ বছরের বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি, বিশেষত 'ইংরেজ পুরাণ', ভেঙে দেশীয় রীতিতে আসার চেষ্টার নানা দিক আলোচনা করে একটি যুগান্তরকারী মন্তব্য করেছেন—

"বাংলা উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়নি লোকায়তের পৌরুষ, বাংলা উপন্যাসের কাহিনীতে আসেনি পুরাণ বা মিথ ভাঙার লোকায়তিক পেশি, বাংলা উপন্যাসের সংলাপে আসেনি আমাদের প্রতি ক্রোশে আলাদা উপভাষার খর চলিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গ শ্লেষ রসিকতার শান।" ১

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মানিক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সতীনাথ প্রমুখ তাবড় তাবড় কথা সাহিত্যিকদের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি আলোচনার পর উপরোক্ত মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মন্তব্যটি আর একবার উক্ত মহান লেখকদের লেখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে যেমন ইঙ্গিত করে সেই সঙ্গে পরবর্তী প্রতিভাবান লেখকদের নতুন সৃষ্টির খোঁজ নিতেও বলে, যেখানে দেখা মিলবে 'লোকায়তের পৌরুষ', কাহিনীতে পুরাণ বা মিথ ভাঙার লোকায়তিক পেশি' ও 'সংলাপে প্রতিক্রোশে আলাদা উপভাষার ক্ষর চলিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গশ্লেষ রসিকতার শান'।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের উপসংহারে আমরা দেবেশ রায়েরই দুই যুগান্তকারী উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'এ এই খোঁজ চালিয়েছি, চেষ্টা করেছি তার মন্তব্যের যাথার্থ তারই রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। এবং দেখানো হয়েছে এতদিনের উপন্যাস রীতিতে যা সম্ভব হয়নি দেবেশ রায় দেশজ রীতিকে অবলম্বন করে উক্ত দুই উপন্যাস রচনা করে তা সম্ভব করে তুলেছেন।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' তিস্তা অববাহিকা অঞ্চলের লোকজীবনের বৃত্তান্ত এবং তিস্তার জলপ্রবাহের বৃত্তান্ত। "১৬৮ কিমি দীর্ঘ তিস্তার গোটা দৈর্ঘ্যকে নয়, দেবেশ বেছে নিয়েছেন তার ছোট একটি অংশকে। তিস্তা যেখানে পার্বত্য ভূমি পেরিয়ে সমতলে এসে কালিম্পং থানা ছাড়িয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় ঢুকেছে। সেখানে আপলচাঁদ ফরেস্ট ছাড়িয়েই যে এলাকা, যার অল্প দক্ষিণে জলপাইগুড়ি শহর, সেই এলাকা নিয়েই দেবেশ রায়ের উপন্যাস।" ২

এই এলাকার মাটি, নদী, ঝোরা, বনজঙ্গল, চর, বাঁধ, রাস্তাঘাট এককথায় ভূগোল উঠে এসেছে তার উপন্যাসে। আদি পর্ব 'গয়ানাথের জোত জমি'তে সার্ভে পার্টির নদীর পাড় ধরে জমি জরিপ, মৌজা ম্যাপ,

গয়ানাথের বিশাল জোতদারি এলাকা দিয়ে উপন্যাসের এলাকাটাকে প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এরপর 'বাঘারুর নির্বাসন' বন পর্বে বাঘারু যে পথ ধরে, বনবাদার, চা বাগান পেরিয়ে ডায়নার চরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, উপন্যাসে এসেছে সেই পথের নিখুঁত বর্ণনা। বাঘারু আনন্দপুর চা বাগান পার হয়, কান্তদিঘি কুমার পাড়া পার হয়। এরপর কুমলাই, মাথা চুলকা, ধূপঝোড়া। বার ঘড়িয়ায় মাঠ ছেড়ে নিপুছাপুরের দিকে যাত্রা। এভাবে ক্রমে সে পৌঁছে যায় ডায়নার চরে।

চর পর্বে 'তিস্তা' যে যে এলাকা দিয়ে বয়ে গেছে সেই ছড়ানো জায়গা গুলোর বর্ণনা এরকম — "এতো জায়গায়, এত স্রোত তিস্তা দিয়ে যায় বলেই তিস্তাও যেন নিজেকে এমন ছড়িয়ে দেয়। এমনকি এই সমতলে, যেখানে তিস্তা তিস্তাই সেখানেও পশ্চিমপারে বোদাগঞ্জ, রঙধামালি, জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি আর পূবপারে মাল-লাটাগুড়ি, দোমোহনি, ময়নাগুড়ি, বার্নেশঘাট, বাকালি, মেখলিগঞ্জ এই দুই পারের মাঝখানে তিস্তা মাইল মাইল ছড়ানো ছিটানো। যাকে তিস্তা বলা হয়, যে জায়গাটাকে তিস্তা বলে সব সময় দেখা হয়, দেখানো হয় তার সবটা জুড়ে ত আর কখনও জল থাকে না। তিস্তা কোন নদী নয়, এক একটা ভূখণ্ড।..... তিস্তা তো একটি নদী নয়-একটি নদীর ভেতরেই অনেক নদী।" ৩

তাহলে তিস্তার ভেতরেই পড়ে নিতাইদের চর, চর ২ নম্বর, কাশিয়াবাড়ি, বোয়ালমাড়ি, মউয়ামাড়ি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত দহগ্রাম ইত্যাদি চর এলাকা।

বৃক্ষ পর্বে আপলচাঁদ থেকে নিতাইদের চর এবং চরুয়ারা যে বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে সমস্ত নদী পথ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এসেছে উপন্যাসে।

মিছিল পর্বে এসেছে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার হয়ে আসাম সংলগ্ন অঞ্চল ও আসামের বঙ্গাইগাঁও ও মালিগাঁও পর্যন্ত। পশ্চিম দিকে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, বিহারের ঠাকুরগঞ্জ, কিষাণগঞ্জ, ডালখোলা ইত্যাদি এলাকা।

'অন্ত্য' পর্বে পুবে তোর্সার পার থেকে মাদারিহাট, গয়েরকাটা, চালসা ওদলাবাড়ি হয়ে গাজলডোবা, তিস্তা ব্যারেজের স্থল পর্যন্ত বন-পাহাড়-নদী, চা বাগান অধ্যুষিত পথ। এই ভুগোলে বিধৃত হয়ে আছে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'।

এই উপন্যাসের ইতিহাস প্রায় সমকালীন। ১৯৬৮'র বন্যার প্রায় বছর দশেক পর বামফ্রন্টের আমলে গাজলডোবার জমি জরিপের কাজ শুরু হয়। "স্পেশাল সেটলমেন্টের জরিপের কাজ শুরু হল ৭৭ সাল

নাগাদ।" ৪

জরিপের উদ্দেশ্য—গাজলডোবায় তিস্তার ওপর ব্যারেজ নির্মাণ করা। জমি জরিপ ও ব্যারেজ তৈরি এই বিষয়টিকে নিয়েই উপন্যাসের মূল বৃত্তান্ত চলতে থাকে। তার সাথে যুক্ত হয় আর এক ইতিহাস। দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু বাঙালীদের তিস্তাপারের চরভূমিতে বসবাস করার ইতিহাস। কৃষক সমিতির খাশ জমি দখল, জরিপওয়ালাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বচসা কিংবা চা শ্রমিকদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মূলত ওই পূর্ববঙ্গাগত ভাটিয়াদেরই।

জমিখাশ করে ব্যারেজ নির্মাণ, বনভূমির ক্ষতি সাধন ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে আর এক সমকালীন ইতিহাস উত্তরখণ্ড আন্দোলন। প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে রাজবংশীদের অতীত ইতিহাস। ১৫১০ থেকে ১৭৭৩ পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে তারপর ১৯৪৯ পর্যন্ত করদ দেশীয় রাজা হিসাবে মোট ৪৪০ বছর রাজবংশী রাজার শাসনের ইতিহাস। তারপর ক্ষত্রিয় সমিতির আন্দোলন। ১৮৯০ থেকে ১৯৩০/৩৫ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলাকালীন রাজবংশীয়রা ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে পৈতে পরা শুরু করে।

তিস্তাপারের রাজনীতি ও মূলত তিস্তা ব্যারেজকে নিয়ে। ১৯৬৭, ও ১৯৬৯ সালে দু'দুবার পশ্চিমবাংলায় অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসে। তারা ক্ষমতায় এসে ভূমি সংস্কারে হাত দেয়। খাশজমি উদ্ধার, ভূমিহীনদের মধ্যে তা বন্টন, জমি খাশ করে উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো, কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষামূলক কাজ শুরু করা এবং তাতে গয়ানাথ, সম্পৎ রায়দের মত জোতদারদের অসুবিধায় পড়তে হয়। তারা এবং প্রধানত হেরে যাওয়া কংগ্রেসী লোকেরা মিলে উত্তরখণ্ড দল গঠন করে। উত্তরখণ্ডের লক্ষ রাজবংশী ঐতিহ্য বা গৌরবকে স্মরণ করে কামতাপুর রাজ্য গঠন করা, যুক্তফ্রন্ট, পরে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিনীতির বিরুদ্ধাচারণ করা। সেই সঙ্গে তিস্তা ব্যারেজের বিরুদ্ধে রাজবংশীদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান।

আর বামফ্রন্টের চ্যালেঞ্জ এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে রাজনৈতিক ভাবে পরাস্ত করে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এই দুই বিপরীত মুখি আন্দোলন ময়নাগুড়ি সম্মেলনে এক বিশেষ রূপ নেয়। শ্রীদেবীর ফাংশানকে সামনে রেখে উত্তরখণ্ডীরা যে জনসমাবেশের আয়োজন করেছিল, জল্পেশযাত্রার ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি করে যে মিছিলের ব্যবস্থা করেছিল বামপন্থীদের তথা সরকারি প্রচেষ্টায় তা হাস্যকরভাবে বিফল হয়ে যায়। আসন্ন নির্বাচনের কথা ভেবে অসমাপ্ত ব্যারেজ উদ্বোধনের ব্যবস্থা ও সেজন্য সারা উত্তরবঙ্গ তোলপাড় করে বামপন্থীদের হাজার হাজার লোকের মিছিলে একদিকে যেমন ভোটের প্রস্তুতি তেমনি, অন্যদিকে উত্তরখণ্ড আন্দোলনকারীদের

নিস্প্রভ করে দিয়ে বোঝানো যে জনগণ আসলে ব্যারেজের পক্ষে, বামফ্রন্টের পক্ষে। এছাড়া পুলিশ দিয়েও উত্তরখণ্ডীদের ব্যারেজ বিরোধী মিছিল ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। এককথায় গাজলডোবার ব্যারেজের উদ্বোধন উপলক্ষে যে রাজনীতি সংগঠিত হয় তা সম্পূর্ণভাবে বামফ্রন্টের পক্ষে চলে যায়। তবু লেখক দেখিয়েছেন যে এই উন্নয়ন সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। বিশেষত মাদারি, মাদারির মা বা বাঘারুদের মত দারিদ্র্য সীমার অনেক অনেক নিচে বসবাসকারী মানুষদের।

তিস্তাপারের বৃত্তান্তে শুধু তিস্তাপারের ভুগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বা অর্থনীতির কথাই আলোচিত হয়নি আলোচনায় স্থান পেয়েছে রাজবংশী জীবনের বিশ্বাস, রীতিনীতি, ছড়া, গান, ফাকালী, প্রবাদ, রসরসিকতা ও তাদের মুখের ভাষা।

'তিস্তাপুরাণে'র ও ভূগোল তিস্তাপার। ধূপগুড়ি ব্লকের দলগাঁও-সরুগাঁও গ্রাম দশনদী বিশ নদীর পৃথিবী। এখানকার সব কিছুর পরিচয় ব্যাখ্যা পুরাণের ভাষায়। মূল কেন্দ্র দলগাঁও-সরুগাও হলেও সারা উত্তরবঙ্গই এর ভূগোল। এই ভৌগোলিক সীমায় বিধৃত হয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় নদী, আর বুড়িমার গোত এবং গোটা রাজবংশী সমাজ। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে যে রাজবংশী সমাজের পরিচয় পাওয়া গেছে, নৃতত্ত্বের চুলচেরা বিচারে, ইতিহাসের সন তারিখের নিরিখে। এখানে, এই পুরাণে রাজবংশীর পরিচয় পাওয়া যায় তাদের দৈনন্দিনে, আকার আকৃতিতে, চলনে, বলনে, কথনে, আচার বিচার আদব কায়দায়। তাদের ঘর দরজা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা বলার ধরন, খাওয়া-দাওয়ার ধরন, পূজাপার্বণ, রীতিনীতি ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয় যে এরা রাজবংশী। ভাষা তো আর একটি মুখ্য উপায়।

লেখক সযত্নে এই জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এখানেও রাজনীতির কথা এসেছে বুড়িমার গোতের প্রসঙ্গেই। লেভি, জোতদার-আধিয়ার সম্পর্ক, জমি দখল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তাদের ক্রিয়া কর্ম। বর্গা রেকর্ড, দলহীন, ঝাণ্ডাহীন, জমিদখলে ব্যর্থতা, ছোটদাদার মানুষের প্রকৃত মুক্তির বার্তা নিয়ে ক্ষুধার দিকে গিয়ে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। বুড়িমার বিসর্জনে পুরাতনের বিদায়, নতুনের আগমন। অতএব তিস্তাপারের বৃত্তান্ত থেকে আমরা পেলাম সমকালীন সময়ের উত্তরবঙ্গের রাজনীতি, বামশাসিত উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের ধারায় ভূমি সংস্কার তিস্তাব্যারেজ জাতীয় নদী বাঁধের কথা এবং অবশ্যই তিস্তানদীর স্বরূপ।

আর তিস্তাপুরাণ থেকে পেলাম বুড়িমার মিথের আড়ালে একটা সমগ্র রাজবংশী সমাজ। তাদের জীবন

প্রবাহে রাজনীতি, জীবনচর্চা, দৈনন্দিন, জন্মমৃত্যু, সংস্কৃিয়া। তাদের কথাবার্তা, হাস্যপরিহাস, প্রবাদ প্রবচন, রীতি, পার্বণ ইত্যাদি অনেক কিছু।

আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে ওপার বাংলার এক অজগ্রামে যে বাড়িতে ডাকযোগে ষ্টেটসম্যান যেত এবং বৃদ্ধ, অন্ধ দাদুকে ইংরেজি অক্ষরের আকৃতি বলে বলে যাকে পত্রিকা পড়তে হত, সেই বাড়ির সেই ছেলেটি দেবেশ রায়। যিনি ভাল করে বাংলা শেখার আগে ইংরেজি অক্ষর চিনেছিলেন। যিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে কমিউনিস্ট পার্টি করার জন্য এ্যারেষ্ট হয়েছিলেন, যিনি লেখক, সমালোচক, সম্পাদক, রাজনীতিক এবং যার কলম এখনও সৃষ্টিশীল। সেই দেবেশ রায়ের সত্তরোর্ধ জীবন ঘটনাবহুল হবে, তা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা আমাদের সন্দর্ভের প্রয়োজনে প্রথম অধ্যায়ে অত্যন্ত সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র আলোচনা করেছি। শৈশবের কিছু স্মৃতি আলোচিত হয়েছে তাঁর বাল্য জীবনের পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বোঝাবার জন্য। আলোচনা করা হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক জীবন। কারণ তাঁর ব্যক্তি সত্তা গড়েই উঠেছে কমিউনিস্ট মতাদর্শে এবং যাকে অবলম্বন করে তার লেখক সত্তাও পুষ্টি লাভ করেছে।

তাঁর কর্মজীবনের একটা বড় সময় কেটেছে সাংবাদিকতায়। তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ রচনার জন্য সাংবাদিক গদ্য খুবই সহায়ক বলে তিনি মনে করেন। উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

আমরা যে দুটি যুগান্তকারী উপন্যাস তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ আলোচনা করেছি তা রচনা করার আগে তাঁর যে গল্প উপন্যাসের একটা ধারা রয়েছে, সঙ্গত কারণে সেই ধারার মূল বিষয় গুলি স্পর্শ করাও জরুরী। সে জন্য তিনি কীভাবে গল্পকার থেকে ঔপন্যাসিক হয়েছেন এবং কীভাবে নানা উপন্যাসের ভেতর দিয়ে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত এবং তিস্তাপুরাণ লিখেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে এই প্রথম অধ্যায়ে। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণের অতি সংক্ষিপ্ত রূপ এতে ঠাঁই পেয়েছে। বৃত্তান্ত মূলক আর একটি রচনা 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'রও কাহিনি সংক্ষেপ করে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার জন্য গৃহীত মূল দুই উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ'-এর পরিচয় জ্ঞাপক আলোচনা। আলোচনা করা হয়েছে দু'ভাবে। এক)পর্ব গুলির বিন্যাস দেখানো, দুই) কাহিনি সংক্ষেপ। উপন্যাসের যে প্রচলিত উপাদান প্লট, চরিত্র, কাহিনি, দেবেশ রায় সেই ধারা থেকে সরে এসে এপিসোডিক ধরনে এই দু'খানি উপন্যাস লিখেছেন। সে জন্য উপন্যাসের নিটোল কাহিনি এর মধ্যে পাওয়া যাবে না। পর্ব

ও পর্বের অন্তর্গত অধ্যায় গুলির স্বাধীন, স্বতন্ত্র, অস্তিত্ব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে যে টুকু কাহিনির আদল এসেছে তাই এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই একে বিষয়সংক্ষেপও বলা যেতে পারে। উপন্যাস দু'খানির কাহিনি সংক্ষেপ বা বিষয় সংক্ষেপ মূল গবেষণায় প্রবেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় রচনা রীতি ও স্বরূপ বিচার। রচনা রীতির ব্যাপারে দেবেশ রায় ইংরাজি মডেল মুক্ত দেশজ রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। সেজন্য প্রচলিত আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত কাহিনি বিন্যাস এড়িয়ে মহাকাব্যিক ধরনের একটি কথা বৃত্তের সূত্র ধরে অন্য কথা বৃত্তে চলে যাওয়া, বিষয়কে টুকরো টুকরো এপিসোড তৈরি করে বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কথার বিস্তার ঘটিয়ে অনুপুঙ্খ বর্ণনায় বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা তাঁর রচনার বিশেষ রীতি। গল্পের সূত্রে গল্প বলার যে প্রাচীন রীতি আমাদের রূপ কথায়, পঞ্চতন্ত্র , হিতোপদেশে দেখা যায়, দেবেশ রায় তার অনুসরণ করেছেন। এসেছে গল্প বা বিষয়ের ফাঁকে ফাঁকে তত্ত্বকথা শোনানোর ধরন।

আধুনিকতার মূল সুর নিহিত আছে মানবতার মুক্তিতে। শুধু কালের বিচারে আধুনিক হলেই হয় না। বিষয়, বিষয়কে উপস্থাপন করার রীতি, ভাষা, প্রান্তীয় মানুষের কথা, সর্বোপরি এই মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশনা আধুনিকতার মাপকাঠি। সে বিচারে দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ দুই-ই আধুনিক উপন্যাস। এই অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হয়েছে।

স্বরূপ বিচারে উপন্যাসদ্বয় উপন্যাস শ্রেণির কোন দলভুক্ত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাস নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। রোমান্স ধর্মী উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, চরিত্র উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, কাব্যোপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস, মহাকাব্যিক উপন্যাস। কোন কোন উপন্যাস একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত হতে পারে। আবার কোন কোন উপন্যাসে একাধিক শ্রেণির লক্ষণও দেখা দিতে পারে। সে জন্য নির্দিষ্ট ভাবে অনেক উপন্যাসকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হয়না।

দেবেশ রায়ের এই উপন্যাস দুটির মধ্যেও একাধিক শ্রেণি লক্ষণ বর্তমান। তাই একটি বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা বড় কঠিন। তবু যে শ্রেণি লক্ষণ তুলনায় অধিক উপন্যাস দুখানিকে সেই শ্রেণির অন্তর্গত করে বলা হয়েছে উপন্যাস দু'খানি মহাকাব্যিক।

উপন্যাসের রচনারীতিরই একটি প্রধান অঙ্গ হল তার ভাষা রীতি। ভাষা উপন্যাসের প্রাণ, মূল নিয়ন্ত্রক

শক্তি। সে জন্য ভাষা বিষয়ক একটি পৃথক অধ্যায় গড়ে দেবেশ রায়ের নিজস্ব ভাষা শৈলীর বিশদ পরিচয় জ্ঞাপন করা হয়েছে। দুটি উপন্যাসের ভাষা বৈশিষ্ট্য পৃথক পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে। বাক্য বিন্যাস, দীর্ঘ জটিল বাক্য, ছোট সরল বাক্য, প্রশ্নোবোধক বাক্য, বহুস্বর ইত্যাদি ভাষার সৌন্দর্য, প্রবাহমানতা এবং অর্থকে নানাস্তরে বিন্যস্ত করার সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। উপন্যাসের কথা বস্তুকে সঠিক অর্থে রূপ দেওয়ার জন্য ভাষার এই বৌদ্ধিক নির্মাণ সামগ্রিক ভাবে উপন্যাস দু'খানিকে মহিমান্বিত করে তুলেছে।

রাজবংশী ভাষার সঠিক ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ উপন্যাস দুখানির ভাষার ভুবনকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। একই বিষয় অবলম্বনে একই রচনারীতি অনুসরণ করে শুধু শিষ্ট বাংলায় উপন্যাস দু'খানি তিনি রচনা করতে পারতেন। কিন্তু তা কখনোই বর্তমান তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণ হত না। আবার শুধু রাজবংশী ভাষার আঞ্চলিক ধরনেও উপন্যাস দু'খানি লেখা যেত, তবে তা হত নিছকই অন্যান্য আর পাঁচখানা আঞ্চলিক উপন্যাসের মতো।

কিন্তু লেখক তা করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন দু'খানি মহাকাব্য রচনা করতে। আর সেই জন্যই সচেতন ভাবে আঞ্চলিক ভাষার আদলটি তিনি গ্রহণ করেছেন। রাজবংশী ভাষার ব্যাকরণ গত দিকটির দিকে তিনি যত নজর দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি নজর দিয়েছেন এই ভাষার ব্যবহারে কথা কত ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে তার দিকে। উপন্যাসে চিত্রকল্প রচনা, বাস্তব ও সজীব করে তোলার ক্ষেত্রে রাজবংশী ভাষা মন্ত্রবৎ কাজ করেছে। যার মুখে, যে পরিবেশে, রাজবংশী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেই চরিত্র ও বিষয়টি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এই চতুর্থ অধ্যায়ে রাজবংশী ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি প্রথমে আলোচনা করে ভাষার স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর দুই উপন্যাসে এর প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রেও বর্ণনার ভাষায় রাজবংশী প্রয়োগ, শিষ্ট বাংলায় রাজবংশী শব্দ, বাক্য প্রয়োগ, পাত্রপাত্রীর মুখে রাজবংশী ভাষা নানা দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। এ ভাষার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়েও কিছু মতামত তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি উপন্যাস দুখানিতে রাজবংশী ভাষার প্রয়োগ যে উপন্যাস দুখানিকে মহাকাব্যিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে তাও বলা হয়েছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপুরাণ' দুটি উপন্যাসেরই শিরোনাম যে তিস্তা নদী, সেদিক থেকে দুটি উপন্যাসই নদী কেন্দ্রিক। স্বাভাবিক ভাবে দুটি উপন্যাসে 'তিস্তা'র ভূমিকা কি তা নিয়ে একটা অধ্যায় প্রয়োজন। পঞ্চম অধ্যায়টিতে তা আলোচনা করা হয়েছে।

সভ্যতার বিকাশে নদীর ভূমিকা, ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে নদীর ভূমিকা এবং বাংলার নদী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করে বাংলা নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের কথায় আসা হয়েছে। এবং পদ্মানদীর মাঝি, তিতাস একটি নদীর নাম ও গঙ্গা এই তিন খানি উপন্যাসে নদী কিরূপে দেখা দিয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। সেই সূত্রেই আমাদের আলোচ্য তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ও তিস্তাপুরাণে তিস্তা কী ভূমিকা পালন করেছে তা সবিস্তারে বলা হয়েছে। এই দুই উপন্যাসে নদীর ভূমিকা দু'রকম। তিস্তাপারের বৃত্তান্তে নদীর নিজস্ব রূপ কখনো বন্যার, কখনো নিসর্গের। আবার নদী অন্বিত রাজবংশী ও ভাটিয়ারাও কিভাবে এই নদীকে ব্যবহার করেছে তাও আলোচনায় এসেছে।

তিস্তাপুরাণে, নদী বন্যা রূপে পাহাড়ের খাদে ঝুলে আছে। কবে আসবে, কিংবা আদৌ আসবে কিনা, বা এসেও গেছে হয়তো এরকম পৌরাণিক ভাবনার নদী। তবু তাকে নিয়েই বুড়িমার গোত্র বা বংশের দিন যাপন। তিস্তা ছাড়াও আরও কিছু নদী যেমন জলঢাকা, বড়বাঁক, আংড়াভাসা, নোমাই, গোলুন্দি, দুদুয়া ইত্যাদির কথাও এসেছে।

নদী শুধু নদী নয়, সংস্কৃতিরও বাহন। তাই তিস্তা পূজিতা হন তিস্তাবুড়ি হিসেবে। নদীকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান পূজাপার্বণ, গান বাঁধা হয়। এই ভাবে জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকে তিস্তা।

সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে আমি অধ্যায় পরম্পরায় সাজিয়ে উপসংহারে এসে শেষ করেছি। আমার গবেষণা-চক্রের সিদ্ধান্ত হল এই উপসংহার। বানান বিষয়ে বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসরণ করেছি। তবে যুক্তবর্ণ ব্যবহারে পুরোনো রীতি অনুসৃত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

১। উপন্যাস নিয়ে, দেবেশ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৪১

২। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-জানুয়ারী, ২০০০, পৃঃ ৩২০

৩। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দেবেশ রায়। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, একাদশ সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ১৯৮।

৪। তদেব পৃঃ ৪৪৫

পরিশিষ্ট-

গ্রন্থ পঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ় ১৩৯৫, জুলাই ১৯৮৮, একাদশ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২। তিস্তাপুরাণ - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৬,জানুয়ারী ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অন্তর্বয়ন ঃ কথা সাহিত্য - পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ কাল - ১৯৯০, একুশে।

২। আমার কালের কয়েকজন কথা শিল্পী - জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৪, ভারবি।

৩। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ - ডঃ রামেশ্বর শ, প্রথম প্রকাশ ঃ ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পুস্তক বিপণী।

৪। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস - অশ্রুকুমার শিকদার, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ, মার্চ ২০০৩, অরুণা প্রকাশনী।

৫। আত্মীয় বৃত্তান্ত - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা জানুয়ারী ১৯৯০, মাঘ ১৩৯৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬। আকাদেমি বানান অভিধান- পবিত্র সরকার, অমিতাভ দাশগুপ্ত, প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ষষ্ঠ সংস্করণ

৬ জানুযারি ২০০৮।

৭। ইতিহাসের লোকজন - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা জানুয়ারী ১৯৯২, মাঘ ১৩৯৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।

৮। ইছামতী - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৮২, চতুর্দশ মুদ্রণ ঃ ১৪১৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

৯। উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ - ডঃ নির্মল দাশ, পুনর্মূদ্রণ, জানুয়ারী ২০০১, সাহিত্য বিহার।

১০। উপন্যাস জিজ্ঞাসা - রবীন্দ্রগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ ২৮ আগষ্ট, ১৯৯৫, গ্রন্থ নিলয়।

১১। উপন্যাসের বর্ণমালা - সুমিতা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৩, পুস্তক বিপণি।

১২। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস - সুকুমার দাস, প্রথম প্রকাশ ঃ ২ জুন, ১৯৮২, কুমার সাহিত্য প্রকাশন।

১৩। উপন্যাসের উজানে - রবিন পাল, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স ।

১৪। উপন্যাসের ঘরবাড়ি - জহর সেন মজুমদার, প্রথম প্রকাশ ঃ রজত জয়ন্তী বর্ষ প্রকাশন মে ২০০১, পুস্তক বিপণি।

১৫। উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে - দেবেশ রায়, প্রথম বর্ধিত দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৬, মাঘ ১৪১২।

১৬। উপন্যাস নিয়ে - দেবেশ রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৭। উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ ও রাজবংশী - অশোক রায় প্রধান, প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা ২০০৬, রয়্যাল পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৮। কোচবিহারের ইতিহাস- ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল, প্রকাশকাল আশ্বিন, ১৩৯৪, অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা।

১৯। খোয়াবনামা - আখতারুজ্জামান ইলিয়াশ, প্রকাশ কাল বৈশাখ ১৪০৩, এপ্রিল ১৯৯৬ নয়া উদ্যোগ ২০৬, বিধানসরণী, কলকাতা।

২০। গল্প-উপন্যাস সমগ্র-দিনেশ চন্দ্র রায় সম্পাদনা -গৌতম সেনগুপ্ত, প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০০, দে'জ পাবলিশিং।

২১। গঙ্গা - সমরেশ বসু, প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৭৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০, মৌসুমি প্রকাশনী ১-এ কলেজ রো, কলকাতা।

২২। গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি- ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৪১২, জুলাই ২০০৫।

২৩। ঢোঁড়াই চরিত মানস - সতীনাথ ভাদুড়ী, নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর, ২০০৪, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা।

২৪। তিতাস একটি নদীর নাম - অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৬৩, উনবিংশ প্রকাশ ১৪১৩, পুঁথিঘর, ২০৬, বিধানসরণী, কলকাতা।

২৫। তৃপাকে এক তোড়া - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ৫ ডিসেম্বর ২০০০,

অগ্রহায়ণ, ১৪০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২৬। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ১- দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০০। ভাদ্র ১৪০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২৭। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ২- দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ রাখি পূর্ণিমা, শ্রাবণ ১৩৯৯, আগষ্ট ১৯৯২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২৮। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৩ - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।

২৯। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৪ - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩০। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৫ - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩১। দেবেশ রায় গল্প সমগ্র ৬ - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০৭, এপ্রিল ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩২। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য - গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩৩। নবসংস্করণে বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা - সম্পাদনা ডঃ অরুণ কুমার বসু, ডঃ অপূর্ব কুমার রায়, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ কলকাতা বইমেলা ২০০৪, সমতট প্রকাশন।

৩৪। প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম - অচিন্ত্য বিশ্বাস, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৫, রত্নাবলী, কলকাতা।

৩৫। পদ্মানদীর মাঝি - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ় ১৩৪৩, ১৫৬ জুলাই ১৯৩৬, সাঁইত্রিশতম মূদ্রণ, চৈত্র ১৪১৩, মার্চ ২০০৭,বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রা:) লিমিটেড, কলকাতা।

৩৬। প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস - অরুণ সান্যাল সম্পাদিত, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩৭। পোষ্ট মডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য - পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ২০০৭, র‍্যাডিকেল ইমপ্রেশন।

৩৮। পঞ্চাশের দশকের কথাকার - উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি।

৩৯। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ১ - ক্ষেত্র গুপ্ত, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২, প্রকাশক ঃ গ্রন্থ নিলয়।

৪০। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ২ - ক্ষেত্র গুপ্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৮ আগষ্ট, ২০০১, গ্রন্থ নিলয়।

৪১। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ৩ - ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০০, গ্রন্থ নিলয়।

৪২। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ৪ - ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগষ্ট, ২০০২, গ্রন্থ নিলয়।

৪৩। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ৫ - ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৫, গ্রন্থ নিলয়।

৪৪। বাচন ও স্বনির্বাচন - অরুণ সেন প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা জানুয়ারী ১৯৯৮, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড।

৪৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি

কলকাতা, পঞ্চম ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭২।

৪৬। বাংলা উপন্যাসের ধারা - অচ্যুত গোস্বামী, পাঠভবন, ১৯৬৮।

৪৭। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮৭, কলকাতা।

৪৮। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা - সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪৯। বাংলা উপন্যাস ঃ দ্বান্দ্বিক দর্পণ - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০ মে, ১৯৯৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি।

৫০। বাংলা উপন্যাসে ওরা - শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যাপিরাস সংস্করণ, নববর্ষ ১৪০৯, প্যাপিরাস।

৫১। বঙ্গীয় শব্দ কোষ (প্রথম খন্ড)- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি ১৯৬৬, নতুন দিল্লী, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০১।

৫২। বঙ্গীয় শব্দ কোষ (দ্বিতীয় খন্ড)- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি ১৯৬৬, নতুন দিল্লী, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০১।

৫৩। ভাওয়াইয়া - সুখ বিলাস বর্মা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৯, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৫৪। ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, মাঘ ১৩৯৮, জানুয়ারি ১৯৯৩।

৫৫। মফস্বলি বৃত্তান্ত - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ অকটোবর ১৯৮০, পরিবর্ধিত ঃ দে'জ সংস্করণ, নববর্ষ ১৩৯৬, এপ্রিল ১৯৮৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫৬। মানুষ খুন করে কেন - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৭৬, দে'জ

সংস্করণ ঃ নববর্ষ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫৭। যযাতি - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮০, প্রথম দে'জ সংস্করণ, বইমেলা ফেব্রুয়ারী ১৯৯১, মাঘ ১৩৯৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৫৮। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প - গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দ্বিতীয় সংস্করণ ; কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০১, দে'জ পাবলিশিং ।

৫৯। শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি - মীর রেজাউল করিম, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পরিবেশক - পুস্তক বিপণি।

৬০। শ্রেষ্ঠ গল্প - অমিয় ভূষণ মজুমদার, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০০, দে'জ পাবলিশিং।

৬১। শৈলী চিন্তাচর্চা - সংকলন ও সম্পাদনা বিপ্লব চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৩, প্রকাশক ঃ রত্নাবলী।

৬২। শৈলী ও শৈলী বিজ্ঞান- আশিস কুমার দে, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০, ভাষা পত্রিকা।

৬৩। শিল্পের প্রত্যহে - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, মাঘ ১৩৯৮ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬৪। শিল্পায়নের প্রতিবেদন - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারী ১৯৯৬, মাঘ ১৪০২ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬৫। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, গুণরাজ খান, মালাধর বসু বিরোচিত সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গলা রানা, রত্নাবলী প্রকাশনা, জানুয়ারি ২০০৩।

৬৬। সময় অসময়ের বৃত্তান্ত - দেবেশ রায়, প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা পুস্তক

৬৬। মেলা জানুয়ারী ১৯৯৩, মাঘ ১৩৯৯ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬৭। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা- ড. রামেশ্বর শ', দ্বিতীয় সংস্করণ ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৯৯ পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৬৮। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে-বাংলা ও নেপালি শব্দার্থ সমীক্ষা। সুবোধ কুমার যশ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

৬৯। সাহিত্য প্রকরণ- হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৌষ সংক্রান্তি ১৪০৬।

৭০। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৭১। সাহিত্য কোষ ঃ কথা সাহিত্য - অলোক রায় সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ২০০২, সাহিত্য লোক।

৭২। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৫৪, পঁচিশতম মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০০৭, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড।

ইংরাজী গ্রন্থ সমূহ

1. A Glossary of Contemporary Literary Theory Jeremy Hawthorn, 4th Edition, 2000

2. A Glossary of Literary terms- M.H. Abrams, 6th Edition (Indian Edfition 1993) Prism Books Pvt. Ltd. Bangalore.

3. Bengali Novels 1982-1987 Arun Kumar Mukhopadhyay, Calcutta, Minerva 2001.

4. Contemporary Bengali Literature Sukumar Ghosh, Calcutta

Academic, 2001.

5. Dictiionary of Litarary terms and Literary theory J.A. Cuddon, Penguin 1982.

6. Idea of comparative literature in India Amiya Dev, Calcutta, Papyrus, 1984.

7. Language of fiction David Lodge, 2nd Edition 1984, Rout Ledge & Kegan Paul.

8 Novel and the modern world David Daiches, rev. ed. Chicago University Press, 1965.

9. Novels of the modern epic Sisir Chattopadhyay, 2nd rev. Calcutta Firma KLM, 1965.

10. Novel in India, its birth and development T.W. Clark, London, George Allen & unwin, 1970.

11. Novel now, a student guide to contemporary fiction Anthony Burgess, London, Faber & Faber, 1971.

12. Novel to day : Contemporary writers on modern fiction Malcolm, ed Bradbury, London, Fontona, 1977.

13. Novelist on the novel Miriam Altot, London, Routledge & Kegan Paul, 1960.

14. Rajbansis of North Bengal Charu Chandra Sanyal, The Asiatic Society, Kolkata-16, First Published in 1965, Reprinted in 2002.

15. Social banditry in Bengal Ranjit Sen, Calcutta, Ratna, 1988.

পত্র পত্রিকা :

১) অনুষ্টুপ, Vol. XXXV, No.1, Oct. 2000	সম্পাদক: অনিল আচার্য
■ তিস্তাপারের অস্থির (?) বৃত্তান্ত	সুখ বিলাস বর্মা
২) উবুদশ, সেপ্টেম্বর ২০০২	সম্পাদক: সিদ্ধার্থ চৌধুরি
■ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : একটি সমীক্ষা	শিখা বসু
■ 'বারো ঘর এক উঠোন'—একটি বহুস্বরিক উপন্যাস	সুতপা ভট্টাচার্য
৩) উত্তর ধ্বনি শারদ ১৪০৯	সম্পাদক: বীরেন চন্দ
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা: প্রাকৃত পটভূমির বিশ্বস্ত রূপায়ণ	ড. গৌরমোহন রায়
৪) 'কিরাত ভূমি' জলপাইগুড়ি	
১২৫ বৎসর পূর্তি সংখ্যা ১৯৯৪	সম্পাদক : অরবিন্দ কর
■ পরিবর্তনশীল জীবনের স্রোতে	
জলপাইগুড়ির রাজবংশী সমাজ	শীতাংশু প্রসাদ চক্রবর্তী
■ তিস্তার পশ্চিমপাড়ের সেকালের আর্থ সামাজিক চিত্র	কেশব চন্দ্র দাস
■ River Management in the district of Jalpaiguri	Sri K.N.Kapoor, F.I.E. (IND)
৫) 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৩	সম্পাদক: সাগরময় ঘোষ
■ ছিন্নভিন্ন এই সময়ের আধুনিকতা	দেবেশ রায়
৬) নাট্যপত্র ঘরে বাইরে, প্রথম বার্ষিক সংখ্যা, জুলাই'০১	সম্পাদক: শেখর সমাদ্দার
■ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : উপন্যাস থেকে নাট্য	সুমন মুখোপাধ্যায়
৭) নীললোহিত ২০০১	সম্পাদক: বাসব দাশগুপ্ত
■ নদী : বাংলা উপন্যাস	শুভঙ্কর ঘোষ
■ উত্তরবঙ্গের নদী উপাখ্যান	ধনঞ্জয় রায়
■ বেদ ও পুরাণে নদী	বাসব দাশগুপ্ত
৮) প্রতিবিম্ব ২ পর্যায়, ২ সেপ্টেম্বর ২০০১	সম্পাদক : প্রশান্ত মাঝি
■ 'তিস্তাপুরাণ' প্রসঙ্গে	অভিরূপ দাস

LIBRARY ★ NBU ★ DARJEELING

৯) বিজ্ঞাপন পর্ব Vol. XVII, No.1, অক্টোবর-ডিসেম্বর '৮০- সম্পাদক: রবিন ঘোষ

■ বাংলা কথা সাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা — দেবেশ রায়

■ প্রত্যাখানের ভাষা — রুশতী সেন

■ দেবেশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার — শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১০) বারো মাস, ২৭ বছর, শারদ ২০০৫ — সম্পাদক : অশোক কুমার সেন

১১) মধুপর্ণী ২১ বর্ষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪ — সম্পাদক : অজিতেশ ভট্টাচার্য

■ পশ্চিম ডুয়ার্সের রাজবংশী সমাজ — ড. পবিত্র কুমার গুপ্ত

■ উপেন্দ্রনাথ বর্মন ও সত্যেন্দ্র প্রসাদ রায়ের সাক্ষাৎকার

■ জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষা:

অবস্থান, বিন্যাস ও সমস্যা — নির্মল দাশ

১২) শুভশ্রী ৪০ ও ৪১ বর্ষ (২০০২-২০০৩) — সম্পাদক : পুলক কুমার সরকার

■ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : আমাদের প্রান্তিক প্রকৃতি — জহর সেন মজুমদার

১৩) সাহিত্য সংস্কৃতি, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯২ — সম্পাদক : সঞ্জীব কুমার বসু

■ গঙ্গা-পদ্মা ধলেশ্বরী (নদী মাতৃক তিন উপন্যাসের আলোচনা) নিভা দে।

১৪) মাধ্যম ও সংযোগ, তৃতীয় বর্ষ :

বিশেষ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০০১। — সম্পাদক : সত্যসাধন পাল